কলাবতী সমগ্র

মতি নন্দী

কলাবতী সমগ্র

মতি নন্দী

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২
প্রচ্ছদ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-102-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১ বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

KALABATI SAMAGRA
[Collection of Novels]
by
Mati Nandi
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

২৫০.০০

সূচি

কলাবতীর দেখা শোনা ১
ভূতের বাসায় কলাবতী ৭৭
কলাবতী ও খয়েরি ১৭৩
কলাবতী, অপুর মা ও পঞ্চু ২৫৫
কলাবতী ও মিলেনিয়াম ম্যাচ ৩৩১
কলাবতীর শক্তিশেল ৪২১

গ্রন্থ-পরিচয় ৪৯৭

কলাবতীর দেখা শোনা

কলাবতীর অনেকদিনেরই বাসনা সে খবরের কাগজের খেলার রিপোর্টার হবে।

সে ভাল ক্রিকেট খেলে। বাংলা দলের হয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলেছে। সাংবাদিকরা পৃথিবীর কত জায়গায় গিয়ে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, এশিয়ান গেমস, অলিম্পিকস রিপোর্ট করে। সেইসব বিবরণ পড়তে পড়তে সে মনে মনে সেইসব খেলার মাঠে চলে যেত। রিপোর্টাররা কত বড় বড় খেলোয়াড়ের খেলা কত জায়গায় দেখেছে— টানব্রিজ ওয়েল্‌সে কপিলদেবের ১৭৫ নট আউট কিংবা ওভালে গাওস্করের ২২১, অলিম্পকসে কার্ল লুইসের চারটে সোনা, উইম্বলডনে সেলেস আর গ্রাফ, ইংল্যান্ডের চার-পাঁচজনকে কাটিয়ে মারাদোনার গোল, সোল এশিয়ান গেমসে পি টি উষা— ভাবলে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে মনে সে বলত, "আহ্‌হ্‌ আমি যদি তখন ওখানে থাকতাম! টিভি-তে দেখা আর মাঠে বসে দেখায় অনেক তফাত।"

সে জানে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় গিয়ে খেলা দেখার খরচটা প্রচুর। দাদু বা কাকার কাছ থেকে তার শখ মেটাবার জন্য অত টাকা চাওয়া উচিত নয়। অবশ্য এটাও সে জানে, আটঘরার প্রাক্তন জমিদার তার ঠাকুরদা রাজশেখর বা অবিবাহিত ব্যারিস্টার কাকা সত্যশেখর মাতৃহীন কলাবতীর কোনও সাধই অপূর্ণ রাখবেন না। কলাবতীর বাবা দিব্যশেখর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছেন, তখন দু'বছর মাত্র তাঁর মেয়ের বয়স। পুনেয় মাসির কাছে দশ বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়ে কলাবতী ফিরে আসে পৈতৃক বাড়িতে।

কাঁকুড়গাছি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে কলাবতী। একদিন তাদের ক্লাসে ইতিহাস পড়াতে পড়াতে বড়দি, অর্থাৎ হেডমিস্ট্রেস মলয়া মুখার্জি ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করেন, "বড় হয়ে তোমরা কী হতে চাও? কী তোমাদের ইচ্ছে?"

কেউ বলল ডাক্তার হতে চাই, কেউ বলল গায়িকা হতে চাই। এরপর কলকল স্বরে সারা ক্লাস ইচ্ছায় ইচ্ছায় ভরপুর হয়ে উঠল। পাইলট, হাইকোর্ট জাজ, পুলিশ, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, অভিনেত্রী, সমাজসেবিকা, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রোফেসারে ক্লাসঘরটা ভরে উঠল। বড়দি জানতে চাইলেন, "কেউ মন্ত্রী হতে চাও না?" সমবেত স্বরে চিৎকার উঠল, "না, না, না।"

কলাবতীই শুধু চুপচাপ বসে ছিল। বড়দি সেটা লক্ষ করে বললেন, "কালু তুমি?"

"বড়দি আমি স্পোর্টস রিপোর্টার হতে চাই।"

এ-কথা শুনে সারা ক্লাস অবাক হয়ে গেছল। হওয়ার মতো এত বিষয় থাকতে শেষে কিনা খবরের কাগজের চাকরি!

"স্পোর্টস জার্নালিজম তো পুরুষদের একচেটিয়া, ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, কলকাতায় যত পপুলার খেলা সেখানে তো পুরুষদেরই প্রাধান্য, মেয়েদের নামই তো কাগজে দেখি না। প্লেয়াররা পুরুষ তাই রিপোর্টাররাও সব পুরুষ, তুমি কি তাদের সঙ্গে সেখানে কাজ করতে পারবে?" বড়দি কথাটা বলে মুচকি হাসলেন।

"না পারার কী আছে!" কলাবতী মুচকি হাসিটাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই বলল, "পাইলট কি পুলিশ অফিসার যদি মেয়েরা হতে পারে তা হলে স্পোর্টস রিপোর্টার কেন হতে পারবে না? তা ছাড়া হচ্ছেও তো। আমিই তো একবার এক মেয়ে রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলেছি।"

"কোন খবরের কাগজের রিপোর্টার?"

কলাবতী এবার একটু চুপসে গেল। ইতস্তত করে বলল, "খবরের কাগজ নয়, একটা ম্যাগাজিন থেকে মেয়েটিকে পাঠিয়েছিল, সঙ্গে ছিল ফোটোগ্রাফার। বলল, আমাকে নিয়ে ফিচার লিখবে।"

"লিখেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কই, আমাকে দেখাওনি তো!" মধ্য চল্লিশ, অবিবাহিতা বড়দির স্বরে কিঞ্চিৎ অভিমান। কলাবতী তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী, নিজের মেয়ের মতোই

ওকে শাসন ও ভালবাসা দিয়ে যতটা পারেন ঘিরে থাকেন। যদিও বকদিঘির মুখুজ্জেবাড়ি আটঘরার সিংহীদের কাছে 'শত্রু' বাড়ি, তা সত্ত্বেও মলয়া মুখুজ্জেদের বাগমারির বাড়িতে কলাবতীর অবাধ যাতায়াত তার দশবছর বয়স থেকেই। এই নিয়ে ক্লাসের কেউ কেউ তাকে ঈর্ষা করে, হাসাহাসিও হয়।

"বড়দি লেখাটা কেন আপনাকে দেখায়নি কালু, আমি সেটা জানি।" কলাবতীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুস্মিতা পট করে বলে উঠল।

"না দেখাবার মতো কিছু তাতে আছে নাকি?"

কলাবতীর কটমট দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে সুস্মিতা বলল, "ওকে ইন্টারভিউ করেছিল ওদের বাড়িতে, সেখানে তখন ওর দাদু আর কাকাও ছিলেন। তাঁরা ওঁদের গ্রামের একটা বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচের কথা তখন সেই রিপোর্টারকে বলেন।"

"হ্যাঁ, আমাদের গ্রাম বকদিঘির সঙ্গে কালুদের গ্রাম আটঘরার মধ্যে সেই ম্যাচ প্রতি বছর হয়। আমি তো সেই খেলা গত বছর দেখেছি।" মলয়া মুখুজ্জে সাধারণ স্বরে কথা বলতে বলতে হেসে ফেললেন। "তা সেই ম্যাচের কথা উঠল কেন, ওটা তো বয়স্কদের একটা ছেলেমানুষি রাইভাল্‌রি!"

সুস্মিতা বলল, "ওই ম্যাচে কালুদের বংশের তিন পুরুষ— দাদু, কাকা আর নাতনি এক ইনিংসে ব্যাট করে নাকি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে। কালু ছেলের ছদ্মবেশে ব্যাট করে শেষ মুহূর্তে আটঘরাকে জিতিয়েছিল। তখন বকদিঘির একজন ওর ছবি তুলে রেখেছিলেন আর সেটা কালুদের বাড়িতে পাঠিয়ে তিনি জানিয়ে দেন সিংহীরা নিয়ম ভেঙে একটা মেয়েকে খেলিয়ে অন্যায়ভাবে জিতেছে। সুতরাং ম্যাচের রেজাল্ট খারিজ। সেই সঙ্গে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটাও খারিজ।"

বড়দি মুখ টিপে, বড় বড় চোখ করে সুস্মিতার কথা শুনে যাচ্ছিলেন। সে থামতেই তিনি বললেন, "সেই ছবি যে তুলেছে তার নামটাও কালুর দাদু নিশ্চয় বলেছেন।"

সুস্মিতার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কলাবতী চাপা গলায় বলল, "সুসি খবরদার!"

"সুসি নামটা বল।" একজন সুস্মিতার পিঠে কলমের খোঁচা দিল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নামটা বলে দে।" আর-একজন উসকে দিল।

"থাক থাক, নাম নিয়ে তোমাদের অত ব্যস্ত হতে হবে না। আমি বলে

দিচ্ছি, সেই লোকটা আমিই, যে ছবিটা তুলেছিল। তাতে হয়েছে কী? পুরুষদের ম্যাচে একটা মেয়েকে না বলেকয়ে খেলালে সেটা তো বেআইনি, ক্রিকেট তো ভদ্রলোকের খেলা।" মলয়া মুখার্জির গলা থেকে শেষবাক্যটি একটু ঝাঁঝ নিয়ে বেরিয়ে এল।

"কিন্তু কালুর দাদু বলেছেন,—" সুস্মিতা নিজেকে সামলে নিয়ে থেমে পড়ল।

"কী বলেছেন?"

"বলেছেন যে—" সুস্মিতা ঢোক গিলল।

"সুসি মেরে ফেলব।" কলাবতী চাপা হুমকি দিল।

"কালু, তুমি চুপ করবে কি?" বড়দি ধমক শেষ করে বললেন, "হ্যাঁ, বলো সুস্মিতা।"

"বলেছেন যে বকদিঘির মুখুজ্জেরা হিংসুটে। ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটা সহ্য করতে না পেরে, একটা সাজানো ছবি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছে কালু ওই ম্যাচে খেলেছিল।"

"সাজানো ছবি! আমি সাজানো ছবি তুলেছি?" বড়দি প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কী! "এমন মিথ্যে কথা আমার নামে? সুস্মিতা তুমি লেখাটা ঠিকমতো পড়েছ তো? কথাটা কালুর কাকা বলেননি তো?"

"বড়দি।" এতক্ষণে কলাবতী কথা বলল, "বড়দি, দাদু কিন্তু ওই ফিচার-লেখকের কাছে স্বীকার করেছিলেন তাঁর নাতনি ছেলে সেজে খেলেছিল আর সেইজন্যই তিন পুরুষের রেকর্ডটা হতে পেরেছে। দাদুর আপত্তি ছিল, ছবির প্রমাণ দিয়ে রেকর্ডটা খারিজ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে। বলেছিলেন, স্পোর্টিং হয়নি। কিন্তু এসব কথা ফিচার-লেখক লেখেননি। তিনি ঝগড়াঝাঁটির কথাই বেশি করে লিখেছেন। 'সাজানো ছবি' এই কথাটা তিনি নিজেই বানিয়ে লিখেছেন। দাদু প্রতিবাদ করে চিঠি দিয়েছিলেন, ছাপেনি।"

"কাগজে তো এখন খেলার বদলে দলাদলি, পলিটিক্স আর মামলার খবরেই ভরা থাকে বলে শুনি। তা কালু, তুমি তো খেলার রিপোর্টার হতে চাও, নিশ্চয় যথার্থ যা দেখবে, শুনবে, বুঝবে সেইসবই লিখবে তো?"

"হ্যাঁ বড়দি।"

সেদিন ক্লাসে এই নিয়ে আর কথা হয়নি। রাত্রে খাবার টেবিলে কলাবতী তার দাদু আর কাকার উপস্থিতিতে ঘোষণার মতোই বলল, "আমি স্পোর্টস রিপোর্টার হতে চাই।"

এবার পূর্বকথা কিছু জানিয়ে রাখা দরকার। যদিও অনেকেই পুরনো অনেক ঘটনাই জানেন, তা হলেও স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য অল্প কথায় আবার বলে নিচ্ছি:

হুগলি জেলায় আটঘরা আর বকদিঘি নামে পাশাপাশি দুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। দুই গ্রামের দুই জমিদার বংশ, আটঘরার সিংহ আর বকদিঘির মুখুজ্জেদের মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল থেকেই শত্রুতার পত্তন। সেটা দুই পুরুষ ধরে খুবই উচ্চস্তরে বজায় ছিল। লাঠালাঠি, ঘর জ্বালানো, খুন করা, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদির পর তাদের ছেলেরা শহর কলকাতায় বিশাল বাড়ি বানিয়ে বসবাস এবং ইংরেজি শিক্ষা, এই দুইয়ের কল্যাণে প্রকাশ্য শত্রুতা ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু বন্ধ বললেই কি আর বন্ধ হয়! আকচা-আকচি, পায়ে পা লাগিয়ে কলহ, রেষারেষি এসব ব্যাপার অব্যাহত ছিল। অথচ দুই বাড়ির মধ্যে কী যেন একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বন্ধুত্বের অদৃশ্য বন্ধনও ছিল যেটা তারা কিছুতেই প্রকাশ্যে মানত না। ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া শুরু করে দেয় সুযোগ পেলেই। সিংহবাড়ির ছেলে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করছে খবর পেয়েই মুখুজ্জেবাড়ির ছেলে রবিবার গির্জায় ছুটল। মুখুজ্জেদের কেউ ওস্তাদ রেখে ধ্রুপদ শিখছে জানামাত্রই সিংহবাড়ির ছেলে ময়দানের ক্রিকেট ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেল। জ্ঞানশঙ্কর মুখুজ্জে দুর্গোৎসবে সাতজন সাহেব এনেছিলেন বেনারসের জামিলা বাই-এর ঠুমরি শোনাতে। দু'মাস পরেই বলেন্দ্রশেখর সিংহ ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করলেন টাউন ক্লাব মাঠে। বিপক্ষে খেলেছিল এগারোটা সাহেব। তবে একই বছরে উমাশঙ্কর ও সোমেন্দ্রশেখর রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়ায়, দুই বাড়ির শঙ্কর ও শেখররা খুবই মুষড়ে পড়ে কেউ কাউকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারায়। ছোটলাটের ওপর এজন্য ওরা খুবই চটে যায়।

বোধহয় সেইজন্যই ১৯২১-এ গাঁধীজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুখুজ্জেরা। দেশের নানাদিকে হরতাল, ধর্মঘট, পুলিশের গুলিচালনা, খাজনা বন্ধ আর বিদেশি বস্ত্র পোড়ানো শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গাঁধীজির এই আন্দোলনের অনেক কিছুই পছন্দ করলেন না। এই দু'জনের সাক্ষাৎ হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। গাঁধীজি এসেছেন শুনে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল বাড়ির চারধার। গাঁধীভক্তরা ওইসময় ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে বিলিতি কাপড় পোড়াতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথকে

উপযুক্তভাবে সমঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তার মধ্যে উমাশঙ্করের ছোট ভাই দয়াশঙ্করও ছিল।

এই খবর সিংহবাড়িতে যথাসময়ে পৌঁছোল। এক সন্ধ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত খদ্দর সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক একটি কবিতা সোমেন্দ্রশেখর পড়ে শোনাচ্ছিলেন বৈঠকখানায়। চরকার সুতো কেটে, বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে স্বরাজ আসবে না, শুধু বক্তৃতাতেও নয়, আসবে বোমা, পিস্তল, আর সন্ত্রাস মারফত, এটাই ছিল কবিতাটির বক্তব্য। শেষে বলা হয়েছে, "বলিস মোদের স্বরাজ সাধনা।/অশনে বসনে বন্ধ নয়,/ গোলাগুলি বোমা ইহারও উপরে/খাঁটি বেদান্ত ইহাতে রয়।" পড়া শেষ করে তিনি সতেরো বছরের বড় ছেলে গুণশেখরকে জিজ্ঞেস করেন, "বুঝলে কিছু?" ছেলেটি মাথা হেলায় এবং অচিরেই জানা গেল সে অনুশীলন পার্টিতে যোগ দিয়েছে।

এর কয়েক মাস পর এক বিকেলে বারান্দায় বসে উমাশঙ্কর মানিকতলা ব্রিজের দিক থেকে বোমা পড়ার দুটো এবং রাইফেলের তিনটে আওয়াজ পেলেন। ভাই দয়াশঙ্করকে বললেন, "খোঁজ নিয়ে দ্যাখ তো।" সন্ধের সময় দয়াশঙ্কর পাংশু মুখে দাদাকে জানাল, "পুলিশের ডি সি ব্ল্যাক ওয়াটার্সের গাড়িতে বোমা মেরেছে গুণশেখর। পুলিশের গুলি ওর পেটে ঢুকেছে, সেই অবস্থায় দৌড়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে আমাদের বাগানে নামে।"

উমাশঙ্কর প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "সোমের ছেলেটা এখন কোথায়?"

"আমার শোবার ঘরে।"

"দরজাটা বন্ধ করে রাখ। কেউ দেখেছে?"

"অনুকূল আর ভোঁদার মা।" অর্থাৎ মালি এবং দিনরাতের কাজের বউ।

"ওদের বলে দে, কারও পেট থেকে পুলিশ যদি একটা কথাও বের করে," দোনলা বন্দুকটা দেওয়াল থেকে পেড়ে উমাশঙ্কর জানিয়ে দেন, "তা হলে দুটো গুলি দুটো পেটে ঢুকবে।"

পুলিশ খোঁজ করতে করতে মুখুজ্জেবাড়িতেও আসে।

"কী বলছেন দারোগাবাবু, এই গাঁধীবাদী বাড়িতে লুকোবে টেররিস্ট! ধরতে পারলে আমি নিজে গিয়ে আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে আসব। সরকার বাহাদুর কি অমনি অমনি রায়বাহাদুর খেতাবটা দিয়েছেন?... ডি সি সাহেব বেঁচে গেছেন তো!"

ডি সি সাহেব মারা যাননি। উমাশঙ্কর অতঃপর তাঁর বাল্যবন্ধু এক

ডাক্তারকে ডাকিয়ে এনে বাড়িতেই গুণশেখরের পেট থেকে গুলি বের করান। তিন সপ্তাহ পর এক রাত্রে শাড়ি-পরা ঘোমটা দেওয়া গুণশেখরকে ব্রুহামে চড়িয়ে সিংহবাড়িতে গিয়ে সোমশেখরের হাতে তুলে দিয়ে বলে আসেন, "শুধু হব্‌স আর রোড্‌সের রানের, উইকেটের খবর রাখলেই কি চলবে, গানবাজনার চর্চা একটু কর। ছেলেটা যে গোল্লায় যাচ্ছে সেদিকে একটু নজর দে।" মাস ছয়েক পর গুণশেখর বোম্বাই থেকে জাহাজে ইংল্যান্ড পাড়ি দেয় ব্যারিস্টার হয়ে আসার জন্য। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। বিয়ে করে ওইখানেই বসবাস ও ব্যাবসা শুরু করে দেয়।

রানিগঞ্জে কয়লাখনি নিলামে চড়বে বলে আচমকা একদিন উমাশঙ্করের কাছে নোটিশ এল। মাথায় হাত দিয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এই মুহূর্তে নগদ অত টাকা তাঁর হাতে নেই। খনির সবকিছু দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ম্যানেজারকে তিনি খুবই বিশ্বাস করতেন। উমাশঙ্কর রানিগঞ্জে গত পাঁচ বছরে দু'বার মাত্র গেছেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, তলায় তলায় ম্যানেজারটি টাকা সরিয়ে এবং ঋণের জালে খনিটিকে জড়িয়ে দিয়ে সটকান দিয়েছে। আগামীকালের মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা শোধ না করলে খনি হাতছাড়া হয়ে যাবে।

খবরটা সেইদিনই কীভাবে যেন পৌঁছে গেল সিংহীবাড়িতে। একটু বেশি রাতেই সোমশেখরের ফোর্ড গাড়িটা থামল মুখুজ্জেবাড়ির পোর্টিকোয়। শয্যা-নেওয়া উমাশঙ্কর খবর পেয়ে নীচের বৈঠকখানায় নেমে আসতেই কোনও ভূমিকা না করে সোমশেখর একটা গয়নার বাক্স টেবিলে রেখে বললেন, "এটা তোর বউঠানের, পাঠিয়ে দিল। সোনা, জড়োয়া সব মিলিয়ে ষাট হাজার টাকার তো হবেই। কাল সক্কালেই জোড়াবাগানে গিয়ে হরি পালের গদিতে এগুলো বন্ধক রেখে টাকা নিবি, তারপর সোজা রানিগঞ্জ দৌড়োবি। আমার গাড়িটা ড্রাইভার সমেত রেখে যাচ্ছি।" উমাশঙ্কর কুণ্ঠিতভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে সোমশেখর বলে ওঠেন, "শুধু আবদুল করিম আর হাফেজ আলির তানকারি লয়কারি নিয়েই কি চলবে? লেটকাট, গ্লান্স কী জিনিস সেটাও একটু বোঝার চেষ্টা কর।"

এঁদেরই দুই পুত্র রাজশেখর ও হরিশঙ্কর দুই বংশের রেষারেষির ঐতিহ্য আজও বহাল রেখেছেন এবং যথারীতি একজন তাঁর পুত্র সতু অর্থাৎ সত্যশেখর, অন্যজন তাঁর কন্যা মলু অর্থাৎ মলয়ার মধ্যে এই বিচিত্র শত্রুতার ধারাটি সফলভাবে প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছেন। রেষারেষিটা বকদিঘি ও

আটঘরা গ্রামের মধ্যেও ছড়িয়ে যায় যখন এই দুই পরিবারের উদ্যোগে 'হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে' নিয়মে একটা বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচ চালু হয়। গত বছর আটঘরার ওপর দায়িত্ব পড়েছিল ম্যাচ অনুষ্ঠানের। সেই ম্যাচে নিয়ম লঙ্ঘন করে কলাবতী ব্যাট করেছিল ছেলের বেশ ধরে। এবং তার ব্যাটিং-এর জন্যই আটঘরা ম্যাচটা জেতে। ব্যাট করার একটা সময়ে হুক করতে গিয়ে তার মাথা থেকে পানামা হ্যাটটা পড়ে যায় আর মলয়া ঠিক তখনই তার ছবিটা তুলে নেন। সেই ছবিতে পরিষ্কার ধরা পড়ে ব্যাটসম্যানটি আসলে ব্যাটসউওম্যান কলাবতী।

এই সবই হল পেছনের কাহিনি। স্কুলের ক্লাসে ওই ম্যাচটার কথা সুস্মিতা খুঁচিয়ে তোলার পর থেকেই বড়দির বিব্রত মুখটা আর ওই কথাগুলো— "সাজানো ছবি! আমি সাজানো ছবি তুলেছি? এমন মিথ্যে কথা আমার নামে?" বারবার ঘুরে আসছিল কলাবতীর মনে। সে তামা-তুলসী ছুঁয়ে বলতে পারে দাদু ওই কথা বলেননি। বড়দিকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। দুই বাড়ির মধ্যে যতই আকচা-আকচি থাকুক রাজশেখর সিংহ এমন অভিযোগ মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে সম্পর্কে কখনওই করবেন না। কথাগুলো সম্পূর্ণ বানিয়ে লিখেছে সেই ফিচার-লেখিকা, যার নাম দেবরিনা সেন। বস্তুত স্পোর্টস রিপোর্টার হওয়ার ইচ্ছাটা কলাবতীর মধ্যে উসকে দিয়েছিল দাদুর মুখে বসিয়ে দেওয়া "একটা সাজানো ছবি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছে" কথাটা। সে লেখাটা পড়েই ঠিক করে আসল সাংবাদিকতা কাকে বলে দেখিয়ে দেবে দেবরিনা সেনদের, অবশ্য যদি সুযোগ পায়। আর সেই রাতেই খাওয়ার টেবিলে সে ঘোষণা করল, "আমি স্পোর্টস রিপোর্টার হতে চাই।"

রাজশেখর ও সত্যশেখরকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে কলাবতী মৃদুস্বরে বলল, "আজ স্কুলে কী লজ্জায় যে পড়তে হল! সুস্মিতা বড়দিকে সব বলে দিয়েছে।"

"কী বলে দিয়েছে?" সত্যশেখর জানতে চাইলেন।

"সেই 'ক্রিকেটের কলাবতী' লেখাটার কথা।" অপরাধীর মতো গলায় কলাবতী বলল।

"বলেছে তো কী হয়েছে?"

"সাজানো ছবি শুনে বড়দি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন।"

"আহ্হ্, মনে আঘাত পাওয়ার মতোই তো কথাটা।" রাজশেখর সহানুভূতি আর মমতা মেশালেন কথাগুলোয়। "তুই বলেছিস তো ওসব কথা আমি বলিনি।"

কলাবতী ঘাড় নাড়ল।

"ব্যস, তা হলে তো ব্যাপারটা চুকেই গেল।" সত্যশেখর উৎসুক চোখে খাবারের ট্রে হাতে প্রবেশ করা মুরারির দিকে তাকিয়ে বললেন।

"না চোকেনি।" রাজশেখর কঠিন স্বরে ছেলেকে ধমক দিলেন। "মলয়া কেঁদে ফেলেছে যখন—"

"কেঁদেছে কোথায়! কালু বলল না, প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। 'প্রায়' শব্দটা লক্ষ করো।" সত্যশেখর সওয়াল করার ভঙ্গিতে আঙুল দিয়ে 'প্রায়'-কে খোঁচা দিলেন।

রাজশেখর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। "এখনই একটা চিঠি লিখব মলয়াকে। কালু, তুমি কাল ফার্স্ট পিরিয়ডের আগেই ওকে চিঠিটা দেবে।"

"খেয়ে উঠেই বরং তুমি লিখো, অত তাড়া কীসের।" সত্যশেখর বললেন, "কালু আর একটা যে কথা বলল সেটা কি শুনেছ? স্পোর্টস রিপোর্টার না কী যেন হবে বলল।"

রাজশেখর চেয়ারে আবার বসে পড়লেন। গলাখাঁকারি দিয়ে একটা রুটি প্লেট থেকে তুলে কেমন সেঁকা হয়েছে তাই পরীক্ষা করতে করতে বললেন, "এদেশে মেয়েরা স্পোর্টস রিপোর্টার হয় না। জলসার হয়, রাজনীতির হয়, সিনেমা, ফ্যাশন, ছবির একজিবিশন, ধর্মসভা, সাহিত্যসভা সবকিছুরই মেয়ে রিপোর্টার হয়, কিন্তু খেলার হয় না।"

"ঠিক, হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট।" সত্যশেখর রুটির টুকরো ডালের বাটিতে ডোবালেন। "কোনও মেয়েকে ফুটবল ম্যাচ রিপোর্ট করতে দেখেছিস, কোনও মেয়ের লেখা ক্রিকেট ম্যাচের রিপোর্ট পড়েছিস? অ্যাথলেটিক্স, সুইমিং, টেনিস, শুটিং, কিত্‌কিত্, বক্সিং, ওয়েট লিফটিং—"

রাজশেখর হাত তুলে ছেলেকে থামালেন। "সতু আর তোমাকে লিস্টি পড়তে হবে না। খেলা আর খেলোয়াড় সম্পর্কে আগের সেই ধ্যানধারণা এখন তো আর নেই। এখন কাগজ খুললেই ক্লাবের সঙ্গে প্লেয়ারদের টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া, বাকি টাকা না পেলে ওরা পায়ে বল ছোঁয় না। তার ওপর আছে প্লেয়ারের সঙ্গে কোচের মন কষাকষি, খেলার মধ্যেই রেফারির কানধরা, তাঁকে লাথি মারা এইসবই তো পড়তে হয়।"

"শুধু কি তাই? দাঙ্গাহাঙ্গামার কথাটাও বলো। ইট ছোড়া, গ্যালারি আর টেন্টে আগুন, ক্ষুর মারা, ব্লেড চালানো!"

"সতু, আর বলার দরকার নেই। কালু এতক্ষণ তো সব শুনলে। খেলাধুলোর হাল যেখানে অমন, তখন একটা মেয়েকে আমি রিপোর্টারি করতে পাঠাতে পারি কি?"

কলাবতী মুখ নামিয়ে খেয়ে যাচ্ছে আর কী যেন ভেবে চলেছে। হঠাৎ একচিলতে হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। চিন্তিত মুখে সে বলল, "বড়দিও আজ ঠিক তোমাদের কথাগুলোই বললেন।"

ওঁরা দু'জনেই খাওয়া থামিয়ে সচকিতে তাকালেন। প্রথমে সত্যশেখর বললেন, "মলয়া তোকে মাঠে যেতে বারণ করেছে?" তারপর রাজশেখর বললেন, "মুখুজ্জেদের মেয়ে খেলার মাঠের বোঝেটা কী?"

"জানি না বোঝে কি না-বোঝে, তবে বড়দি স্পোর্টস নিয়ে মেয়েদের লেখালেখি যে একদমই পছন্দ করেন না সেটা খুব ভালভাবে আজ জানিয়ে দিয়েছেন। বললেন, 'দেখো তোমার দাদু আর কাকাও আমার সঙ্গে একমত হবেন।' এখন দেখছি বড়দির কথাই ঠিক।"

"ঠিক! ওর সঙ্গে আমরা একমত? মুখুজ্জেদের মেয়ে যা বলবে আমরাও তাই বলব?" রাজশেখর হাতের রুটিটা একটানে দু'টুকরো করে আবার সেটা চার টুকরো করলেন।

"মলয়া কি মনে করে মুখুজ্জেরা কাওয়ার্ড বলে সিংহীরাও কাওয়ার্ড? ইট মারে, ক্ষুর চালায় বলে সিংহীদের মেয়ে ভয়ে মাঠে যাবে না?" সত্যশেখর তাঁর বাবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলেন।

"মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে পছন্দ করে না বলে সিংহীবাড়ির মেয়ে মাঠে গিয়ে রিপোর্টিং করবে না, তাই কখনও হয়? কালু তোমার ফাইনাল পরীক্ষাটা শেষ হোক, তারপর দেখি 'বঙ্গবাণী'-তে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা।" কথাটা বলেই রাজশেখর আলু-কপির ডালনায় মনোনিবেশ করলেন।

"বঙ্গবাণী? বাংলা কাগজ কেন? 'স্টেটসম্যান' বা 'টেলিগ্রাফ' নয় কেন? কালু তো ইংরিজি লিখতে পারে।" সত্যশেখর উত্তেজিত হয়ে আঙুলে লাগা ঝোল চাটতে শুরু করলেন।

"সতু আঙুল চাটা বন্ধ করো।... ইংরিজি কাগজে লেখাটা চাট্টিখানি কথা নয়। নেসফিল্ড গুলে না খেলে নির্ভুল ইংরিজি লেখা যায় না। কালুদের স্কুলে কার লেখা যেন গ্রামার পড়ায়, নেসফিল্ডের যে নয়, তা আমি জানি।"

"মুখুজ্জেদের মেয়ে যে-স্কুলের হেডমিস্ট্রেস সেখানে নেসফিল্ড আশা করা যায় না। মলয়া তো একলাইন ইংরিজি লিখতে পারে না।" সত্যশেখর চাটার জন্য আঙুলটা মুখের কাছে এনেই নামিয়ে নিলেন।

"কাকা, তুমি একবার আমায় বলেছিলে—"

"কী বলেছিলুম?" সত্যশেখর সন্ত্রস্ত হয়ে ভাইঝির দিকে তাকালেন। কলাবতী মুখ টিপে হাসছে দেখে তিনি আরও ঘাবড়ে গেলেন।

"বলব দাদুকে?"

"বল না।" সত্যশেখর চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে থুতনি তুলে চ্যালেঞ্জ জানাবার ভঙ্গিতে আবার বললেন, "বল কী বলবি।"

"জানো দাদু বিলেতে থাকার সময় 'লন্ডন টাইমস'-এ একটা চিঠি ছাপাবে বলে, চিঠিটা লিখে কাকা প্রথমে সেটা বড়দিকে পড়তে দিয়েছিল। কাকা নিজে আমায় এ-কথা বলেছে।"

"কেন?" রাজশেখরের স্বরে বজ্রনির্ঘোষ। সত্যশেখরের খাড়া শরীর তার ফলে নুয়ে পড়ল। চল্লিশের ওপর বয়স হলেও বাবার কাছে তিনি এখনও বালক।

"উত্তর দাও সতু।"

"মানে খুব তাড়াহুড়োয় লিখেছিলাম তো। হয়তো ইংরেজির ভুলটুল থেকে যেতে পারে, তাই আর-একজনকে দিয়ে—"

"হরির মেয়েকে দিয়ে তাই ইংরিজি কারেকশন করিয়েছ! আর কোনও লোক পেলে না? শেষে কিনা হরির মেয়ে, উফ্‌ফ্‌! তোমাকে বিলেত পাঠানোটাই আমার বোকামি হয়েছে।"

বোধহয় জীবনে এই প্রথম রাজশেখর স্বীকার করলেন তাঁর বোকামির কথা। কিন্তু পঁচিশ বছর আগে যখন তিনি খবর পান হরিশঙ্করের মেয়ে উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যাচ্ছে, তখন উত্তেজনায় তাঁর কেশর ফুলে ওঠে। ওদের মেয়ে বিলেতে যাবে আর সিংহীবাড়ির ছেলে শুধুই এম এ, এল এল বি হয়ে ওকালতি করবে? হতেই পারে না। মলয়ার এক মাস পরই সত্যশেখর হিথরো এয়ারপোর্টে নামেন ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য। যে-কথাটা তিনি এখনও পর্যন্ত কাউকে বলেননি, এমনকী কলাবতীকেও নয়, তাঁর চিঠি পেয়ে হিথরোয় কিন্তু অপেক্ষা করছিলেন মুখুজ্জেবাড়ির মেয়েটিই।

"সতু, তোমাকে ব্যারিস্টার হতে বিলেত পাঠিয়েছিলুম, চিঠি লেখার জন্য নয়। হরির পয়সায় মলয়া গিয়েছিল ডক্টরেট করতে, চিঠি কারেকশন করে

দেওয়ার জন্য নয়।"

"আজ্ঞে, আমরা দু'জনেই তো—"

"পাশ করেছ, থিসিস লিখেছ, ব্যস, তা হলেই ল্যাঠা চুকে গেল। তুমি হরির মেয়েকে দিয়ে ইংরেজি ঠিক করিয়েছ, নিশ্চয় এটা হরি জেনেছে, নির্ঘাত ও বলে বেড়িয়েছে সিংহীরা মুখ্যু। উফ্‌ফ্‌।'"

"দাদু, ওসব তো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কথা। এই নিয়ে এখন আবার প্রবলেমে পড়ছ কেন?" কলাবতী তার দাদুর আহত মর্যাদায় প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করল।

সারা ঘর অতঃপর চুপ। কলাবতী ভাবতে লাগল, বঙ্গবাণী-তে দাদু কীভাবে ব্যবস্থাটা করবেন? অনেক গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোকেদের সঙ্গে দাদুর চেনাজানা আছে, হয়তো বঙ্গবাণীর সম্পাদকের সঙ্গেও আছে।

"সতু, তোমার চিঠির বিষয়টা কী ছিল?"

"বেড়ালের ডাক, মানে বেড়ালদের ঝগড়া।"

"কী বললে!" রাজশেখর চামচে দই তুলে মুখের দিকে আনছিলেন, সেটা প্লেটের ওপর পড়ে ছিটকে গেল।

"বেড়ালেরা এমন ঝগড়া শুরু করত যে, রাতে ঘুমোতে পারতুম না।" সত্যশেখরের কাঁচুমাচু মুখ আরও অবনত হল।

"তা মলয়া তোমার চিঠিটাকে কী করল?"

"ধুয়েমুছে এমন সাফ করে দিল যে, চিঠির বক্তব্যই বদলে গেল। আমি খুব বিনীতভাবেই বলেছিলাম রাত্তিরে বেড়ালদের ঘরে বেঁধে রাখলে ভাল হয়। টেনস, সিনট্যাক্স, প্রিপোজিশন, একটা ভুলও মলয়া বের করতে পারেনি। ও কিন্তু চিঠিটার বক্তব্যকে ঘুরিয়ে, সাহেবদের বেড়াল পোষার ওপর কষে গালাগাল দিয়ে চিঠিটাকে একেবারে উলটে দিল।"

"গালাগাল...হরিরই মেয়ে তো, এসবে পোক্ত তো হবেই।" রাজশেখরকে কিঞ্চিৎ নরম দেখাল। আয়েশি গলায় জানতে চাইলেন, "কী লিখেছিল মেয়েটা?"

ইতস্তত করে সত্যশেখর বললেন, "এত বছর আগের কথা তো ঠিকঠাক মনে নেই। তবে বেড়ালদের ওপর একটা থিসিসের মতো হয়েছিল। প্রমাণ করতে চেয়েছিল লন্ডনের বেড়ালরা কলকাতার বেড়ালদের থেকে বেশি অসভ্য, বেশি বোকা, বেশি ঝগড়ুটে। চিঠিটা বেশ বড় হয়েছিল, কিন্তু পুরোটাই ছেপেছিল, কুকুর-বেড়ালদের জন্য ওরা কাগজে জায়গা দেয়।"

"দেবেই তো, ইংরেজরা সভ্য জাত! চিঠির রিঅ্যাকশন কিছু হয়েছিল?"

"হবে না মানে! আমাকে ডবল গালাগাল দিয়ে চারদিন ধরে চিঠি বেরোল। তার কী ভাষা! পারলে আমাকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে খায় আর কী!" সত্যশেখর শিউরে উঠলেন পঁচিশ বছর পর।

"হরির মেয়ে তো সিংহীদের গালাগাল খাওয়াল। কালু আমি তোমায় একটা চিঠি লিখে দেব, সদানন্দকে গিয়ে দেবে।"

"কে সদানন্দ?" কলাবতী জিজ্ঞেস করল।

"বঙ্গবাণীর মালিক।" রাজশেখর চেয়ার থেকে উঠে ঘরের কোণে বেসিনে গিয়ে দাঁড়ালেন। "সদানন্দর বাবা শ্যামানন্দ কাব্যতীর্থ আটঘরা স্কুলে বাংলা পড়াতেন, আমি পড়েছি ওঁর কাছে। স্কুলে আমার থেকে পাঁচ ক্লাস নীচে পড়ত সদানন্দ, খবরের কাগজ বের করল। একদিন আমার কাছে ছুটে এল। ব্যাপার কী? এখনই দশ হাজার টাকা ধার না মেটালে কাগজওলা ওকে আর কাগজ দেবে না। আমায় টোপ দিয়ে বলল টু পারসেন্ট সুদও দেবে। আমি অবশ্য সুদটুদ নিয়ে কাউকে ধার দিই না। সে প্রায় হাতে-পায়ে ধরাধরি, টাকা না পেলে কাল তা হলে কাগজ বের করতে পারবে না। দিলাম টাকা।"

"টাকাটা শোধ দিয়েছে?" সত্যশেখর কৌতূহল দেখালেন।

"দিয়েছে এগারো বছরে তিন খেপে।"

"আর সুদ?" কলাবতী জানতে চাইল।

রাজশেখর সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন, "সেটাই তো এবার আদায় করব। একটা চিঠি লিখে দেব, তুমি সেটা নিয়ে সদানন্দর সঙ্গে দেখা করবে।"

"আমিও কালুর সঙ্গে যাব।" সত্যশেখর তাঁর কাঁচাপাকা চুলের মধ্যে বাঁ হাতটা বুলিয়ে দইমাখা একটা আঙুল চাটার জন্য মুখে ঢোকালেন।

"সতু'" একটা বজ্রনির্ঘোষ গড়িয়ে এল সত্যশেখরের দিকে। আঙুলটা মুখ থেকে পড়ে গেল। "তুমি কেন ওর সঙ্গে যাবে? যে রিপোর্টার হতে চায় তাকে একাই সবকিছু সামাল দিতে হয়। সাংবাদিকতা হল ক্রিজে দাঁড়িয়ে ব্যাট করার মতো। এগারোজন লোক তোমাকে হারাতে চায়... এগারোটা কাগজের লোক শেয়ালের মতো ঘুরছে ছোঁ মেরে খবর তুলে নেওয়ার জন্য। কখন গুগলিটা তোমাকে ব্যাট-প্যাড ক্যাচ তোলাবে, শর্ট লেগ সেজন্য অপেক্ষা করে আছে। টাফ ওয়ার্ল্ড, ভেরি কম্পিটিটিভ এই নিউজপেপার ওয়ার্ল্ড।"

"তার ওপর স্পোর্টস রিপোর্টিংটা একেবারেই পুরুষদের জগৎ।" সত্যশেখর কথাটা মনে করিয়ে দিলেন।

"বড়দিও তাই বললেন। পুরুষ প্লেয়ার, পুরুষ অফিশিয়াল, পুরুষ দর্শক, পুরুষ রিপোর্টার, আমি সেখানে কি কাজ করতে পারব?"

"মলয়া একটা সবজান্তা। তুই পারবি কি পারবি না সেটা ও জেনে বসে আছে! আলবাত পারবি।" সত্যশেখরকে একটু বেশিই ক্রোধান্বিত দেখাল। "তুই একাই চিঠি নিয়ে বঙ্গবাণীতে সদানন্দ কাব্যতীর্থের কাছে যাবি।"

"কাকা, সদানন্দ নয়, ওঁর বাবা ছিলেন কাব্যতীর্থ। ইনি ঘোষ।"

ফাইনাল পরীক্ষার পর এক সন্ধ্যায় কলাবতী তার কাকার মোটর থেকে নামল বঙ্গবাণীর ফটকের সামনে।

"কালু, আমি ওই রোল-এর গাড়িটার ধারে পার্ক করে অপেক্ষা করছি, কতক্ষণ আর লাগবে, মিনিট পনেরো?" সত্যশেখর ধীরে তাঁর ফিয়াটটা চালিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ফটক থেকে সোজা পথ। ডান দিকে ফাঁকা জায়গায় কিছু মোটর আর মোটরবাইক। বাড়িটা বাঁ দিকে। মাঝারি আকারের কাঠের পাল্লার দরজা দিয়ে সিমেন্টের একটা গলিতে ঢুকে কলাবতী বিভ্রান্ত হল। বড় বড় কাগজের রিল, গলিটা প্রায় বন্ধ। দুটো মানুষ যাওয়ার মতো ফাঁক। একটি লোক ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে সে বলল, "বঙ্গবাণীর সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করব, কোন দিক দিয়ে যাব বলুন তো?"

"এই তো সোজা গেলেই সিঁড়ি, তিনতলায় ওঁর ঘর।" লোকটি হাত তুলে কাগজের রিলের ফাঁকটা দেখিয়ে চলে গেল।

একটু দমে গেল কলাবতীর উদ্দীপনা ও উৎসাহ। বঙ্গবাণীর বাড়িতে প্রথম পা দিয়েই, ঘিঞ্জি, সরু, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ খবরের কাগজের অফিস সম্পর্কে তার কল্পনাকে ধাক্কা দিল। তার ধারণা ছিল, বাড়িটা ঝকঝকে তকতকে হবে। রিসেপশনিস্ট সুন্দরী মেয়ে দু'-তিনটে টেলিফোন নিয়ে তার জিজ্ঞাসার জবাবে বলবে, 'লিফট্ চারতলায়।'

কিন্তু তার মনে হচ্ছে এখানে বাসা বেঁধে আছে প্রাচীনত্ব। হয়তো এখানকার লোকগুলোও প্রাচীন মনের। তা হলে তো কোনও মেয়েকেই এখানে কাজ দিতে রাজি হবে না। কিছুটা হতাশ হলেও সে ঠিক করল শেষপর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে। জিন্‌স আর ব্যাগি শার্টের বদলে সে শাড়ি পরে এসেছে। শেষবার শাড়ি

পরেছিল আটঘরার এম. এল. এ. গোপীনাথ ঘোষের বড় মেয়ের বিয়েতে। সালোয়ার-কামিজ, জিন্‌স বা স্কার্টে সে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, হাঁটাচলার ধরনই তখন বদলে যায়। কিন্তু আজ সে কাকার পরামর্শে পুরোদস্তুর মেয়ে সেজেই, বলা যায়, জেদ নিয়েই বঙ্গবাণীতে এসেছে। তার মনোভাব হল, আমি একটা মেয়ে। তোমাদের কাগজে কাজ করতে বা শিখতে চাই। দিতে হয় দাও, নয়তো চলে যাও।

সিঁড়ির দোতলা অতিক্রম করার সময় সে দেখল একটা ঘরে চারজন লোক একটা টেবিলে মুখোমুখি। দু'জনের হাতে কলম আর লম্বা ফর্দের মতো ছাপা কাগজ। অন্য দু'জনে ধরে রয়েছে হাতে লেখা কাগজ, যা দেখে তারা পড়ে চলেছে। ঘরের দরজায় কাঠের বোর্ডে লেখা 'রিডিং বিভাগ'।

তিনতলায় পৌঁছে সে দেখল দু'দিকে দুটি ঘর। তাদের মাঝে একটা চওড়া দরজা, যেটা দিয়ে ভেতরের একটা হলঘর দেখা যাচ্ছে। ডানদিকের ঘরের দরজায় কাঠের বোর্ডে লেখা, 'সম্পাদকীয় বিভাগ'। হলঘরের দরজায় লেখা, 'রিপোর্টিং ও বার্তা বিভাগ'। আর বাঁদিকের ঘরের দরজায় লেখা 'সম্পাদক'। দুই ঘরেরই দরজা খোলা এবং তাতে হ্যান্ডলুমের সস্তার বেডকভারের মতো নীল পরদা ঝুলছে। কলাবতীর মনে হল, পরদাগুলো অন্তত ছ'মাস কাচা হয়নি। সে আর-একটু দমে গেল। এইরকম দৈন্যভরা জায়গায় সে কাজ করবে ও শিখবে বলে এসেছে? বঙ্গবাণীর তো যথেষ্টই টাকা আছে, তবে দৃষ্টিভঙ্গিটা আধুনিক নয় কেন?

তার দরকার সম্পাদকের হাতে একটা চিঠি দেওয়া। সম্পাদকের ঘরের সামনে কোনও বেয়ারা বা পিয়নকে দেখতে না পেয়ে সে পরদা সরিয়ে ঢুকে দেখল ঘরের মধ্যেই কাঠের পার্টিশান দিয়ে তৈরি আর-একটা কামরা, যার দেওয়াল ঘষা কাচের। তার বাইরে বসে বিরাট টাক, খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি, মধ্য পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক মন দিয়ে কিছু পড়ছেন। ইনিই কি সম্পাদক? বোধহয়, না। ইতস্তত করে কলাবতী গলাখাঁকারি দিল।

"কী চাই?" মাথা না তুলে তিনি জানতে চাইলেন।

"সদানন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কেন, কী জন্য?" মাথা না তুলেই আবার প্রশ্ন।

"একটা চিঠি, রাজশেখর সিংহ দিয়েছেন ওঁকে দেওয়ার জন্য।"

"কই, দেখি চিঠিটা।" মাথা না তুলেই হাত বাড়ালেন। চিঠিটা হাতে পেয়ে মুখ তুলে দেখেই সোজা হয়ে বসলেন। এতক্ষণ গলা শুনেও খেয়াল করেননি,

এখন তিনি দেখলেন শাড়িপরা একটি মেয়ে।

"আমি পি এ টু দ্য এডিটর। আপনাকে একটু বসতে হবে। দুটো এডিটোরিয়াল এখন ওঁকে পড়ে শোনাব, অ্যাপ্রুভড হলে কম্পোজে পাঠাব।" তাঁর হাতে ধরা কাগজটা দেখিয়ে পি এ মশাই বললেন, "তারপর দরকার বুঝলে উনি আপনাকে ডাকবেন।"

বাধ্য মেয়ের মতো কলাবতী মাথা নেড়ে বলল, "বেশ।" পি এ মশাই দুটো এডিটোরিয়াল ও চিঠিচা হাতে নিয়ে ঘষা কাচের কামরার সুইংডোর ঠেলে ঢুকলেন এবং বেরিয়ে এলেন তিন মিনিট পর।

"আসুন।" একটু সম্ভ্রম মাখানো ভারী গলায় তিনি কলাবতীকে আমন্ত্রণ জানালেন।

"তুমি রাজশেখরদার নাতনি। বোসো, বোসো।" শ্যামবর্ণ, সিঁথিকাটা কালো চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা, চার্লি চ্যাপলিনের 'ভবঘুরে'-মার্কা গোঁফ। সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি। কলাবতীর মনে হল, দাদুরই বয়সি, তবে চুলে কলপ না দিলেই ভাল হত। বঙ্গবাণীর মালিক হাতের চিঠিটা পতাকার মতো নেড়ে সামনের চেয়ারটা দেখালেন। "তুমি কি জানো আমরা একই স্কুলে পড়েছি? উনি আমার থেকে পাঁচ ক্লাস সিনিয়ার ছিলেন?"

কলাবতী মাথা নেড়ে বলল, "শুনেছি।"

চারদিকে সে চোখ বোলাল। সম্পাদকের ঘরটা এতক্ষণ এই বাড়িতে যা কিছু সে দেখেছে, তার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। এই ঘরে কার্পেট, এয়ারকুলার, সোফা, মেহগনির টেবিল, পরদা, ঘুরনি চেয়ার ইত্যাদি দেখতে পাবে একদমই সে আশা করেনি।

"তোমার ঠাকুরদা আমার বাবার কাছ থেকে যে বাংলা লেখার তালিম পেয়েছিলেন, তা তো জানতাম না! এই দেখো চিঠিতে সে-কথা লিখেছেন," চিঠিটা অবশ্য কলাবতীর হাতে তিনি দিলেন না, শুধু পতাকার মতো নাড়লেন। "কিন্তু রাজশেখরদা তো আমায় মুশকিলে ফেলে দিলেন। তোমাকে বাংলা লেখা শেখাবার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন, কিন্তু আমার সময় কোথা?" সদানন্দ জিজ্ঞাসাটা কলাবতীর জিম্মায় দিয়ে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যে, সে অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমতা আমতা করে সে বলল, "দাদু খুব আশা করেই আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।"

"তার ওপর আবার স্পোর্টস বিভাগে! খেলাধুলোর খ-ও আমি জানি না।"

"ও-কথা বলবেন না সদাবাবু।" পি এ মশাই অভিমানী গলায় আপত্তি জানালেন। "এই তো সেদিন, ভারতীয় ফুটবলের মান কী করে তোলা যায়, তাই নিয়ে সেমিনারে বলে এলেন।"

"আহ্‌হা ওসব কি আমার কথা?" সদানন্দ সস্নেহে তাঁর পি এ-র দিকে তাকালেন। "ভবনাথই তো পয়েন্টগুলো লিখে দিয়েছিল। আর জানোই তো বক্তৃতাটা আমি ভালই করি। ভবনাথের তৈরি কাঠামোয় আমি খড়-মাটি চাপিয়েছি। আরে বাবা, শিল্ড ফাইনালে শিবদাস বিজয়দাস ভাদুড়ির খেলা তো ছোটবেলায় দেখেছি, সুতরাং বলতে অসুবিধে হবে কেন?"

"আপনি ভাদুড়ি ব্রাদার্সের খেলা দেখেছেন!" কলাবতী অবাক হয়ে গেল। সে তো আশি বছরেরও আগের কথা! দাদু ছেলেবেলায় তাঁর বাবা সোমেন্দ্রশেখরের কাছে মোহনবাগানের আই এফ এ শিল্ড জয়ের গল্প শুনেছেন। তখন সদানন্দর তো জন্মাবার কথাই নয়!

"দেখেছি মানে? সেদিন খেলার পর গড়ের মাঠে যে কী কাণ্ড হয়েছিল কী আর বলব! আমরা কয়েকজন মিলে তো ঠিকই করে ফেলেছিলুম কেল্লার ওপর থেকে ইউনিয়ন জ্যাকটা নামিয়ে তেরঙ্গা পতাকা তখনই তুলে দেব।" সদানন্দ চিঠি ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে বললেন, "তখন স্বদেশি যুগ, দেশপ্রেম জিনিসটা ছিল। আর এখন?" হাতটা নামিয়ে আনলেন সদানন্দ।

কলাবতী হুঁশিয়ার হয়ে গেল। সদানন্দ স্বদেশি যুগে থাকতে ভালবাসেন, বর্তমান যুগকে পছন্দ করেন না। বিষণ্ণ গলায় কলাবতী বলল, "এখন তো করাপশনের যুগ।"

"ঠিক। ঠিক বলেছ।" সদানন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। "রাজশেখরদার নাতনির মতোই বলেছ। এই দেখো তোমার দাদু লিখেছেন, 'এই বংশের সকলেই, আমি, আমার পুত্র ও একমাত্র পৌত্রী, সকলেই বঙ্গজননীর বাণী শিক্ষা করিয়াছি বঙ্গবাণী হইতেই... বাংলাটা লক্ষ করো, দারুণ! হবেই তো, বাবার কাছে স্কুলে তালিম পেয়েছেন যে! কিন্তু মা, তুমি এখানে কী কাজ শিখবে, তাও আবার স্পোর্টস! ওখানে তো পুরুষদের রাজত্ব।"

"ডেস্কে বসেও তো কাজ করা যায়।" কলাবতী সতর্কভাবে বলল। সে জানে প্রথমে এই কথা উঠবেই।

"হ্যাঁ, তা অবশ্য যায়। কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করেই—"

কলাবতী জানে, এই কথাটাও উঠবে। সে ব্যস্ত হয়ে সদানন্দকে থামিয়ে

বলল, "না, না, পড়াশোনা অবশ্যই শেষ করব। পরীক্ষার পর এই দু'-তিনমাস কেন শুধু শুধু বসে থাকা, তাই দাদু বললেন, স্পোর্টস ভালবাসিস, ক্রিকেটও খেলিস, ময়দানটাও তোর অপরিচিত জায়গা নয়। এই সময়টায় তুই বরং সাংবাদিকতায় তালিম নে। বঙ্গবাণীকে তো আর মাইনে দিতে হবে না—"

"বললেন, মাইনে দিতে হবে না?" সদানন্দ হাঁফ ছেড়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। "এই হচ্ছে রাজশেখরদা। টাকাকড়ির ব্যাপারে অত্যন্ত উদার। বাবার কাছে পড়েছেন তো!"

সদানন্দ টেবিলের গায়ে সাঁটা কলিং-বেলের বোতাম টিপলেন। হাফশার্ট-ধুতিপরা বেয়ারা এল।

"ভবনাথবাবুকে ডাকো। জরুরি কাজ।"

বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই পি এ মশাই বললেন, "তা হলে শুরু করি?"

অনুমতি পেয়ে তিনি সম্পাদকীয়, যা কালকের কাগজে প্রকাশিত হবে, পড়তে শুরু করলেন। তার প্রথম বাক্য: কলকাতার রাস্তায় পাগলা কুকুরের দৌরাত্ম্য এমন প্রকট হয়ে উঠেছে যে, গৃহস্থরা নির্ভয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারছেন না।

সদানন্দ হাত তুলে পি এ-কে থামিয়ে কলাবতীকে বললেন, "কাল আমাদের চাকরকে একটা কুকুর তাড়া করেছিল। কর্পোরেশনকে কড়কানি দেওয়া দরকার। হ্যাঁ, আপনি পড়ুন।"

পি এ মশাই আবার পড়া শুরু করতে যাবেন তখন একটি লোক প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। "আমায় ডাকছেন?"

"বোসো।"

ভদ্রলোকটি বসলেন কলাবতীর পাশের খালি চেয়ারে। সে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল থলথলে ভুঁড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি, চশমা, ঠোঁটের কোণে পানের রস, বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মাথায় সুগন্ধি তেলের গন্ধ।

"ভব, এই মেয়েটি আমার খুবই পরিচিত, আটঘরার জমিদার, এখন অবশ্য জমিদারি নেই, না থাকলেও বনেদিয়ানা, বংশগৌরব সেসব তো আর চলে যায় না। রাজশেখর সিংহর নাতনি কলাবতী। উনি আমার বাবার ছাত্র ছিলেন, এটাও ওঁর একটা বড় পরিচয়। বাংলা ব্যাকরণ, রচনা সবই বাবা ওঁকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন, আমাকেও। ওর ঠাকুরদা আমার কাছে পাঠিয়েছেন ওকে বাংলা লেখা আর খেলার ব্যাপারে লেখা শেখার জন্য।"

"বেশ বেশ, খুব ভাল কথা।" ভবনাথ সামনে-পেছনে দু'বার শরীরটা দোলালেন।

"কিন্তু আমার হাতে সময় কোথায়?"

"তা তো বটেই।" ভবনাথ অনিশ্চিত দৃষ্টিতে সম্পাদকের দিকে তাকালেন।

"তুমিই একে শেখাও।"

"বেশ, বেশ, শেখাব নিশ্চয়, খুকি, তুমি খেলা ভালবাসো? একটু-আধটু খেলেছ তো?"

"বলতে ভুলে গেছি ভব, কলাবতী মেয়েদের ক্রিকেটে বাংলার হয়ে খেলেছে। স্পোর্টস এডিটরের অন্তত ওকে চেনা উচিত।"

ভবনাথের মুখ পলকের জন্য ফ্যাকাশে দেখাল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে খুবই উৎসাহভরে বলে উঠল, "চিনি, খুবই চিনি। গত বছরই তো মেয়েদের রঞ্জি ট্রফিতে সেঞ্চুরি করেছে।"

মেয়েদের রঞ্জি ট্রফি শুনে কলাবতীর যতটা হাসি পেল ততটাই ভয় পেল সেঞ্চুরি করার কথা শুনে। এখনও তার কোনও সেঞ্চুরি নেই। ক্লাব-ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৮৯ নট আউট। কিন্তু প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না। দরকার কী লোকটিকে অপ্রতিভ করে। চটে থাকলে মুশকিল হতে পারে। ভবনাথ যদি তাকে একটা সেঞ্চুরি পাইয়ে দেনই তাতে কারও কোনও ক্ষতি হবে না।

"সেঞ্চুরিটা কাদের সঙ্গে খেলায় হয়েছিল?" পি এ মশাই অযথাই নাক গলিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন।

কলাবতী ফাঁপরে পড়ে গেল। একটা যে-কোনও রাজ্যের নাম বলে দেওয়া যায় এবং পাঁচ মিনিট পরই এরা সেটা ভুলে যাবে। তবু লজ্জা করল। নিজের মুখে একটা ডাহা মিথ্যা বলা তার দ্বারা সম্ভব নয়। বিব্রত মুখে সে ভবনাথের দিকে তাকাল।

"গুজরাতের সঙ্গে খেলায়।" ভবনাথের মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না।

"ভব, তোমার ডিপার্টমেন্টে কলাবতীকে নিয়ে নাও।" সদানন্দ একটা জটিল সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার মতো গলায় কথাটা বললেন। "আজকাল তো মেয়েরাও মাঠে যাচ্ছে। একে যদি তৈরি করে নিতে পারো, অবশ্য বয়সটা খুবই অল্প, ফুলটাইম কাজ করতে পারবে না। হালকা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেখতে পারো, এজেন্সি কপির অনুবাদ করাটা শিখিয়ে দিয়ো। ক্রিকেট যখন

খেলে তখন ক্রিকেট মাঠেও ওকে পাঠাতে পারো।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। ক্রিকেটারকে ক্রিকেট মাঠেই তো পাঠানো দরকার। ক্রিকেটের টেকনিক্যাল সাইড নিয়ে এখন তো কেউ লেখেই না। শুধুই সাহিত্য আর কাব্য।"

"তা হলে ওকে এখন নিয়ে যাও। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা ওকে পাইয়ে দাও।"

"অবশ্য, অবশ্য। এসো কলাবতী।"

ভবনাথের সঙ্গে কলাবতী সম্পাদকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'রিপোর্টিং ও বার্তা বিভাগ' লেখা দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকল। ঘরটায় দুটো ভাগ। বাঁদিকে সাত-আটটা ছোট টেব্‌লে বসে লিখে চলেছে কয়েকজন। ডানদিকেও তাই। একদিকে সাব এডিটররা, অন্যদিকে রিপোর্টাররা। মেঝেয় স্তূপ করে রাখা খবরের কাগজের ফাইল। দেওয়াল ঘেঁষে কাঠের লকার, স্টিলের আলমারি। দুটো টেলিপ্রিন্টার মেশিন অনর্গল ফটফট শব্দ করে চলেছে। মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা টাইপ-করা কাগজ মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। একজন বেয়ারা মেশিন থেকে সেটা ছিঁড়ে নিয়ে ছোট ছোট খণ্ড করতে লাগল। একজন মাঝবয়সি সাব এডিটর চেঁচিয়ে উঠলেন, "ভগীরথ, কপি নিয়ে যা।"

হলঘরের শেষ প্রান্তে একটা বড় টেব্‌লে বার্তা সম্পাদক বসেন। তাঁর সামনে দু'জন লোক খুবই বিনীতভাবে কিছুর যেন ব্যাখ্যা করছে।

রিপোর্টারদের টেব্‌লে দুটো ফোন এবং দুটোই কথা শোনা ও বলায় ব্যস্ত। "শচীনদা, আপনার ফোন," বলে একজন চেঁচিয়ে ডাকল।

চলতে চলতে একঝলকে যতটুকু দেখা যায়, কলাবতী দেখে নিল।

খেলার বিভাগটা রিপোর্টিং বিভাগের পেছনে জানলার ধারে। একটা বড় গোলাকার কাঠের টেব্‌ল। তিনজন লোক বসে। ভবনাথের সঙ্গে একটি মেয়েকে দেখে জিজ্ঞাসু কৌতূহলী চোখে তারা তাকাল। টেব্‌লে টেলিফোন, নিউজপ্রিন্টের প্যাড, পিন দিয়ে গুচ্ছকরা টেলিপ্রিন্টার কপি এবং প্রায় এক বিঘত লম্বা তলায় কাঠের চাকতি দেওয়া দুটো সরু লোহা, যাতে গাঁথা রয়েছে বাতিল বা অনুবাদ হওয়া কপি। দুটো ফাইল বক্স। তার ওপর একটা বাঁধানো হাজিরা খাতা। পেপার ওয়েট, পিন কুশন ইত্যাদি।

"পরেশ, সি এ বি-র প্রেস কনফারেন্স থেকে বলদেব এখনও ফেরেনি?" ভবনাথ উদ্বিগ্ন চোখে জিজ্ঞেস করল।

"না।" হাওয়াই শার্ট পরা, গোলগাল, বেঁটে, বাঁ হাতে পাথর লাগানো

তিনটে আংটি পরা পরেশ প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে নাক ঝাড়তে লাগল।

"বলদেব গেছে তো?"

"কাল বলেছিল বাড়ি থেকে সোজা সি এ বি-তে চলে যাবে। গেছে কিনা জানি না।" পরেশ কাগজটা দলা পাকিয়ে টেব্‌লের নীচে ছুড়ে দিল।

"মুশকিলে ফেলল দেখছি। ওহ্‌হ্‌ কলাবতী, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।" ভবনাথ দুশ্চিন্তা ঝেড়ে তিনজনের কৌতূহল মেটাতে উদ্যোগী হল।

"এর নাম কলাবতী সিংহ, ক্রিকেটে বেঙ্গল প্লেয়ার। সেঞ্চুরি টেঞ্চুরি আছে। সদাবাবুর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাতনি।"

ভবনাথ একটু জোর দিল শেষ বাক্যটিতে। "সদাবাবুর বাবার কাছে এর ঠাকুরদা বাংলা শিখেছেন। মানে এরা অবাঙালি সিংহ নয়, বাঙালিই। বাংলা শিখেছেন মানে বিশুদ্ধভাবে প্রাঞ্জল গদ্যে বাংলায় ভাবপ্রকাশ করাটা শিখেছেন। তিনি একে সদাবাবুর কাছে পাঠিয়েছেন স্পোর্টস জার্নালিস্ট করার জন্য।"

ভবনাথ তার কথার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য থামল। উদাসীন তিনজোড়া চোখ কলাবতীর মুখে নিবদ্ধ। কলাবতী অস্বস্তিতে।

গলা নামিয়ে ভবনাথ বলল, "সদাবাবু এ-ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখালেন। বললেন, খেলার বিভাগই সেরা জায়গা গদ্য শেখার জন্য।"

তিনজোড়া চোখের উদাসীনতা নিমেষে ঘুচে উদ্দীপনা ফুটে উঠল।

"এ তো খুবই ভাল কথা ভবদা। আমরা সব শিখিয়ে দেব।" পরেশ কথাটা বলে প্যাডের আর-একটা কাগজ ছেঁড়ার জন্য হাত বাড়িয়েও টেনে নিল আড়চোখে কলাবতীর দিকে তাকিয়ে।

"নিজে ক্রিকেট খেলেছে যখন, অন্য খেলাগুলোও বুঝে নিতে পারবে, না পারলে আমরা তো আছিই।"

"বয়স তো খুবই কম, ছোটাছুটি করতে পারবে বলেই তো মনে হয়। এই বয়সে এটা করাও উচিত।"

ভবনাথ কলাবতীর সঙ্গে ওদের পরিচয় করালেন: পরেশ বিশ্বাস, কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য আর সুব্রত ঘোষ। কলাবতীর মনে হল, এরা সবাই তার থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বয়সি। কৃষ্ণপদর চুলের তটরেখা কপাল থেকে অনেকটা পিছিয়ে যাওয়ায় যে চড়াটা তৈরি হয়েছে তাকে সামলাবার জন্য ডান কানের পাশ থেকে এক গোছা চুলের প্রবাহ এনে তার ওপর বিছিয়ে দেওয়া। এর

সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখছে মোটা গোঁফ। সুব্রত ঘোষের ঝাঁকড়া চুল খুবই এলোমেলো। রোগা শরীর, প্যান্টে গোঁজা টি-শার্ট ঠেলে রয়েছে একটা ছোট্ট ভুঁড়ি, গলায় পাউডারের দাগ। কাচের গোল পেপার ওয়েটটা অনেকক্ষণ ধরে আঙুল দিয়ে টেবলে ঘোরাচ্ছে। ছটফটে প্রকৃতির। দ্রুত কথা বলে।

পরেশ বিশ্বাস নাকঝাড়া ছাড়াও কলম দিয়ে কান খোঁচায়। ধীরে কথা বলে। রেক্সিনের একটা হাতব্যাগ তার সামনে। ব্যাগটা খুলে একটা সবুজ ডাঁশা পেয়ারা বের করে কলাবতীর দিকে বাড়িয়ে বলল, "আমার বাড়ির গাছের।"

ইতস্তত না করে পেয়ারাটা সে তুলে নিল। পরেশকে তখন খুশি দেখাল। "তা হলে ভবদা ওকে প্রথমে মাঠ করতে পাঠান।"

মাঠ করা কী জিনিস! কলাবতী বিভ্রান্ত বোধ করল।

"রোববারে আমাদের লোক কম থাকে, সোমবারের কাগজে জায়গা বেশি, ভরাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।" পরেশ কলমটা কানে ঢুকিয়ে একচোখ বন্ধ করে দু'বার ঘোরাল।

"আমিও ঠিক তাইই ভেবেছি।" ভবনাথ টেব্‌লে দু'হাত রেখে ঝুঁকে পড়ল। "অন্যের লেখা অনুবাদ করে কি নিজের লেখা তৈরি করা যায়?"

"যায় না।" কৃষ্ণপদ বলল।

"লেখা ওরিজিন্যাল হওয়া চাই। সেটাই তো আসল কথা। নিজের স্টাইল, নিজের গদ্য শুরু থেকেই গড়ে তুলতে হবে। নিজে যা দেখবে, শুনবে, বুঝবে, তাই দিয়ে গুছিয়ে অল্পকথায় সহজভাবে লিখবে। কেমন, তাই তো?" ভবনাথ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলল, "ঠিক বলেছি তো?"

তিনটি মাথা অনুমোদন জানিয়ে নড়ে উঠল। কলাবতীর মনে পড়ল বড়দিও ঠিক এই কথাই ক্লাসে বলেছিলেন, তবে প্রসঙ্গটা অন্যরকম ছিল। দেখা, শোনা, বোঝা যেন যথার্থ হয় অর্থাৎ লেখাটা রগরগে করার জন্য, তর্ক বাধানোর জন্য বানিয়ে মিথ্যা কিছু লিখো না।

"কলাবতী, তা হলে সামনের রোববারই তুমি মাঠে যাও। লিগ ক্রিকেট চলছে। ময়দানের বড় মাঠগুলো তুমি তো চেনো। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, কালীঘাট, ইডেন— এগুলোয় পারলে ঢুঁ মারবে। বাড়ি থেকে সোজা ময়দান চলে যাবে, সন্ধের মধ্যেই অফিসে এসে লিখে দিয়ে তারপর বাড়ি। ডেস্কে যে থাকবে সে তোমার লেখা ঝাড়মোছ করে দেবে, ভুলটুল কিছু হলে দেখিয়ে দেবে।"

"রোববার আমি ডেস্কে থাকব, কিছু চিন্তা কোরো না।" কেষ্ট ভট্টাচার্য আশ্বস্ত করল কলাবতীকে।

"আমি কোন ম্যাচটা তা হলে করব?" এতক্ষণে কলাবতী কথা বলল।

"সব ম্যাচ।" ভবনাথ দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "গড়ের মাঠে যত খেলা আছে, সব।"

কলাবতী আবার বিভ্রান্ত হল। রবিবার ময়দানে দুটো ডিভিশনের কতগুলো লিগ ম্যাচ হয়? পনেরো-কুড়িটা! তা হলে সব ম্যাচ একজনের পক্ষে দেখা কি সম্ভব!

"আরে তুমি কি সব ম্যাচ দেখবে নাকি?" সুব্রত পেপার ওয়েট ঘোরানো বন্ধ করল। "সব ম্যাচের রেজাল্টটা শুধু নেবে। এ-মাঠ ও-মাঠ ঘোরাঘুরিও করতে হবে না। সি এস জে সি, মানে ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব টেন্টটা তো চেনো?"

কলাবতী মাথা কাত করল। একবার তাদের বাংলা দলের প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল ওখানে। সে হাজির ছিল। সুব্রত পেপার ওয়েটে মনোনিবেশ করেছে। তার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিল কেষ্ট। "ক্লাবের লোকেরাই স্কোরবুক নিয়ে টেন্টে আসবে। তাই থেকে তুমি যা দরকারি মনে হবে টুকে নেবে।"

বেয়ারা চন্দ্রনাথ একগোছা কপি টেলিপ্রিন্টার থেকে এনে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে যাওয়ার আগে কলাবতীর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। পরেশ কপিগুলো টেনে নিল। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে সুব্রত বলল, "বঙ্গবাণী স্পোর্টস।"

তখন ভবনাথ গলা নামিয়ে কলাবতীকে বোঝাতে শুরু করল, "যারা স্কোরবুক নিয়ে আসবে তারাই বলে দেবে সেঞ্চুরি হয়েছে কিনা, কোনও বোলার পাঁচ-ছ'টা উইকেট পেয়েছে কিনা, হ্যাটট্রিক হয়েছে কিনা। নামী কোনও প্লেয়ার সেঞ্চুরি করলে কত বলে কত মিনিটে, ক'টা বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারি, ওটাও লিখে নেবে। কোনওরকম ডিসপিউট দেখা দিলে, কার কী বক্তব্য জেনে নেবে।"

কিছু কপি কৃষ্ণপদর সামনে ঠেলে দিয়ে পরেশ বলল, "দ্যাখ তো কেষ্ট, ক্রিকেট বোর্ডের মিটিং ছিল, কোনও খবরটবর আছে কিনা।"

সুব্রত মুখ নামিয়ে টেলিফোনে কথা বলে যাচ্ছে নিচুস্বরে। ভবনাথ বোকা ছাত্রীকে জ্যামিতির কঠিন একটা প্রবলেম বোঝাবার মতো মুখ করে বলল,

"আউট ফাউট নিয়ে খুব ঝামেলা হয়। সাপোর্টাররা তো বটেই, ব্যাটসম্যানরাও রেফারিকে মারে।"

"ভবদা, রেফারি নয়, আম্পায়ার।" সুব্রত টেলিফোনটা মুখ থেকে সরিয়ে কথাটা বলেই আবার ফোনটা মুখে ধরল।

ভবনাথ প্রথমে হতবাক হল, তারপরই রেগে বলে উঠল, "জানি, জানি, রেফারি নয়, আম্পায়ারই। পঁয়ত্রিশ বছর মাঠ চষছি, আমাকে আর শিখিয়ো না। ...রেফারি আর আম্পায়ারের মধ্যে পার্থক্য কিছু কি আছে? সাহেবদের এই এক বাজে অভ্যেস, একই কাজের দুটো নাম দেওয়া। ফুটবলের রেফারি আর হকির আম্পায়ার, কাজ তো একই! তা হলে দুটো নাম দেওয়া কেন?"

প্রশ্নটা যেহেতু কলাবতীর দিকে তাকিয়ে হল তাই সে সযত্নে মাথা নেড়ে বলল, "কোনও মানে হয় না।"

ভবনাথের রাগ প্রশমিত হল। সে আবার শুরু করল, "ফুটবল মাঠের মতো মারপিট, হাঙ্গামা ক্রিকেট মাঠেও এখন হচ্ছে। লিগে রেলিগেশনের ম্যাচগুলোতেই বেশি করে হয়। এইরকম ম্যাচে তুমি কিন্তু একদম যাবে না। যদি দেখো লাঠি, বাঁশ নিয়ে কিছু লোক একজনের পেছনে দৌড়োচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি উলটোদিকে দৌড়োবে। কী ঘটল টটল, সেটা পরে টেন্টে জেনে নেবে। শাড়ি পরে ছুটে পালানো যায় না...।"

"না, না, আমি মাঝে মাঝে শাড়ি পরি, নয়তো সালোয়ার-কামিজ আর জিন্‌সই বেশিরভাগ সময় পরি।" কলাবতীর কথায় ভবনাথ আশ্বস্ত হল।

"মাথাটাথা ফাটল কিনা, অ্যারেস্ট হয়েছে কিনা এসব তুমি টেন্টে অন্য কাগজের রিপোর্টারদের কাছ থেকেই পেয়ে যাবে। অফিসে এসে ডেস্কে যে থাকবে তাকে বললেই সে পুলিশে, হাসপাতালে ফোন করে জেনে নেবে। আচ্ছা, আজ তা হলে এই পর্যন্তই, তোমাকে তো... বাড়ি যেন কোথায়?"

"কাঁকুড়গাছি।"

"ভবদা, বলা ফোন করে জানাল সি এ বি-তে যেতে পারেনি। ছেলের পা ভেঙেছে, তাকে নিয়ে মেডিকেলে গেছে।" সুব্রত বলল ফোন রেখে দিয়ে।

"মুশকিলে ফেললে তো।" ভবনাথ বিব্রত ও বিরক্ত মুখে সুব্রতকে নির্দেশ দিল, "সি এ বি-তে ফোন করে বিল্টুবাবুর কাছ থেকে জেনে নাও।"

কলাবতী তখন হাঁটতে শুরু করেছে যাওয়ার জন্য। পেছন থেকে পরেশ বলল, "পেয়ারা কেমন লাগল সেটা বোলো কিন্তু।"

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখল গাড়িতে ঠেস দিয়ে কাকা রোল খাচ্ছেন।

সত্যশেখর তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তোর জন্য দুটো রেখেছি, চিকেনের। এত দেরি হল কেন? কী বলল সদানন্দ ঘোষ?"

"যেতে যেতে বলছি।"

গাড়িতে ওঠার সময় সে দেখল সিটের ওপর দুটো রোল। হাতে তুলে নিয়ে একটা পাকানো কাগজ ছিঁড়ে কামড় বসাল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সত্যশেখর বললেন, "খেতে বেশ, ঝালটা বেড়ে দিয়েছে, গোটাছয়েক সেঁটেছি। ওদিকে একটা ফুচকাওলাকে দেখলুম—"

"কাকা, আজকের মতো রিটায়ার করো। তার বদলে এই পেয়ারাটা খাও।"

সত্যশেখর পেয়ারায় কামড় দিয়ে দু'-তিনবার চিবিয়েই থুঃ থুঃ করে মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, "মানুষে খায় এ-জিনিস!"

বাড়ি ফেরামাত্র মুরারির কাছ থেকে শুনল দাদু তার জন্য পড়ার ঘরে অপেক্ষা করছেন।

"কাজ হল?"

গদিমোড়া ইজিচেয়ারে রাজশেখর বই পড়ছিলেন। পাশের টেব্‌লেও একটা বই রাখা।

"হল। তোমার চিঠিটা দারুণ কাজে লেগেছে।"

"চিঠি লিখতে জানা চাই। এটা তো আর বেড়াল-কুকুরের ওপর চিঠি নয়।" রাজশেখর নাতনির পেছনে দাঁড়ানো লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন।

"ও-চিঠিটা আমার লেখা ছিল না, মলয়ার লেখা।" সত্যশেখর বিপন্ন প্রতিবাদ জানালেন।

"চিঠি লেখা একটা আর্ট। রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিগুলো একবার পড়ে দেখো, মেয়েকে লেখা জওহরলালের চিঠিগুলোও তো পড়োনি। কিছুই পড়লে না, শুধু অন্যকে দিয়ে চিঠিই লেখালে।... কালু, বলো আমার চিঠিতে কী ফল হল?"

"সদানন্দবাবু তো খুব উচ্ছ্বসিত। আমার ঠাকুরদা তাঁর বাবার কাছে বাংলা শিখেছেন—"

"ঘেঁচু শিখেছেন।" রাজশেখরের কণ্ঠ থেকে বজ্রপাতের চাপা শব্দ বেরিয়ে এল। "ক্লাসে এসে শুধু বেতটা দেখিয়ে বলতেন, 'পদ্য মুখস্থ হয়েছে? বই বন্ধ করে এবার খাতায় লেখ,' তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। একের নম্বরের ফাঁকিবাজ ছিলেন সদার বাবা।"

"কিন্তু দাদু, তুমি যে চিঠিতে লিখেছ—।"

"আরে ওটাই তো আর্ট। লিখেছি তো কী হয়েছে? কাজ হাসিল করতে হলে ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বলতে হয়।"

একগাল হেসে কলাবতী বলল, "আমিও আজ বলেছি। তোমার নাম করে বলে দিলাম, আমার কাজের জন্য বঙ্গবাণীকে মাইনে দিতে হবে না। ব্যস, ভদ্রলোক এটা শুনে ভীষণ স্বস্তি পেয়ে অমনই স্পোর্টস এডিরকে তলব করলেন।"

এরপর কলাবতী বঙ্গবাণীতে যা দেখল, শুনল, সবিস্তারে রাজশেখরকে তা জানাল। "একটা জিনিস বুঝলাম, ওখানকার লোকগুলোর মনটা ভাল, কিন্তু খেলা সম্পর্কে আগ্রহটা যেন কম।" একটু থেমে গভীর স্বরে সে বলল, "তাতে অবশ্য আমার কিছু আসে-যায় না। আমার দরকার একটা লেখার জায়গা।"

"কিন্তু এই ম্যাচ-রেজাল্ট টোকা রিপোর্টারি করে কি কোনও লাভ আছে?" সত্যশেখর এবার খুবই গুরুতর একটা সমস্যা হাজির করে বাবার দিকে তাকালেন।

"তা কেন?" কলাবতী প্রতিবাদ করল। "আমাকে টেন্টে গিয়ে রেজাল্ট টুকতে বললেই কি তা করব? মাঠে বসে ম্যাচ দেখব। কেউ ভাল খেললে তার সম্পর্কে লিখব যাতে সি এ বি-র নজরে পড়ে। কাগজে প্রশংসা বেরোলে উঠতি প্লেয়াররা খুব উৎসাহ পায়।"

"তুই উৎসাহ পেতিস?" সত্যশেখর জানতে চাইলেন।

"উৎসাহ! কাগজে তো কখনও আমার নামই বেরোয়নি। উৎসাহ পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।"

এইবার রাজশেখর তাঁর হাতের বইটা তুলে বললেন, "কার্ডার্স, নেভিল কার্ডাস।... 'সামার গেম', সেই টোয়েন্টি নাইনের বই।" বইটা রেখে পাশ থেকে আর-একটা তুলে নিলেন। "এটা 'গুড ডেজ', থার্টি ফোরের বই। বাবা কিনে দিয়েছিলেন, কত বছর পর শেলফ থেকে বের করলুম। কার্ডাসের সেরা আমলের লেখা। কালু এবার তোকে তো এসব বই পড়তে হবে। চার পুরুষ ধরে কার্ডাস পড়ার একটা রেকর্ড তা হলে হবে।"

কলাবতী চোখ প্রায় ছানাবড়া করে বলল, "ওরে বাবা, ওই কঠিন ইংরিজি পড়ার বিদ্যে আমার এখনও হয়নি দাদু। রেকর্ডটা পরে করলেও চলবে।"

"আমি তোকে বাংলা মানে করে বুঝিয়ে দেব।" বলা বাহুল্য, কথাটা সত্যশেখরের।

"থাক কাকা। ময়দানি ক্রিকেটের হালচালটা আগে বুঝে আসি তারপর তোমার বাংলা-কার্ডাস শুনব।"

রবিবার দশটায় কলাবতী ময়দানে পৌঁছোল। উঠতি প্রতিভা থাকে ছোট ক্লাবে, এই বিশ্বাসে সে ঠিক করেই রেখেছে ছোট ক্লাবের ম্যাচ দেখবে। শহিদ মিনারের ধারে ভবানীপুর মাঠে আম্পায়াররা স্টাম্পের ওপর বেল সাজাচ্ছেন। বাউন্ডারির ধারে খেলোয়াড়রা জড়ো হয়েছে মাঠে নামার জন্য। কলাবতী এই মাঠের খেলা দেখার জন্য দাঁড়াল না। তার কাঁধে ঝুলছে চামড়ার ঝুলি। তাতে আছে জলের বোতল, স্যান্ডুইচ, কলা, কাপড়ের টুপি আর খাতা-কলম। ভবনাথের উপদেশমতো সে জিন্‌স আর শার্ট পরেছে।

সি এস জি সি টেন্ট ও মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির মাঝের পথ ধরে এগিয়ে গুরু নানক সরণি আর রেড রোড পার হয়ে, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মরণে গড়া স্মৃতিস্তম্ভের চাতালে এসে সে দাঁড়াল। তার সামনে রয়েছে ফুটবলে শট নিতে যাওয়া গোষ্ঠ পালের মূর্তি। আরও দূরে মোহনবাগানের ঘেরা মাঠ। ডানদিকে ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়াম, বাঁদিকে মহমেডান স্পোর্টিং-এর ঘেরা মাঠ। এইসবের মধ্যে খোলা মাঠে সাদা ট্রাউজার্স শার্ট পরা লোকেদের ছোটাছুটি, ব্যাট-বলে ধাক্কার শব্দ আর অ্যাপিলের চিৎকার।

কোন মাঠে সে প্রথমে যাবে? তালতলা? পুলিশ, কাস্টমস, গ্রিয়ার না হাইকোর্ট মাঠে? ঘেরা মাঠে সে যাবে না এটা আগেই ঠিক করে রেখেছে। মনে মনে কিছু একটা স্থির করে সে পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে টস করল। সেটা লুফেই 'টেইল' বলে মুঠো খুলে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হাইকোর্ট!" মাঠে প্রথম দিন রিপোর্টারি করতে এসেই ঠিক টস ডেকেছে। এটা তার কাছে শুভ লক্ষণ বলে মনে হল।

টেন্টের বাইরে, বাউন্ডারির ধারে ছোট একটা শামিয়ানা। তার নীচে দুই দলের স্কোরাররা টেব্‌লে স্কোর লেখার খাতা বিছিয়ে পাশাপাশি বসে। সঙ্গে পেনসিল, ইরেজার, নানা রঙের কলমে ভরা বাক্স। স্টিলের কয়েকটা চেয়ার আর একটা বেঞ্চ পাতা। দু'দলের কিছু খেলোয়াড়, ক্লাবকর্তা তাতে বসে। দর্শক বলতে কেউই নেই। চমৎকার বাতাস বয়ে আসছে গঙ্গার দিক থেকে। বাউন্ডারি ফ্ল্যাগগুলো টানটান হয়ে উড়ছে। দু'ধারে সাদা বিছানার চাদরের মতো বাঁশে বাঁধা সাইট স্ক্রিন বাতাসে কাঁপছে। কলকাতার মাঝখানে অলস

নির্জন দুপুর কাটাবার সেরা জায়গা ক্রিকেট মরসুমের গড়ের মাঠ।

দূর থেকেই কলাবতী শামিয়ানার বাঁশে ঝোলানো স্কুলের ব্ল্যাক বোর্ডের মতো টেলিগ্রাফিক স্কোরবোর্ডটার দিকে তাকাল। তাতে টিনের প্লেটে সংখ্যা ঝুলিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় ম্যাচের হালচাল। বোর্ডের ওপর দিকে পাশাপাশি ঝুলছে শূন্য ও ২, এখন ব্যাটসম্যান দু'জনের এই রান। মাঝে ৪ অর্থাৎ চারজন আউট হয়ে গেছে, তার নীচে ৭, তার মানে ইনিংসের এখন এটাই মোট রান।

চার উইকেট পড়ে গেছে! হতেই পারে না, কলাবতীর মনে হল নিশ্চয় ভুল করে '৪' ঝুলিয়ে দিয়েছে। খেলা তো বড়জোর তিন কি চার ওভার মাত্র হয়েছে, আর এর মধ্যেই সাত রানে চার উইকেট!

দ্রুত পা চালিয়ে সে শামিয়ানার নীচে এল। দু'জন স্কোরারের মাঝে ঝুঁকে বিনীতভাবে সে বলল, "দাদা চারটে উইকেট কে নিল?"

ওভার সদ্য শেষ হয়েছে। স্কোরবুকের নানা জায়গায় ওরা পেনসিলের আঁচড় দিচ্ছে। কেউ জবাব দিল না।

আবার সে বলল, "উইকেট চারটে কে...।"

"আপনি কে?" বয়স্ক স্কোরারটি মুখ না তুলে প্রশ্ন করল।

"প্রেস রিপোর্টার।" কলাবতী গলাটা গম্ভীর করে ভারিক্কি হওয়ার চেষ্টা করল। লোকটি তেরছা চোখে কলাবতীকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বিস্মিত হল। ছেলেদের পোশাকে একটি মেয়ে, তাও এত অল্পবয়সি, সুতরাং অবাক তো হবেই!

"কোন কাগজের?"

"বঙ্গবাণী।" বলেই সে অস্বস্তিতে পড়ল। যদি জিজ্ঞেস করে, "প্রেসকার্ড দেখি?" তা হলে তো একটা বেইজ্জতি পরিস্থিতিতে সে পড়ে যাবে। তার কাছে তো প্রেস রিপোর্টারের কোনও প্রমাণপত্রই নেই। কিন্তু লোকটি আর কোনও কথা বলল না, যেহেতু পরের ওভার আরম্ভ হয়ে গেছে।

খাতা বের করে কলাবতী যতটা সম্ভব ততটা ঝুঁকে স্কোরবুক থেকে বোলারের নামটা পড়ার চেষ্টা করল। স্বাধীন সঙ্ঘের বি. বাগচি নামের বোলারই চারটি উইকেট পেয়েছে। খেলা হচ্ছে মিত্র পরিষদের সঙ্গে। তিনজন শূন্য রানে বোল্ড; একজন এক রানে এল বি ডবলু; অতিরিক্ত চার বাই রান আর নট আউট ব্যাটস্‌ম্যান দুই। বি. বাগচির দু'ওভারে চার উইকেট, এক রান দিয়ে!

খেলার পঞ্চম ওভার শুরু হয়েছে। বাগচির এটা তৃতীয় ওভার। প্রথম বলেই উইকেটকিপার ক্যাচ এবং ফসকানো এবং বলটা গেল বাউন্ডারিতে। স্কোয়ার লেগ থেকে কলাবতী বুঝতে পারল না বলটা কী ধরনের ছিল। গুড লেংথে জোরে বল, খুবই জোরে। ব্যাটসম্যান যেন ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে কুঁকড়ে গেল। বলটা ব্যাটের কানায় লেগেছিল। মনে হচ্ছে সুইং ছিল। পরের তিনটি বলই প্যাডে লাগল। বাগচি ছাড়া আর কেউ কিন্তু এল বি ডবলু অ্যাপিল করল না। কলাবতী একটু অবাকই হল। আম্পায়ার সবকটা অ্যাপিলেই মাথা নাড়ল।

"এটা রমেনের কাণ্ড, আমাকে ডোবাবার জন্যই বাগচিকে আজ নামিয়েছে।"

কলাবতীর পেছনেই চাপা হিসহিস স্বরে কেউ একজন কথাগুলো বলল। মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, বেঁটে গোলগাল, ধুতি, পাঞ্জাবি, জওহরকোট, চশমা, টাকমাথা এবং মুখটা রাগে থমথমে এক প্রৌঢ়। লোকটা কথাগুলো যাকে বলল, সে প্যান্ট, শার্ট খয়েরি হাফহাতা সোয়েটার পরা এক যুবক, মুখটা কাঁচুমাচু।

"এখুনি রমেনকে খবর পাঠা, বাগচিকে আর-একবারও যেন বল না দেয়। বোলিং যদি দেখাতে চায়, তা হলে অন্য ম্যাচে যেন দেখায়।... আড়াইশো রান পরিষদকে দেব কথা দিয়েছি আর রমেন কিনা চারটে উইকেট ফেলে দিল সাত রানে? ক্যাপ্টেনসি করা ঘুচিয়ে দেব। বলে দে, মিত্র পরিষদের টোটাল আড়াইশো করাতেই হবে। নয়তো পরের ম্যাচ থেকে স্বাধীন সঙ্ঘের অন্য ক্যাপ্টেন!"

"এখুনি খবর পাঠাচ্ছি তিলুদা।" খয়েরি হাফ সোয়েটার ব্যস্ত হয়ে পা বাড়াল। তখন একটা আক্ষেপের শব্দ উঠল শামিয়ানার নীচে। কলাবতী তাড়াতাড়ি মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখল সেকেন্ড স্লিপ মাঠে উপুড় হয়ে, বল যাচ্ছে থার্ডম্যানের দিকে। ক্যাচ ফসকেছে!

এবার ওভারের শেষ বল। বাগচি ষোলো কদম ছুটে আসবে। শেষ কদমে লাফিয়ে উঠে হুবহু কপিলদেবের মতো ডেলিভারিটা করবে। কলাবতী লক্ষ করল, স্ট্রাইকার ডেলিভারির আগেই স্টাম্পের কাছে চলে এল এবং বোধহয় চোখ বুজিয়ে ফেলেই ব্যাটটা সামনে ধরে রইল।

বোল্ড! হওয়ারই কথা। ব্যাটসম্যানটিকে মনে হচ্ছে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আম্পায়ারের দিকে না তাকিয়েই সে হাঁটতে শুরু করেছে। একজন

ফিল্ডার দৌড়ে গিয়ে তাকে আটকাল। নো বল ডেকেছেন আম্পায়ার। ক্রিজে আবার ফিরে যাওয়ার সময় তার চলন দেখে কলাবতীর মনে হল, যেন খুবই অপমানিত বোধ করছে তাকে ডেকে নেওয়ায়। বাগচিকে আর-একটা বল করতে হবে। এবার সে ছুটে এসে খুব ধীরগতির ডেলিভারি করল। স্ট্রাইকারটি ব্যাট চালাল এমনভাবে যাতে বোঝা গেল সে ঠিক করেই রেখেছিল, হয় এস্পার নয়তো ওস্পার! ক্যাচটা উঠল বোলারেরই মাথার ওপর এবং বাগচি সেটা লুফে নিল।

"হাফ সাইড তেরো রানে! অথচ আড়াইশো দেব বলেছি শিবুদাকে।" দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দও হল।

কলাবতী আর মুখ ফিরিয়ে দেখল না। সে জানে কথাটা কে বলল। ওদিকে এক গ্লাস জল হাতে খয়েরি হাফ সোয়েটার মাঠের মধ্যে পড়িমরি ছুটে যাচ্ছে ক্যাপ্টেন রমেনের দিকে।

এরপরই ম্যাচের চরিত্রটা বদলে গেল। পরের ওভারে মিত্র পরিষদ পেল এগারো রান। বাগচি ডিপ ফাইন লেগ থেকে হেঁটে আসছে তার চতুর্থ ওভার বল করার জন্য। ওর বলে কী আছে সেটা বোঝার জন্য কলাবতী সাইটস্ক্রিনের দিকে এগোল। ওখান থেকে লক্ষ করলে ধরা যাবে বলে কী কারিকুরি রয়েছে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ক্যাপ্টেন হাত নেড়ে বাগচিকে ডিপ ফাইন লেগে ফিরে যেতে বলছে! বাগচি হতভম্বের মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং মাঠের বাইরে কলাবতীও। তিন ওভার বল করে পাঁচ উইকেট পাওয়া বোলারকে আর বল করতে দেওয়া হল না।

এরপর ক্রিকেট খেলার নামে শুরু হল প্রহসন। রানের বন্যা বইতে শুরু করল মাঠের ওপর। এল বি ডবলু-র জন্য একটা আবেদনও আর শোনা গেল না, একটা ক্যাচও আর লোফা হল না, কাছে দাঁড়ানো ফিল্ডারের কাছে বল গেলেও নির্বিঘ্নে রান নেওয়া গেল, ব্যাটসম্যান ক্রিজের দু'হাত বাইরে এবং উইকেটকিপারের গ্লাভ্‌সে বল, কিন্তু স্টাম্প না হয়ে সে ক্রিজে ফিরে এল। একমাত্র বোল্ড আউট হওয়া ছাড়া ব্যাটসম্যানদের আর কোনওভাবে আউট হওয়ার উপায় রইল না। কিন্তু লেগস্ট্যাম্পের বাইরে ছাড়া বলই পড়ছে না, সুতরাং বোল্ড হওয়ারও উপায় নেই।

এত সুযোগ পেয়েও মিত্র পরিষদের আরও তিনজন আউট হল। রানের জন্য দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে একজন ব্যাটসম্যান হুমড়ি খেয়ে পড়ে চটপট

আর ওঠারই চেষ্টা করল না। তাকে রানআউট না করে উপায় নেই, তাই করা হল। আর-একজন ড্রাইভ ধরনের কিছু একটা করার পল বলটা ব্যাট থেকে স্টাম্পে এসে লাগল। তৃতীয়জন খুব জোরে সামনে দাঁড়ানো সিলি মিড অফ-এর দিকে বল মারে। সে বেচারি নিজের পেট বাঁচাবার জন্য খপ করে বলটা ধরে নেয়। পেট রক্ষা করার আনন্দে সে ক্যাচটা ফেলে দেওয়ার কথা ভুলে যায়।

খেলা দেখতে দেখতে কলাবতীর আটঘরা-বকদিঘি ক্রিকেট ম্যাচের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। গ্রামের ক্রিকেট আর কলকাতার ক্রিকেট তার কাছে যেন সমান মনে হল। তার থেকেও যেটা বেশি করে অনুভব করল, এইরকম গড়াপেটা করে খেলে যারই লাভ হোক, ক্ষতিটা হচ্ছে বাংলার। ময়দানে যে এইভাবে ক্রিকেট খেলা হয় এটা সে জানত না।

মিত্র পরিষদের ইনিংস লাঞ্চে হল আট উইকেটে ২৫২ রান। দু'দলের খেলোয়াড়রা টেন্টে বসে যখন খাওয়ায় ব্যস্ত, তখন প্রায় নির্জন শামিয়ানার নীচে কলাবতী স্যান্ডুইচের মোড়ক খুলল। খেতে খেতে সে ঠিক করল, স্বাধীন সঙ্ঘের ক্যাপ্টেন রমেনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নেবে কেন সে বাগচিকে দিয়ে আর বল করাল না।

মিত্র পরিষদ ফিল্ড করতে নামার পর কলাবতী দেখল, রমেন টেন্টে ঢোকার কাঠের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। সম্ভবত ব্যাটিং অর্ডারে নীচের দিকে, তাই এখনও প্যাড পরেনি।

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

একটি মেয়ে, দুপুরে ময়দানে ক্রিকেট মাঠে, তাও আবার কথা বলতে চায়, সুতরাং রমেন খুব অবাক হয়ে বলল, 'বলুন।"

"আমি বঙ্গবাণীর রিপোর্টার।"

রমেন আরও অবাক! ভরদুপুরে রিপোর্টারি করতে কোনও মেয়েকে সে কখনও দেখেনি।

"আপনি বাগচিকে দিয়ে আর বল করালেন না, এটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে। তিন ওভারে পাঁচটা উইকেট যে নেয় তাকে আর বল না দেওয়ার কারণটা বলবেন?"

রমেন ভাবেনি এমন প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। ছোট টিমের খেলা দেখতে কখনও কোনও রিপোর্টার আসে না, এইসব খেলায় দর্শকও হয় না। সুতরাং যেমন খুশি তেমনভাবে খেললেও কৈফিয়ত চাইবার কেউ নেই।

রমেন কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না। উত্তর হাতড়াতে লাগল।

ছেলেটার বলের পেস লক্ষ করেছেন?" রমেন প্রশ্ন করল।

"দারুণ।" কলাবতী বলল।

"উইকেটের অবস্থা খুব খারাপ। ময়দানে কোনও খোলা মাঠেই যত্ন নিয়ে উইকেট তৈরি করা হয় না। বাগচির এক-একটা বল এমন লাফিয়ে উঠছিল যে, আমার ভয় করেছিল। মনে হল, ব্যাটসম্যানদের মারাত্মক চোট লাগতে পারে, মারাও যেতে পারে। তাই আর ওকে বল দিইনি।" চমৎকার একটা যুক্তি দাখিলের সুখ রমেনের মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

"কিন্তু আমি যতটুকু দেখলাম, তাতে একটা বলও লাফাতে দেখিনি।"

"না, না, কী বলছেন আপনি! ওর থার্ড ওভারে তিনটি বল ব্যাটসম্যানের কপালের কাছে উঠেছিল।"

কলাবতী বুঝল তর্ক করে লাভ নেই, তাই সে এবার চালাকির আশ্রয় নিল। গলাটা একটু নামিয়ে বলল, "তিলুদা কিন্তু আমাকে বলেছেন মিত্র পরিষদকে আজ আড়াইশো রান দেবেন। আমাকে আন্ডার প্রিপেয়ার্ড উইকেট বা ইনজুরি হতে পারে বলে কোনও লাভ নেই।"

রমেনের অপ্রতিভ অবস্থাটা কেটে যাওয়ার পর মুখটা থমথমে হয়ে উঠল।

"আপনি যদি ওদের আড়াইশো রান না দেওয়াতে পারতেন, তা হলে কিন্তু পরের ম্যাচেই উনি ক্যাপ্টেনসি থেকে আপনাকে বরখাস্ত করতেন।"

"তাই বলেছে বুঝি?" রমেন দাঁতে দাঁত ঘষল। "অফ দ্য রেকর্ড বলছি, পরিষদ হল শিবু ঘোষের টিম। শিবু ঘোষ, নিশ্চয় জানেন বাংলার ক্রিকেটের একটা কেষ্টবিষ্টু, অনেক ক্ষমতা রাখে। শুনছি নাইনটি সিক্সে ওয়ার্লড কাপ ক্রিকেটের খেলা এখানে আনার চেষ্টা হবে। তখন অনেক কমিটি, সাব-কমিটি হবে। শিবু ঘোষ ইচ্ছে করলেই তিলুদাকে একটা কমিটিতে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এইবার কি বুঝতে পেরেছেন কেন পরিষদকে তোয়াজ করে জিতিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে? আপনাকে বলেই দিচ্ছি, আমরা দেড়শো রানের মধ্যেই আউট হব, খেলাটা দেখুন আর আমার কথাটা মিলিয়ে নিন।"

"আপনি এইভাবে গড়াপেটা খেলা খেলতে রাজি হলেন?" কলাবতীর স্বরে আন্তরিক বেদনার ছায়া পড়ল। "একটা অল্পবয়সি সম্ভাবনাময় বোলার, ভাল বল করে সবার চোখে পড়তে চায়, আর তাকে...।"

"আপনি এ-লাইনে নতুন, তাই এইসব কথা বলছেন। ময়দানটা আগে

ভাল করে ঘুরে দেখুন। হরির লুটের মতো গড়াপেটা ম্যাচ হওয়ায় গত বছর লিগই বাতিল করা হল। এ-বছর একদিনের লিগ হয়েছে। কিন্তু তাতে কি গড়াপেটার উচ্ছেদ ঘটেছে? করাপ্ট, অল করাপ্ট।" রমেন কথাগুলো বলে সিগারেটটা মাটিতে আছড়ে ফেলে হনহন করে টেন্টের মধ্যে ঢুকে গেল।

ম্যাচটা শেষপর্যন্ত দেখার ইচ্ছে কলাবতীর আর রইল না। সে হাঁটতে শুরু করল। দু'-তিনটে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ খেলা দেখে আবার হাঁটতে লাগল। কোনও মাঠেই তার চোখ বা মন বসল না। বুদ্ধি নেই, সাহস নেই, পরিচ্ছন্নতা নেই, অমন খেলা সময় নষ্ট করে দেখা যায় না।

অবশেষে ক্লান্ত বোধ করে সে ওয়াই এম সি এ মাঠে এল। কিছু দর্শক স্কোরারদের কাছাকাছি ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে ঝালমুড়ি চিবোচ্ছে। কলাবতীও এক টাকার ঝালমুড়ি কিনল। স্কোরবোর্ডে দেখল তিন উইকেটে ১০৮। একজনের ২৩ ও অন্যজনের ১৬ রান। আউট হওয়াদের কেউ হয়তো হাফ সেঞ্চুরি করে থাকতে পারে কিন্তু কাগজে তার নাম উঠবে না। সেজন্য নব্বই টব্বই অন্তত করতে হবে। কলাবতী দর্শকদের পাশে গিয়ে বসল। একজনের কাছ থেকে জেনে নিল, খেলা হচ্ছে সবুজপাতার সঙ্গে কদমতলা ফ্রেন্ডসের। ব্যাট করছে পাতা।

হঠাৎ তার মনে হল কিছু যেন একটা হচ্ছে। আম্পায়াররা কেমন যেন অন্যমনস্ক, সাত বলে ওভার হল, এমনকী আট বলেও। মিড উইকেটের ফিল্ডার বলের পেছনে ছুটতে ছুটতে বলে শট মেরে বাউন্ডারি পার করিয়ে দিল। বল এন্তার শর্ট পিচ পড়ছে। যেন স্বাধীন সঙ্ঘেরই ফিল্ডিংটা কলাবতীর মনে হল আবার সে দেখছে। তবে এখানে এগুলো ঘটছে শুধু একজন ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রেই, যে গাওস্করের মতো সাদা সান হ্যাট পরে খেলছে। গাওস্করের মতোই বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা, ব্যাট ধরা, হাঁটাচলাও তার মতো।

"ওরে ইন্দ্রজিৎ, বাবা, আঁকুপাকু করিসনি।" দর্শকদের একজন ব্যঙ্গভরে চেঁচিয়ে উঠল। "তোর সেঞ্চুরি হবেই হবে, একটু রয়েসয়ে দেখে খেল।"

কলাবতী মুখ ফিরিয়ে দেখল ২৩ সংখ্যাটা ৪৪ হয়ে গেছে তিন ওভারেই। হাফপ্যান্ট পরা একটি ছেলে বোর্ডে স্কোর ঝোলাবার কাজ করছে। স্কোরারদের পেছনে গিয়ে কলাবতী দাঁড়াল। আই তালুকদারের নামের ঘরে দেখল দশটা বাউন্ডারি আর চারটে এক লেখা।

"বাউন্ডারি, আই. তালুকদার।" এক স্কোরার বলে দিল, অন্যজন তার স্কোরবইয়ে চার বসাল।

"বিলু, স্কোর বায়ান্ন কর।" স্কোরার চেঁচিয়ে হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটিকে নির্দেশ দিল।

"বায়ান্ন কেন? চার মারল, আটচল্লিশ হবে তো!" বিলু প্রতিবাদ জানাল যোগের ভুল ধরিয়ে।

"যা বলছি কর।" স্কোরার চাপা ধমক দিল। বেচারা বিলু রানের তোড়ে এমন হিমশিম খাচ্ছে যে, তাল রেখে স্কোর টাঙাতে ভুল করে ৫২-র বদলে ৬২ করে ফেলল।

হইহই করে উঠল দর্শকদের দু'-তিনজন।

"ওরে চক্ষুলজ্জার মাথাও কি খেয়ে ফেলেছিস! চুয়াল্লিশ থেকে বাষট্টি, একটা স্ট্রোকেই!... চালিয়ে যা বাবা।"

আর-একজন চেঁচিয়ে উঠল, "বোলার চেঞ্জ, বোলার চেঞ্জ! এই বোলারটা গুড লেংথে বল ফেলছে, একে চেঞ্জ করো।"

সবাই হেসে উঠল এ-কথা শুনে। লজ্জিত বিলু তাড়াতাড়ি ৫২ করে দিল ৬২-কে।

"দাদা, ব্যাপারটা কী বলুন তো?" কলাবতী উঠে গিয়ে সেই লোকটির পাশে বসল যে 'ওরে ইন্দ্রজিৎ, বাবা' বলে চেঁচিয়েছিল। একটি মেয়ে ময়দানে বসে ছোট দুটো ক্লাবের লিগ ম্যাচ দেখছে, লোকটির এতে অবাক হওয়ারই কথা। সে অবাক হয়ে কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ময়দানে নতুন?"

"হ্যাঁ। ঠিক বুঝতে পারছি না। ওখানে কী হচ্ছে।"

"ক্রিকেট বোঝেন?"

"আমি খেলি। গত বছর বেঙ্গলের হয়ে এলাহাবাদে খেলে এসেছি।"

লোকটি এবার গম্ভীর হয়ে গেল। "ওই যে ইন্দ্রজিৎ তালুকদার, এই সিজনে ওর চারটে সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। ওকে বেঙ্গল টিমে ঢোকাবার দাবিটা জোরালো করতে আরও অন্তত একটা সেঞ্চুরি দরকার। সেই সেঞ্চুরিটাই ওখানে হচ্ছে।"

"হলে, বেঙ্গল টিমে ইন্দ্রজিৎ ঢুকে যাবে?"

"যাবে, ওর লবিটা ভাল। অন্তত চোদ্দোজনের মধ্যে তো আসবেই।"

"কদমতলা ফ্রেন্ডস এতে রাজি হল?"

"কদমতলা ফ্রেন্ডস তো আর চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য লড়ছে না। লিগের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে, ওখানেই থেকে যাবে। সুতরাং এই ম্যাচটা

হারলে ওদের কোনও ক্ষতি হবে না। অথচ সবুজপাতা ঋণী হয়ে রইল কদমতলার কাছে। পরে যখন কদমতলার দরকার হবে সবুজপাতা ঋণশোধ করে দেবে।"

কলাবতীর স্তম্ভিত মুখটা দেখে লোকটি মুচকি হেসে বলল, "খেলা দেখুন। বাঙালি ছেলের বীরত্ব কতদূর যায় সেটা স্বচক্ষে দেখুন।"

কলাবতীর দেখা আর শোনা হতে হতেই ইন্দ্রজিতের ৫২টা ৭২ হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে সে যেন অ্যালিসের মতো কোনও আজব দুনিয়ায় বসে খেলা দেখছে। যথাসময়ে সেঞ্চুরিটা হয়ে গেল। কদমতলার জনাদুই খেলোয়াড় হ্যান্ডশেক করল, সাদা টুপি এবং ব্যাট তুলে ইন্দ্রজিৎ শামিয়ানা থেকে কয়েকজনের পাঠানো করতালি গ্রহণ করল।

সবুজপাতা শেষপর্যন্ত তিন উইকেটে ম্যাচটা জিতল। কলাবতী স্কোরবই থেকে খেলার ফল টুকে নেওয়ার সময় দেখল, ইন্দ্রজিতের অপরাজিত ১২৪ রানে আছে তেইশটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি। শতরানে পৌঁছেছে ৪৪ বল খেলে।

ভবনাথদা বলেছিলেন, 'কার কী বক্তব্য জেনে নেবে।' কোট খুলে চেয়ারে বসে একজন আম্পায়ার চা খাচ্ছেন। কলাবতী তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "স্কোরবুকে যে জোচ্চুরি করে রান বাড়ানো হল, তাতে আপনারা আপত্তি করলেন না?"

"বাড়ানো হয়েছে নাকি!" তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। "আমরা তো মাঠে ছিলাম, স্কোরে কী লেখা হয়েছে তা তো আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দু'দলেরই স্কোরার স্কোর রেখেছে, কেউ তো আমাদের কাছে এই নিয়ে কমপ্লেন করেনি, সুতরাং আমাদের কিছুই করার নেই।"

কলাবতীর মনে হল ময়দানে আর তার থাকার দরকার নেই। শরীর ক্লান্তিতে ভরে উঠেছে। সারাদিনই ফিল্ড করে স্কোরবোর্ডে ৩০০—০ দেখার মতো এখন তার মনের অবস্থা।

কলাবতী সি এস জি সি-র কাঠের ফটক ঠেলে ঢুকেই দেখল, তাঁবুর বাইরের বাগানে খদ্দরের পাঞ্জাবি-ধুতি-পরা কৃষ্ণপদ ভটচাজ একটা চেয়ারে বসে।

"তোমার জন্যই চলে এলুম। একে নতুন, তায় মেয়ে, চেনা পরিচয়টা করিয়ে না দিলে কেউ তো তোমায় পাত্তা দেবে না।... এই যে রূপায়ণ, এদিকে আয়।" কৃষ্ণপদ, প্রচুর দাড়িওলা, চশমাপরা একজনকে ডাকল।

"একে চিনিস? এর নাম কলাবতী সিংহ, আমাদের কাগজে স্পোর্টসে জয়েন করেছে। আজই প্রথম মাঠে এল। ভাল ক্রিকেট খেলে, ভাল লেখে।"

"তাই নাকি? কাল তা হলে তো বঙ্গবাণী পড়তে হবে।"

কলাবতী শুনে খুশি হল, আবার ভয়ও পেল। তার লেখা পড়ে যদি হাসে! যদি বলে কাঁচা, ছেলেমানুষি, কিস্‌সু বোঝে না!

কৃষ্ণপদ আর একজনকে ডাকল, "অ্যাই দেবাশিস, শুনে যা।"

"কেষ্টদা এক মিনিট।" কালো রং, দাড়িহীন, সরু গোঁফের লোকটি একজনের সঙ্গে কথা বলছে। কৃষ্ণপদ তখন ফিসফিসিয়ে কলাবতীকে জিজ্ঞেস করল, "মাঠে গেছলে তো?"

"হ্যাঁ, দুটো মাঠে খেলা দেখেছি।"

"কিছু পেলে? লেখার মতো?"

"হ্যাঁ পেয়েছি। প্রথম মাঠে..." কলাবতী থমকে পড়ল কৃষ্ণপদর ঠোঁটে তর্জনীর চাবি দেখে।

"চুপ। রূপায়ণ, দেবাশিস, ওই যে সুপ্রিয়, এদের সামনে একদম মুখ খুলবে না। যা খবর পাবে পেটের মধ্যে রাখবে। এটা হল সাংবাদিকতার ফার্স্ট লেসন। কাউকে কোনও খবর সাপ্লাই করবে না।"

"কী সাপ্লাই করবে না কেষ্টদা?... আরে তুমি তো কলাবতী সিনহা?" দেবাশিস এগিয়ে এসে বলল।

"কী করে চিনলি একে?" কৃষ্ণপদ পালটা প্রশ্ন করল।

"ওকে তো খেলতে দেখেছি, দাঁড়াও-দাঁড়াও..." দেবাশিস তর্জনী দিয়ে কপালে চারটে টোকা মেরে স্মৃতির ভাণ্ডারের ঢাকনা খুলে বের করে আনল, "গত বছর এই ইডেনেই, ফার্স্ট বলেই তো তুমি বোল্ড হয়েছিলে? ইয়েস, ইয়েস, বোলার ছিল ডায়না এদুলজি। আমি অবশ্য মেয়েদের ক্রিকেট দেখি না, একটা কাজে মিনিট দশেকের জন্য গিয়ে পড়েছিলুম। ফার্স্ট বলেই... অ্যাম আই কারেক্ট?"

কলাবতীর শ্যামলা রঙের মুখ লজ্জায় পলকের জন্য বেগুনি হয়ে উঠল। মুখে হাসি টেনে বলল, "হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।"

"এক মিনিট।" দেবাশিস ব্যস্ত হয়ে টেন্টের ভেতর ঢুকে গেল। কলাবতী মুখ নামিয়ে কীভাবে তার রিপোর্ট শুরু করবে, তাই ভাবতে লাগল।

কৃষ্ণপদর মনে হল, প্রথম বলেই বোল্ড হওয়ার লজ্জায় কলাবতী হয়তো মনমরা হয়ে পড়েছে। তাকে চাঙ্গা করার জন্য বলল, "আরে, প্রথম বলে কে

না আউট হয়? গাওস্কর হয়নি? এই ইডেনেই তো মার্শালের বলে হয়েছে। আর গোল্লা করা? জানো, একবার ডবলু. জি. গ্রেসের কাছে এক ছোকরা খুব লম্বা লম্বা বাত ঝাড়ছিল। সে নাকি দারুণ ব্যাট করে, বড় বড় স্কোর করেছে। অনেকক্ষণ শুনে গ্রেস জিজ্ঞেস করলেন, 'কখনও গোল্লা করেছ?" ছোকরা বুক ভুলিয়ে বলল, 'জীবনে শূন্য রানে আউট হইনি।' গ্রেস শুনে বললেন, 'তা হলে ক্রিকেটের কিছুই তো শেখোনি।' বুঝলে কলাবতী, গোল্লা করার খুব প্রয়োজন আছে। তা হলে ওটাকে একশো করার জন্য তুমি চেষ্টা করবে। তাই না?"

কলাবতী মাথা নেড়ে সায় দিল।

"তুমি এখন অফিসে চলে যাও। রেজাল্ট ফেজাল্ট আমি নিয়ে যাব'খন। আমার পৌঁছোনোর জন্য অপেক্ষা কোরো না, তুমি লিখে রেখে দিয়ে চলে যেয়ো, আমি রেজাল্টগুলো তলায় জুড়ে দেব।"

বঙ্গবাণীর খেলার বিভাগে পৌঁছে সে কাউকেই দেখতে পেল না। অবশ্য সেজন্য তার কোনও অসুবিধে হল না। কৃষ্ণপদ যা বলে দিয়েছিল, কলাবতী তাই করল। দুটো মাঠে যা দেখেছে, শুনেছে এবং বুঝেছে সেগুলো যথাসাধ্য গুছিয়ে ঝাঁঝালো ভাষায় লিখে, অবশেষে আক্ষেপ জানিয়ে শেষ করল, "নীচের দিকে যদি এইভাবে খেলা হয়, বনিয়াদটাই যদি ভেজাল দিয়ে তৈরি হয় তা হলে এরপর সুউচ্চ অট্টালিকা কখনওই তৈরি করা যাবে না।" প্রায় এক কলামের একটা রচনা লিখে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে সে বাড়ি চলে গেল।

রাত্রে রাজশেখরকে সে সবিস্তারে মাঠের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলল, "দাদু, তোমার সামার গেম্‌স আর গুড ডেজ যেখান থেকে বের করেছ, আবার সেখানেই তুলে রেখে দাও। আমার আর কার্ডাস পড়ার দরকার নেই।"

"সে কী রে! আমি যে দু'দিন ধরে কত ভাল ভাল জায়গা অনুবাদ করে রাখলাম, তার কী হবে?" সত্যশেখর আক্ষেপ জানিয়ে বললেন, "বাংলার ক্রিকেট সুউচ্চ অট্টালিকা না হোক, তোর লেখাটা তো চোখে পড়ার মতো উচ্চ দরের হতে পারবে।"

পরদিন ভোরবেলায় রাজশেখরের সঙ্গে জগিং সেরে বাড়ি ফিরেই কলাবতী দেখল কাকার হাতে বঙ্গবাণী, কিন্তু মুখটা বিমূঢ়। কাগজটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কলাবতী দ্রুত খেলার পাতাটা খুলল। ছাপার অক্ষরে তার লেখা বেরিয়েছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ তা পড়বে। নাই-বা

তার নাম দিয়ে বেরোল, কিন্তু খেলার নামে যা চলছে তার একটা আংশিক ছবি তো সে তুলে ধরেছে। কত লোক প্রশংসা করে বলবে, এমন লেখাই তো চাই! প্রতিশ্রুতিমানরা কীভাবে নষ্ট হয়, সেটা তো নিজের চোখে বাগচিকে দেখেই লিখেছে।

কিন্তু তার লেখাটা কোথায়? কলাবতীর মাথায় এবার ভেঙে পড়ল যেন বাংলার ক্রিকেটের 'সুউচ্চ অট্টালিকাটাই'। তার লেখাটা কোথায়? "ঝড়ের মতো শত রান" হেডিং দিয়ে লম্বা এক কলামের লেখায় 'স্টাফ রিপোর্টার' শুরু করেছে, "রবিবার ওয়াই এম সি এ মাঠের ওপর ঝড় বয়ে গেল। মাত্র ৪৪ বলে সবুজ পাতার ইন্দ্রজিৎ তালুকদার কদমতলার বোলিং তছনছ করে শতরানে পৌঁছোন। মরসুমে এটি তাঁর পঞ্চম শতরান। ২৩টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কা মেরে তিনি শেষপর্যন্ত ১২৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। বাংলার রঞ্জি দলের ভঙ্গুর মিড্‌ল অর্ডার ব্যাটিং-এ ইন্দ্রজিতের মতো ব্যাটসম্যানই যে এখন দরকার সে-কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।" কিন্তু তার লেখাটার একটা বাক্যও তো এতে নেই। সে শুরু করেছিল, "বাংলার রঞ্জি দলে কেন অন্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের সংখ্যা বাড়ছে তার প্রকৃষ্ট এক কারণ রবিবার ওয়াই এম সি এ মাঠে দেখা গেল। ইন্দ্রজিৎ তালুকদার মরসুমে তাঁর পঞ্চম লিগ শতরানটি ৪৪ বলে করলেন কদমতলা ফ্রেন্ডসের ফুলটস ও শর্ট পিচ বলের ভর্তুকি দ্বারা। বাংলা দলে ইন্দ্রজিতকে এরপর নেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই জোর দাবি উঠবে।"

কলাবতী ফ্যালফ্যাল চোখে কাকার দিকে তাকাল। সত্যশেখরেরও সেইরকম অবস্থা।

"লেখাটা কাল টেব্‌লে রেখে চলে এসেছিস। উড়েটুড়ে মানে হারিয়ে টারিয়ে যায়নি তো?" ঢোক গিলে সত্যশেখর বললেন।

কলাবতী মাথা নাড়ল, "পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে এসেছিলুম।"

"তা হলে?"

কলাবতীর চোখ দিয়ে দরদর করে জল নেমে এল। তার প্রথম সাংবাদিকতা প্রয়াস ছাপার মুখ আর দেখল না।

"তুমি নিশ্চয় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ।" কৃষ্ণপদ তার পাশে বসা গম্ভীর মুখ কলাবতীকে একগাল হেসে বলল, "আরে সাংবাদিকতার এটাই তো ফার্স্ট লেসন। খবরের

কাগজে আগে থাকবে খবর। সাহিত্য ফাহিত্য, মন্তব্য, উপদেশ, পরামর্শ থাকবে... অবশ্যই থাকবে, কিন্তু পরে। তুমি পরেশ কি সুব্রতকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো।"

"আবার আমায় নিয়ে কেন টানাটানি করছ কেষ্টদা।" সুব্রত কপি লিখতে লিখতে কলাবতীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আবার বলল, "লেখাটা ফেলে না দিয়ে ওকে তো বলতে পারতে এটাকে কিছু এধার-ওধার করে একটা ফিচারের মতো লিখে দাও। আমাদের তো মাঝে মাঝে ম্যাটার শর্ট পড়ে যায়, তখন ওটা চালিয়ে দেওয়া যেত।"

"তা অবশ্য বলতে পারতুম।" কৃষ্ণপদ তার ডানদিকের চুল আলতো দুটো থাপ্পড়ে চেপে বসাল। "তা হলে কলাবতী তুমি আরও দু'-একটা ম্যাচ দেখে ফিচার গোছের একটা লেখা লিখে ফেলো। ছোট করে লিখবে। তোমার লেখাটা এত বড় করে ফেলেছিলে, যেন ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালের রিপোর্ট করছ। লেখাটার আকার দেখেই তো বুঝে গেছলুম বাদ দিতে হবে।"

"তা হলে এবার কোন ম্যাচটায় যাব?" শুকনো গলায় কলাবতী জানতে চাইল।

"পরেশ, ফিকশ্চারটা দে তো।"

টাইপ করা একটা কাগজ পরেশ ফাইলবক্স থেকে বের করে দিল। কৃষ্ণপদ ভ্রূ কুঁচকে সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "বড় টিমের ম্যাচ থেকে ফিচারের মেটিরিয়াল পাবে না তুমি, সেকেন্ড ডিভিশনের ম্যাচই বরং করো। শনিবার বাগুইহাটি স্পোর্টিং নিজেদের মাঠে খেলবে কদমতলা ফ্রেন্ডসের সঙ্গে। কাঁকুড়গাছি থেকে তোমার যেতেও সুবিধে হবে।"

"মাঠটা কোথায় কেষ্টদা?"

"মাঠটা?" কৃষ্ণপদর চুলের ওপর ঘরের ছাদ যেন ভেঙে পড়ল। "তাই তো? পরেশ বাগুইহাটির মাঠটা কোথায় রে?"

"আমি কী করে জানব! আমি কি ক্রিকেট করি?" পরেশ প্যাড থেকে একটা কাগজ প্রবল বিরক্তি নিয়ে ছিঁড়ল।

"কোথা থেকে কোথা থেকে সব ক্লাব যে সি এ বি ধরে আনে! হ্যাঁরে সুব্রত—!" কৃষ্ণপদ বিপন্ন চোখে তাকাল।

"তোমায় ভাবতে হবে না, কলাবতী ঠিক খুঁজে বের করে নেবে। বাগুইহাটির মোড়ে বাস থেকে নেমে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই সে বাতলে দেবে।" সুব্রত লেখা থেকে মুখ না তুলে বলল।

"সাংবাদিকতার ফার্স্ট লেসন হল এটাই, অজানাকে খুঁজে বের করা।" কৃষ্ণপদ হাই তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

বাড়ি ফিরতেই মুরারি জানাল, "বড়দি তোমাকে ফোন করেছিলেন। কী দরকার সেটা আর বলেননি। তোমাকে ফোন করতে বলেছেন।"

"কাকা কোথায়?"

"নীচে, চেম্বারে। ওঁর কাছেই ফোনটা এসেছিল।"

"মক্কেল রয়েছে?"

"তিনটে লোককে তো দেখেছিলুম।"

দোতলার ফোনটা দিনসাতেক হল মরে রয়েছে। কাকার চেম্বারের ফোন ব্যবহার করতে কলাবতী নীচে নেমে এল।

সত্যশেখর ঘরে একা এবং টেবিলের ওপর সাজানো তিন শালপাতা আলুকাবলি। তাকে দেখে সত্যশেখর ব্যস্ত হয়ে বললেন, "লোকগুলো এসে আর ওঠেই না... নে। শুরু কর। বেশি আর খাব না, চারটে হয়ে গেছে।"

"বড়দি ফোন করেছিলেন?"

"হুঁ।" শালপাতাটা চেটে নিয়ে সত্যশেখর বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেললেন। কলাবতীকে ডায়াল করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে বললেন, "এগুলো ফেলে তুই আজেবাজে ফোন করতে শুরু করলি?"

"বড়দি আজেবাজে?"

"এই আলুকাবলি আমার জন্য আলাদা করে তৈরি করিয়ে আনে মুরারি। এর কাছে তোর বড়দি?"

কলাবতী উত্তর দিতে যাচ্ছে, তখন ফোনে ওধার থেকে গম্ভীর পুরুষ গলা বলে উঠল, "হ্যালও।"

গলাটা চিনতে পারল কলাবতী। "কে হরিদাদু, আমি কালু বলছি।"

"কী খবর তোমার, ভাল আছ তো? বাড়ির সবাই, সতু, রাজু ভাল আছে?"

"আছে।"

"মলুর কাছে শুনলাম, তুমি নাকি বঙ্গবাণীতে স্পোর্টস রিপোর্টিং করছ? আর কি কাগজ পেলে না? ওর এডিটর তো সদানন্দ ঘোষ, আমাদের ওদিককারই ছেলে। ওর বাবা স্কুলে বাংলা পড়াত। সদানন্দ তো এক কলম বাংলাও লিখতে পারে না, ওর কাগজে তুমি কী লিখবে? যে বাংলা শিখেছ সেটাও ভুলে যাবে। কার বুদ্ধিতে ওখানে গেলে, নিশ্চয় রাজুর।"

কলাবতী সন্ত্রস্ত এবং হুঁশিয়ার হয়ে গেল। "না, না, দাদুর তো ভীষণ আপত্তিই ছিল। ঠিক আপনার মতোই বলেছিলেন, সদানন্দ তো এককলমও বাংলা লিখতে পারে না, ওর কাগজে লিখলে..." কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

"কী বললে?" হরিশঙ্কর মুখুজ্জে হুংকার ছাড়লেন, "রাজু এ-কথা বলেছে? ও বাংলার বোঝেটা কী? ও তো বিদ্যাসাগর মশায়ের 'উপক্রমণিকা' পড়েনি, পড়েছে নেসফিল্ড। সদানন্দর বাংলা বোঝার যোগ্যতা ওর আছে? সম্পাদকীয়গুলো পড়ে দেখো, কী ওজঃ কী ঝংকার, আমি তো ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গলা শুনতে পাই ওর লেখা থেকে... খুব ভাল করেছ তুমি... এই যে মলু এসে গেছে, ধরো।"

"কে, কালু?"

"হ্যাঁ, বড়দি।"

"ফোন করেছিলুম একটা ব্যাপারে। তুমি তো বঙ্গবাণীর স্পোর্টসে জয়েন করেছ। আমার মামাতো দাদার মেয়ে ঝুপু টেনিস খেলে, ওকে নিয়ে তুমি লিখতে পারো। দিনরাত পরিশ্রম করছে। স্টেফি গ্রাফ, সাবাতিনি, এরাই ওর আদর্শ। ওদের মতো হতে চায়। প্রভাতদা, বউদি ওঁরাও খুব চেষ্টা করছেন। তুমি এদের নিয়েও লিখতে পারো।"

"ওঁরা থাকেন কোথায়?"

"লিলুয়ায়। দাদা ওয়েলিংটন জুট মিলে বড় চাকরি করেন। বউদি কাল এসেছিলেন। কথায় কথায় আমি বললুম, আমার এক ছাত্রী খবরের কাগজে স্পোর্টস রিপোর্টার।"

"না বড়দি, আমি ঠিক রিপোর্টার নই। টুকটাক কাজ শিখছি, চাকরি করি না।" কলাবতী ভুল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করল।

"ওই হল। তুমি লিখলে সেটা কাগজে বেরোবে।"

"না বড়দি, তার কোনও গ্যারান্টি নেই।"

"তা হলে, প্রভাতদার মেয়ের কথা তোমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়?" হতাশা ফুটে উঠল মলয়া মুখার্জির গলায়।

"বড়দি, আমি বরং মেয়েটিকে আগে একবার দেখি। ও খেলে কোথায়, সাউথ ক্লাবে? কোনও টুর্নামেন্ট জিতেছে?"

"তা তো আমি বলতে পারব না। ওদের কোয়ার্টারটা বেশ বড়, সঙ্গে অনেকটা জমি আছে, হয়তো সেখানেই খেলে। বউদি তো তোমার কথা

শুনে লাফিয়ে উঠলেন। একটু পাবলিসিটি পেলে নাকি ঝুপু খুব উৎসাহ বোধ করবে, তা ছাড়া স্পনসরার পেতেও সুবিধে হবে। তুমি যদি যাও তো বাড়িতে ওঁরা গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।"

"না, না, ওসব নয়। লিলুয়া স্টেশন থেকে আমায় তুলে নিলেই হবে। আমি বুধবার তিনটে নাগাদ হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠব। ওঁদের এটা জানিয়ে দিন।"

"এখনই ফোন করছি। বলে দিচ্ছি পরশু তিনটে থেকে যেন গাড়ি নিয়ে সবুজ সালোয়ার কামিজ পরা একটা মেয়ের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করে।"

ফোন রেখে সে সত্যশেখরের দিকে তাকাল। টেব্‌লের তিনটি শালপাতা নেই।

"কী করব, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। এত ভাল জিনিস!"

বুধবার লিলুয়া স্টেশনের বাইরে এসে কলাবতী হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে বাজে। সবুজ একটা মারুতি দেখে তাকানোমাত্র গাড়ির পেছনের জানলা থেকে এক মহিলা হাত বাড়িয়ে নাড়লেন। ড্রাইভারও হর্ন বাজাল। গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ধরে কৃতার্থ হওয়ার মতো গলায় মহিলা বললেন, "সবুজ সালোয়ার কামিজ দেখেই বুঝে গেছি। আমি মলুর বউদি ছবি চ্যাটার্জি... বেশিক্ষণ লাগবে না, মিনিট দশেকের রাস্তা... উনি আসতে পারলেন না, লেবারদের ঝামেলা চলছে। এখন মিলে রয়েছেন, আমাকে বললেন তোমাকে রিসিভ করতে। আচ্ছা, বঙ্গবাণী তো বেশ বড় কাগজ, এখন সার্কুলেশন কত, লাখ চার-পাঁচ হবে?"

ফাঁপরে পড়ল কলাবতী। সে সত্যিই জানে না বঙ্গবাণীর বিক্রয়-সংখ্যাটা কত। তার অনুমান, লাখ দেড়েকের বেশি নয়। কিন্তু তার মনে হচ্ছে দেড় লাখ বললে ছবি চ্যাটার্জি খুবই হতাশ হবেন, খাতিরটাও কমিয়ে দেবেন।

"এখন ছ'লাখের কাছাকাছি।"

"ছ-অ-অ-অ লাখ!" পুলকিত বিস্ময়ের ধাক্কায় ছবি চ্যাটার্জি অনর্গল কথা বলতে শুরু করলেন।

"জানলে, আমিও একসময় খুব খেলাধুলো করতুম। সাঁতার কাটতুম, দৌড়োতুম, গাছে চড়তুম... গাছে চড়াটাও তো একটা খেলা, তাই না? চোর-পুলিশ, গাদি, কানামাছি, কতরকমের যে খেলা খেলেছি! কিন্তু কোনও খেলাতেই উঁচুতে আর উঠতে পারলুম না। এই আক্ষেপটা আজও আমার

রয়ে গেছে। উনিও বড় টেনিস প্লেয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কলেজে পড়ার সময় খেলতেন। কিন্তু কেরিয়ারের কথাটা তো ভাই আগে ভাবতে হবে। উইম্বলডন জিতবেন ভাবতেন, সেই সাধ আর পূর্ণ হল না।"

ছবি চ্যাটার্জির বয়স, কলাবতীর মনে হল, বড়দির চেয়ে অনেক কম, বড়জোর পঁয়ত্রিশ। কিন্তু দেহের ওজনে বড়দির থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোগ্রাম বেশিই হবেন। মুখটি সুন্দর, যাকে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো বলা যায়, দুধে-আলতা গায়ের রং। ধনীর কন্যা এবং দর্শনশাস্ত্রের এম. এ.। কলাবতী চ্যাটার্জিদের সম্পর্কে যথাসাধ্য হোমওয়ার্ক করেছে লিলুয়া রওনা হওয়ার আগে। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে, ভস্মে ঘি ঢেলেছে।

"আমাদের অপূর্ণ সাধ, আকাঙ্ক্ষা এখন ঝুপুকে দিয়ে আমরা মেটাতে চাই। উনি গাদা গাদা বই কিনছেন আর রাতদিন পড়ছেন। সব টেনিসের বই। কোচিং-এর বই, স্পোর্টস সাইকোলজির বই, স্পোর্টস মেডিসিনের বই, বড় বড় প্লেয়ারদের জীবনী, শোবার ঘরের চারটে তাক বইয়ে ভরে গেছে। ঝুপুও খুব খাটে। তবে ওর সম্পর্কে কাগজে কিছু বেরিয়েছে দেখলে উৎসাহটা বাড়বে, আরও খাটবে। ও বড় হলে সেটা তো দেশেরই বড় হওয়া, খবরের কাগজের এই দিকটা, মানে দেশের গৌরবের দিকটা তো দেখা উচিত, ঠিক কিনা? তুমি আসবে শুনে কালই ওর গোটা তিরিশ ছবি তোলানো হয়েছে, তোমার তো লেখার সঙ্গে লাগবে?"

কলাবতী আগাগোড়াতেই হুঁ-হুঁ করতে করতে অবশেষে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা কোয়ার্টারের ফটকে পৌঁছোল। একতলা বাংলো বাড়ি। মোরাম-ঢাকা পথ ফটক থেকে ঢাকা বারান্দা পর্যন্ত, দু'ধারে মরসুমি ফুল আর চন্দ্রমল্লিকা। কলাবতীর চোখ মুগ্ধ হয়ে গেল এবং তারপরই বিস্ময়ে গোলাকার। বাংলোর পশ্চিমে, ভ্রূকপরা ছোট্ট একটি মেয়ে, হাতে একটা টেনিস র‍্যাকেট, যার হাতলটার আধখানাই কেটে বাদ দেওয়া, কৌতূহলী চোখে তার দিকেই তাকিয়ে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল। তারপর থামিয়ে রাখা কাজটা শুরু করল— বাঁ হাতের টেনিস বলটা শূন্যে ছুড়ে র‍্যাকেট দিয়ে মারল। বাংলোর দেওয়ালে লেগে বলটা ফিরে আসতেই ভলি করল। এইভাবে সে জমিতে বল পড়তে না দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভলি মেরে যেতে থাকল, ডাইনে-বাঁয়ে সরে অথবা পিছিয়ে গিয়ে।

কলাবতী লক্ষ করল মেয়েটি একবারের জন্যও বল থেকে চোখ সরাচ্ছে না। ভ্রূ কুঁচকে, গালের পেশি শক্ত করে মনপ্রাণ নিজের কাজে ঢেলে সে বল

মেরে যাচ্ছে। কখনও যদি বল ফসকাচ্ছে, পাশেই রাখা একটা প্লাস্টিকের বালতি থেকে বল তুলে নিয়ে আবার শুরু করছে। সময় নষ্ট হচ্ছে না।

"ঝুপু এখন ভলি প্র্যাকটিস করছে।" ছবি ফিসফিস করে গোপন খবর জানাবার মতো গলায় বললেন, "সাড়ে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত ভলি সেশন, দেড়শো ভলি।"

"দেএএএড় শোওও!" কলাবতী অনেকটা 'ছঅঅঅ লাখ'কে নকল করে বলল। শুনে আত্মপ্রসাদের হাসি ছড়িয়ে পড়ল শ্রোতার মুখে। "তিন মাস পর ওটা দুশো হবে।"

"দুউই শো!"

"তারপর আধঘণ্টা চলবে ব্যাক হ্যান্ড। দু'হাতে র‍্যাকেট ধরে মানে টু ফিস্টেড ব্যাক হ্যান্ড, যেভানে মোনিকা সেলেস মারে, তুমি দেখেছ তো?"

"টিভিতে দেখেছি। আধঘণ্টায় ঝুপু ক'টা মারবে?"

"পঞ্চাশটা। আমরা সপ্তাহের ট্রেনিং শিডিউলই ওকে লিখে দিই। গত হপ্তায় মেরেছে পঁয়তাল্লিশটা। তিন মাস পর এটা হবে একশো দশ। ব্যাক হ্যান্ডের পর পনেরো মিনিট রেস্ট। তখন ওর ঘাড়ে-হাতে ম্যাসাজ করে দিই।"

"ট্রেনিং-এর সময় কেউ লক্ষ করেন না, ঠিকমতো হচ্ছে কিনা?" বলতে বলতে কলাবতী তার ঝোলা থেকে নোটবই আর কলম বের করল।

"কেন, আমি থাকি। ওই যে, ওখানে বসে দেখি।" কলাবতীকে টুকতে দেখে ছবি চ্যাটার্জি প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে বললেন।

ঝুপুর পেছনে একটা বড় রঙিন বাগানছাতা আর চেয়ার কলাবতী আগেই দেখেছে। তার পেছনে নিকোনো মাটির একটা ছোট টেনিস কোর্ট, যাতে চুনগোলা দিয়ে দাগ টানা। কোর্টে নেট খাটানো রয়েছে।

"পেছনে বসে ওকে উৎসাহ দিয়ে যান?"

"বল গার্লদের মতো বলও কুড়িয়ে দিই। উফ্‌ফ কী যে পরিশ্রম করতে হয় মেয়ের জন্য, সে তো তুমি বুঝবে না ভাই।"

"কোর্টটা মাটির কেন?"

কথাটা শুনে ছবি চ্যাটার্জির যেন শ্বাসকষ্ট শুরু হল। "বলছ কী ভাই! ঘাসের কোর্ট পৃথিবীতে আর ক'টা, সবই তো ক্লে কোর্ট! উইম্বলডন ছাড়া সার্কিটে আর ঘাস কোথায়?"

কলাবতী মনে মনে জিভ কামড়াল। বড্ড ভুল প্রশ্ন সে করে ফেলেছে।

এখন থেকেই ঝুপু মাটির কোর্টের সঙ্গে সড়গড় না হলে গ্রাফ কি সেলেসের সঙ্গে লড়বে কী করে।

"কম খরচ হয়েছে? তিন লরি মাটি, সেইসঙ্গে গোবর, খোল, আরও কত কী!"

ঝুপু সমানে ভলি মেরে চলেছে। একজন অপরিচিত যে দূর থেকে লক্ষ করছে এটা সে গ্রাহ্যেই আনছে না। বয়স বড়জোর নয়-দশ। মায়ের মতোই রং এবং মুখের গড়ন। ছোট চুল স্টেফি গ্রাফের মতো ঘাড়ের কাছে রিবন বাঁধা। পা দুটি লম্বা এবং সুগঠিত।

"শুধু একা একা ট্রেনিংই করে যাচ্ছে? ম্যাচ খেলে না?"

"ওর বাবা রোজ সকালে বেরোবার আগে এক ঘণ্টা ওর সঙ্গে খেলেন।"

"আপনাদের দু'জনকেই খুব খাটতে হয়।"

"নিশ্চয়। চলো ভেতরে গিয়ে বসি। ঝুপু আজ আর ব্যাকহ্যান্ড করবে না। তোমার তো ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

"না, তেমন কিছু প্রশ্ন আমার নেই।" কলাবতী এগোল ছবি চ্যাটার্জির সঙ্গে। বারান্দা থেকে বসার ঘরে ঢুকেই সে থ' হয়ে গেল। ঘরটা তো টেনিস পোস্টারের প্রদর্শনী! দেওয়ালে এক ইঞ্চিও খোলা জায়গা নেই। জিমি কোনর্স, বর্গ, এভার্ট, নাভ্রাতিলোভা থেকে সাম্প্রাস আর কাপ্রিয়াতি পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছরের সব নামীদের রঙিন ছবি।

"এরা সবসময় চোখের সামনে থাকলে ঝুপু প্রেরণা পাবে।" সোফায় বসলেন ছবি চ্যাটার্জি। সামনের সোফায় কলাবতী।

ঘরে ঢুকল ঝুপু। মায়ের আঙুলের নির্দেশে কলাবতীর পাশে বসল। মুখটা নামানো। ঘামে ভেজা ঘাড়ের চুল চামড়ায় সেঁটে রয়েছে। একে কী জিজ্ঞেস করবে?

"তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?"

ঝুপু মায়ের দিকে তাকাল।

"সারাদিনটাই তো ওর ট্রেনিং শিডিউলে ভরা। পড়বার সময় কোথায়? রেস্ট নেওয়াটাও খুবই দরকার, তাই ওকে স্কুলে দিইনি। আমিই বাড়িতে পড়াই।"

"তোমার বন্ধুরা কী বলে তোমার এই টেনিস খেলা নিয়ে?"

ঝুপু মাথা নেড়ে অস্ফুটে বলল, "বন্ধু নেই।"

"বুঝলে ভাই, বেশি বন্ধুটন্ধু থাকলে তখন হইচই করার দিকেই মন চলে যাবে, তাই আমি ওকে মিশতে টিশতে দিই না। ঠিক করিনি?"

কলাবতী চুপ করে রইল।

'এখানকার দিনে মানুষ খাটে তো টাকা রোজগারের জন্যই। স্টেফি গ্রাফ বাইশ বছর বয়সেই এক কোটি দশ লক্ষ ডলার শুধু প্রাইজমানিই জিতেছে। টাকায় এটা কত হয় বলো তো? ঝুপুর বাবা হিসেব করে দেখেছে, প্রায় তেত্রিশ কোটা টাকা! চার বছর বয়সে বাবা স্টেফির হাতে র‍্যাকেট তুলে দিয়েছে বলেই তো আজ সে এত বড় হয়েছে, এত টাকা করেছে। ঝুপুর হাতে র‍্যাকেট আমরা দিয়েছি, গত বছর, ওর ন'বছর বয়সে। আমি বলছি না বারো বছর পর ও তেত্রিশ কোটি টাকার মালিক হবে। কিন্তু কিছু তো হবে... কুড়ি কোটি... পনেরো কোটি... দশ কোটি?" ছবি চ্যাটার্জি উত্তেজিত হয়ে সামনে ঝুঁকে টেব্‌লে চড় বসালেন। "এর সঙ্গে বড় বড় কোম্পানির প্রোডাক্টের এনডোর্সমেন্ট থেকে পাওয়া আরও দশ কোটি যোগ করো। আসলে কী জানো, খরচ করা আর লেগে থাকা এই দুটো না হলে কিছু হয় না। তিন থেকে পাঁচ বছর ফ্লোরিডায় কি ক্যালিফোর্নিয়ায় কোনও টেনিস অ্যাকাডেমিতে ঝুপুকে রাখা দরকার। কিন্তু খরচের কথা ভেবে আমরা এসব চিন্তা ত্যাগ করেছি। স্পনসরার পেলে অবশ্যই ওকে পাঠাব। তুমি ভাই সেইভাবে লিখো যাতে স্পনসরাররা এগিয়ে আসে।"

কলাবতী আড়চোখে ঝুপুকে দেখল। মাথাটা হেলিয়ে সে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেয় আঁক কাটছে। চোখের ভাব ঘুমে জড়িয়ে আসার মতো। কলাবতীর ইচ্ছে করল বুকের কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে বলতে— 'ছুট্টে এই বাংলো থেকে বেরিয়ে সামনে যাকে পাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাও।'

ভেতরের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ছবি চ্যাটার্জি "আসছি" বলে উঠে গেলেন। সেই ফাঁকে কলাবতী নিচুস্বরে ঝুপুকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ভাল লাগে রোজ এইভাবে ট্রেনিং করতে?"

মেয়েটি শুধু তাকিয়ে রইল।

"বলো না, ভয় কী আমাকে বলতে?"

ভেতর থেকে ছবি চ্যাটার্জির গলা ভেসে এল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছে। তুমি কি এখন আসতে পারবে না?..."

কলাবতী আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না?"

ঝুপু মাথা হেলিয়েই সিধে করে নিল। তার মা ফিরে এসেছেন।

"ঝুপুর বাবার ফোন, মিলে আটকে পড়েছেন। বললেন ক্যাসেটটা তোমাকে শোনাতে।"

"কীসের ক্যাসেট!"

"ইন্টারভিউয়ের ক্যাসেট। টুর্নামেন্ট জিতলে রিপোর্টাররা যখন নানারকম প্রশ্ন করবে তখন ঝুপু কী উত্তর দেবে? ওর বাবা ইংরেজিতে আশিটা নানারকমের প্রশ্ন আর তার উত্তর নিয়ে ক্যাসেট তৈরি করেছে। রাত্তিরে ঘুমোবার আগে ঝুপু আধঘণ্টা ক্যাসেট শোনে আর মুখস্থ করে। উনি প্রতিদিন লাঞ্চ করতে এসে খাবার টেবলে ওকে ইন্টারভিউ করেন। সবদিক থেকেই আমরা ওকে তৈরি করে যাচ্ছি। তোমাকে ক্যাসেটটা এনে..."

ওকে থামিয়ে কলাবতী বলল, "আজ থাক, আমার দেরি হয়ে যাবে ফিরতে।"

আবার ফোন বেজে উঠল।

"আহ্, একটু কথা বলতেও দেবে না, আসছি ভাই।"

ছবি চ্যাটার্জি ঘর থেকে বেরোতেই কলাবতী ঝুপুর দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে ভেংচি কাটল।

"তুমি গুপি গায়েন বাঘা বায়েন দেখেছ?"

"হ্যাঁ, টিভিতে।"

"ভূতের রাজা দিল বর, দিল বর।" সুর করে লাইনটা চাপা স্বরে গেয়ে উঠে সে বলল, "কেমন লাগে?"

"খুব ভাল।"

পাশের ঘর থেকে ভেসে এল, "আর বলবেন না মিসেস দাস, কোথা থেকে যে এরা ঝুপুর খবর পেল, একেবারে ফোটোগ্রাফার নিয়ে হাজির হয়েছে...।"

'অরণ্যদেব?"

ঝকমক করে উঠল ঝুপুর চোখ। "সকালে কাগজওলা কাগজ দিলেই আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে টুক করে পড়ে নিই।"

"তারপর কী করো?"

"বাবা সার্ভিস প্র্যাকটিস করায়।"

"কতক্ষণ?"

"পঞ্চাশটা।"

"করতে ভাল লাগে?"

"না।" বলেই মুখটা পাংশু হয়ে গেল ঝুপুর।

"রেলের এক অফিসারের বউ।" ঘরে ঢুকলেন ছবি চ্যাটার্জি। "মেয়ে ক্লাস ফোরে উঠেছে, ফার্স্ট হতে পারেনি তাই দুঃখ করছিল।... দুপুরে খেয়ে বেরিয়েছ, এতক্ষণে খিদে পাওয়ার কথা, একটু কিছু মুখে দাও। কোনও কথা শুনব না।"

কলাবতী "না, না" উপেক্ষা করে তিনি ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকলেন, "বাসন্তী, নিয়ে এসো।"

সেই ফাঁকে কলাবতী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি স্টেফি গ্রাফ হতে চাও?"

"না।"

"কী হতে ইচ্ছে করে?"

"ভূতের রাজা।"

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল এক প্রৌঢ়া। এতরকমের খাবার! কলাবতী আঁতকে উঠে বলল, "করেছেন কী? সব কি আমার জন্য?"

"তা না হলে কার জন্য। আমার শরীর দেখছ তো, খাওয়া কমিয়েও কিছু হচ্ছে না, আর ঝুপুর তো এসব খাওয়ার কথাই নয়।"

কলাবতী লক্ষ করল, ঝুপুর জুলজুল চোখ খাবারের প্লেটগুলো চেটে গেল। তার পলকের জন্য মনে পড়ল কাকাকে। কী খুশিই না হত এই ট্রে-টা যদি সামনে পেত।

"মাংসের শিঙাড়া, চিংড়ির কাটলেট আর পুডিংটা আমার করা। ঝুপুর বাবা কাল নিউ মার্কেট থেকে পেস্ট্রি, আপেল, আঙুর, আর পেস্তার বরফি এনেছে।"

খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে কলাবতীর মনে হল, সে খুবই অন্যায় করবে এগুলো খেয়ে। মেয়েকে নিয়ে একটা লেখা খবরের কাগজে যাতে বেরোয় সেজন্য খাদ্যের আড়ম্বর দিয়ে এটা তাকে খুশি করার চেষ্টা। কিন্তু সে ঠিক করেই ফেলেছে এই দুর্ভাগা মেয়েটি সম্পর্কে একটি লাইনও লিখবে না।

"কিন্তু আমার তো এর সবকটাই খাওয়া বারণ। বড়দি বোধহয় আপনাকে বলতে ভুলে গেছেন, দিন সাতেক হল জন্ডিস থেকে উঠেছি, খাওয়া দাওয়া প্রচণ্ড রেস্ট্রিকটেড। সামান্য বেনিয়ম হলেই আবার শুরু হতে পারে। আমায় মাফ করবেন।" কলাবতী ঝোলা কাঁধে উঠে দাঁড়াল।

"অন্তত একটা কিছু...।" ছবি চ্যাটার্জির কাতর স্বরে হতাশাটা স্পষ্ট।

"না। এবার আমি যাব।" কলাবতীর স্বরে এবং শরীরে কাঠিন্য ফুটে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে সে বারান্দায় এল। মারুতিটা ফটকের সামনে অপেক্ষা করছে। পায়ে পায়ে ঝুপু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

"গাড়ি তোমাকে স্টেশনে দিয়ে আসবে। কিন্তু একটু কিছুও মুখে দেলে না, আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"একটু ভাল হয়ে নিই, তারপর একদিন এসে প্রচুর খেয়ে যাব।" কলাবতী হাসল ঝুপুর দিকে তাকিয়ে। মেয়েটির চোখে আবার ঘুম-জড়ানো শ্রান্তি নেমে এসেছে।

"ওম্মা, দেখেছ! আসল জিনিসটাই দিতে ভুলে গেছি।" ছবি চ্যাটার্জি ঘরের মধ্যে ছুটে গেলেন। তখন কলাবতী ঝুপুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভূতের রাজা দেখতে কেমন জানো?"

"না।"

চোখ-মুখ কুঁচকে সে জিভ বের করে দেখাল। হন্তদন্ত হয়ে ছবি চ্যাটার্জি ফিরে এলেন হাতে একটা খাম নিয়ে। "ছবিগুলোই দিতে ভুলে যাচ্ছিলাম।"

খাম হাতে গাড়িতে ওঠার সময় কলাবতী একবার ফিরে তাকাল। বারান্দায় মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ঝুপু, জিভটা বের করে।

ফেরার সময় তার মনে হয়েছে, যদি না লিখি তা হলে বড়দি কী ভাববেন? ওঁরা বড়দির আত্মীয়। বড়দি নিশ্চয় আশা করবেন, তাঁর আত্মীয়ের মেয়েকে নিয়ে কালু লিখবে। অথচ তার মন একদমই রাজি হচ্ছে না এই লেখাটা লিখতে। একটা বিচিত্র ধরনের সংকট।

বাড়ি ফিরেই সে ফোন করল। তার অসীম সৌভাগ্য, ফোন করার সময় চেম্বারে কাকা ছিল না এবং অপরপ্রান্তে ফোনটা হরিশঙ্কর নয়, ধরল মলয়াই।

"বড়দি আমি খুব মুশকিলে পড়ে গেছি। কী করব সেটা আপনিই বলে দিন।" কলাবতী মরিয়া হয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মলয়ার সাহায্য চাইল।

লিলুয়ায় যা দেখল এবং শুনল তার বিবরণ সংক্ষেপে জানিয়ে সে বলল, "বড়দি, ওঁরা নিজেদের অপূর্ণ মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দশ বছরে একটা মেয়ের শরীর আর মনের ওপর রীতিমতো অত্যাচার চালাচ্ছেন। এভাবে বোকার মতো কখনও খেলোয়াড় তৈরি করা যায় না। খেলাটা আপনা

থেকেই আসে, একে জোর করে চাপিয়ে খেলোয়াড় বানানো যায় না, এটা একটা স্বতস্ফূর্ত ব্যাপার।

"ওঁরা মেয়েটাকে মেরে ফেলছেন, ওর জীবনটাকে নষ্ট করছেন। ট্যালেন্ট আছে কি নেই তা জানি না, তবে এখনই বলে দিতে পারি, ঝুপু কোনওদিনই টেনিস প্লেয়ার হবে না। বাবা-মা ওকে ঘিরে কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখছেন, কী ভয়ংকর স্বার্থপর! আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ঝুপুর জন্য।... বড়দি, আপনার আত্মীয় ওঁরা, আপনিই অনুরোধ করেছেন লেখার জন্য, কিন্তু লিখতে আমার মন চাইছে না। বড়দি, আমি তা হলে কী করব?"

কলাবতী শ্বাস প্রায় না নিয়েই একটানা কথা বলে তার ভেতরের উত্তেজনাকে মুক্তি দিল, কিন্তু ওধার থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না কেন! সে ভাবল, তা হলে বড়দি কি ক্ষুণ্ণ হলেন? হয়তো মামাতো দাদা-বউদিকে কথা দিয়ে ফেলেছেন তাঁর ছাত্রীকে দিয়ে লিখিয়ে কাগজে ছাপিয়ে দেবেন। এখন সেই ছাত্রী লিখতে না চাওয়ায় নিশ্চয় রেগে গেছেন।

"বড়দি? হ্যালো..."

"কালু, একদিন ক্লাসে তোমায় কী বলেছিলাম তা মনে আছে?"

"কী বলেছিলেন?"

"যথার্থ যা দেখবে, শুনবে, বুঝবে, তাই লিখবে। ...কালু তুমি কিন্তু এই লেখাটা লিখবে না।" গম্ভীর থমথমে মলয়ার কণ্ঠস্বর। "মানবিক বোধ নষ্ট কোরো না। কিছু না লিখলেই বোধহয় ঝুপুর উপকার করা হবে। আমি কালই লিলুয়ায় গিয়ে ওঁদের সঙ্গে কথা বলব। আর-একটা কথা... আমি খুব খুশি হয়েছি।"

ফোনটা রেখে কলাবতীর মনে হল, বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল।

দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্রধানমন্ত্রী আসবেন তাই নজরুল ইসলাম সরণিতে, যাকে সবাই ভি আই পি রোড বলে, গাড়ি চলাচল বন্ধ। কারণটা অবশ্যই নিরাপত্তার জন্য। তবে মিনিবাসে বসে থাকা কলাবতীর কাছে এটা নেহাতই বাড়াবাড়ি মনে হল। প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাবে তার জন্য আধঘণ্টা আগে গাড়ি-চলাচল কেন যে বন্ধ করা হবে, তার কোনও ব্যাখ্যা সে খুঁজেপাচ্ছে না।

আসলে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাগুইহাটি স্পোর্টিং মাঠে যাওয়ার জন্য সে সময়ের হিসেব করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা আগমন হলে এয়ারপোর্ট থেকে উল্টোডাঙা আর নজরুল সরণির মোড় পর্যন্ত ট্রাফিক বন্দোবস্তটা যে কেমন হয় সেটা তার জানা ছিল না। কনভয় যখন উলটোডাঙা মোড় থেকে বাঁদিকে বেঁকে ইস্টার্ন বাইপাস ধরল, তখন ছাড়া-পাওয়া গাড়িগুলো প্রতিযোগিতা শুরু করল, কে আগে যাবে। ফলে যানজট।

সুতরাং বাগুইহাটির মোড়ে সে যখন মিনিবাস থেকে নামল, তখন দশটা পঁয়তাল্লিশ। মাঠটা সাইকেল রিকশাওয়ালা চেনে। কলাবতীর আপাদমস্তক দেখে সে ভাড়া হাঁকল, চার টাকা। তাই সই বলে সে রিকশায় উঠে বসল।

দু'ধারে মাটি আর খোয়া, মধ্যে আরও ভাঙা, গর্ত হওয়া পিচ ঢালা পথ। ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়ে, এ-গলি সে-গলি হয়ে মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর কলাবতী দেখল, সাদা ট্রাউজার্স আর শার্ট পরা তিনটি ছেলে হেঁটে আসছে। তাদের হাতে কিটব্যাগ। একজনের হাতে ক্রিকেট ব্যাটও। ওদের দেখে সে আশ্বাস পেল, তা হলে রিকশায় ঠিক জায়গার দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু এই সময় ওদের তো মাঠে থাকার কথা! কলাবতী ধাঁধায় পড়ল।

"আর কতদূর?" একটু উদ্বিগ্ন হয়েই সে জানতে চাইল। তাড়াতাড়ি মাঠে পৌঁছোনোর থেকেও, গর্তভরা রাস্তায় রিকশার সওয়ার হওয়া থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়াটাই এখন তার কাছে কাম্য।

"আপনে এত ব্যস্ত হইতেছেন ক্যান? ঠিক জায়গায়ই লইয়া যামু। যেহানে কিরকেট খেলা হয়, সেই মাঠ ত?"

"হ্যাঁ।"

এক মিনিট পরই রিকশা থেকে কলাবতী একটা মাঠ দেখতে পেল। মাঠের দু'দিক দিয়ে রাস্তা, বাকি দু'দিকে একতলা ছোট ছোট পাকা বাড়ি। মাঠের মাঝখানে আড়াআড়ি পায়ে চলা একটা পথ পিচের ওপর দিয়ে চলে গেছে। তবে পিচের অংশটা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া। ক্রিকেট মরসুমে চলাচলের জন্য ওটাকে ঘুরে যেতে হয়।

কিন্তু পিচ ঘিরে এখন কেন দড়ি? রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে কলাবতী হতভম্ব হয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল। খেলা কোথায়? এটাই তো বাগুইহাটি স্পোর্টিং-এর মাঠ!

মাঠের একদিকে সাত-আটটি ছেলে রবারের বলে ক্রিকেট খেলছে।

তিনটি গোরু ঘাস খেয়ে চলেছে। একটা টালির চালের ঘর মিড অন বা থার্ডম্যান বাউন্ডারির পেছনে। ঘরের দেওয়ালে ছোট হলুদ বোর্ডে লাল অক্ষরে বাগুইহাটি স্পোর্টিং ক্লাব লেখাটা সে দূর থেকে পড়তে পারল। তার নীচে ছোট অক্ষরগুলো আর পড়া গেল না। ওটাই তা হলে ক্লাবঘর।

সন্দেহ নেই ঠিক মাসেই সে এসেছে, কিন্তু খেলা হচ্ছে কই? কলাবতী ঘড়িতে দেখল এগারোটা প্রায় বাজে। ফিল্ডার, ব্যাটসম্যান, আম্পায়ার, সাইটস্ক্রিন, স্কোরার— কোথায় কী! ক্লাবঘরের দরজাটা খোলা। ভেতর থেকে গেঞ্জি আর খেটো ধুতি পরা একটি লোক বেরিয়ে এল। পিচের কাছাকাছি এসে পড়া গোরুগুলোকে ভাগাবার জন্য "হেই, হেই, হেট..." বলে চিৎকার করতেই অবিচলিতভাবে উলটো দিকে ঘুরে ওরা আবার ঘাস খেয়ে যেতে লাগল।

কলাবতী এগিয়ে গেল লোকটির দিকে।

"শুনছেন, শুনছেন।"

ডাক শুনে লোকটি তাকাল।

"আজ এই মাঠে বাগুইহাটির সঙ্গে কদমতলা ফ্রেন্ডসের খেলা ছিল না?"

"ছিল। হয়নি।" সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে লোকটি ক্লাবঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। কলাবতী পিছু নিল।

"হল না কেন?"

"জানি না।"

"দুটো টিম এসেছিল?"

"এসেছিল।"

তারা ক্লাবঘরের দরজায় পৌঁছোল।

"তা হলে খেলা হল না কেন? আম্পায়াররা আসেননি?"

"এসেছিল।" লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকল। কলাবতীও পিছু নিল। "কদমতলার ক্যাপ্টেন বলল খেলব না, আমাদের সেক্রেটারি গুচাবাবুও বলল খেলব না তাই খেলা হল না।"

কলাবতী ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। বেশ লম্বা বড় ঘরটার এককোণে একটা তোলা উনুন, থালা, গ্লাস, হাঁড়ি ইত্যাদি। লোকটি এই ঘরেই থাকে আর রেঁধেবেড়ে খায়। নিশ্চয়ই ক্লাবের মালি। ঘরের মাঝে টেব্‌লটেনিস বোর্ড। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রয়েছে ক্যারম বোর্ড। মেঝেয় বাঁশে জড়িয়ে রাখা

প্র্যাকটিস নেট। গোলাচুনের বালতি, ঝাঁটা, বেঞ্চে রাখা দুটো ক্যানভাসের থলির খোলা মুখ থেকে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা ব্যাট আর কয়েক জোড়া প্যাড। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দশ-বারোটা স্টিলের ফোল্ডিং চেয়ার।

"অনেকদূর থেকে আসছি দাদা, একটু বসব। এক গ্লাস জল খাওয়াবেন?" কলাবতী একটা চেয়ার খুলে নিয়ে বসে পড়ল।

মধ্যবয়সি লোকটি কথাবার্তায় অমায়িক এবং ভালমানুষ। যেভাবে কথা বলল, তাতে মনে হয় একটু লেখাপড়া করেছে। ময়দানে মালি বলতে যা বোঝায় সেইরকম নয়। একটি মেয়ে 'দাদা' বলেছে, জল চেয়েছে, এতে যেন তাকে খুশি মনে হল।

একটা স্টিলের জাগ তুলে নিয়ে লোকটি "একটু বসুন, টিউকল থেকে এনে দিচ্ছি" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেবলটেনিস বোর্ডের ওপর স্কোরবুকটা পড়ে রয়েছে। কৌতূহলবশতই কলাবতী উঠে গিয়ে তার পাতা ওলটাল। একেবারে শেষ দুটো পাতায় আজকের দুটো দলের খেলার স্কোর লেখা! বোঁওও করে কলাবতীর মাথার মধ্যে একটা ভীমরুল ঢুকে পড়ল।

তাজ্জব ব্যাপার! খেলাই হল না অথচ স্কোরবইয়ে ম্যাচের স্কোর আর রেজাল্ট লেখা! কী করে এটা সম্ভব? কলাবতী আরও অবাক হল দু'জন আম্পায়ারেরই সই রয়েছে দেখে। চোখ কচলে নিয়ে সে আবার স্কোর বইয়ের পাতা দুটো দেখল। বাগুইহাটির সাতজন প্রথম ব্যাট করে তুলেছে ১৬৩ রান। জবাবে কদমতলার পাঁচজন আউট হয়ে ১৪৩ রান। ম্যাচ ড্র! দ্রুত সে ঝোলা থেকে খাতা বের করে টুকতে লাগল।

লোকটি জলভরা জাগ নিয়ে ফিরে, একটা প্লাস্টিকের গ্লাসে জল ঢেলে কলাবতীর হাতে দিয়ে বলল, "আপনি কি খেলা দেখতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। আমার দাদা কদমতলা ফ্রেন্ডসে খেলে। তার খেলা দেখব বলে এলাম আর কিনা খেলাই হল না!" কলাবতীর গলায় আশাভঙ্গের বেদনা ফুটে উঠল। "হল না কেন বলুন তো?"

"দুটো টিমই তো খেলতে চাইল না। বলল, এ-ম্যাচে জিতলেও যা, হারলেও তাই। গুচাবাবু আম্পায়ার দু'জনকে বলল, ম্যাচটা না খেললে অনেক টাকা খরচা বাঁচবে। দয়া করে আপনারা ম্যানেজ করে দিন। ছেলেরাও খেলতে চাইছে না। কদমতলার ক্যাপ্টেন বলল, স্কোর আমরা বানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা স্কোরে ড্র দেখিয়ে দিন। এখানে সি এ বি-র কেউ নেই, জানাজানিও হবে না।"

"আম্পায়াররা রাজি হলেন?"

"রাজি তো হচ্ছিল না। তখন এ-পাড়ারই একটা ছেলে মানিক, নামকরা মস্তান, ছুরি বের করে একজন আম্পায়ারকে বলল, আপনার মেয়ে-জামাই বাগুইহাটিতে থাকে না? ব্যস, ওতেই কাজ হয়ে গেল। ভালই করেছে, যা দিনকাল! অন্যজনও বলল, ছুরি মারলে কি সি এ বি রক্ষে করতে আসবে? আপনি সই করে দিন, আমিও করে দিচ্ছি। তখন দু'জনেই সই করে দিল। আপনার দাদা কি আপনাকে বলেনি খেলা হবে না?"

কলাবতী মাথা নাড়ল। একটা দারুণ খবর পেয়ে যাওয়ার উত্তেজনায়, যদিও তার ঝোলায় জলের বোতল রয়েছে, তবুও সে আর-এক গ্লাস জল চাইল। যে-ম্যাচে একটা বলও খেলা হল না সেই ম্যাচের স্কোর আম্পায়াররা সি এ বি-তে দেবে। কালকের কাগজে কাগজে এই খেলার রেজাল্টও বেরোবে! এমন কাণ্ড পৃথিবীর কোথাও ঘটেছে কি? আর একজনও খবরের কাগজের লোক আসেনি। এমন অসাধারণ একটা খবর শুধুমাত্র সে জোগাড় করেছে। একেই বোধহয় 'স্কুপ' বলে। কাল বঙ্গবাণী পড়ে সবার চোখ চড়কগাছ হয়ে যাবে। সি এস জি সি টেন্টে নিশ্চয় বলাবলি হবে, দু'দিন মাঠ করেই একটা মেয়ে কিনা এমন একটা খবর বের করে ফেলল! কলাবতী শিহরিত হল আনন্দে। দু'দিনেই সে সবার নজরে পড়ে যাবে।

লোকটির হাত থেকে যখন সে জলের গ্লাস নিচ্ছে তখনই ব্যস্তভাবে একটি লোক ঘরে ঢুকল। মাঝবয়সি, রোগা, লম্বা, মুখে উদ্বেগ। কলাবতীকে দেখে ভ্রূ-জোড়া কোঁচকাল।

"শ্যামাপদ, স্কোরবইটা দে।"

শ্যামাপদ তটস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি স্কোরবইটা তুলে নিয়ে নবাগতর হাতে দিল। সে স্কোরবইটা খুলে খুব মন দিয়ে উপর-নীচ চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করল, "যা ভেবেছি, যোগে ভুল করেছে। আবার এখন দৌড়োও।" তারপর সে কলাবতীর দিকে প্রায় কটমট করে তাকিয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল, "আপনি কে? এখানে, এখন?"

"আমি বঙ্গবাণীর রিপোর্টার, আমার নাম কলাবতী সিংহ। নতুন, তাই আগে আমায় দেখেননি। আপনি?" শুকনো, কঠিন স্বরে উত্তর দেওয়া লোকটি কেমন যেন মিইয়ে গেল। কলাবতী ইতিমধ্যে বুঝে গেছে জোচ্চুরি যারা করে তারা অমেরুদণ্ডী শ্রেণিতে পড়ে। এদের সঙ্গে ডেঁটে কথা বলতে হয়।

"আমি ক্লাবের সেক্রেটারি শ্রীশ মিত্তির।"

"ইনিই গুচাবাবু।" শ্যামাপদ যোগ করল।

"আপনি এখানে এসেচেন কেন?" গুচাবাবু ঈষৎ অবাক হয়ে প্রশ্নটা করল।

"কেন আবার, ম্যাচটা রিপোর্ট করব বলে।"

"কিন্তু খেলা তো হয়নি।" বিনীতকণ্ঠে সেক্রেটারি জানালেন।

"হয়নি বুঝি? তা হলে সেটাই রিপোর্টে লিখব। কিন্তু কেন হয়নি?"

"কদমতলার প্রেসিডেন্ট আজ সকালে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন, তাই ওরা খেলবে না বলল। শোক আর সম্মান জানাতে আমরাও এক মিনিট নীরবতা পালন করে খেলা বাতিল করতে রাজি হয়ে গেলাম, এই আর কী!"

"তা হলে এটাই লিখব, বাগুইহাটির সেক্রেটারি শ্রীশ মিত্র জানালেন, কদমতলার প্রেসিডেন্ট হঠাৎ হার্ট...।"

"না, না, না, আমি ঠিক নিশ্চিত নই এ-ব্যাপারে। এসব আপনি লিখতে যাবেন না।" গুচাবাবু আঁতকে উঠল।

"নিশ্চিত না হয়েই আপনারা এক মিনিট নীরবতা পালন করে ফেললেন?" বয়স্ক একটা লোকের মিথ্যা কথা বলা দেখে কলাবতীর যেমন মজা লাগছে তেমনই দুঃখও হল। নিজেদের এরা কত নীচে নামাতে পারে, বয়সকেও মর্যাদা দেয় না।

"দেখুন, ব্যাপারটা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। আপনার বয়স কম, মাঠের হালচাল সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ। এসব একটু-আধটু হয়েই থাকে। না হলে ক্লাব চালানো যায় না।" গুচাবাবুর কথায় ও ভাবভঙ্গিতে আত্মসমর্পণের মতো দীনতা ফুটে উঠল।

"একটু-আধটু কী হয়ে থাকে?" কলাবতী নাছোড়বান্দার মতো কোণঠাসা করতে চাইল গুচাবাবুকে।

"একটু-আধটু ম্যানিপুলেট, একটু-আধটু ম্যানেজ না করলে আমাদের মতো গরিব ক্লাবের টিকে থাকা যায় না। আজকের ম্যাচটা যে খেলা হল না, এতে কারুর কোনও ক্ষতি হয়নি। না বেঙ্গল ক্রিকেটের, না ক্রিকেটারদের, না সি এ বি লিগের, না এই দুটো ক্লাবের। কারুরই পাকা ধানে মই পড়ল না। বাগুইহাটি-কদমতলা অলরেডি নক আউটে উঠে গেছে, এটা ছিল গ্রুপের শেষ লিগ ম্যাচ। পয়েন্ট ভাগাভাগিতে কারুরই কোনও বাড়তি সুবিধে হল

না, তা হলে অন্যায়টা কোথায়? বরং একটা ম্যাচ খেলানোর খরচা থেকে, অযথা রোদ্দুরে ছুটোছুটি করার থেকে বাড়িতে গিয়ে ঘুমোনো কি সিনেমা দেখা অনেক কাজের!" বলতে বলতে শ্রীশ মিত্তিরের গলা অন্তরঙ্গ হয়ে এল। একটা বাচ্চা অবুঝ মেয়েকে সে যেন বোঝাবার চেষ্টা করল কেন এই নোংরামিতে তারা নামে।

কলাবতী চেয়ার থেকে উঠে পড়ল গম্ভীর মুখে। গুচাবাবুকে যেন বিপন্ন বিপন্ন মনে হল। মুখে অনিশ্চিত ভয়।

"আপনি কি লিখবেন নাকি? প্লিজ লিখবেন না, জানাজানি হলে দুটো ক্লাবই বিপদে পড়ে যাবে, সাসপেন্ড হবে। প্লেয়াররা, আম্পায়াররা শাস্তি পাবে।" গুচাবাবু হাতজোড় করে ফেলল।

"মাফ করবেন। আমার কাজ আমাকে করতেই হবে।" ঘর থেকে বেরোবার জন্য সে পা বাড়াল।

"তা হলে কিন্তু আমরাও ভাবব কী করা যায়।" গুচাবাবু খোলাখুলিই জানিয়ে দিল পেছন থেকে।

"ভাবুন।" কলাবতী হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

রাস্তায় আসামাত্রই সে খালি একটা রিকশা পেয়ে গেল। বাগুইহাটি মোড়ে যাওয়ার জন্য তিন টাকা চাইল রিকশাওয়ালা। একটাকা ভাড়া কমে যাওয়াকে সে ভাল লক্ষণ বলে ধরে নিল। কলাবতী রিকশায় উঠে বসল। আসার সময় ভাঙাচোরা গর্ত ভরা রাস্তা তাকে যে কষ্ট দিয়েছিল, ফেরার সময় সে কিছুই অনুভব করল না। একটা নতুন আনন্দে সে মশগুল। সাংবাদিকরা যে সাফল্য চায় সেটা যে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে, এটা ভাবতেই মাথার মধ্যে ঢুকে যাওয়া ভীমরুলটা আবার উড়তে লাগল। সে ঠিক করল এখনই বঙ্গবাণীতে গিয়ে লেখাটা লিখতে বসবে। ভেবেচিন্তে দারুণভাবে এটা তাকে লিখতে হবে।

বঙ্গবাণীর খেলার টেব্‌লে তখন বলদেব। পাঁচজনের মধ্যে ওরই বয়স কম। খেলার বই, ম্যাগাজিন পড়ে। কিঞ্চিৎ বিলাসী এবং কাজে ফাঁকি দেওয়ার কোনও সুযোগই নষ্ট করে না। বলদেবের সামনে খোলা রয়েছে একটা সিনেমার ইংরেজি পত্রিকা এবং পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা একটি লোক।

লোকটি খুবই রুগ্‌ণ, জিরজিরেই বলা যায়। গাল বসে যাওয়া লম্বাটে মুখে কপালটা ছোট, ভ্রূ দুটি ঘন এবং চোখজোড়া কোটরে ঢোকা। মাথায় প্রচুর

চুল, যা অযত্নে সত্যিই পাখির বাসার মতো, দাড়ি কয়েকদিন কামানো হয়নি। লোকটির দাড়ি এবং চুল কাঁচাপাকা, তবে সাদার ভাবটাই বেশি। ওর পরনে ফিকে খয়েরি রঙের খদ্দরের ঢিলেহাতা পাঞ্জাবিটা চওড়া কাঁধে যেন হ্যাঙারে ঝোলানো মনে হয়। সেটা পরিষ্কার না ময়লা বোঝা শক্ত, তবে ইস্ত্রি করা নয়। ধুতিটা আধময়লা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। গোড়ালির চামড়া ফাটা এবং তার মধ্যে ময়লা জমে আছে। বয়স মনে হয় সত্তরের কাছাচাছি।

লোকটি ঝুঁকে বলদেবকে কিছু একটা বলছে তখন কলাবতী টেব্‌লে ওদের উলটোদিকে বসল। তাকে দেখে বলদেব একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি এখন?"

"খেলা হয়নি তাই চলে এলাম।"

"কেন, পিচ খুঁড়ে রেখেছে?" তারপর বলল, "কাদের খেলা ছিল?"

"বাগুইহাটি-কদমতলা।" কলাবতী এইটুকু বলেই ঝোলার মধ্য থেকে স্যান্ডুইচ বের করায় মন দিল।

"হ্যাঁ, কী বলছিলেন যেন?" বলদেব পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বলল।

"গত বুধবার আপনাদের কাগজে একটা লেখা বেরিয়েছে, বরুণ বসুরায়ের সঙ্গে ইন্টারভিউ।"

কলাবতী চোখ তুলে লোকটির দিকে তাকাল। শঙ্কর দত্ত নামে বাইরের একজন, যে বলদেবেরই বন্ধুর ভাই, ইন্টারভিউ নিয়েছে। অনেকদিন আগের লেখা, কম্পোজ হয়ে পড়ে ছিল। দুটো স্যান্ডুইচের একটা বলদেবের দিকে বাড়িয়ে কলাবতী বলল, "বলদেবদা খাবেন?"

"নাহ্, ভাত খেয়ে আর এখন পাঁউরুটি চিবোতে পারব না। মিষ্টিফিষ্টি থাকে তো দাও।"

"নেই। কলা দিতে পারি।"

"দাও।"

কলাটা হাতে নিয়ে সন্তর্পণে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলদেব বলল, "হ্যাঁ ইন্টারভিউ, তা কী হয়েছে?"

"উনি বলেছেন ফর্টিএইট ওলিম্পিকের জন্য লখনউয়ে যে সিলেকশন ট্রায়াল হয়, তাতে হপস্টেপ অ্যান্ড জাম্পে সাড়ে আটচল্লিশ ফুট নাকি লাফিয়েছিলেন। এটা ভুল কথা।" বিনীত, মৃদু গলায় লোকটি এমনভাবে বলল যে, বলদেব কলায় কামড় দিতে গিয়ে থেমে গেল।

"আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।" কলাবতী বলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বসুন।" বলদেব কথাটা বলে কলার আধখানা মুখে পুরল। "ভুল কথা কেন?"

লোকটি চেয়ারে বসল। একটু কুণ্ঠিতভাবেই, ইতস্তত করে বলল, "বরুণ অতটা লাফায়নি।"

"সেটা আপনি জানলেন কী করে? আটচল্লিশ সালে আপনি কি তখন লখনউয়ে ছিলেন?" বলদেব ঝাঁঝালো গলায় বলল।

"ছিলুম।"

শান্ত, নিচু গলায় লোকটি বলল। কলাবতী ও বলদেবের দৃষ্টি একই সঙ্গে প্রখর হয়ে উঠল।

"কী জন্য ছিলেন?" বলদেব প্রশ্ন করে নড়েচড়ে বসল।

"কম্পিটিটার ছিলুম। আমি, বরুণ আর বোম্বাইয়ের হেনরি রেবেলো হপস্টেপের ট্রায়ালে ছিলুম।"

"আপনার নাম?" কলাবতী জিজ্ঞেস করল।

"পরিমল বেরা।... সাড়ে আটচল্লিশ ফুট লাফিয়েছিল রেবেলো। তখন ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ছিল জাপানের তাজিমার, সাড়ে বাহান্ন ফুট, বার্লিন ওলিম্পিকে করা।"

"আপনি বলতে চান বরুণ বসুরায় সাড়ে আটচল্লিশ ফুট লাফাননি? মিথ্যে কথা বলেছেন?" বলদেব সতর্কভাবে ধীরে ধীরে কথাটা বলল উকিলের জেরা করার ভঙ্গিতে।

"না, লাফায়নি। আমি আর বরুণ দু'জনেই সাড়ে চুয়াল্লিশ করেছিলুম। তাই দূরত্বটা আমার ভালই মনে আছে। রেবেলোর ধারেকাছে আমরা তিনটে জাম্প করেও যেতে পারিনি।" অত্যন্ত দৃঢ় এবং তৃপ্তস্বরে পরিমল কথাগুলো বলল। "অসাধারণ পারফরমান্স!"

"বরুণ বসুরায় একটা অডিট ফার্মের মালিক, মানী লোক। তাঁকে মিথ্যেবাদী বলতে হলে প্রমাণ দাখিল করতে হবে।... আপনি কী করেন?" বলদেব তাচ্ছিল্যভরে কথা বলে লোকটির আপাদমস্তক চোখ বোলাল।

পরিমল এই প্রথম যেন কুঁকড়ে গেল। একটু দ্বিধাভরে বলল, "আমি বিশেষ কিছু করি না, সামান্য একটা ব্যাবসা।"

"কীসের ব্যাবসা?"

"ছবির ফ্রেমের ব্যাবসা।"

"তার মানে ছবি-বাঁধাইয়ের?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ব্যাবসাটা?"

"আমি যেখানে থাকি, তার কাছেই।"

"কোথায় থাকেন?"

"চুয়াল্লিশের এফ অবিনাশ কবিরাজ লেন, বাগমারিতে।"

কলাবতীদের বাড়ি থেকে বাগমারি বেশি দূরে নয়, বড়দিদের বাড়ি তো ওখানেই, আর অবিনাশ কবিরাজ লেনে থাকে তাদের ক্লাসেরই সুচরিতা। এই বৃদ্ধ তার এলাকারই লোক, কলাবতী ব্যাপারটায় তাই কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"লাফিয়েছিলেন সাড়ে চুয়াল্লিশ আর থাকেন চুয়াল্লিশ নম্বরে, অদ্ভুত যোগাযোগ তো!" কলাবতী হালকা স্বরে বলল। পরিমল হাসল। নীচের পাটির সামনের দুটো দাঁত নেই।

"তা এখন কী করতে হবে?" বলদেব ভ্রূ তুলে জানতে চাইল, "প্রতিবাদ ছাপাতে হবে?"

"না, না, না, এমন কিছু বিরাট ব্যাপার এটা নয় যে, চিঠি ছাপতে হবে। আমি কতটা লাফিয়েছিলুম তা জেনে এখন কার কী লাভ! আর জানলেও তাতে আমার এক ছটাকও সম্মান বাড়বে না।"

"কেন, ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনি তারা তো গর্ববোধ করতে পারবে এই বলে যে..." কলাবতী থেমে গেল পরিমলের মুখের ছড়ানো হাসিটা দেখে।

"আমি বিয়েথা করিনি, সংসারেও কেউ নেই।"

"অ, সম্মানটম্মানের দরকার নেই, ভাল কথা। তা হলে কী চান?"

"রেবেলোর সম্মান।"

"কী বললেন!" বলদেব সিধে হয়ে বসল। এতক্ষণ তার যে গড়িমসি ভাবটা ছিল সেটা পরিমলের দুটি শব্দেই খসে পড়ল।

"আসল সাড়ে আটচল্লিশ যে লাফিয়েছিল, তাকে তার প্রাপ্য সম্মানটা দেওয়া হোক, এটাই চাই।"

"বলছেন কী আপনি? চল্লিশ বছরেরও আগে কে একজন একটা লাফ মেরেছিল... বেশ ভাল কথা, সাড়ে আটচল্লিশের কোনও প্রমাণ আছে কি?"

"বরুণ বসুরায়ও কি প্রমাণ দিয়েছে?"

বলদেব মনে মনে যে বিব্রত হচ্ছে কলাবতী ওর মুখ দেখেই সেটা বুঝে গেল।

"যে লিখেছে সে প্রমাণ দেখেই লিখেছে। বরুণ বসুরায় তাকে পেপার কাটিং দেখিয়েছেন।"

"কোন কাগজের কাটিং?" পরিমল বেরা অবাক হয়ে জানতে চাইল। "আমার কাছেও কাটিং আছে। ট্রায়ালের পরের দিন লখনৌ হেরাল্ড-এ আমাদের লাফের ডিসট্যান্স দিয়ে রেজাল্ট বেরিয়েছিল। আমি কেটে রেখেছি।"

"আপনার কাছে কাটিং আছে?" বলদেব নিশ্চিত হওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলল।

"আমি এনে দেখাতে পারি।" পরিমল জোর দিয়ে বলল।

"বেশ, দেখাবেন এনে।" কথাটা বলে বলদেব সিনেমা ম্যাগাজিনটায় ঝুঁকে পড়ল।

পরিমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে "আচ্ছা আসি, নমস্কার" বলে চলে যাচ্ছে, তখন কলাবতী পেছন থেকে তাকে ডাকল।

"পরিমলবাবু, শুনুন।"

পরিমল বেরা ঘুরে দাঁড়াল এবং এগিয়ে এল।

"ধরা গেল রেবেলো সাড়ে আটচল্লিশ ফুটই লাফিয়েছিল, কিন্তু সেটা না বললে এত বছর পর কী এসে যায়? আপনারই বা এই নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন? ওটা তো আর ওয়ার্ল্ড রেকর্ড নয়!" কলাবতী শান্তভাবেই খোঁজ করতে চাইল পরিমলের 'দুশ্চিন্তা'র।

"কিন্তু তখনকার ওয়ার্ল্ড ক্লাস জাম্প ওটা। রেবেলো ওলিম্পিক ফাইনালে উঠেছিল, গোল্ডও পেতে পারত।" পরিমলের গলায় উচ্ছ্বাস আর তারিফ এসে গেল।

বলদেব ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে বলল, "ওলিম্পিকের কথা হচ্ছে না। প্রশ্নটা হল, আপনার কী এমন মাথাব্যথা হল যে, রেবেলোর হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন?"

"করব না?" পরিমলের কোটরে-ঢোকা চোখজোড়া হঠাৎই দপ করে জ্বলে উঠল। গলায় ফুটে উঠল ব্যগ্রতা। "একজনের কৃতিত্ব অন্য লোক নিয়ে নেবে! কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একজন অ্যাথলিট জীবন শুরু করে। দিনের পর দিন ঘাম ঝরিয়ে, সাধ-আহ্লাদ বর্জন করে, ডিসিপ্লিনড থেকে সে একটু একটু

করে এগোয়। তার এগোনো মানে দেশেরও এগোনো। এজন্য তো তাকে মর্যাদা, শ্রদ্ধা দেওয়া উচিত। চুরি করে একজন সেটা নিয়ে নেবে আর তাতে আপনারা সাহায্য করবেন?" পরিমলের এই প্রথম গলার স্বর উঠল, তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। চেয়ারের পিঠ ধরে থাকা মুঠি জোড়ার শিরা ফুলে উঠেছে।

সে আবার বলল, "রেবেলো আপনাদের কাগজ পড়বে না, নিশ্চয় বাংলা জানে না। এখন সে কোথায় আছে তাও আমি জানি না। কিন্তু আমি তো আছি, আমি তো জানি। এক অ্যাথলিটের মর্যাদা অন্য অ্যাথলিট রক্ষা করবে, এটাই তো কর্তব্য।"

বলদেব চোখ নামিয়ে নিল। মৃদুস্বরে বলল, "কাল-পরশুই তা হলে স্পোর্টস এডিটরের কাছে নিয়ে আসুন আপনার কাটিংটা। সত্যি হলে ভুলটা নিশ্চয় সংশোধন করা হবে।"

"হ্যাঁ, এনে দেখাব, নমস্কার।"

পরিমল চলে যাওয়ার পর কলাবতী বলল, "অদ্ভুত লোক, না?"

"মাথায় ছিট আছে।"

"থাকতে পারে, তবে ছিটেল লোকেরাই কিন্তু আমাদের নাড়া দেয়। একজন অ্যাথলিটের মর্যাদা অন্যজন রক্ষা করবে, এমন কথা জীবনে কখনও শুনিনি, আপনি শুনেছেন?"

বলদেব কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। "দেখি কী কাটিং আনে।"

অত জোর দিয়ে বলল যখন, নিশ্চয় আনবে।" কলাবতী প্যাডের কাগজে হাত মুছে, বোতল থেকে জল খেল। দেওয়াল-ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে, খাতাটা খুলে প্যাডটা টেনে নিল।

এখন সে বাগুইহাটি-কদমতলা ম্যাচটা সম্পর্কে লিখবে। শ্যামাপদ আর গুচাবাবুর সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো মনে করার জন্য সে কয়েক মিনিট মাথা নামিয়ে চোখ বন্ধ করল। মাথার মধ্যে একটা টেপ রেকর্ডারের চলা যেন শুরু হল। দু'জনের প্রতিটি কথা সে শুনতে পাচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মাঠটাকে। গোরু চরছে, দড়ি দিয়ে ঘেরা পিচ, একধারে রবারের বলে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে, মাঠের পাশের বাড়িগুলো, দু'ধারের রাস্তা, কিন্তু দু'জন আম্পায়ার আর সাদা ট্রাউজার্স ও শার্টপরা তেরোটা মানুষকে সে খুঁজে পাচ্ছে না।

কলাবতী ঠিক করল, এইখান থেকেই সে লেখাটা শুরু করবে।

তিন পাতা লিখে ফেলে প্যাডের নতুন পাতার ওপরের কোণে চার সংখ্যা সবে লিখেছে, তখন সম্পাদকের বেয়ারা এসে কলাবতীকে বলল, "আপনাকে ডাকছেন।"

কলাবতী প্রায় চমকে উঠল। "কে ডাকছেন!"

"এডিটর।"

বেয়ারা চলে গেল। বলদেব বার্তা বিভাগে গিয়ে গল্প জুড়েছে। কলাবতী তার লেখা তিনটি পাতা ঝোলার মধ্যে ভরে, ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে, সম্পাদকের ঘরে এল দুরুদুরু বক্ষে।

মধ্যিখানে সিঁথি-কাটা চুলে সদানন্দ দু'হাতের তেলো আলতো করে বুলোচ্ছিলেন। চশমাটা টেব্‌লে। সেটা তুলে চোখে দিয়ে একগাল হেসে বললেন, "বোসো বোসো। তারপর কাজকম্ম কেমন চলছে? ভাল লাগছে? ভব বলছিল, তুমি তো বাংলা ভালই লেখো, পরিশ্রমও করতে পারো। এরকমই তো চাই। না ঘুরলে, না খাটলে শুধু টেলিফোন করে করে খবর জোগাড় করলে জার্নালিস্ট হওয়া যায় না। ঘোরো, হাঁটো... বসে থেকো না, ঘুরে ঘুরে খবর খুঁজে বেড়াও। আজকে কি বেরিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। বাগুইহাটি গেছলুম।" সদানন্দর কথা তাকে উৎসাহিত করেছে। সে উত্তেজিত স্বরে দ্রুত বলে গেল। "জানেন, কী দারুণ একটা খবর আজ পেলুম! ম্যাচ খেলাই হয়নি, অথচ খেলা হয়েছে বলে স্কোরবইয়ে ভুয়ো রান, উইকেট, টোটাল, এমনকী ম্যাচটা ড্র বলে লেখাও হয়ে গেল আর তাতে দু'জন আম্পায়ার সইও করে দিয়েছেন। ভাবতে পারেন, এটা লিগের খেলা! খেলার মাঠে এর চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু কি হতে পারে? আর কোনও কাগজের লোক ভাগ্যিস যায়নি। আমি একাই খবরটা পেয়ে গেছি।"

কলাবতী জ্বলজ্বল চোখে সম্পাদকের দিকে তাকাল। টানা কথাগুলো বলে সে হাঁফিয়ে পড়েছে। সে আশা করছে সম্পাদকও ওইভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে রিভলভিং চেয়ারটাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানো বন্ধ করে খাড়া হয়ে বসবেন। কিন্তু সদানন্দ ঘোষ তা করলেন না।

"এটা তো একটা দুর্নীতির ব্যাপার।" সদানন্দ অনুত্তেজিত গলায় বললেন।

"নিশ্চয়। জালিয়াতি, চিটিং।" কলাবতী আরও উত্তেজিত।

"সিরিয়াস, খুবই সিরিয়াস অভিযোগ তুমি করতে যাচ্ছ দুটো ক্লাব আর আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে। কীভাবে তা হলে লিখবে?"

"এই দেখুন না, লেখাটা প্রায় হয়েই গেছে।" কলাবতী ব্যস্ত হয়ে ঝুলি থেকে তিনটি পাতা বের করে এগিয়ে দিল।

তিন পাতা লেখা পড়ার পর ঈষৎ চিন্তিত মুখে সদানন্দ বললেন, "তুমি যা-যা লিখেছ, কোর্টে যদি ওরা যায় তা হলে প্রমাণ দাখিল করতে পারবে?"

"নিশ্চয়। স্কোরশিটটাই প্রমাণ। তা ছাড়া শ্যামাপদ, শ্রীশ দু'জন আম্পায়ার—।"

সদানন্দর মাথা নাড়া দেখে কলাবতী থেমে গেল। "ওরা নিজেদের বাঁচাবার জন্য বলবে কোনও স্কোরশিটই তৈরি হয়নি, সেরকম কিছু সি এ বি-তে জমাও পড়েনি। সুতরাং বঙ্গবাণী মিথ্যে কথা লিখেছে। এরপর ওরা ক্ষতিপূরণ চেয়ে মানহানির মামলা করবে।"

"তা কী করে হয়! আমি নিজের চোখে স্কোরবুকে যা দেখলুম সেটা ভুল?"

"হ্যাঁ, ভুল। এইমাত্র বাগুইহাটির প্রেসিডেন্ট, আমারই সম্পর্কিত ভাগনে টেলিফোনে পুরো ব্যাপারটাই জানিয়ে বলল, স্কোরবই থেকে দুটো পাতা ওরা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে আর আম্পায়াররা সি এ বি-কে রিপোর্ট করেছে, রাত্রে কারা পিচ খুঁড়ে দেওয়ায় ম্যাচটা খেলানো যায়নি। সুতরাং ভুয়ো স্কোরশিট বানানো হয়েছে বলে যদি কালকের বঙ্গবাণীতে খবর বেরোয় তা হলে আপনারা বিপদে পড়ে যাবেন।" সদানন্দর মুখে বিষণ্ণ একটা হাসি, চোখেও দুঃখের ছায়া। তিনি বিশ্বাস করেন কলাবতী যা দেখেছে এবং লিখেছে তার শতকরা একশো ভাগই সত্যি। কিন্তু তিনি নিরুপায়। নাতনির বয়সি মেয়েটির মনের অবস্থাটা তিনি বুঝতে পারছেন। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে, টগবগিয়ে একটা কিছু করে দেখাবার ইচ্ছেটা যে কীভাবে মিইয়ে আসে, সেটা এখন তিনি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন।

বিধ্বস্ত কলাবতী মাথা নামিয়ে বসে রয়েছে। সে বুঝে গেছে তার লেখাটা আর ছাপা হবে না। একটা ফাঁপানো বেলুন ছাড়া তার বুকের মধ্যে আর কিছু যেন এখন নেই। মাথা নাড়ল সে। সাংবাদিক হওয়ার শখ ঘুচে গেছে। আজই শেষ। খেলার মাঠ বড় নোংরা লাগছে তার, দমবন্ধ হয়ে আসছে।

"তুমি বরং ডেস্কে বসেই কাজ করো।"

কলাবতী চেয়ার থেকে উঠে অস্ফুটে বলল, "দেখি।"

পায়ে পায়ে সম্পাদকের ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল। পরেশ এসে গেছে। কলাবতীকে দেখেই একগাল হেসে বলল, "মাঠ থেকে ফিরলে?"

"হ্যাঁ। বাগুইহাটি-কদমতলা ম্যাচ ছিল।"

"রেজাল্ট কী?"

"ড্র।"

পরেশ ছোট্ট একটা পেয়ারা বাড়িয়ে ধরল। "নাও, আমার গাছের। তোমার জন্যই এনেছি।"

পেয়ারাটা হাতে নিয়ে তার চোখে প্রায় জল এসে গেল। সামান্য ফল কিন্তু অসামান্য আন্তরিকতা। এটাই সে এখন চাইছে।

"স্কুল খুলে যাচ্ছে পরেশদা। এখন আর রোজ আসতে পারব না।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সবার আগে লেখাপড়া।"

কলাবতী বাড়ি ফিরল একটু দেরি করে। ইচ্ছে করেই বঙ্গবাণী অফিস থেকে সে বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে এসেছে অস্থির মনকে শান্ত করার জন্য। হাঁটতে হাঁটতে একটা ব্যাপার সে ঠিক করে ফেলেছে, মাঠের লোকেদের কাছে হেরে যাওয়া মানেই পৃথিবীর লয় নয়। সে মোটেই দুঃখে ভেঙে পড়বে না। জীবনে যা আসবে সেটা হাসিমুখে সহজভাবে নেবে।

যখন সে ফটক ছাড়িয়ে বাড়িতে ঢুকল, তখন তার মনে কোনও খেদ, কোনও বিদ্বেষ বা কষ্ট আর নেই। দাদু আর কাকাকে সে জানিয়ে দিল, খেলার রিপোর্টার হওয়ার ইচ্ছেটা আপাতত সে মুলতুবি রাখছে। বুদ্ধিটা আর-একটু পরিপক্ক না হলে মাঠের লোকেদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না।

"তবে আজ একটা অদ্ভুত লোককে দেখলুম, যে নিজে এককালে ট্রিপল জাম্পার ছিল।"

"আগে যাকে বলা হত হপ স্টেপ অ্যান্ড জাম্প?" এই বলে সত্যশেখর জানিয়ে দিলেন অ্যাথলেটিক্সের খবরটবর তিনি রাখেন।

"হ্যাঁ, আগে তাই বলা হত। এই লোকটির নাম পরিমল বেরা।"

"পরিমল বেরা?" রাজশেখর ঔৎসুক্য দেখালেন। "ভাল অ্যাথলিট ছিল। আমাদের বরুণের সঙ্গে ওর খুব কম্পিটিশন হত।"

"আমাদের বরুণ মানে!" কলাবতী অবাক হয়ে গেল। "বরুণ বসুরায়?"

"হ্যাঁ রে, গোবিমাসিমার দেওর বরু! আমার থেকে বয়সে কিছু ছোট। খুব চালিয়াতি কথাবার্তা বলত। আমাকে বলেছিল লন্ডন ওলিম্পিকে যাওয়ার জন্য সিলেক্ট হয়েছিল, কিন্তু গোড়ালিতে চোট লাগে ফাইনাল জাম্পটা দেওয়ার সময়, তাই ও নিজেই নাম উইথড্র করে নিয়ে ওলিম্পিকে যায়নি।"

"উইথড্র না কচু। ট্রায়ালেই কোয়ালিফাই করতে পারেনি। লখনউয়ে

সেই ট্রায়ালে পরিমল বেরাও নেমেছিল। বরুণ বসুরায়ের একটা ইন্টারভিউ কিছুদিন আগে বঙ্গবাণীতে বেরিয়েছে। তাতে বলেছে, সাড়ে আটচল্লিশ ফুট নাকি ট্রায়ালে লাফিয়েছিল। পরিমল বেরা আজ বঙ্গবাণীতে এসে বলল, ওটা হেনরি রেবেলো লাফিয়েছিল। তখনকার ওয়ার্ল্ড ক্লাস জাম্প। সে আর বরুণ লাফিয়েছিল রেবেলোর থেকে চার ফুট কম, সাড়ে চুয়াল্লিশ। তখনকার পেপার কাটিং ওর কাছে আছে, এনে দেখাবে।"

"বরুণের স্বভাবটা দেখছি বুড়ো বয়সেও পালটায়নি। ভাবল এত বছর পর কে আর ধরতে পারবে, তাই গুলটা মেরে দিল।" রাজশেখর মিটমিট করে হাসলেন।

সত্যশেখর বললেন, "এর একটা প্রতিবাদ ছাপিয়ে দিক পরিমল বেরা।"

"বললেই কি বঙ্গবাণী ছাপাবে?" কলাবতী প্রায় বলদেবের ভঙ্গি নকল করল। "প্রমাণ চাই না?"

"কারেক্ট। সতু যে ব্যারিস্টারি করে কীভাবে, বুঝতে পারি না। প্রমাণ ছাড়া কোনও প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়?" রাজশেখরকে খুবই ক্ষুব্ধ দেখাল।

মাথাটা চুলকে আড়চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে সত্যশেখর বললেন, "বরুণ বসুরায়ও কি প্রমাণ দেখিয়ে দাবি করেছে সাড়ে আটচল্লিশ লাফিয়েছিল?"

"নিশ্চয় প্রমাণ দিয়েছে। আচ্ছা, আমি এখনই ওকে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।" রাজশেখর মার্চ করার ভঙ্গিতে ফোনের কাছে গেলেন। তিন মিনিট খোঁজাখুঁজি করে ডাইরেক্টরি থেকে নম্বরটা বের করে ডায়াল করলেন।

অতঃপর রাজশেখরের তরফে সংলাপটা এইরকম হল:

"হ্যালো, এটা কি বরুণ বসুরায় মশাইয়ের বাড়ি?... হ্যাঁ ওকেই চাইছি... আরে বরু, কী সব আজেবাজে কথা ইন্টারভিউয়ে বলেছিস? আমি রাজুদা কথা বলছি... দুম করে বলে দিলি লখনউয়ে সাড়ে আটচল্লিশ ফুট ট্রায়ালে লাফিয়েছিস... গোবিমাসি বাতের কথা বলেছিলেন, আমি তো কোবরেজ দেখাতে বলেছি, দেখিয়েছেন কি?... কী বলছিস? সাড়ে আটচল্লিশই। তা হলে পরিমল বেরা যে বলছে ও আর তুই দু'জনেই সাড়ে চুয়াল্লিশ... হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর কাছে তখনকার পেপার কাটিং আছে। বঙ্গবাণীতে গিয়ে দেখিয়ে এসেছে... ট্রায়ালে নয়? কী বললি, প্র্যাকটিসে সাড়ে আটচল্লিশ করেছিস? সেটা তা হলে বলিসনি কেন? বুঝতে না পেরে ভুল করে লিখে দিয়েছে বললেই হল? ...পরিমল ধরাধরি করে লখনউ ট্রায়ালে গেছল, ওর ট্রেন ভাড়া কি ওর রানিং শু-টা তোরই দেওয়া, এসব কথা এখন অবান্তর। শাক

দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না রে, গন্ধ বেরোবেই। রেবেলোর ডিসট্যান্সকে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়াটা খুবই অন্যায়। না না বরু, এই বয়সে এটা ভাল কাজ করিসনি। তুই নিজের ভুল স্বীকার করে কাগজে একটা চিঠি দে। ...কেউ প্রতিবাদ করলে তবেই দিবি? আচ্ছা, তাই দিস। আর শোন, গোবিমাসিকে কোবরেজ দেখাতে বলবি। রাখছি তা হলে।"

ফোন রেখে একগাল হেসে রাজশেখর বললেন, "আমার গুলটা কেমন হল কালু। যেই বলেছি, পরিমল বঙ্গবাণীতে গিয়ে কাটিং দেখিয়ে এসেছে, অমনই বাছাধন স্বীকার করল ট্রায়ালে করিনি, প্র্যাকটিসে করেছি। ব্যাপারটা কী জানিস কালু, আমি তো সত্তর পেরিয়ে গেছি, এখন কোনও বুড়োকে জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলতে দেখলে লজ্জা করে। আর লজ্জা করেছে বলেই আমার কর্তব্য বরুকে দিয়ে এটা শুধরে নেওয়ানো।"

"দাদু এই 'কর্তব্য' শব্দটা আজ দ্বিতীয়বার শুনলুম, প্রথমবার শুনেছি পরিমল বেরার মুখ থেকে। হেনরি রেবেলোকে খাটো করে বরুণ বসুরায় ওর কৃতিত্বটাকে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়াতেই ওর মনে হয়েছে রেবেলোকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হল না। কী বলল জানো দাদু? এক অ্যাথলিটের মর্যাদা অন্য অ্যাথলিট রক্ষা করবে, এটাই তো কর্তব্য। ভাবতে পারো!"

রাজশেখর কিছুক্ষণ কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন, ভাবতে পারেন না।

"হ্যালো, স্পোর্টস? বলদেবদা আছেন? আমি কলাবতী বলছি।"

"কে, কলাবতী নাকি? আমি ভবদা।"

"ওহ্‌হ ভবদা, কেমন আছেন? একটা ব্যাপারে বলদেবদাকে ফোন করছি, উনি আছেন?"

"এখনও ফেরেনি মাঠ থেকে। তা তুমি আর আসছ না কেন? ভালই তো কাজ করছিলে, বাংলাটাও অনেক ইমপ্রুভ করেছিলে। রোজ না পারো মাঝে মাঝে তো আসতে পারো, ফিচার টিচারও তো লিখতে পারো। তা বলদেবকে কীজন্য দরকার?"

"দরকারটা খুবই সামান্য। পরিমল বেরা নামে কোনও লোক পেপার কাটিং নিয়ে দেখাতে এসেছিল কিনা সেটাই জানতে চাইছিলুম।"

"আরে বরুণ বসুরায় নামে পুরনো আমলের এক অ্যাথলিট তো ক'দিন

আগে এটা নিয়ে আমায় ফোন করেছিল। কিন্তু কোনও পেপার কাটিং নিয়ে কেউ তো আমার কাছে আসেনি!"

"আসেনি। অথচ খুব বড় মুখ করে বলে গেল, এনে দেখাবে। লোকটা তা হলে দেখছি ধাপ্পা দিতে এসেছিল।"

"এইরকম অনেক লোকই আমাদের কাছে আসে। আসলে জেলাসি থেকেই ওরা এইসব বলে। মনুষ্য চরিত্র বোঝা বড় শক্ত, কলাবতী।"

"হ্যাঁ, ভবদা, দু'দিনেই আমি সেটা একটু একটু বুঝেছি। আচ্ছা এখন আমি রাখছি, একদিন যাব।"

ফোন রেখে কলাবতী বিষণ্ণ মনে হাসল। কেন জানি পরিমল বেরাকে তার সাচ্চা মানুষ বলে মনে হয়েছিল। যখন বলছিল 'এটাই তো কর্তব্য'। তখন ওর চোখে কেমন একটা আলো জ্বলে উঠেছিল। যেরকম আলো কলাবতী কখনও দেখেনি। গভীর অনুভব ছাড়া অমন আলো জ্বলতে পারে না। অথচ আজ আটদিন হয়ে গেল পরিমল বেরা বঙ্গবাণীতে যায়নি। ভবনাথদাই হয়তো ঠিক, মনুষ্য চরিত্র বুঝতে তার অনেক বাকি।

কয়েকদিন পর সুচরিতা এসে কলাবতীকে নিমন্ত্রণ করল। তার ভাইপোর অন্নপ্রাশন, দুপুরে খাওয়া। একমাত্র কলাবতী ছাড়া ক্লাসের আর কাউকে সে বলেনি। রাত্রে কলাবতী নিমন্ত্রণের কথাটা তুলে দাদু আর কাকার কাছে জানতে চাইল। "কী উপহার দেওয়া যায় বলো তো? সোনার বালা কি আংটির কথা বোলো না। ওসব সেকেলে উপহার এখন চলে না।"

"একটা বারবি ডল কিনে দে।" সত্যশেখর মুহূর্তে সুপারিশ করে ফেললেন।

"পুতুলটুতুল! ভেঙে ফেলবে দু'দিনেই।" কলাবতী নাকচ করে দিল।

"একটা সিল্ক কি গরদের ফ্রক।" রাজশেখর এমনভাবে বললেন যেন কেনা প্রায় হয়েই গেছে।

"ক'দিন আর পরবে? দেখতে দেখতে তো বড় হয়ে যাবে।"

রাজশেখরও নাকচ হলেন।

"তা হলে একটা ট্রাইসাইকেল।" দ্বিধাভরে সত্যশেখর প্রস্তাব দিলেন।

"ছ'মাসের ছেলে ট্রাইসাইকেল চালাবে! বলছ কী?"

ছেলেকে লজ্জিত হতে দেখে রাজশেখর এগিয়ে এলেন তাকে লজ্জামুক্ত করতে। "তা হলে প্যারাম্বুলেটর। সেটা তো ওকে চালাতে হবে না।"

"কলকাতায় এখন কেউ প্র্যাম ঠেলে না। রাস্তায় যা গর্ত, বাচ্চার হাড়গোড়

আর আস্ত থাকবে না।"

"একটা ফার্স্ট এইড বক্স দিলে কেমন হয়?" সত্যশেখর নড়েচড়ে বসলেন। "শুধু বাচ্চার কেন, বাড়ির লোকেরও কাজে লাগবে।"

রাজশেখর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "তা হলে বরং গোটাচারেক বেবি ফুডের কৌটো দেওয়া..." নাতনির মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

"এমন একটা কিছু বলো, যেটা দিলে সারাজীবন আমাকে মনে রাখবে।" কলাবতী অধৈর্য হয়ে বলল।

ওঁরা দু'জন চিন্তায় ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে ভয়ে ভয়ে সত্যশেখর প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় বললেন, "একটা কম্পিউটার ...না, না, না অনেক দাম, তার থেকে বরং একটা অভিধান দিলে কেমন হয়? সারাজীবন বাচ্চাটার কাজে লাগবে, তোকেও মনে রাখবে।"

লাফিয়ে উঠল কলাবতী। "হাতে করে নিয়ে যেতেও আমার সুবিধে হবে। কাকার ওরিজিনালিটির ধারেকাছে কেউ আসতে পারবে না, তাই না দাদু?"

অবশেষে ইংরেজি থেকে বাংলা একটা অভিধান হাতে কলাবতীকে দেখা গেল অবিনাশ কবিরাজ লেন দিয়ে হেঁটে সুচরিতার বাড়ির দিকে যেতে। বাড়িটা সে চেনে। হাঁটতে হাঁটতে একটা পানের দোকানে সার দেওয়া মহাদেব, কৃষ্ণ, হনুমান ও রামের ছবি দেখে তার ছবি বাঁধাইয়ের দোকানগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, "আরে চুয়াল্লিশের এফ-এ তো পরিমল বেরা থাকে! একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে কেমন হয়?"

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। খুঁজে বের করতে তার মোটেই অসুবিধে হল না। সুচরিতাদের বাড়ি ছাড়িয়ে দুটো মোড় ঘুরে একতলা চুয়াল্লিশের-ডি বাড়িটা। তারপর দোতলা একটা মাঠকোটা যার নম্বরের সঙ্গে রয়েছে ই এবং এফ। একপাল্লার টিনের দরজা দিয়ে ঢুকে সরু একটা পথ, যার দু'ধারে করোগেটেড টিন আর শালকাঠ দিয়ে তৈরি দুটো দোতলা বাড়ি। খোলা কাঁচা নর্দমা। ঘরগুলোর সামনে দড়িতে শুকোচ্ছে প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি। রান্না হচ্ছে শোবার ঘরেই। কাঠের সোজা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

কলাবতী ফাঁপরে পড়ল। কোন বাড়িটা 'এফ'? একটি বউ তার ঘর থেকে উঁকি দিয়ে কলাবতীকে এতক্ষণ দেখছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই আপনার?"

"পরিমল বেরা, এফ বাড়িতে থাকেন।"

"ওই সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়, প্রথম ঘরটাই। সাবধানে উঠবেন।"

সিঁড়িটার একদিকে ধরার কাঠ খসে পড়েছে, একটা ধাপে কাঠের পাটা নেই। দোতলায় পৌঁছেই দেখল সামনের প্রথম ঘরটার দরজা আধ-ভেজানো। পাল্লার ফাঁক দিয়ে কলাবতী পরিমল বেরাকে দেখতে পেল। তক্তপোশে চিত হয়ে পাঁজির মতো একটা বই পড়ছে। পরনে সবুজ চেক লুঙ্গি, খালি গা। কলাবতী দরজায় টোকা দিল। পরিমল উঠে বসল।

"আপনি!" তাড়াতাড়ি দড়িতে টাঙানো পাঞ্জাবিটার দিকে হাত বাড়িয়ে পরিমল বেরা আবার বলল, "বসুন।"

"বসতে আসিনি। শুধু একটা কথা জানবার জন্যই এসেছি।" কলাবতী তীব্র চোখে তাকাল। পরিমল বেরার অবাক ভাবটা তখনও ঘোচেনি। অস্ফুটে বলল, "কী কথা?"

"বলে এসেছিলেন পেপার কাটিং দেখাবেন, দেখিয়ে এসেছেন?"

পরিমল বেরা মাথা নাড়ল, "না।"

"তা হলে অত জোর দিয়ে বলে এসেছিলেন কেন? কোথায় সেই পেপার কাটিং? মিথ্যা কথাগুলো বলতে আপনার কি লজ্জা করল না? ভেবেছিলেন, আপনার মুখের কথা শুনেই বঙ্গবাণী লিখে দেবে, বরুণ বসুরায় বাহবা নেওয়ার জন্য হেনরি রেবেলোকে চিট করেছে। ...আসলে আপনি একটা ঈর্ষাপরায়ণ, জেলাস লোক। বরুণ বসুরায়কে খাটো করার জন্য ধাপ্পা দিতে গেছলেন। এক অ্যাথলিটের মর্যাদা আর-এক অ্যাথলিট রক্ষা করবে, এটা কর্তব্য। ...কর্তব্যের নমুনাটা তো খুব দেখালেন... আসলে আপনার মতো লোকেরাই স্পোর্টসের সম্মান নষ্ট করে, অ্যাথলিটদের মর্যাদা নষ্ট করে।" মেশিনগানের মতো কথার বুলেট ছুড়ে গেল কলাবতী। রাগে তার সারা শরীর কাঁপছে।

পরিমল বেরার লম্বা দেহটা কথায় ঝাঁঝরা হয়ে সামান্য নুয়ে পড়েছে। চোখে-মুখে অসহায় লজ্জা।

"বলেছিলুম ঠিকই। কিন্তু কাটিং রাখা খাতাটা খুঁজে পেলুম না... এত বছর পর, কোথায় যে..." পরিমল বেরা ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। কলাবতীও ঘরটা দেখল।

কোনও কিছু হারিয়ে যাওয়ার উপায় নেই এই ঘরে। একটা কেরোসিন স্টোভ, হাঁড়ি, থালা-বাসন, হারিকেন, মশলার কৌটো, জলের কলসি, গ্লাস ও বালতি ছাড়া আর কিছু নেই। এর মধ্যে কোনও খাতা লুকিয়ে থাকতে পারে না। তক্তায় একটা ওয়াড় ছাড়া তেলচিটচিটে বালিশ, সুজনি আর পাট

করে রাখা মশারি। ওখানেও খাতা থাকলে খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরিমল তক্তপোশের তলা থেকে একটা টিনের বাক্স টেনে বের করে ডালাটা খুলে দেখাল। "এর মধ্যে রেখেছিলুম।"

পাটকরা একটা ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি, ছোট কয়েকটা মোড়ক, পাকিয়ে রাখা কাগজ ছাড়া কলাবতী বাক্সে আর কিছু দেখতে পেল না।

"ঠিক সময়েই দেখছি আপনার জিনিস হারায়।" রাখঢাক না করেই কলাবতী কথাগুলোয় ব্যঙ্গের বিছুটি মাখিয়ে দিল, "অজুহাতটা ভালই দিলেন, হারিয়ে গেছে।"

যন্ত্রণায় পরিমল বেরার মুখটা কুঁকড়ে গেছে। নিরুপায় দুই মুঠি বুকের কাছে। "বিশ্বাস করুন, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি কাউকে ছোট করার জন্য, কাদা ছিটোবার জন্য এসব বলিনি। সত্যিই রেবেলো সাড়ে আটচল্লিশ ফুট লাফিয়েছিল, বরুণ নয়।"

"এখন এসব বলে কী লাভ?"

"আমার কিছু বলার নেই। আপনার কথার জবাব দেওয়ার মুখ আমার নেই।" অপরাধীর মতো পরিমল বেরা মাথা নামিয়ে নিল।

"যেখান থেকে পারুন, লিখিত প্রমাণ এনে দিন।" কলাবতী দরজার দিকে এগিয়ে থমকে ঘুরে বলল, "সাতদিন অপেক্ষা করব, তার মধ্যে প্রমাণ না দিতে পারলে আপনাকে নিয়ে স্টোরি করব। বঙ্গবাণীতে ওটাই হবে আমার শেষ লেখা।"

কলাবতী সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঘুরে দাঁড়াল। ঘর থেকে পরিমল বেরা বেরিয়ে এসেছে। আবেগরুদ্ধ গলায় কলাবতী বলল, "জানেন, আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলুম। আমার দাদু, কাকাও বিশ্বাস করেন। আপনি সব ভাল ধারণা ভেঙে দিলেন।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সে ওপরে তাকিয়ে দেখল বাজপড়া লোকের মতো পরিমল বেরা দাঁড়িয়ে।

"কলাবতী, হ্যালো, আমি বলদেবদা বলছি। আরে একটা মজার ব্যাপার... একটা চিঠি এসেছে দিল্লি থেকে। কে লিখেছে? ...পরিমল বেরা। পড়ে শোনাব?"

"পড়ুন।"

"চিঠিটা ক্রীড়া-সম্পাদককে লেখা। 'মাননীয়েষু, সাতদিনের মধ্যে প্রমাণ

দাখিল করতে না পারার জন্য আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও দুঃখিত।' কলাবতী, বানান টানানগুলো কিন্তু ফোনে আর বলছি না, বুঝে নিয়ো। হ্যাঁ, তারপর লিখেছে, 'লখনউয়ে দুইটি ইংরাজি, একটি উর্দু ও একটি হিন্দি কাগজের অফিসে গিয়াছিলাম। কিন্তু চল্লিশ বছরেরও অধিক কালের কাগজ ইহাদের কাহারও কাছে পাইলাম না। তাহারা বলিল, দিল্লি গিয়া খোঁজ করিতে, সেখানে বড় বড় কাগজের অফিস রহিয়াছে, হয়তো তাহাদের কাছে আটচল্লিশ সালের কাগজ থাকিতে পারে। তাই আমি দিল্লি আসিয়াছি। কিন্তু লখনউ ট্রায়ালের সময় এখানে বড় কোনও খবরের কাগজের অফিস ছিল না। একটি-দুটি যাও বা ছিল, তাহারা কাগজ উঠাইয়া দিয়াছে। একজন আমাকে একটি লাইব্রেরির কথা বলিল, যেখানে পুরাতন খবরের কাগজ রাখা আছে। টাকা দিলে নাকি সেখানে খবরের কাগজ হইতে ছবি তুলিয়া দেয়। আমি কাল সেখানে যাইব। ইতিমধ্যে দয়া করিয়া আমার সম্পর্কে কিছু লিখিবেন না। আমাকে আরও কয়েকটি দিন সময় দিন। আশা করি, আমার এই প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করিবেন। আপনি মহানুভব, তাই আশা করি কয়েকটা দিন ভিক্ষা নিশ্চয়ই দিবেন। নমস্কার জানিবেন। ইতি— আপনার বশংবদ শ্রীপরিমলকুমার বেরা।' কলাবতী শুনলে তো?"

"বলদেবদা আপনারা কী করবেন এবার?"

"করব মানে? কী আবার করব, এই পাগলের চিঠি কি রেখে দেব নাকি? একটা তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার নিয়ে লোকটা যে লখনউ-দিল্লি করবে কে জানত! লোকটা সম্পর্কে তুমি ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলে বলেই ফোন করলুম। ভবদা তো চিঠিটা ফেলেই দিচ্ছিল।"

"পরিমল বেরা যদি প্রমাণ নিয়ে আসে?"

"খেপেছ তুমি! জীবনে আর বঙ্গবাণীমুখো হবে না। এসব লোক আমার জানা আছে।"

"যদি কোনও প্রমাণ পাঠায়, আমাকে কি একবার জানাবেন?"

"জানাব।"

ওদের কথোপকথন ওইখানেই শেষ হল।

কলাবতীর স্কুল খুলে গেছে। পড়াশোনা নিয়ে সে ব্যস্ত। সাংবাদিকতা, বঙ্গবাণী, ময়দান, স্পোর্টস ডেস্ক— এসব তার কাছে এখন আবছা হয়ে আসছে। স্কুলে বড়দির সঙ্গে দেখা হলেই তার অস্বস্তি হয়, এই বুঝি ঝুপুকে স্টেফি গ্রাফ করে তোলার প্রসঙ্গটা উঠবে। কিন্তু ওঠেনি। অবশেষে একদিন

সে বড়দির ঘরে গিয়ে নিজেই জিজ্ঞেস করল, "ঝুপুর বাবা-মা'র সঙ্গে আপনি কথা বলবেন বলেছিলেন।"

"বলেছি।" মলয়া মুখার্জি চিঠি পড়া বন্ধ করে গম্ভীর মুখটা তুললেন, "ওঁরা আর আমার মুখ দেখবেন না বলেছেন।... কিন্তু কালু, তুমি যা বুঝেছ সেটাই ঠিক। মন খারাপ কোরো না।" আবার তিনি চিঠি পড়া শুরু করলেন।

মনটা সত্যিই তার খারাপ হয়ে গেল। বড়দির সঙ্গে আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটল তারই জন্য। তার চেয়েও খারাপ লাগছে, বাচ্চা ঝুপুকে একটা টেনিস রোবট বানাবার জন্য ওর বাবা-মায়ের হাস্যকর, অবুঝ এবং লোভী চেষ্টা দেখে।

রবিবার কাকার সঙ্গে ইভনিং শো-এ সিনেমা দেখতে গেছল কলাবতী। চার্লি চ্যাপলিনের 'গোল্ড রাশ'। বাড়ি ফিরতেই রাজশেখর জানালেন, "কালু, বঙ্গবাণী থেকে বলদেব ব্যানার্জি নামে একজন তোকে ফোন করেছিল। তোকে জানিয়ে দিতে বলল, ফর্টিএইট ওলিম্পিক ট্রায়ালের রেজাল্টের একটা ফোটোস্ট্যাট কপি ওরা ডাকে পেয়েছে। কোথা থেকে এসেছে সেটা ওরা জানে না। তবে একটা চিরকুট আঁটা ছিল, তাতে লেখা 'অনেক চেষ্টায় এইটুকুমাত্র জোগাড় করিতে পারিয়াছি।' তলায় নাম লেখা পরিমল বেরা।"

শোনামাত্র কলাবতী আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ইয়াহ্। দাদু লোকটা কথা রেখেছে।

রাজশেখরকে কিন্তু উৎফুল্ল দেখাল না। মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "কালু, মুশকিল হয়েছে একটাই। ট্রায়ালে যারা নিজেদের ইভেন্টে প্রথম হয়েছে শুধু তাদেরই নাম ছাপা হয়েছে, তাতে হেনরি রেবেলোরও নাম আছে।"

"আর তার জাম্পের ডিসট্যান্সটা?" কলাবতী নিজেই যেন এবার লাফিয়ে উঠবে এমনভাবে সে হাত মুঠো করে শরীরটা কুঁকড়ে স্প্রিং-এর মতো গুটিয়ে নিল।

"নেই। কারও ডিসট্যান্স, টাইমিং কি হাইট, কিছুই নেই। শুধুই প্রথম হওয়াদের নাম।"

ধীরে ধীরে আলগা হয়ে এল কলাবতীর শরীর। দু'চোখে ফুটে উঠল গভীর দুঃখ। শুধু বলল, "বেচারা!"

রাজশেখর বললেন, "তবু পরিমল চেষ্টা করেছে নিজের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। দুঃখ করার কিছু নেই কালু, এটাই হল স্পোর্টসম্যানের কাজ।" নাতনিকে বুকে টেনে তিনি মাথায় হাত বুলোলেন।

"দাদু, কালই আমি পরিমল বেরার কাছে যাব। ওকে অপমান করে কথা

বলে এসেছি, মাফ চাইব। ফোটোস্ট্যাটে রেবেলোর লাফাবার ডিসট্যান্স নাই থাকুক, আমি বিশ্বাস করি পরিমল বেরাই সত্যি।"

"বহু বছর ওকে দেখিনি, কাল ভোরে জগিং করতে করতে আমরা দু'জনেই যাব।"

ভোরেই ওরা জগ করতে করতে চুয়াল্লিশের এফ-এর সামনে পৌঁছোল। টিনের দরজাটা খোলাই রয়েছে। এখানকার মানুষ ভোরেই উঠে পড়ে কাজে বেরোনোর জন্য। রাজশেখরকে দেখে একতলায় লোকেরা অবাক হয়ে গেল। এই ধরনের চেহারার মানুষ মাঠকোটায় কখনও আসেনি।

"দাদু, তুমি আর উঠো না, আমি ওকে ডেকে আনছি।" এই বলে কলাবতী সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

পরিমল বেরার ঘরের দরজাটা খোলা। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘরে যে একটা বউ! তক্তপোশটায় একটা বাচ্চা কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরে কিছু জিনিসপত্রও রয়েছে। স্টোভে ভাত ফুটছে। ঝাঁট দেওয়া বন্ধ রেখে অবাক হয়ে বউটি তাকিয়ে।

"এখানে পরিমল বেরা থাকেন না?"

"থাকত, এখন আর থাকে না।" বারান্দায় উবু হয়ে বসে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজছে যে লোকটি, সে-ই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঘরটা আমাকে দিয়ে গেছে। পরিমল বেরাকে কী দরকার, টাকা ধার করেছিল?"

"না, ধার করেনি, তবে আমার ওকে ভীষণ দরকার।"

"ছবির ফ্রেম করতে দিয়েছিলেন? কিন্তু দোকান তো বেচে দিয়েছে।"

"সে কী?"

"কী একটা খুব জরুরি কাজে ধারধোর করে লখনউ গেল, আমার কাছ থেকে নিয়েছে দেড়শোটা টাকা। বললুম, কী এমন জরুরি কাজ পরিমলদা? বলল, সে তুই বুঝবি না। তারপর ক'দিন বাদে ফিরে এসে বলল, কাজ হয়নি, দিল্লি যেতে হবে। দোকানটা বেচে টাকা নিয়ে দিল্লি সেই যে গেল তো গেলই, আর ফিরে আসেনি। বুড়ো বয়সে কী যে ভীমরতি ধরল, দোকান কি কেউ বেচে?"

"কোথায় ওকে পাব, বলতে পারেন?"

"না।" লোকটি ঘরে ঢুকে গেল।

অসাড় মাথা নিয়ে এক-পা এক-পা করে কলাবতী নীচে নেমে এল।

"কী হয়েছে কালু, পরিমল..." রাজশেখর নাতনির মুখ দেখে ব্যস্ত স্বরে বললেন।

"এখানে আর থাকে না।... চলো দাদু।"

ধীরে ধীরে জগ করে ছোটার মধ্যেই রাজশেখর আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন, কলাবতীর চোখ দুটি জলে ভেজা, ছলছল দৃষ্টি।

'কালু, তোর কী হল? চোখে জল!"

"দাদু, আমার আনন্দ হচ্ছে। কী যেন হারিয়েছিলাম। মানুষকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখন আবার পারছি।"

ভূতের বাসায় কলাবতী

"কালু, এ হল আমার পিসতুতো বোন ইচ্ছাময়ী, তোর দিদা হয়, আর ইচ্ছে, এ হল আমার নাতনি, দিব্যর মেয়ে কালু, কলাবতী। এইবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল, এখন ছুটি চলছে।" রাজশেখর কথা শেষ করেই চোখের ইঙ্গিতে প্রণাম করতে বললেন। কলাবতী ইচ্ছাদিদাকে তারপর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসা দাদুকে প্রণাম করল।

ইচ্ছাময়ী প্রসন্ন চোখে কলাবতীর চিবুক ছুঁয়ে আঙুল ছোঁয়ালেন ঠোঁটে। "শিখলে. কোথায় গুরুজনদের প্রণাম করার এই শিক্ষাটা? এসব তো আজকালকার মেয়েরা জানেই না।" জিন্‌স আর টপ পরা কলাবতীর থেকে চোখ সরিয়ে তিনি রাজশেখরের দিকে তাকালেন।

"সিংহিবংশের মেয়েদের কি এসব শেখাতে হয়, এ-বাড়িতে যে জন্মেছে, এ-বাড়ির বাতাসে যে শ্বাস নিয়েছে, সে আপনা থেকেই শিখে যায়।" রাজশেখরের গলার স্বরে ফুটে উঠল ক্ষীণ অহংকার চাপা গর্ব।

কলাবতী এই প্রথম দেখল ইচ্ছাদিদাকে। দাদুর যে একজন পিসতুতো বোন আছে সে জানত না। চেহারায় দাদুর সঙ্গে অনেক মিল আছে। তেমন লম্বা নাক, বড় বড় টানা চোখ, ভারী গলা। সওয়া ছ'ফুট দাদুর পাশে দাঁড়ালে ইচ্ছাদিদার মাথা কান পর্যন্ত তো পৌঁছোবেই আর ওজনেও দাদুর নব্বই কেজি-র থেকে সামান্যই কম হবে। ওদের অমিলটা শুধু চুলে। রুপোর মতো ঝকঝকে থাক থাক বাবরি রাজশেখরের ঘাড় ঢেকে রেখেছে, বিধবা ইচ্ছাময়ীর মাথায় কাঁচাপাকা কদমফুল।

"রাজুদা তুমি যাবে তো?"

"এই পা নিয়ে! অসম্ভব।" রাজশেখর ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান পায়ের

গোড়ালিটা আঙুল দিয়ে দেখালেন। চারদিন আগে ভোরে নিত্যদিনের মতো দু'মাইল প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে রাস্তায় গর্তে পা পড়ে মচকে যায়। লাঠিতে ভর দিয়ে এখন ঘর থেকে বারান্দায় ইজিচেয়ার পর্যন্ত আসতে পারছেন।

"দিব্যকে কত ছোট দেখেছিলুম। লখনউয়ে থাকতেই শুনেছিলুম ওর বউ মারা গেছে। তারপর সন্নেসি হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে একটা মেয়ে রেখে।" ইচ্ছাময়ী স্নেহাতুর চোখে কলাবতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। "তোমার আর নাতি-নাতনি নেই?"

"নাহ।" রাজশেখর গম্ভীর হলেন। "সতু বিয়ে করেনি, মনে হয় করবেও না, পঁয়তাল্লিশ পার করে ফেলেছে। যা ওর মনে হয় তাই করুক, আমি তো তিনবার বলেছি, আমার কথা এড়িয়ে গেছে।... যাক গে কালুই আমার নাতনি আবার নাতিও। নিজের ইচ্ছেমতো ও বড় হয়েছে, আমি কোনও হস্তক্ষেপ করিনি। ওর স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হল হরির মেয়ে মলু, সেই হল কালুর গার্জেন, মায়ের মতো। হরিকে তোর মনে আছে?"

"বকদিঘির মুখুজ্যে হরিশঙ্কর? ওরে বাবা মনে থাকবে না!" ইচ্ছাময়ী ভুরু কপালে তুললেন। "কালোয়াতি গান শিখবে বলে একবার আগ্রা না পাটিয়ালা কোথায় যেন গেছল। তারপর ওস্তাদজির ঘাড়ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে।"

"তুই তা হলে জানিস।" তৃপ্তস্বরে রাজশেখর বললেন, "ওস্তাদজি হরিকে বলেছিলেন, আমার বকরিটাও তোর থেকে শুদ্ধভাবে পুরিয়া কল্যাণের সরগম করতে পারে। তাই শুনেই আগ্রা থেকে তানপুরাটা বগলে নিয়ে হরি চলে আসে। ওস্তাদজি ভদ্রলোক, ওকে ঘাড়ধাক্কা আর দেননি।"

"রাজুদা, তুমি আমার নাতনির বিয়েতে না আসতে পারো, কিন্তু সতু আর কালু অবশ্য অবশ্যই যেন আসে। এই কার্ডে ঠিকানা লেখা আছে, তোমার বাড়ির কাছেই বাড়ি ভাড়া করে বিয়ে হবে।"

ইচ্ছাময়ী আধহাত লম্বা একবিঘত চওড়া একটা খাম এগিয়ে দিলেন। খাম থেকে রাজশেখর কার্ডটা বার করলেন-- একটা কাগজের পালকি। কার্ডের ভাঁজ খুলে ভ্রূ কুঁচকে পড়ার চেষ্টা করে তাকালেন কলাবতীর দিকে। বুঝতে পেরে সে রাজশেখরের ঘরে গিয়ে চশমাটা নিয়ে এল।

"হ্যাঁরে ইচ্ছে, ছেলের বাবার নামটা যেন চেনা চেনা ঠেকছে— জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ প্রাক্তন ডি আই জি। আই সি এস প্রেমেন ঘোষের ভাই না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি চেনো নাকি?"

"সার বলেন ঘোষের ছেলে ওরা। প্রেমেন আমার সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্সে

পড়ত। তখন ওদের ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে কয়েকবার গেছি। ভাল ঘরেই কুটুম্বিতে করছিস। পা-টা এই সময়ই বিগড়োল নইলে অবশ্যই যেতুম, কত বছর প্রেমেনকে যে দেখিনি। নাতনির বিয়ে দিতে সেই লখনউ থেকে এসে উঠেছিস কোথায়?"

"গড়পাড়ে আমার ভাশুরের বাড়িতে। ছেলের বাড়ি থেকে বলল লখনউ গিয়ে বিয়ে দিতে পারব না, আপনারাই মেয়ে নিয়ে কলকাতায় আসুন। কলকাতার কিছুই তো জানি না, যা কিছু করাকম্মো সব ভাশুরপোরাই করে দিচ্ছে। এই বিয়েবাড়ি ভাড়া করা যে কী ঝকমারি তা কি আগে জানতুম! ছ'মাস আগে বুক না করলে নাকি পাওয়া যায় না। ভাশুরপোর চেনা ছিল তাই ধরাধরি করে একটা বাড়ি পাওয়া গেছে। এই তোমাদের কাঁকুড়গাছির কাছেই। আজ তা হলে আমি উঠি, গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, এখনও দশ-বারো জায়গায় যেতে হবে নেমন্তন্ন করতে।"

ইচ্ছাময়ী চলে যাওয়ার পর কলাবতী কার্ডটা পড়ল।

"দাদু, ১৬ নম্বর সি আই টি রোড, মনে হচ্ছে বাড়িটা চিনি, আমাদের স্কুলের কাছেই। খুব পুরনো, মোটা মোটা থাম আছে, ফটক আছে অনেকটা আমাদের বাড়ির মতোই। এখন বিয়ের জন্য ভাড়া দেয়।"

"কলকাতার বনেদি বাড়িগুলোর এখন বেশির ভাগেরই এই দশা। পূর্বপুরুষরা তো আর জানত না কলসির জল গড়িয়ে গড়িয়ে খেয়ে একশো-দেড়শো বছর পরে বংশধরদের কী হাল হবে। তারা তো বড়লোকি দেখাতে মোটা মোটা থামের বাড়ি করে গেছে। এখন ওই থামে সিমেন্ট-বালি লাগিয়ে কলি করাবার টাকা নেই তার ওপর অংশীদারের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। সেদিক থেকে আমি বরং বেঁচে গেছি। আমার সম্পত্তির মালিক হবে একজনই।" রাজশেখর মিটমিট হাসলেন কলাবতীর দিকে তাকিয়ে।

"এতবড় বাড়ি, লোক মাত্র তিনজন, কী হবে এটা দিয়ে? তার থেকে বরং বিক্রি করে ফ্ল্যাট কেনো।" কলাবতী দাদুকে চটাবার জন্য বলল। রাজশেখর হাতের লাঠিটা তুলতেই দুটো লাফ দিয়ে কলাবতী সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাতে খাওয়ার টেবিলে ওরা তিনজন। রাজশেখর, ছোট ছেলে সত্যশেখর ওরফে সতু আর কলাবতী। রুটি ছিঁড়ে আলু-পটল-কুমড়োর ডালনার বাটিতে ডুবিয়ে সতু বলল, "শীতকালেই খাওয়ার আরাম, তাই না রে কালু? কতরকমের তরিতরকারি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি—"

কাকাকে থামিয়ে দিয়ে কলাবতী বলে উঠল, "তার ওপর অঘ্রান, পৌষ,

মাঘ, ফাল্গুন মাসে বিয়ের সিজন, কত নেমন্তন্ন খাওয়া।"

"কালু পৌষ মাসে বিয়ে হয় না।" রাজশেখর ভুল ধরিয়ে দিলেন।

রুটি চিবোতে চিবোতে সতু বলল, "ওহ্, কতদিন নেমন্তন্ন বাড়ির বেগুনভাজা আর ছোলার ডাল যে খাইনি। ফুলকো ফুলকো গরম লুচি... পৃথিবীর কোনও খাবারের সঙ্গে তুলনা হয়?"

রাজশেখর বিরক্ত চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের বাড়ির লুচি কি ফুলকো হয় না? ছোলার ডাল বেগুনভাজা কি অপুর মা খারাপ রাঁধে?"

কলাবতী প্রসঙ্গ ঘোরাতে বলল, "তোমার লুচি বেগুনভাজার একটা ব্যবস্থা আজ হয়েছে।"

সতু সটান হয়ে গেল। "নেমন্তন্ন! কোথায়, কার, কবে?"

"আর তিনদিন পরে, ইচ্ছেদিদার নাতনির, ষোলো নম্বর সি আই টি রোডে।"

সতু এবার বাবার মুখের দিকে তাকাল। রাজশেখর বললেন, "ইচ্ছে হল আমার পিসতুতো বোন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ তো রাখো না, জানবে কী করে। আমাদের কত আত্মীয় সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছের মা খাঁদুপিসির বিয়ে হয় গাজিয়াবাদে, ইচ্ছের বিয়ে হয় লখনউয়ে। ওর নাতনির বিয়ে হচ্ছে কলকাতায় সার বলেনের নাতির সঙ্গে। আজ ইচ্ছে এসেছিল নেমন্তন্ন করতে। তোমরা তো ওদের কাউকেই চোখে দ্যাখোনি। অবশ্য আমিও কাউকে দেখিনি শুধু ইচ্ছেকে ছাড়া। যাই হোক, তোমরা দু'জন এ-বাড়ির তরফে নেমন্তন্নটা রেখে এসো।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।" সতু দাঁত দিয়ে রুটি ছিঁড়ে পটলের টুকরো মুখে ঢোকাল। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গেলে বিয়ের নেমন্তন্নে যাওয়ার থেকে ভাল আর কী হতে পারে, তাই না রে কালু? কত লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, আলাপ পরিচয় হয়, কত খবর জানা যায়। তা হলে বাবা আমি আর কালু যাচ্ছি। কার নাতনি রে কালু?"

"বললুম তো ইচ্ছেদিদার।"

"ওহ্ ইয়েস, ইচ্ছে মানে উইশ, ডিজায়ার, অ্যাসপিরেশন। মনে থাকবে। কতদিন ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল যে—।"

"দাদু, কী উপহার দোব?"

কলাবতীর প্রশ্নে রাজশেখর গভীর চিন্তায় পড়ে ক্ষীরের বাটিতে চামচ নাড়তে লাগলেন।

"সোনার একটা কিছু না দিলে তো মান থাকে না। ইচ্ছের নাতনি মানে আমারও নাতনি।"

"একটা আংটি?" কলাবতী প্রস্তাব দিল।

রাজশেখর ভ্রূ তুলে তাকিয়ে রইলেন। কথাটা যথেষ্ট মনঃপূত হল না।

"তা হলে কানের কিংবা গলার? আধ ভরির?" সতু প্রস্তাবটার সংশোধন করল।

"যা ভাল বুঝিস। পাঁচজন লোক দেখবে তো সিংহিবাড়ি কী দিল।"

"তা হলে এক ভরির, কী বলো কাকা?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি কালই হাইকোর্ট থেকে ফেরার পথে বউবাজার ঘুরে কিনে নিয়ে ফিরব। গলার একটা, পাথরটাথর বসানো— হ্যাঁরে কালু, পুঁইশাকের সঙ্গে মাছের তেল আর কাঁটা দিয়ে ছ্যাঁচড়া বোধহয় বিয়েবাড়িতে আজকাল আর করে না। লোকজনের খাওয়ার টেস্ট যে কত খারাপ হয়ে গেছে।" সতু আক্ষেপ জানিয়ে কাঁচাপাকা চুলেভরা মাথাটা নাড়তে লাগল, "কত কাল যে খাইনি।"

"কাকা, অপুর মা চারদিন আগে পুঁইশাক আর ইলিশের মুড়ো দিয়ে ছ্যাঁচড়া করেছিল।"

"কালু, তোর কাকার জিভ আর স্মৃতিশক্তি দুটোই খারাপ হয়ে গেছে।" রাজশেখর চেয়ার ছেড়ে উঠলেন বিরক্ত মুখে।

ফিসফিস করে কলাবতী কাকার দিকে ঝুঁকে বলল, "দাদুর কথাটার মানে বুঝলে? আবার ডায়েট চার্ট করে তোমাকে থানকুনি, কালমেঘ, উচ্ছে, কাঁচাহলুদ খাওয়ানো শুরু করবে।"

"না, না, ছ্যাঁচড়া ফ্যাঁচড়া কি একটা খাওয়ার মতো জিনিস? পেঁপেসেদ্দ কত টেস্টফুল বল?"

সতু একটু জোরেই বলল, যাতে ঘর থেকে প্রস্থানরত রাজশেখরের কানে কথাটা পৌঁছোয়।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা ঘণ্টাখানেক উতরেছে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। কাকা আর ভাইঝি সি আই টি রোড ধরে হাঁটছে। সত্যশেখরের পরনে ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড়তোলা চটি। কলাবতী পরেছে শাড়ি। টিকলো নাকে

একটা হিরেমাত্র। যখনই মুখটি ঘোরাচ্ছে রাস্তার দোকানের আলোয় ঠিকরে উঠছে দ্যুতি। পথচারীরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। নাকের এই নাকছাবিটা রাজশেখর দিয়েছিলেন কলাবতীর মাকে, সেইসঙ্গে আরও লাখ দেড়েক টাকার সোনার ও জড়োয়ার গহনা। তার অঙ্গে আর একটিও গহনা নেই, অবশ্য হাতঘড়িটাকে যদি গহনা ধরা না হয়। জামদানি শাড়ি পরে সে যখন দাদুকে দেখাতে আসে বিয়েবাড়ি যাওয়ার আগে, তখন মুগ্ধ চোখে রাজশেখর বলেন, "এত সুন্দর করে সাজতে শিখলি কার কাছে?"

"বড়দির কাছে।" একটু আড়ষ্ট হয়েই কলাবতী বলেছিল। সে জানে মুখুজ্যেবাড়ির প্রশংসা শুনলেই দাদু তেলেবেগুনে হয়ে যায়।

"মলুর, মলয়ার কাছে? ও-বাড়ির মেয়েরা আবার সাজগোজের বোঝেটা কী? হরির মেয়ের রংটাই শুধু ফরসা। তোর এই রঙের পাশে কি মেমসাহেবদের রং দাঁড়াতে পারে? লোকে কেন যে ফরসা ফরসা করে হেদিয়ে মরে। কালো হচ্ছে জগতের আলো।"

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা কলাবতী। নাকটা কুঁচকে বলল, "তা হলে এবার যাই বিয়েবাড়ি আলো করে দিয়ে আসি।"

"কাকার দিকে নজর রাখিস, লুচি-ছ্যাঁচড়ায় যা লোভ।"

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে বিয়েবাড়ির সামনে হাজির হল। নানান রঙের নানান চেহারার মোটরগাড়ি এসে ফটকের সামনে দাঁড়াচ্ছে, সাজগোজ করা মেয়ে পুরুষ ও বাচ্চারা গাড়ি থেকে নামছে। ফুল দিয়ে বাংলায় 'স্বাগতম' আর ইংরেজিতে 'ওয়েলকাম' লেখা ফটকের মাথায়। সামনে দাঁড়ানো কিছু বয়স্ক ও আধা-বয়স্ক ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোক এগিয়ে হাতজোড় করে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ভেতরে ঢুকে ডান দিকের না বাঁ দিকের কোন পথ ধরে যেতে হবে।

ফটকটা পার হয়েই বাঁদিক ও ডান দিকে পথ চলে গিয়েছে অর্ধচক্রাকারে একটুকরো ঘাসের জমিকে ঘিরে এবং আবার এসে মিলেছে বাড়িতে ওঠার টানা লম্বা সিঁড়িতে। সিঁড়িতে প্রায় দশটা ধাপ। উঠে গেলে চওড়া দালান। তার দু'দিকে দুটো ঘর, সামনে তিনটে দরজা। দরজা পার হলে উঠোন। উঠোন ঘিরে চওড়া দালানের মতো রক। রকের দু'ধারে দোতলায় যাওয়ার দুটো সিঁড়ি। সিঁড়ির শ্বেতপাথরগুলো ভাঙা এবং ফাটা, থামগুলোয় দায়সারা কলি করা। ফটকে ঢুকেই দু'ধারে আগাছা। মার্কারি ভেপারের আলো ফটকের

মাথায়। বাড়ির ছাদ থেকে ঝুলছে তিন-চার রঙের টুনি বাল্‌ব, দু'দিকের পথের ধারে রাখা চেয়ারে আমন্ত্রিতরা বসে।

ওরা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। কলাবতীর হাতে সোনালি জরির ফিতেয় বাঁধা রঙিন কাগজে মোড়া গহনার বাক্স। হাবিলদারি সাদা গোঁফ, টাকমাথা, গরদের পাঞ্জাবি গায়ে, ছড়ি হাতে এক বৃদ্ধ হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন সত্যশেখরের দিকে।

"আপনারা কি বরপক্ষের?"

"না, না, কনেপক্ষের, কাছেই তো বাড়ি, তাই হেঁটেই চলে এলুম।" সত্যশেখর বিনীত স্বরে বলল।

"কিছু মনে করবেন না, আমি তো সবাইকে চিনি না। মানুর বিয়েতে এসেছেন তো?"

"অবশ্যই।" সত্যশেখর সপ্রতিভ দ্রুত উত্তর দিল্।

"তা হলে এই ডান দিকে চলে যান। বর এখনও আসেনি, লগ্ন তো দশটায়। একটু পরেই এসে যাবে, কলকাতায় ট্র্যাফিকের যা অবস্থা।" বলতে বলতে বৃদ্ধ সদ্য আগত এক দম্পতির দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আয় রে কালু।" সত্যশেখর ডান দিকের পথ ধরল।

কলাবতী তখন কথা বলছে সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতিপরা এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে।

"ইচ্ছেদিদার নাতনি!" প্রৌঢ়কে থতমত দেখাল। "আমি বাচ্চুর জ্যাঠামশাইয়ের শালা, ধানবাদে থাকি। তুমি বরং বাঁ দিকের ওই চেয়ারের একটায় বোসো। মুশকিল হয়েছে কী, আমি এদের বাড়ির দু'-তিনজন ছাড়া কাউকেই চিনি না।" কিন্তু কিন্তু করে তিনি বললেন।

"ওই একই সমস্যা আমারও। ইচ্ছাদিদার নাতনির নাম যে বাচ্চু, সেটাই এই প্রথম শুনলাম।" বলেই কলাবতী বাঁ দিকের পথে এগোল। বিব্রত হয়ে ভাবল, বিয়ের কার্ডে অমিতা না সুমিতা কী যেন একটা নাম দেখেছিল। নামটা এখন আর মনে পড়ছে না। ওটা সঙ্গে করে আনলে ভাল হত। চেয়ারগুলো ভরতি হয়ে রয়েছে। খালি চেয়ারের খোঁজে সে তাকাচ্ছে তখন দেখতে পেল হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছেন হরিদাদু। অবাক হয়ে সে এগিয়ে গেল হরিশঙ্কর মুখুজ্যের দিকে। সিংহবাড়ির এক নাতনির বিয়েতে কিনা বকদিঘির মুখুজ্যেবাড়ির লোক নিমন্ত্রিত! তাজ্জব ব্যাপার!

"হরিদাদু আপনি?"

"কেন আমি কি নেমন্তন্ন খেতে যাই না? আমার বহুদিনের বন্ধুর নাতনির বিয়ে, এই অ্যাত্তটুকু বয়স থেকে বাচ্চুকে দেখে আসছি। তারপর এধার-ওধার তাকিয়ে হরিশঙ্কর বললেন, "খালি চেয়ার তো একটাও দেখছি না। তুমি বরং ভেতরে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে বোসো।"

বয়স্ক মহিলামহল কলাবতীর একেবারেই ভাল লাগে না। সে বলল, "এই তো বেশ দাঁড়িয়ে আছি, অসুবিধে হচ্ছে না। বড়দি আসেনি হরিদাদু?"

"না। সন্ধে থেকে মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে। বাচ্চুর বিয়েতে আটঘরার লোকের নেমন্তন্ন ভাবতেই পারছি না। সিংহিবাড়ির সঙ্গে ভবতোষদের সম্পর্ক আছে তা তো জানতুম না।"

"আমিও কি জানতুম ইচ্ছাদিদার নাতনির বিয়েতে আপনাকে দেখতে পাব!" কলাবতী হাসল। দেখল দূরে একটা চেয়ারে বসে কাকা হাত তুলে তাকে ডাকছে।

"ইচ্ছেদিদা কে?" হরিশঙ্কর উদ্‌গ্রীব হলেন।

"লখনউয়ে থাকেন। দাদুর পিসতুতো বোন। আচ্ছা আমি এখন কাকার কাছে যাব, ডাকছে।"

অবাক হয়ে থাকা হরিশঙ্করকে রেখে কলাবতী তার কাকার কাছে এল।

"হরিকাকা এখানে কেন রে?"

"ওঁর বন্ধুর নাতনি বাচ্চুর বিয়ে।"

"বাচ্চু কী? মানুর বিয়ে।"

"হরিদাদু তো বাচ্চুই বললেন।"

"আমাদের এই এক মুশকিল। আদর করে এক-একজন এক-একটা নাম রাখে। কেউ ডাকবে বাচ্চু, কেউ বলবে মানু।... হ্যাঁরে ভেতরটা একবার ঘুরে আসবি? উপহারটা তো মেয়ের হাতে দিতে হবে। চট করে দিয়ে আয় আর সেইসঙ্গে পারলে দেখে নিবি এই ব্যাচটার পাতে এখন কী চলছে, চাটনি পর্যন্ত এসেছে কি না।"

"কাকা তোমার এখনই খিদে পেয়ে গেল? কোর্ট থেকে ফিরেই তো চারটে আম দিয়ে দই আর চিঁড়ে খেলে!"

"খিদে পাবে না? চুপচাপ একা বসে, এত লোক যাচ্ছে আসছে কাউকেই চিনি না শুধু ওই হরিকাকা ছাড়া। কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা বলা আর ইনভাইট করে চিমটি খাওয়া একই কথা, কালু তুই একটু ভেতরে গিয়ে দ্যাখ। বরযাত্রীরা এসে পড়লে তখন তো ওরাই প্রায়রিটি পাবে খেতে বসায়। তার মানে

আমাদের বসতে বসতে থার্ড কি ফোর্থ ব্যাচ, তার মানে তো বেগুনভাজার টেস্ট একদমই নষ্ট হয়ে যাবে।" সত্যশেখরকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাল।

ভেতর থেকে এক মহিলা এই সময় বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনারত এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে জর্দার কৌটো চেয়ে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। সত্যশেখর তাকে ডেকে বলল, "এই মেয়েটিকে একটু কনের কাছে নিয়ে যাবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, এসো ভাই।" তিনি কলাবতীর হাত ধরলেন। "আসলে কী জানেন আমাদের লোকজন খুব কম, ঠিকমতো খাতিরযত্ন করতে পারছি না। তা ছাড়া চিনিও না কাউকে। এসো ভাই।" কলাবতীকে হাত ধরে তিনি বাড়ির ভেতর নিয়ে বাঁ দিকের সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেন।

"এই যে সতু, তুমি একা যে, বাবা আসেনি?"

সত্যশেখর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। হরিশঙ্কর তাকে বসার জন্য ইশারা করে বললেন, "বসে পড়ো, নয়তো কেউ টেনে নেবে।"

ধপ করে বসে পড়ল সত্যশেখর। "বাবার পা মচকে গেছে।"

"মচকাবেই তো। দিন দিন যা মোটা হচ্ছে। তা ভবতোষ চাটুজ্যের নাতনির বিয়েতে তোমরা নেমন্তন্ন পেলে কোন সুবাদে?"

"কেন, মানুর ঠাকুমা তো বাবার পিসতুতো বোন ইচ্ছেপিসি! মানু তো সম্পর্কে বাবার নাতনি, ওরা চাটুজ্যে বামুন হতে যাবে কেন?"

"মানু আবার কে?"

"কেন, আজ যার বিয়ে হচ্ছে!"

"বিয়ে তো হচ্ছে বাচ্চুর। শিলিগুড়ির ছেলের সঙ্গে। ভুল করে খেতে ঢুকে পড়োনি তো।" হরিশঙ্কর মুচকি হাসলেন। "তুমি আবার যা পেটুক। সিংহিরা অবশ্য খেতে ভালবাসে। খেয়ে খেয়ে মোটা হয় আর পা মচকায়।"

রাগে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সত্যশেখরের মাথা। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে বলল, "ভুল আপনি করেননি তো। বাচ্চু নয় মানুরই বিয়ে হচ্ছে। একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন।"

"আচ্ছা দেখছি।" খোঁজ নেওয়ার জন্য হরিশঙ্কর এধার ওধার তাকিয়ে সদ্য খেয়ে উঠে বেরিয়ে আসা একটি বেঁটেখাটো যুবককে ধরলেন। "ভাই, বলতে পারেন যার বিয়ে হচ্ছে তার নাম বাচ্চু কিনা?"

যুবকটি পান চিবোনো বন্ধ করে ভ্রূ কোঁচকাল। কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, "বাচ্চু?... হতে পারে। আমার বউ বলতে পারবে, ওর মামাতো

বউদির ননদ হয় কনে। আচ্ছা, দাঁড়ান আমি জিজ্ঞেস করে আসছি।"

দাঁড়াতে আর হল না। বাড়ি থেকে কোমরে গামছা বাঁধা একটি লোক বেরিয়ে এসে চেঁচাল, "পাত পড়েছে। এই ব্যাচে যারা খাবেন তারা চলে আসুন।"

"শুনলে তো সতু। চলো চলো আর দেরি কোরো না।" হরিশঙ্কর কনুই ধরে টান দিলেন। সত্যশেখর চলতে শুরু করল।

সেই মহিলাটি কলাবতীর হাত ধরে বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন। একতলায় উঠোনের দু'ধারে যে টানা লম্বা রক তার ডাইনে ও বাঁয়ে টেবিল পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বাঁ দিকের টেবিলে তখন ধুতিপরা কোমরে গামছা বাঁধা দুটি লোক শালপাতার থালা পাতছে, এইমাত্র একটা ব্যাচ খাওয়া শেষ করে উঠে গেছে। কৌতূহলবশতই কলাবতী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ডান দিকের রকে যারা খাচ্ছে তাদের দিকে তাকাল। তার মনে হল পাতে বেগুনভাজা রয়েছে, ছোলার ডাল পরিবেশন করছে কালো ট্রাউজার্স, সাদা শার্ট পরা তিন-চারজন লোক, তাদের হাতে সাদা গ্লাভ্‌স। তার অদ্ভুত লাগল আর একটা জিনিস দেখে বাঁ দিকের মতো ডান দিকের টেবিলে শালপাতায় নয়, নিমন্ত্রিতরা খাচ্ছে কলাপাতায়। দু'দিকে দু'রকম একই বিয়ের ভোজে, কী করে হয়!

যাই হোক, এই নিয়ে ভাবার জন্য কলাবতী সময় আর পেল না, কেননা ততক্ষণে সেই মহিলা তাকে একটা বড় ঘরের মধ্যে এনে ফেলেছেন। সারা ঘর জুড়ে বসে রয়েছেন সাজগোজ-করা মহিলারা। একদিকে সিংহাসনের মতো চেয়ারে বসে কনে। কলাবতী এধার-ওধার তাকিয়ে ইচ্ছেদিদাকে খুঁজে তাঁকে দেখতে পেল না। সসংকোচে কনের দিকে সে এগিয়ে গেল। গহনার বাক্সটা কনের হাতে তুলে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "দাদুর আশীর্বাদ।"

মাথায় ফুলের মুকুট, কপালে চন্দন, গলায় বেলফুলের মালা এবং হাতে ও গলায় সোনার গহনা এবং গোলাপি বেনারসিপরা মেয়েটি স্মিত হেসে দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করল এবং পাশে দাঁড়ানো এক বিবাহিতা মহিলার হাতে বাক্সটি তুলে দিল। কাগজের মোড়কটা ছিঁড়ে বাক্সের ডালাটা খুলেই তার চোখদুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল উত্তেজনায়। মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরোল।

"ওম্‌মা, কী দারুণ পেন্ডেন্ট, মুক্তো বসানো!"

"কই, দেখি, দেখি।" সামনে-বসা একজন বললেন।

গহনার বাক্সটা তুলে ধরে সবাইকে দেখানো হল। খাতা কলম নিয়ে

একজন বিধবা উপহারের তালিকা রাখছেন। তিনি জানতে চাইলেন, "কে দিয়েছে রে রাধু, নামটা বল।"

বাক্সটার ভেতর থেকে ছোট্ট একটা কাগজ বার করে রাধু নামের মহিলা চেঁচিয়ে পড়লেন, "ইচ্ছার নাতনিকে তার শুভ বিবাহে আটঘরার সিংহবাড়ির শুভেচ্ছা। আশীর্বাদক, রাজশেখর।"

লেখাটা কলাবতীরই। ইচ্ছার সঙ্গে শুভেচ্ছা মিল দেওয়ার লোভ সে সামলাতে পারেনি। সারা ঘরে একটা গুঞ্জন। গহনাটার দাম কত হতে পারে তাই নিয়ে ফিসফাস। একজন বলল আড়াই হাজার টাকার কম নয়। আর একজন বলল, শুধু মুক্তোগুলোর দামই তো আড়াই হাজার, ওটা হাজার পাঁচেকের কম নয়। এখন সোনার দর কত করে জানো? কে একজন বলল, খুব বড়লোকের বাড়ি থেকে দিয়েছে। এইসব কথাবার্তা কলাবতী কান লাল করে শুনল।

"আরে, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো।"

একজন হাত ধরে কলাবতীকে বসিয়ে দিল। সে বসতে যাচ্ছে তখন কোমরে গামছা জড়ানো একজন দরজার কাছ থেকে বলল, "যাঁরা এই ব্যাচে বসতে চান তাঁরা নীচে আসুন। দেরি করবেন না।"

শোনামাত্র কলাবতী উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুত দরজার দিকে এগোল, তার খিদে পায়নি কিন্তু কাকার পাশে তাকে বসতেই হবে, দাদুর কড়া হুকুম। সিঁড়ি দিয়ে সে নামছে আর তারই বয়সি একটি মেয়ে, খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের গোড়ে, হাতে একটা শাঁখ, ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। দু'জনের ধাক্কা লাগে প্রায়। দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকাল।

"কালু তুই!"

"তুই সুশি!"

সুস্মিতা আর কলাবতী পরস্পরের দিকে সদ্য-ভাজা ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে রইল। ওরা দু'জনে কাঁকুড়গাছি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে একই ক্লাসের ছাত্রী। দু'জনেই এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।

"আমার বউদির খুড়তুতো বোনের বিয়ে, শিলিগুড়ি থেকে বর আসবে এখনই। তুই এখানে?"

"বলছি।" কলাবতী এখন নিশ্চিত হয়ে বুঝে গেল, বড়রকমের একটা ভুল সে করে ফেলেছে। ভুলটা যেভাবেই হোক ম্যানেজ করতে হবে।

"এ-বাড়িতে কি আর একটা বিয়ে হচ্ছে?" কলাবতীর গলায় সন্দেহের সুর।

"দ্যাখ না কী যে মুশকিল হচ্ছে। আমাদের লোক ওদিকে চলে যাচ্ছে ওদের লোক আমাদের দিকে চলে আসছে। সেইজন্য তো সদরগেটে লোক দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।" সুশি মেশিনগানের মতো তড়বড় করে বলল। "একটা বাড়িতে দুটো বিয়ে, পার্টিশান করে আলাদা করারও ব্যবস্থা নেই। বিয়েবাড়ির যে এত ডিমান্ড কে জানত? বাড়িওলা বলল দেরি করে ফেলেছেন, আরও দু'মাস আগে এলে গোটা বাড়িটাই পেতেন, এখন আপনাদের শেয়ার করে নিতে হবে, রাজি থাকেন তো এখনই অ্যাডভান্স করুন। যত বিয়েবাড়ি এদিকে রয়েছে সব তো ভাড়া হয়ে গেছে, কী আর করা যায় অগত্যা ভাগাভাগি করেই নিতে হল।" এরপর গলা নামিয়ে সুশি বলল, "হ্যাঁরে কালু, তুই ভুল করে এদিকে চলে আসিসনি তো?"

ওদের পাশ দিয়ে হুড়মুড় করে মেয়েরা নীচে নেমে যাচ্ছে নতুন ব্যাচে বসার জন্য। সিঁড়ির একধারে সরে গিয়ে কলাবতী বলল, "বোধহয়।" তারপর উৎফুল্ল হওয়ার ভান করে কলাবতী বলল, "তোর বউদি তো আমারও বউদি। বউদির বোন তো আমারও দিদি। দিদির বিয়েতে এসেছি মনে করলেই আর গন্ডগোল নেই। তবে ওদিককার লোকেরা না জানলেই ভাল। দাদুর পিসতুতো বোনের নাতনি, কাউকে জীবনে চোখেও দেখিনি শুধু ইচ্ছেদিদাকে ছাড়া। চল, তোদের বিয়ের খাওয়াটাই খাব।"

কথাগুলো বলার সময় কলাবতীর মনের মধ্যে খচখচ করছিল একটাই কথা: দাদু শুনলে কী বলবে? অত দামি একটা গহনা কিনা ভুল জায়গায় দিয়ে এলুম!

"তুই একা এসেছিস?"

"সঙ্গে কাকাও আছে। ভুল নেমন্তন্নে এসেছি জানলে লজ্জায় পড়ে যাবে। এতক্ষণে হয়তো খেতে বসে গেছে।"

"সে আমি ম্যানেজ করে দোব। চল, তাড়াতাড়ি, বসার জায়গা পাস কিনা দ্যাখ।"

কলাবতীর হাত ধরে সুশি টেনে নিয়ে চলল। লম্বা টানা টেবিলগুলো তখন ভরে গেছে। কলাবতী গলা তুলে দেখার চেষ্টা করল কাকাকে এবং দেখতেও

পেল। সত্যশেখর তখন সামনে দাঁড়ানো এক মহিলাকে হাত নেড়ে প্রাণপণে কী যেন বোঝাচ্ছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ কলাবতীকে দেখতে পেয়ে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করল, "কালু, কালু, এই যে, এই যে, এখানে তোর জায়গা রেখেছি, চলে আয়।"

"সুশি, ওই যে কাকা!"

ভিড়ে মধ্য দিয়ে কলাবতী এগিয়ে গেল, পেছনে সুশি।

"এই দেখুন, মিথ্যে কথা বলিনি, শুধু শুধু চেয়ার আটকে রাখিনি।" সত্যশেখর উদ্ভাসিত মুখে মহিলার দিকে তাকাল। ব্যাজার মুখে সরে যাওয়ার সময় মহিলা বললেন, "এ কী, অনাচ্ছিস্টির নিয়ম, যে আগে আসবে সেই তো আগে বসবে।"

"কাকা ভাল আছেন? আপনি যে আসবেন ভাবতেই পারিনি।" সুশি কয়েকবার কলাবতীদের বাড়িতে এসেছে, সত্যশেখরকে সে চেনে। সত্যশেখরের পাশের চেয়ারটা খালি, তার পাশের চেয়ারে হরিশঙ্কর। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মুখটা আড়চোখে দেখে নিয়ে সত্যশেখর বলল, "আসব না মানে! ইচ্ছেপিসির নাতনির বিয়েতে আসব না?"

মুহূর্তের জন্য সুশির মুখ হতভম্ব হয়ে স্বাভাবিক হল কনুইয়ে কলাবতীর চিমটি খেয়ে।

"তা তো জানিই।" সুশির মুখ হাসিতে ভরে গেল। "ইচ্ছেদিদা তো সন্ধে থেকে আপনার কথাই বলছিলেন।"

এই সময় একটা হইচই, ব্যস্ততা বিয়েবাড়িতে পড়ে গেল। শোনা গেল "বর এসেছে, বর এসেছে।" সুশি চঞ্চল হয়ে উঠল। "কাকা, আমি যাই, বরণের সময় শাঁখ বাজাতে হবে, লজ্জা করে খাবেন না কিন্তু।"

"না, না, লজ্জা কেন করব।" সত্যশেখর আশ্বস্ত করল সুশিকে। "ওদিককার মতো কেটারিং সার্ভিস তো এদিকে নয় যে, চেয়ে চেয়ে খেতে হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

হরিশঙ্কর চোখ বুজে গলা চুলকোচ্ছিলেন। সুশি চলে যাওয়ার পর বললেন, "মেয়েটি কে কালু?"

কলাবতী টেবিলের তলা দিয়ে প্রায় হামা দেওয়ার মতো অবস্থায় শরীর গলিয়ে এধারে উঠে এসে চেয়ারে বসল। "সুশি তো ইচ্ছেদিদার ভাশুরের নাতনি। আমার বন্ধুও।"

বেগুনভাজা সহযোগে খানছয়েক লুচি শেষ করে সত্যশেখর ছোলার

ডাল পরিবেশনকারীকে "আরও দু'হাতা দিন," বলেই কলাবতীর কাছে ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল, "ইচ্ছেদিদার সঙ্গে দেখা হল?"

কলাবতী অস্ফুটে বলল, "হুঁ।"

"আমি এসেছি কি না জানতে চাইল?"

"হুঁ।"

"যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত, কী বলিস?"

কলাবতীর মুখ দিয়ে এবার কোনও শব্দ বেরোল না। আড়চোখে দেখল কাকার পাতে কুমড়োর ছোঁকার একটা ঢিপি বসিয়ে দিয়ে লোকটি বলল, "আপনাকে পরিবেশন করে সুখ আছে, খাইয়ে লোক তো আর দেখা যায় না।"

"ফ্রাই হয়েছে?"

"হয়েছে।"

সত্যশেখর উত্তেজিত হয়ে চেয়ার থেকে চার ইঞ্চি উঠে আবার বসে পড়ল। "আপনি পরিবেশন করবেন তো?"

"করব।"

হরিশঙ্কর মন্তব্য করলেন, "এত ভাল ভাল জিনিস থাকতে সতুর নজর যত্তসব অখাদ্যের দিকে।"

আটটা ফ্রাই খেয়ে সত্যশেখর জানিয়ে দিল, "কালু, আর কিছু খাব না শুধু কয়েক টুকরো মাছ, ব্যস, আজকের মতো শেষ।"

"দাদু বলে দিয়েছে তোমার ওপর নজর রাখতে।"

"নিশ্চয় রাখবি। খাইয়ে লোক তো আর দেখা যায় না, দেখে নে। খুব ভাল করে নজর করে দ্যাখ। ভাল রান্নার মতো ভাল করে খাওয়াও একটা শিল্প, একটা আর্ট।"

আর্টের প্রদর্শনীতে সত্যশেখর জুড়ে দিল গোটাকয়েক পানতুয়া এবং সোজা বর্ধমান থেকে আনা হয়েছে শুনে, প্রায় চারশো গ্রাম সীতাভোগ।

অবশেষে একসময় হরিশঙ্করকে বলতে হল, "সতু, আমরা যে উঠতে পারছি না, এবার ক্ষান্ত হও।"

হাত ধুয়ে সবাই বসে আছে। খুবই লজ্জা পেয়ে সত্যশেখর দইয়ের মালসা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা পরিবেশকের দিকে মাথা নেড়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। গ্লাসের জলে হাত ডুবিয়ে রুমালে আঙুল মুছতে মুছতে সে বলল, "কালু, এবার তো ইচ্ছেপিসির সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত।"

কলাবতীর এখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। বিনা উপহারে তারা যাবে কী করে কনে দেখতে? দাদুর মানসম্মান তা হলে ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে। তার থেকে বরং কেটে পড়াই উচিত। কাকা তো জানেই না কার জন্য আনা উপহার সে কাকে দিয়ে ফেলেছে।

"কাকা, বড্ড গরম, একটু বাইরে বসি গিয়ে।"

"তাই চল, জিরিয়ে নিয়ে ইচ্ছেপিসির সঙ্গে দেখা করব।"

ওরা ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসছে তখন দোতলার ডান দিকের বারান্দা থেকে জলদমন্দ্র কণ্ঠে হাঁক শোনা গেল, "কালু না?"

এ-গলা ইচ্ছেদিদা ছাড়া আর কারও হতে পারে না। কলাবতীর বুকের মধ্যে কাঁপন লাগল। সে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, যা ভয় করেছিল সেটাই ইচ্ছেদিদার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"এত দেরি করলে কেন... ওপরে এসো। তোমার কাকা আসেনি?"

কলাবতী মাথাটা কাত করে আঙুল দিয়ে কাকাকে দেখাল।

"ওপরে এসো।"

"কাকা, ওপরে যেতে বলছে।"

"চল। এই একপেটে খেয়ে আবার সিঁড়ি ভাঙা। হ্যাঁরে, 'এত দেরি করলে কেন' বললেন কেন? তুই তো অনেক আগে ওপরে গিয়ে উপহারটা দিয়ে এসেছিস, ইচ্ছেপিসির সঙ্গে দেখাও হয়েছে বললি।" সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সত্যশেখর বলল।

"কাকা, একটা বিশাল ভুল হয়ে গেছে। দোষটা অবশ্য আমারই, আমি যে একটা গাধা আজ তা টের পেলুম। উফ্‌ফ, দাদু শুনলে কী যে বলবে!"

"হয়েছে কী?" সত্যশেখর সিঁড়ি ভাঙা ভাঙা বন্ধ করে উৎকণ্ঠিত চোখে তাকাল।

"ডান দিকের সিঁড়িতে না উঠে বাঁ দিকে উঠে পড়েছিলুম আর সেখানেই কনের হাতে উপহারটা দিয়ে দিয়েছি।"

"করেছিস কী! অত দামি গহনা দিয়ে দিলি? এখন কী হবে?"

"ফিরিয়ে আনব?"

"পাগল হয়েছিস। ওপরে চল। আর নয়তো এখান থেকেই সটকে পড়ি।"

"না, না, সেটা বিশ্রী দেখাবে। দিদা তো আমাদের দেখে ফেলেছে। চলো, ওপরেই যাই।"

কাকা আর ভাইঝি একগাল হাসি নিয়ে বারান্দায় ইচ্ছাময়ীর সামনে দাঁড়াল। চওড়া বারান্দা তখন নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবে গিজগিজ করছে। সত্যশেখর কোনওক্রমে শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে প্রণাম করল, কলাবতীও।

"কত্ত ছোট্ট তোমাকে দেখেছিলুম আর আজ দেখছি। চলো, আমার নাতনিকে দেখবে, এই পাশের ঘরেই।" ইচ্ছাময়ীর কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘর থেকে হুড়মুড়িয়ে মেয়েরা বেরোতে শুরু করল, "বর এসেছে, বর এসেছে," বলে।

ধাক্কা সামলাতে সামলাতে সত্যশেখর বলল, "কালু, বর আসা কখনও দেখেছিস, দেখার মতো একটা জিনিস।"

"না কাকা, কখনও তো দেখিনি। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।" কলাবতী আদুরে গলায় বলল।

"তা হলে দেখবি চল। পিসিমা কালুকে একটু দেখিয়ে আনি।" সত্যশেখর কথা শেষ করেই ভাইঝির হাত ধরে টানল।

"দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি এসে কনে দেখে যেয়ো।"

"নিশ্চয় দেখব।" যেতে যেতে সত্যশেখর বলল, "যা খিদে পেয়েছে তাড়াতাড়ি তো ফিরতেই হবে।"

দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বরের মোটরগাড়ি ঘিরে থাকা ভিড়টার পাশ কাটিয়ে, ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে দু'জনে প্রায় দৌড়ে একশো মিটার অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁফাতে হাঁফাতে সত্যশেখর বলল, "আর পারছি না রে একটু জিরোই। যাক, প্রণামটা তো করা হয়েছে, এতেই মনে করে রেখে দেবেন আমরা গেছলুম।"

"কাকা, দাদুকে কী বলব?"

"বলবি পেটভরে খেলুম, রান্না খুব ভাল হয়েছে—"

"আর উপহারের গহনাটা যে ভুল কনেকে দিয়ে এলুম! আমি কিন্তু দাদুকে মিথ্যে কথা বলতে পারব না।"

"বলবি না। বাবাকে তোর থেকে বেশি আমি চিনি। সত্যি কথা বললে সাতখুন মাফ করে দেবে।"

কলাবতীর কাছ থেকে সব শুনে রাজশেখর ঘরের কড়ি-বরগা কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলেন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছিল সত্যশেখর এইবার ঘরে ঢুকল।

"জানো বাবা, হরিকাকা আর একটু হলেই ধরে ফেলেছিল। কিন্তু কালুর

বন্ধু সুশি এমন ম্যানেজ করে দিল যে, আমি পর্যন্ত টের পাইনি কালু ডাইনে-বাঁয়ে গুলিয়ে ফেলেছে।"

"ঠিক বলছিস হরি ধরতে পারেনি? ওকে বিশ্বাস নেই, তলে তলে ঠিক খোঁজ নেবে। ধরতে পারলে চারদিকে বলে বেড়াবে রাজুর ছেলেটা হাঁদা, নাতনিটা বোকা। সিংহিদের চিমটি কাটার সুযোগ পেলে তো ছাড়বে না, কালু, এ নিয়ে তুই চিন্তা করিসনি। উপহারটা যেই পাক একটা কনে তো পেয়েছে, ব্যস! ইচ্ছের নাতনিকে আমি একটা কিছু পরে দোব। তোর বন্ধু সুশিকে একদিন নেমন্তন্ন কর, ওর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করব। মেয়েটি আমাদের মান রক্ষা করে দিয়েছে।"

নেমন্তন্ন করার আগেই দু'দিন পর বিকেলে সুশি এসে হাজির হল কলাবতীদের বাড়িতে। সঙ্গে ওর দাদা সমীর আর বউদি চঞ্চলা। ওরা দেখা করতে চায় রাজশেখরের সঙ্গে। সমীরের হাতে একটা অ্যাটাচি কেস।

"কী ব্যাপার রে?" ভয়ে ভয়ে কলাবতী জিজ্ঞেস করল সুশিকে।

"ব্যাপার গুরুতর, তুই যে উপহারটা বাচ্চুদিকে দিয়ে এসেছিস সেটা ফিরিয়ে দিতে দাদা এসেছে। বাচ্চুদি তো কিছুতেই নেবে না, আমরাও ওই উপহার গ্রহণ করতে পারব না। ভুল করে দেওয়া অন্যের জন্য অত দামি জিনিস কি নেওয়া যায়, তুই বল?"

"কিন্তু একবার দিয়ে ফেলা উপহার দাদুই বা ফিরিয়ে নেবেন কী করে? তাতে তো ওঁর মর্যাদা থাকবে না।"

বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে বিপন্ন মুখে দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন বৈঠকখানায় রাজশেখর আলাপ করছিলেন সমীর আর চঞ্চলার সঙ্গে। পায়ের ব্যান্ডেজ খুললেও লাঠি হাতে রাজশেখর সাবধানে চলাফেরা করছেন। সমীর পূর্ব রেলের অফিসার, থাকে আসানসোলে।

"আরে, বোলতা আমি চিনব না। হুগলি জেলার প্রায় সব গ্রামেরই নাম আমি জানি। আমাদের আটঘরা থেকে দশ-বারো মাইল বড়জোর। খুব বর্ধিষ্ণু জায়গা বোলতা। স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে, অনেক সরকারি দপ্তর হয়েছে. টেলিফোন আছে, প্রচুর টিভি সেট, একটা ব্যাঙ্কও আছে, কলেজও নাকি হবে শুনেছি।" রাজশেখর তাঁর নিজের জেলার প্রসঙ্গ পেলে একটু সোজা হয়ে

বসেন। উত্তেজিত হয়ে ওঠার এটা প্রাথমিক লক্ষণ।

"ঠিকই শুনেছেন। আমরা একটা জমি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু যারা কলেজ করার জন্য উদ্যোগী হয়ে কমিটি করেছে তারা জমিটা নিতে চায়নি।" সমীরের স্বরে খেদ ফুটে উঠল।

"কেন? খুব বেশি দাম চেয়েছিলে?"

"আজ্ঞে না, নিঃশর্ত দান করব বলেছিলুম। প্রায় পাঁচ বিঘে জমি বাস-রাস্তার ওপর। কাছেই পোস্ট অফিস, থানা, জায়গাটা নির্জন। একটা বিশাল দিঘি আছে আমাদেরই বাড়ির পেছনদিকে। কলেজ করার আইডিয়াল জায়গা।"

"তা হলে?"

"জমিতে ভুত আছে। ওখানকার লোকেদের বিশ্বাস। প্রায় দেড়শো-দুশো বছরের বিশ্বাস। তাই ওই জমিতে কেউ পা পর্যন্ত রাখে না, গোরু-ছাগল পর্যন্ত চরতে দেয় না। জমিটায় পা রাখলে নাকি তার মৃত্যু অবধারিত। শুনেছি অনেকে নাকি মারাও গেছে তবে আমরা শুধু শুনেই এসেছি ছোটবেলা থেকে, চোখে দেখিনি। জমিটা এখন জঙ্গল হয়ে আছে। পেয়ারাগাছে পেয়ারা হয়, বেলগাছে বেল, কুলগাছে কুল। কেউ পাড়তে যায় না। ফল হয় আর গাছেই থাকে, তারপর জমিতে পড়ে পচে যায়। আমাদের বাড়ির লাগোয়াই পুরনো ভাঙা বাড়ি আর পোড়ো একটা শিবমন্দির আর তার গায়েই জমিটা।"

"আশ্চর্য তো!" রাজশেখর টানটান হয়ে বসলেন। "খুব ইন্টারেস্টিং। একবিংশ শতাব্দীতে আমরা পা দিতে চলেছি আর আমার জেলার লোক কিনা এখনও ভূতপ্রেতকে ভয় পায়।" রাজশেখরকে যত না অবাক তার থেকেও বেশি লজ্জিত দেখাল।

এই সময় কলাবতী ও সুশি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকল। এতক্ষণ ওরা বাইরের বারান্দায় শলাপরামর্শে ব্যস্ত ছিল, আর ঘরের কথাবার্তা শুনছিল।

"দাদু"। কলাবতী রাজশেখরের গা ঘেঁষে বসল। দাদুর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। "দাদু, তোমার জেলার লোকেদের পক্ষে এটা নিশ্চয় খুব লজ্জার, তাই না?"

"নিশ্চয়। ভুতে বিশ্বাস করে কারা? ভিতু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা।"

"তা হলে এই ভূতের ভয়টা তো ভেঙে দেওয়া উচিত। কী বলো?"

"ভাঙবেটা কে? আমার পা-টায় এখনও তেমন জোর ফেরেনি নইলে আমিই গিয়ে— একবার ভাব তো, কলেজ করার জন্য অতবড় একটা জমি

কিনা ভূতের মাঠ হয়ে পড়ে আছে, কলেজ হবে না!"

"তুমি নাই বা গেলে, সিংহিবাড়িতে কি আর লোক নেই? সুশি দেশের বাড়িতে যাচ্ছে সামনের শনিবার, আমিও ওর সঙ্গে বোলতায় যাব। দেখব ভূত আমার ঘাড় মটকাতে পারে কি না।" কলাবতী বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুসি বসাল।

রাজশেখর উত্তেজিত হয়ে বললেন, "অবশ্যই যাবি। সিংহিরা ভূতপ্রেত দৈত্যদানোকে কোনওদিন ভয় করেনি, শুধু একবার মাত্র আমার বাবা সোমেন্দ্রশেখর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে পঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ক্রিকেট ম্যাচে ভয় পেয়েছিলেন মহম্মদ নিসারকে ফেস করতে গিয়ে। বলেছিলেন, বল হাতে যখন ছুটে আসছিল তখন ওকে দেখে হাঁটু দুটো একটু কেঁপে উঠেছিল। ব্যস, সারা সিংহি বংশের হিস্ট্রিতে ওই একটাই ভয় পাওয়ার কেস পাওয়া গেছে। ভূতেরা কি নিসার, লারউডের থেকেও ভয়ংকর?... নিশ্চয়ই যাবি।"

"কিন্তু দাদু," গলাখাঁকারি দিয়ে সুশি এবার বলল, "এটা কিন্তু খুব ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপার হয়ে যাবে। বোলতার লোকেরা দেড়শো-আড়াইশো বছর ধরে, মানে বর্গির আমল থেকে বিশ্বাস করে আসছে ওই মাঠে অপদেবতা বাস করে। শুধু শুধু কি আর বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই ভূতটুত তারা দেখেছে। না দাদু, কালুর ওখানে গিয়ে কাজ নেই, কিছু একটা হয়েটয়ে গেলে—"

'ওহ, তুমিও দেখছি এইট্টিস্থ সেঞ্চুরিতে পড়ে রয়েছ।" হতাশ স্বরে কথাটা বলে সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে রাজশেখর চোখ বুজলেন। সমীর ও চঞ্চলা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল। সমীর টেবিলে রাখা অ্যাটাচি কেসটা খুলল।

"যেজন্য আমরা এসেছি জ্যাঠামশাই।" সমীর কুণ্ঠিত স্বরে বলল।

"কী জন্য?" রাজশেখর চোখ খুললেন। সমীরের হাতে গহনার বাক্সটা দেখেই তাঁর ভ্রূ কুঁচকে উঠল, অথবা বলা যায় সিংহের কেশর ফুলে উঠল।

"এটা কী?" গর্জনই বলা যায়, রাজশেখরের প্রশ্নটিকে।

সমীর কিন্তু ঘাবড়াল না। শান্ত দৃঢ়স্বরে সে বলল, "এটা আমাদের বাচ্চুর জন্য আপনি পাঠাননি। ইচ্ছার নাতনিকে দিচ্ছেন বলে এই কাগজটায় লেখা রয়েছে। এ-জিনিস বাচ্চু নেবে না। ফেরত দেওয়ার জন্য আশা করব তার অপরাধ আপনি ক্ষমা করবেন।"

সারা ঘরে শব্দ নেই। সব চোখ রাজশেখরের মুখের দিকে। কঠিন মুখটি

ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল। দুই চোখে ফুটে উঠল কৌতুক মেশানো স্নেহ। ধীর স্বরে তিনি বললেন, "দুটো শর্তে নিতে পারি। ইচ্ছার নাতনিকে কিছু একটা দোব বলে মন স্থির করেছি, সেটা দোব বাচ্চুকে নিজের হাতে। ওকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসবে। দ্বিতীয় শর্ত, কালু বোলতায় যাবে। 'কিছু একটা হয়েটয়ে গেলে' এই ভয়ে সিংহিবাড়ির মেয়ে গর্তে লুকিয়ে থাকবে আমি বেঁচে থাকতে? তাই কখনও হয়।"

"দুটো শর্তই আমরা মানব।" এতক্ষণে কথা বলল চঞ্চলা।

কলাবতী দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল, তাকে জড়িয়ে ধরল সুশি।

"কালু, এবার এদের মিষ্টি-মুখ করানোর ব্যবস্থা কর, এই প্রথম এরা আমাদের বাড়িতে এসেছে।"

কলাবতী ভেতরে গিয়ে দাদুর নির্দেশ জানিয়ে এল মুরারিকে। কলাবতী কবে, কার সঙ্গে, কীভাবে বোলতায় যাবে রাজশেখর সেইসব বিষয় জেনে নিচ্ছিলেন আর দেশের বাড়ির খবরও।

"দেশের বাড়িতে থাকেন আমার কাকা। বিয়ে করেননি, একা মানুষ, বয়সে আপনার থেকে একটু ছোটই হবেন। আমরা ওঁকে ডাকনামেই ব্যাংকাকা বলে ডাকি।" সমীর জানাতে লাগল রাজশেখরকে তাদের দেশের বাড়ির কথা। "জমিজমা, চাষবাস, ফলের বাগান, মাছচাষ সবকিছুই দেখাশোনা, বিক্রিটিক্রি করা ব্যাংকাকাই করেন। দোতলা বাড়ি, সাত-আটখানা ঘর সবই ফাঁকা পড়ে আছে, বছরে এক-আধবার আমরা যাই। আমি তো দেড় বছর যাইনি, সুশি তো তবু গত বছর গেছল। ব্যাংকাকার খেলাধুলোয় খুব উৎসাহ। বোলতা স্পোর্টিং ক্লাব, বি এস সি-র আজীবন প্রেসিডেন্ট, টাকা দিয়ে ক্লাবটাকে উনিই চালান। আমরা কেউ গেলে উনি খুব খুশি হন।"

"ওই যে বললে একটা পোড়ো শিবমন্দির আছে, ওটা কবেকার?" রাজশেখর কৌতূহলভরে জানতে চাইলেন।

"লোকমুখে শুনেছি ওটা নাকি বর্গিদের প্রতিষ্ঠা করা।"

"তার মানে পলাশির যুদ্ধের পনেরো বছর আগে, নবাব আলিবর্দি খাঁ'র আমলে। নাগপুর থেকে মরাঠি বর্গিরা ঘোড়ায় চেপে আসত লুটপাট করতে, নিষ্ঠুরভাবে খুন করে আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দিয়েছিল বাংলাকে।" রাজশেখর বললেন, "ওদের রণহুংকার ছিল, 'হর হর মহাদেও'। শিবের ভক্ত ছিল ওরা।"

"ওদের আসার খবর পেলেই গ্রাম ছেড়ে মানুষ পালাত।" চঞ্চলা বলল,

"তখনই তো বাচ্চাদের ভয় দেখাতে ঘুমপাড়ানি ছড়াটা তৈরি হল, 'ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে।' এখন অবশ্য এই ছড়ায় বাচ্চারা আর ভয় পায় না।"

"কিন্তু ভূতের ভয় পায়। তবে শুধু আমাদের কেন সারা পৃথিবীর বাচ্চারা ভয় পায় আর সেজন্যই তো ভূতের গল্প শুনতে চায়।" সমীর বলল।

"কিন্তু বর্গিরা শিবমন্দিরটা তৈরি করেছিল, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?" রাজশেখর তাঁর সন্দেহটা জানালেন।

"আমি তো করি না।" সমীর বলল। "বর্গিরা তো লুটপাট করে চলে যেত। তাদের অত সময় কোথায় মিস্ত্রি খাটিয়ে ছ'-সাত মাস ধরে মন্দির তৈরি করার? তবু বোলতার লোকের ধারণা মন্দির নাকি বর্গিরা তৈরি করেছে। আর ভূত তৈরির গল্পটা শুনবেন?"

ট্রে-হাতে, আম, লিচু, তালশাঁস, সন্দেশ আর ঘোলের শরবত নিয়ে মুরারি ঘরে ঢুকল। রাজশেখর বললেন, "প্লেটগুলো খালি করতে করতে বলো তোমার ভূত তৈরির গল্প।"

সমীর কাঁটা দিয়ে এক টুকরো আম মুখে ভরে শুরু করল। "আমাদের এখনকার বাড়ি থেকে যাট-সত্তর গজ দূরে পুরনো বাড়িটা। পূর্বপুরুষরা একটা গড় তৈরি করেছিলেন। তাই লোকে বাড়িটাকে বলত গড়বাড়ি। জায়গাটার নামও হয়ে যায় গড়বাড়ি। এখন গড়বাড়ি একটা ধ্বংস্তূপ। এই গড়ের পাশেই একটা প্রকাণ্ড দিঘি খোঁড়া হয়। এখন সেটা বুজে বুজে আর আগের মতো নেই। দিঘিটাকে বলা হয় গড়ের দিঘি। জংলা আগাছায় ভরা এই দিঘির সংস্কার হয়নি, মাছ আছে কিন্তু প্রচুর। বছরে একবার মাছ বিক্রি করেন ব্যাংকাকা। এই দিঘির কিনারেই শিবমন্দির। মন্দিরটাকে জড়িয়ে আছে একটা অশ্বত্থ গাছ। দূর থেকে মনে হয় জটাজুট ভরা একটা বিশাল মাথা। মন্দিরের গা বেয়ে নেমেছে মোটা মোটা ঝুরি আর ডালপালা। কত যুগ যে পুজো হয় না তা বলতে পারব না, দেড়শো-দুশো বছর তো হবেই। শিবমন্দিরে যেতে হলে ওই ভূতের জমির ওপর দিয়ে যেতে হবে নয়তো দিঘির দিক দিয়ে নৌকোয় করে যেতে হবে। অতএব কেউ আর শিবমন্দিরের ধারেকাছে মাড়াত না, ফলে পুজোটুজো বন্ধ হয়ে যায় আপনা থেকেই।

"তখনকার দিনে ডাকাতের খুব ভয় ছিল। ডাকাতির হাত থেকে বাঁচার জন্য গড়বাড়ির নীচে একটা পাতালঘর তৈরি করা হয়েছিল। সেটা লম্বায় কতটা চওড়ায় কতটা তা আমরা জানি না, কেননা কেউই কোনওদিন সেই

পাতালঘরটা চোখে দেখিনি। মাটির নীচে ঘর, সেখানে যাওয়ার রাস্তা বা সিঁড়িটা কোথায় তাও আমরা জানি না। কেউ জানার চেষ্টাও কখনও করেনি। শুনেছিলাম আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট পাতালঘরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গড়ের মাঠের খানিকটা খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন। কিন্তু কাজটা শেষ হওয়ার আগেই তিনি বদলি হয়ে যান, কাজ আর এগোয়নি। খোঁড়াখুঁড়িতে দু'-চারখানা ছোট ছোট পাতলা ইট বেরিয়েছিল, তাতে দেবনাগরি অক্ষরে কারও নামের আদ্যক্ষর লেখা ছিল। আমি কেন আমার ঠাকুরদার বাবাও সে ইট চোখে দেখেনি।"

রাজশেখর সকলের খাওয়া দেখা আর সমীরের গল্প শোনা, দুটো কাজ একসঙ্গেই সারছিলেন। খালি প্লেটগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আর দুটো আম দিক।"

"না, না, আর না।" সমীর মাথা নাড়ল।

"সন্দেশ?"

সমীরের মাথা স্থির রইল এবার।

"মুরারি।" রাজশেখর হাঁক দিলেন। "বলো, তারপর।"

সমীর শুরু করল, 'তারপর বর্গিদের কথা। ধনী লোকেদের বাড়িতে তখন খুব ডাকাত পড়ত। ডাকাত আসছে শুনলেই টাকাকড়ি, গহনা, দামি জিনিসপত্তর নিয়ে একটা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে ওই লুকোনো পাতালঘরে বাড়ির সবাই আশ্রয় নিত। ডাকাতরা চলে গেলে বেরিয়ে আসত। সুড়ঙ্গপথটা যাতে ডাকাতরা আবিষ্কার করতে না পারে সেজন্য সেটা বাইরে থেকে বন্ধ করে তালাচাবি দিয়ে চাবিটা খুব বিশ্বাসভাজন কাউকে দিত। চাবি নিয়ে সেই লোকটি বাড়ির কাছাকাছি একটা ঝাঁকড়া গাছে উঠে লুকিয়ে বসে থাকত। ডাকাতদের আসা আর চলে যাওয়া দেখার পর লোকটা গাছ থেকে নেমে এসে চাবি দিয়ে তালা খুলে দিত।

"বোলতার দিকে বর্গিরা আসছে খবর পেয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি নিয়ে গড়বাড়ি থেকে সুড়ঙ্গপথে পাতালঘরে পালিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁদের একজন বিশ্বস্ত কাজের লোক সুড়ঙ্গের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে তালাচাবি দিয়ে দিঘির পাড়ে একটা পুরনো তেঁতুলগাছে উঠে লুকিয়ে বসে থাকে। এদিকে বর্গিরা ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির। গ্রামের লোকজন যার যা কিছু সম্বল ছিল তাই নিয়ে আগেই পালিয়েছে। বর্গিরা গড়বাড়িতে ঢুকে দেখল চারদিকে ভোঁ ভাঁ। গোয়ালে গোরু পর্যন্ত নেই, বড়

বড় সিন্দুকের ডালা খোলা, ভেতরে সোনার একটা দানাও নেই, অগত্যা তারা হতাশ হয়ে বোলতা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু দু'-চারজন বর্গি নাকি তখনও গড়বাড়ির আশেপাশের জঙ্গলে ঘুরছিল।

"যে বিশ্বস্ত কাজের লোক তেঁতুলগাছের মগডালে চড়ে বসে ছিল, সে যখন দেখল বর্গিরা চলে গেছে তখন সে গাছ থেকে নেমে গড়বাড়ির দিকে এগোল তালা খুলে দেওয়ার জন্য। যে বর্গিগুলো জঙ্গলে ঘুরছিল তাদের একজনের চোখে পড়ে যায় ওই চাকরটা। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও আর খবর বার করার জন্য অকথ্য মার। কিন্তু শত অত্যাচারেও বর্গিরা তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বার করতে পারল না। তখন প্রচণ্ড রাগে তারা তরোয়াল দিয়ে কাজের লোকটার মুণ্ডচ্ছেদ করে।"

সমীর জল খাওয়ার জন্য কথা বন্ধ করল। মুরারির নতুন করে আনা সন্দেশের প্লেট তখনও খালি হয়নি। একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে সমীর আবার শুরু করল। "এখানে দু'রকম গল্প বোলতায় চালু আছে। একটা হল, বর্গিরা কাজের লোকটাকে মেরে ফেলার পর তার শরীর তল্লাশ করে সুড়ঙ্গের চাবি পেয়ে যায়। এরপর খোঁজাখুঁজি করে সুড়ঙ্গের দরজাও বার করে ফেলে, তারপর অন্য বর্গিদের ডেকে এনে পাতালঘরে যারা লুকিয়ে ছিল তাদের কচুকাটা করে তাদের সর্বস্ব লুট করে চলে যায়। সেই মৃতরাই নাকি পরে ভূত হয়। আর একটা গল্প হল, সেই কাজের লোকটাকে খুন করে লাশটা ফেলে রেখে বর্গিরা নাকি চলে যায়। ওদিকে পাতালঘরে আশ্রয় নেওয়া লোকেরা তো আটকা পড়ে থাকে। চাবিটা তো লাশের পোশাকের মধ্যে। অবশেষে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে সেই লোকগুলো দরজা-বন্ধ পাতাল ঘরের মধ্যে একে একে মারা যায়। এরাই পরে ভূত হয়েছে।" সমীর হাসল। তার গল্প আর সন্দেশ দুটোই শেষ।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। প্রথম কথা বলল কলাবতী, "আচ্ছা দাদু, ভূতেরা কতদিন বাঁচে?"

"যতদিন মানুষের মনে ভয় থাকে ততদিন বাঁচে। তবে এই গড়বাড়ির পাতালঘরের ভূতেদের আড়াইশো বছর বেঁচে থাকার কোনও যুক্তি নেই। আছে কি?" রাজশেখর তাকালেন সমীরের দিকে।

"আছে, কেননা বোলতায় ভয়টাও বেঁচে আছে। ওখানকার লোকের ধারণা ওই গড়বাড়ির জমিতে বাড়ি তৈরি করে বাস করলে তার সর্বনাশ হবে। ওখানে অপদেবতারা বাস করে। আমার ঠাকুরদার আমলে একজন

প্রচলিত প্রবাদ অগ্রাহ্য করে বাড়ি করেছিল। গৃহপ্রবেশের দিন পরিবারের কর্তা কলেরায় মারা যায়, তারা বাড়ি বিক্রি করে দেয়। যিনি কেনেন তাঁর একমাত্র ছেলে বাড়িতে বাস করার তিনদিনের মধ্যে গড়ের দিঘিতে ডুবে মারা যায়। তাঁরাও বাড়ি বিক্রি করে দেন। যারা কিনল তাদের কেউ মরেনি তবে তিনদিনের মাথায়ই বাড়িতে আগুন লেগে তারা সর্বস্বান্ত হয়। ব্যস, বোলতায় আরও পাকাপোক্ত হয়ে গেল ভূতের ভয়। একজন পাঁচ কাঠা জমি কিনেছিল, এরপর আর বাড়ি করেনি।"

"যে বাড়িটা হয়েছিল, সেটা এখনও আছে?" কলাবতী জানতে চাইল।

"নেই। পুড়ে একদম ছাই হয়ে গেছে।" সমীর উঠে দাঁড়াল। "এবার আমরা আসি জ্যাঠামশাই। পরশু শনিবার সুশি বোলতা যাবে। ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। হাওড়া স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে এক ঘণ্টা, তারপর পনেরো মিনিট বাসে, তারপর সাইকেল রিকশায় একাই চলে যাবে। গত বছর তো তাই গেছল। এবার তো সঙ্গে কলাবতী থাকবে। ব্যাংকাকা খুব খুশি হবেন।"

"সুশি তা হলে শনিবার আমাদের বাড়ি চলে আয়, খেয়েদেয়ে দু'জনে একসঙ্গে স্টেশনে যাব।" কলাবতী ঘরের দরজার দিকে এগোল ওদের সঙ্গে। "উফফ, কতদিন যে ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়িনি।"

সেইদিন রাতে কলকাতায় হঠাৎই দমকা ঝড় উঠল মিনিটদশেকের জন্য। ঘনঘন মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে শুরু হল বৃষ্টি। আধঘণ্টা পর সব শান্ত। তারপর ফোন এল স্কুলের বড়দি মলয়া মুখার্জির কাছ থেকে। মলয়া প্রায়ই রাতে কলাবতীকে ফোন করে ওর খবর নেয়। ওদের মধ্যে এইভাবে কথা হল:

"কালু, বৃষ্টিতে ভেজোনি তো?"

"না বড়দি, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুধু চাঁপাগাছটা দুলে দুলে কীভাবে ভিজছে তাই দেখছিলুম।"

"ঠান্ডা পড়েছে, পাখা আজ বন্ধ রাখবে।"

"রাখব।"

"দাদুর পা কেমন? এখন তিনি কোথায়?"

"ভাল আছে। দাদু লাইব্রেরিতে ভূতেদের নিয়ে এক সাহেবের লেখা বই পড়ছে।"

"হঠাৎ ভূতেদের নিয়ে লেখা বই পড়ছেন?"

"আমি সুশির সঙ্গে মানে আমাদের ক্লাসের সুস্মিতার সঙ্গে ওদের গ্রামের

বাড়ি বোলতায় যাব ভূত দেখতে, সামনের শনিবার। তাই দাদু জানতে চাইছে ভূত কোথায় থাকে বেলগাছে না শ্যাওড়া গাছে না হানাবাড়িতে না মানুষের মনে।"

"সাহেবের বইয়ে বেলগাছ শ্যাওড়াগাছ থাকবে কী করে? ওরা কি এসব গাছ চোখে দেখেছে? বোলতাটা কোথায়?"

"আমাদের আটঘরা মানে আপনাদের বকদিঘিরও কাছাকাছি বোলতা জায়গাটা। হরিদাদু নিশ্চয়ই জানেন। বোলতার লোকেরা ভীষণ ভয় পায় সুশিদের পোড়ো গড়বাড়ি আর গড়ের মাঠটাকে। বর্গিরা সুশিদের পূর্বপুরুষের অনেককে খুন করেছিল, তারাই নাকি ভূত হয়ে রয়েছে।"

"বর্গিরা খুবই অত্যাচার করেছিল, বিশেষ করে আমাদের হুগলি জেলায়। তুমি তো জানো না, রঘুজি ভোঁসলের ছেলে জানাজির সর্দারিতে ওরা শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত এসে পড়েছিল। গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতা অ্যাটাক করতে পারে এই ভয়ে সতেরোশো বিয়াল্লিশে ইংরেজরা বাগবাজার থেকে আদি কলকাতার পূর্বদিক ঘিরে গর্ত খোঁড়ে গোবিন্দপুর পর্যন্ত। তাকে বলা হত মারহাট্টা ডিচ। এখন অবশ্য এই ডিচটা নেই। বছর চল্লিশ পরেই এটা বুজিয়ে ফেলে একটা রাস্তা তৈরি করা হয়। ওই রাস্তাটার নাম কী বলো তো?"

"সার্কুলার রোড। এখন তার দুটো নাম, দুই আচার্য— প্রফুল্লচন্দ্র আর জগদীশচন্দ্রের নামে। দাদু বলেছে বহু লোক ভুল করে বাগবাজার থেকে উলটোডাঙা মানিকতলা বেলেঘাটা যে খালটা তাকে মারহাট্টা ডিচ বলে।"

"বোলতায় কিন্তু বেলগাছ কি শ্যাওড়াগাছের দিকে একদম যাবে না, শুধু দূর থেকে দেখবে। আমার একটা বায়নাকুলার আছে সেটা নিয়ে যেতে পারো ভূত দেখতে সুবিধে হবে।"

"বড়দি, আপনি তিন বছর বিলেতে থেকে ডক্টরেট করে এলেন। আর কিনা ভূতে বিশ্বাস করেন?"

"কে বললে করি? ভূতটূত ওসব মনগড়া ব্যাপার। তবে কিনা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বিশ্বাস করে আসছে তাকে চট করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, ভাল কথা আমার বায়নাকুলারটা বোধহয় তোমাদের বাড়ির কারও কাছে আছে।"

"হ্যাঁ, কাকার কাছে। ভাবছি কাকার ক্যামেরাটাও নিয়ে যাব, ভূতের ছবি তুলে রাখব। আর আমার টেপ রেকর্ডারটাও নেব ভূতের গলার স্বর যদি—"

"আহা-হা, আবার ক্যামেরা-টেপ রেকর্ডার কেন? কাছে যাওয়ার মতো কোনও ব্যাপারেই থাকবে না। ভূতেরা আধুনিক যন্তরপাতি একদমই পছন্দ করে না। তুমি খুব স্মার্ট পোশাক সঙ্গে নেবে মানে শাড়িটাড়ি নয়, দৌড়ে যাতে পালাতে সুবিধে হয় এমন কিছু সবসময় পরে থাকবে— বারমুডা, জিন্‌স, সালোয়ার কামিজ, তুমি তো এসব পরোই, তবে গ্রামের লোক পছন্দ নাও করতে পারে। ভূতেদের পা খুব লম্বা হয় মনে রেখো, তাড়া করলে পালাতে পারবে তো?"

"মনে হয় পারব। স্কুলের স্পোর্টসে একশো, দুশো, চারশো মিটার দৌড়ে তো ফার্স্ট হয়েছি বরাবর।"

"আর শোনো, সুশির উপস্থিত বুদ্ধিটা খুব ভাল, ওকে সবসময় কাছে কাছে রাখবে। মনে আছে তো স্কুলের স্পোর্টসে ও তোমাকে কীভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছিল!"

"মনে আছে। এই সেদিন বিয়েবাড়িতে ওর উপস্থিত বুদ্ধির আর একটা প্রমাণ পেলুম। ও না বাঁচালে আমি আর কাকা খুব লজ্জায় পড়ে যেতুম। পরে সব বলব কী ঘটেছিল। এখন ফোন রাখছি, খাওয়ার ডাক পড়েছে।

"পাখা বন্ধ রাখবে।"

"রাখব।"

"বেলগাছ দূর থেকে দেখবে। মনে রেখো ভূতেদের পা খুব লম্বা হয়।"

সুশি সম্পর্কে মলয়া যে উপস্থিত বুদ্ধির কথা বলল, সেটা অনেকেই জানে। তবু মনে করিয়ে দিচ্ছি। স্কুলের বার্ষিক স্পোর্টসে 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' প্রতিযোগিতায় কলাবতী সেজেছিল গুন্ডা। সে এমন মেকআপ নিয়েছিল যে, উপস্থিত সব শিক্ষিকা, অভিভাবক আর ছাত্রীরা, প্রায় দুশো লোক, কেউ বুঝতেই পারেনি হলদে কাপড়ের টুপি মাথায়, কালো কাচের চশমা চোখে, ফুলহাতা লাল জামা আর জিন্‌স পরা ছিপছিপে চেহারার, থুতনিতে হালকা দাড়ি, হাতে একটা ছ'ইঞ্চি ফলার ছুরি নিয়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে যে গুন্ডাটা আসলে সে কলাবতী। হেডমিস্ট্রেস অর্থাৎ বড়দি মলয়া মুখার্জি যখন নিরুপায় হয়ে মাইক্রোফোনে চিৎকার করলেন 'হেল্‌প হেল্‌প, পুলিশ, পুলিশ, বাঁচান আমাদের বাঁচান।' তখন উপস্থিত কিছু পুরুষ গুন্ডাটাকে ধরার জন্য এগোতে থাকে। কলাবতী বিপদ বুঝে পালাবার জন্য এধার-ওধার যখন তাকাচ্ছে তখনই সুশি 'আঁ আঁ আঁ' শব্দ করে চোখ উলটে মূর্ছা যায়। সবার নজর কলাবতীর থেকে ঘুরে গেল সুশির দিকে আর সেই ফাঁকে কলাবতী

ছুটে মাঠ থেকে পালায়। গো অ্যাজ ইউ লাইকের প্রথম পুরস্কারটা অবশ্য সে-ই পেয়েছিল।

কাঁকড়গাছির মোড় থেকে বাসে উঠেই সুশি বলল, "এই মুহূর্ত থেকে বোলতা হয়ে কাঁকুড়গাছির বাড়িতে ঢোকা পর্যন্ত সব খরচ আমার। তুই আমার অতিথি, একদম পকেটে হাত ঢোকাবি না।"

কলাবতী বলল, "কিন্তু ট্রেনে ঝালমুড়ি, বাদাম, শশা—"

"সব আমার।"

দু'জনেরই কাঁধ থেকে ঝুলছে মোটা কাপড়ের অ্যাডিডাসের ক্যারিব্যাগ। বড়দি যেসব পোশাক নিতে বলেছে কলাবতী সেগুলো নিয়েছে। মাত্র ক'টা দিন তো থাকবে তাও গ্রামের মতো জায়গায়, বিয়েবাড়িতে তো আর যাচ্ছে না। পুজোটুজোও এখন নেই। ক্রিকেট খেলার জন্য ভারতের কয়েকটা শহর সে ঘুরে এসেছে। তার ধারণা আছে কোথায় কী পোশাক নিয়ে যেতে হবে। তার ব্যাগে আছে টেপ রেকর্ডার আর গানের ক্যাসেট। বায়নাকুলার বা ক্যামেরা নেয়নি। ঘুরে বেড়াবার জন্য কাপড়ের পাম্পশুটা নেব নেব করেও তার বদলে হাওয়াই চপ্পল নিল।

এগারোটা তেত্রিশের ট্রেনে উঠে বারো-তেরোটা স্টেশন ছুঁয়ে পৌনে একটায় তারা ট্রেন থেকে নামল, মাত্র পনেরো মিনিট লেট করেছে তারকেশ্বর লোকাল। ভিড় ছিল না, বসেই এসেছে সারা পথ এবং দু'জন ঝালমুড়িওলাকে সমৃদ্ধ করেছে আট টাকায়, শসাওলাকে দু'টাকায়, বাদামওলাকে দু'টাকায়, কলাবতী এক সফ্‌ট ড্রিঙ্কসওলাকে ডাকতে যাচ্ছিল সুশি বাধা দেয়, "খবরদার খাবি না, ট্রেনে সব নকল জিনিস, খেলেই কিন্তু জন্ডিস।"

ওরা যে যাচ্ছে ব্যাংকাকাকে সেটা অবশ্য গতকাল জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুশিদের দেশের বাড়ির কাজের লোক জনার্দন, যাকে ওরা জনাদা বলে, তার হাত দিয়ে ব্যাংকাকা গোটা কুড়ি ল্যাংড়া আম আর শ'খানেক লিচুর সঙ্গে একটা থলিতে বেঁধে এক বিঘত লম্বা দশটা কইমাছ আর প্রায় এক কেজি বাড়িতে তৈরি গাওয়া ঘি পাঠিয়ে দেন। কালই জনাদা ফিরে গেছে বোলতায়, সঙ্গে চিঠি নিয়ে। মুখেও অবশ্য তাকে বলে দেওয়া যেত কিন্তু জনাদার শ্রবণশক্তি কিছুটা গোলমেলে। তাকে বলা হয়েছিল, দু'কেজি মতো

কই পেলে ব্যাংকাকা যেন পাঠিয়ে দেয়। তিনদিন পর ব্যাংকাকা দু'কেজি খই পাঠিয়ে দেন, সঙ্গে একটা চিঠি— 'হঠাৎ খইয়ের দরকার হল কেন, কলকাতাতে কি খইয়ের আকাল পড়েছে?' অতঃপর চিঠি দিয়ে ভুলটা ধরিয়ে দিতে দশটা কইমাছের সঙ্গে আম, লিচু আর ঘি তিনি পাঠিয়ে দেন।

ট্রেনের পর বাসে দশ মিনিট গিয়ে নামল ইকড়ি নামে একটা জায়গায়। সুশি বলল, "এখানে সুবল সামন্তর দোকানের মাথা সন্দেশ খুব ফেমাস, খাবি?"

কলাবতী সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বাসস্টপের কাছেই দোকানটা। ওরা দুশো গ্রাম করে সন্দেশ দোকানের বেঞ্চে বসে খেল। খেতে খেতে কলাবতী বলল, "এখানে ঘড়ির দোকান আছে? আমার ব্যান্ডটা ছিঁড়ব ছিঁড়ব হয়েছে, বদলাতে হবে।"

"আমাদের বোলতায় ঘড়ি, ট্রানজিস্টর, টিভি সবকিছু সারানোর দোকান আছে, ওখানেই পেয়ে যাবি।"

এরপর ওরা সাইকেল রিকশায় রওনা দিল বোলতার উদ্দেশে। যেতে যেতে যা কিছু চোখে পড়ছে অবাক হয়ে যাচ্ছে কলাবতী। বিশাল একটা বাঁশবন দেখে সে বলল, "সুশি, এখানে বাঘ থাকে?"

"বাঘেদের তো মাথা খারাপ হয়নি। এখানকার লোক পিটিয়ে কিমা করে দেবে।"

"ওটা কী গাছ রে?"

"ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখ, কী ঝুলছে গাছে?"

"ওম্মা, তাই তো কত্ত কালোজাম!"

"আমাদের বাগানেও আছে, কত খেতে পারিস দেখব।"

রাস্তাটা দু'পাশের জমি থেকে উঁচু। একটা নিচু পাঁচিল দেওয়া পুরনো বাড়ির সিমেন্ট বাঁধানো লম্বা দাওয়ায়, রৌদ্রের মধ্যে ছাতা মাথায় এক বৃদ্ধা বসে কৌতূহলে তাকিয়ে দেখছিলেন কারা সাইকেল রিকশায় চড়ে যাচ্ছে।

"সুশি, সুশি, দেখেছিস!" বৃদ্ধার দিকে আঙুল তুলল কলাবতী।

সুশি তাকাল। তার চোখ পড়ল বৃদ্ধা ছাড়াও আরও কিছুতে।

"এই রিকশাওলা, থামাও, থামাও।" সুশি চেঁচিয়ে উঠতেই রিকশাওলা ব্রেক কষল। লাফ দিয়ে নামতে নামতে সুশি বলল, "একটু দাঁড়াও, আসছি।"

বাড়ির সদর দরজাটা খোলা। কলাবতী দেখল সুশি দৌড়ে ঢুকল। বৃদ্ধার কাছে গিয়ে প্রণাম করে কী যেন বলল। বৃদ্ধার মুখ ভরে গেল হাসিতে।

দু'জনে কী যেন কথা হল। আঙুল দিয়ে বৃদ্ধা পাঁচিলের ধারের কলাগাছটা দেখালেন, সুশি ছুটে গিয়ে কলাপাতা ছিঁড়ে আনল। বৃদ্ধার সামনে ঢাকনা খোলা চারটে আচারের বোয়েম। তিনি তাই থেকে আচার তুলে তুলে কলাপাতায় রাখলেন। সুশি আঙুল দিয়ে রিকশায় বসা কলাবতীকে দেখাল। বৃদ্ধা আর একটু আচার দিলেন। সুশি তারপর গদগদ মুখে কী যেন বলতে বৃদ্ধার মুখ স্নেহের, সুখের হাসিতে ভরে গেল।

"নে, ধর।" রিকশায় ওঠার আগে সুশি কলাপাতাটা কলাবতীর হাতে ধরিয়ে দিল। "চলো গো এবার।"

"টক, মিষ্টি, ঝাল সবরকমের; আমের, তেঁতুলের আর করচমার। একটু একটু করে বুড়ি দিল। লেবুরও ছিল, আমি আর চাইনি।" সুশি তেলচুপচুপে মশলামাখা আমের টুকরো মুখে দিয়ে বলল।

"তোর চেনা?"

"দূর, চেনা হতে যাবে কেন? স্রেফ গিয়ে বললুম, ঠাকমা কলকাতা থেকে আসছি তোমার হাতের আচার খাব বলে, দাও। না দিলে এখানে বসে কাঁদতে শুরু করব। বুড়ির সে কী হাসি! জিজ্ঞেস করল, কাদের বাড়ির মেয়ে তুই? বললুম। বলল, ব্যাঙের ভাইঝি? বাবার নাম কী? বললুম। বলল, ট্যাংরার মেয়ে তুই? তারপর কলাপাতা ছিঁড়ে আনতে বলল। আসার সময় বলল, ক'দিন আগে এলি না কেন, কামরাঙার আচারটা খাওয়াতে পারতুম। খেতে কেমন লাগছে রে কালু?"

"জবাব নেই। তোদের বাড়িতে ব্যাং আর ট্যাংরা ছাড়া আর কী আছে?"

"জ্যাঠামশাইয়ের ওজন ছিল তিনমন, নাম ফড়িং।"

"এইসব বুড়িরা এখনও আছে বলেই নাতনিরা চিরকাল নাতনিই থেকে যায়।"

গল্প করতে করতে ওরা বোলতার ফুটবল মাঠের ধার দিয়ে, বি এস সি-র ক্লাবঘরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন একটা শিকড়সমেত উপড়ে পড়া নিমগাছ দেখে কলাবতী বলল, "এখানেও খুব ঝড় হয়ে গেছে দেখছি।"

কথাটা শুনে রিকশাওলা প্যাডেল করতে করতেই বলল, "শুধু ঝড় নয় দিদিমণি, চার-পাঁচটা বাজও পড়েছে। আপনারা যে বাড়িতে যাচ্ছেন সেখানকার ভাঙা শিবমন্দিরে দু'-দুটো বাজ পড়েছে। ইকড়ির বাসস্টপের কাছে দুটো লোক গাছতলায় বাজে মরেছে। সে যে কী অবস্থা, সারা জেলাটা তছনছ করে দিল বৃষ্টি আর বাজ।"

সুশি ভয়ে ভয়ে বলল, "আর বাজ পড়বে না তো?"

কলাবতী বলল, "আচ্ছা, ভূতেরা কি বাজকে ভয় করে?"

ব্যাংকাকা দোতলার বারান্দা থেকে ওদের আসতে দেখে নীচে নেমে এসে বাইরের উঁচু দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। শীর্ণকায়, কাঁচাপাকা চুল কদমছাঁট, গায়ে হাফহাতা পাঞ্জাবি, পায়ে কাপড়ের পাম্পশু, ধুতি মালকোঁচা করা, চাহনিতে কৌতূহল। ওরা প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "ভাত খাবি তো? রান্না করাই আছে। আমি একটু বেরোচ্ছি। ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে, ঝড়ে গোলপোস্ট পড়ে গেছে, পরশু আবার সেমিফাইনাল খেলা। শেতলের মা রইল, যা দরকার ওকে বলবি। কালু কোনওরকম লজ্জা করবে না, নিজের বাড়ি মনে করবে।" এই বলে ব্যাংকাকা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন।

দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরটায় ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। বিরাট একটা সেকেলে পালঙ্ক, তাতে অন্তত চারজন বয়স্ক লোক পাশাপাশি শুতে পারে। মোটা মোটা দুটো পাশ বালিশ আর বালিশ। এক বিঘত চওড়া গদিতে ধবধবে সাদা চাদর পাতা। লাল সিমেন্টের মেঝেটা দেখলেই বোঝা যায় নিয়মিত মোছা হয়। সিলিং-এ পাখা ঝুলছে। চারটে জানলাই বেশ বড়, খড়খড়ির পাল্লা দেওয়া। এইরকম ঘর কলাবতীদের আটঘরার বাড়িতেও আছে।

ঘরের বাইরেই রেলিং দেওয়া টানা বারান্দায় এসে সে দাঁড়াল। সেখান থেকে পশ্চিমে গড়ের দিঘির অনেকটাই দেখা যায়। দিঘির পাড়ের কাছে নলবন আর জলাঘাসে ভরা। মাঝখানটায় কিন্তু পরিষ্কার টলটলে জল। দিঘির অপর পাড়ে কয়েকটা মাটির বাড়ি। তার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ট্রেকার চলছে। রাস্তাটা দিঘিকে বেড় দিয়ে বোলতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে তারকেশ্বরের দিকে। লোকে এর নাম দিয়েছে 'বাবার সড়ক'।

বাড়ি থেকে একটা সরু পথ গেছে ভাঙাচোরা বাঁধানো ঘাটে। সেখানে একটা ছোট্ট নৌকো বাঁধা, তার আকৃতিটা ত্রিভুজের মতো। দুটো দাঁড় নৌকোর দু'ধারে লোহার কড়ায় আঁটা। দু'জন লোক পাশাপাশি বসে দাঁড় বাইতে পারে এমন একটা পাটাতন নৌকোয় পাতা।

কলাবতী সুশিকে ডেকে বলল, "নৌকোটা কাদের রে, তোদের?"

'হ্যাঁ, দাদার জন্য ব্যাংকাকা ওটা তৈরি করে দেন। দাদা ছুটিছাটায় এসে দিঘিতে ঘুরে বেড়াত। এখন আর চড়ার লোক নেই, পড়েই থাকে।"

"চল, আমরা নৌকোয় চড়ে ঘুরব।"

"আজ নয়, কাল সকালে। চান করবি তো নীচে চল, যা ভ্যাপসা গরম, টিউবওয়েল থেকে জল তুলে রেখেছে শেতলের মা। দেখবি কী ঠান্ডা জল।"

"তোদের শিবমন্দিরটা কোনদিকে?"

"বারান্দার পুবে গেলে দেখতে পাবি। তুই দ্যাখ, আমি চান করতে যাচ্ছি।"

কলাবতী বারান্দার পূর্ব দিকে গেল। ব্যাংকাকা থাকেন এইদিকের ঘরটায়। ঘরের দরজায় শিকল তোলা। গড়বাড়িটা একটু দূরে। দোতলা বলে কিছু নেই। একতলায় খাড়া রয়েছে মোটা মোটা কয়েকটা ভাঙা দেওয়াল। দরজা-জানলার জায়গাগুলো ফাঁকা। বাড়িটা আগাছায় ভরা, ভাঙা ইট ছড়িয়ে রয়েছে। দেওয়ালগুলোর পেছনেই শিবমন্দির। সেটিও ভাঙা, তবে বোঝা যাচ্ছে না যেহেতু অশ্বত্থ গাছে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো বলে। রিকশাওলা বলেছিল দুটো বাজ এর ওপর পড়েছে। কলাবতী দূর থেকে খুঁজল কিন্তু বাজ পড়ার কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না। তার মনে হল মন্দিরের পেছন দিকে সম্ভবত বাজ পড়েছে, তাই সে পোড়া বা ভাঙা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কাল সকালে দেখতে হবে।

ওদের খিদে ছিল না। শেতলের মা কয়েকটা আম কেটে দিল।

"চল সুশি, একটু ঘুরে দেখি তোদের বোলতা, সেইসঙ্গে ঘড়ির দোকানটাও।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকে জংলা পোড়ো মাঠটাকে দেখিয়ে সুশি বলল, "এই হল সেই গড়ের মাঠ আর ওই তোর শিবমন্দির। ভূতেদের ছেলেমেয়েরা ওখানে কানামাছি খেলে।"

"পাতালঘরটা কোথায় বল তো?"

"লোকে তো বলে শিবমন্দিরের তলায়।"

"চল না শিবমন্দিরটা একটু দেখে আসি।"

সুশি শিউরে উঠে বলল, "আজ শনিবার, ভূতেদের ডিস্টার্ব করতে নেই। আজ ওদের শনিপুজোর দিন।" খিলখিল করে সে হেসে উঠল। "আজ ভূতটুত থাক, কাল সকালে দেখা যাবে!"

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে বোলতা বাজার এলাকায় এল। সেখানে শিবমন্দির, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, অডিয়ো ক্যাসেটের দোকানের সামনে ঘড়ি-সারাইয়ের দোকান। দোকানটা বন্ধ। দোকানের পাশে একটা বটগাছের গায়ে টিনের

সাইনবোর্ডে লেখা, 'যে-কোনও মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করিয়া থাকি।' তার নীচের আর একটা টিনে, 'টিউকলের অভিজ্ঞ মিস্ত্রি পাওয়া যায়।' ওরা ফেরার পথে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টা ঘুরে ফুটবল মাঠের দিকে গেল। মাঠে ব্যাংকাকা দাঁড়িয়ে দু'জন লোক দিয়ে গোলপোস্ট খাড়া করার কাজে ব্যস্ত। চার-পাঁচজন ছেলে আর এক প্রৌঢ় তার পাশে।

"কাকা, এখানে কী টুর্নামেন্ট হচ্ছে?" সুশি জানতে চাইল।

"বংশীবদন চ্যালেঞ্জ শিল্ড আর প্রিয়বালা চ্যালেঞ্জ কাপ, জেলার একটা টপ টুর্নামেন্ট, চল্লিশ বছর ধরে চলছে। কত ফুটবলার এখান থেকে বেরিয়েছে জানিস। ভোঁদা মিত্তির ইন্ডিয়ার গোলকিপার খেলেছে সে তো রসবেড়িয়ার ছেলে, এই মাঠ থেকে উঠে ইস্টবেঙ্গলে খেলেছে। কালো দত্ত, শৈলেন মান্নার পর অমন একটা ব্যাক আর মোহনবাগানে খেলেনি, সে তো পাশের ইকড়ি গ্রামের রাসু দত্তর নাতি।"

"শৈলেন মান্নার পর কালো দত্ত ছাড়া আর কেউ খেলেনি বলছেন কেন?" কলাবতী নিচু স্বরে প্রতিবাদ জানাল, "জার্নেল সিং? সুব্রত ভট্চায?"

প্রৌঢ়টির চোখদুটিতে অবাক চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি ব্যাংকাকাকে বললেন, "মেয়েটি দেখছি খেলার খবর ভালই রাখে।"

"রাখবে না? আটঘরার রাজশেখর সিংহির নাতনি যে!"

"অ অ, তাই বলো। তা এখানে এয়েচে কী জন্যে, বেড়াতে?"

জবাব দিল সুশি। "বেড়াতে আর ভূত দেখতে। গড়ের মাঠের ভূত।"

প্রৌঢ়র চোখে আবার বিস্ময়। "বলে কী। খবরদার ওই কাজটি কত্তে যেয়ো না। কলকাতায় থাকো তো, তাই ভূত জিনিস জানো না। ওই শিবমন্দিরের পাশে বেলগাছে সাদা কাপড় পরে ওঁরা বসে থাকেন। খড়ম খটখটিয়ে হেঁটে বেড়ান গড়ের মাঠে।"

কলাবতী বলল, "আপনি দেখেছেন?"

"পাগল নাকি! আমি কেন দেখতে যাব। ওঁদের দেখলে কি আর আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতুম। কবে ওখানে চলে যেতুম।" আঙুলটা তুলে তিনি আকাশের দিকে খোঁচালেন। "দুলেপাড়ার খ্যাঁদা দেখেছিল, ওঁরা মড়ার খুলি দিয়ে অমাবস্যার রাতে ফুটবল খেলছেন। তেরাত্তির পোয়াল না, বেচারার লাশ ভাসতে দেখা গেল পুকুরে। ওঁদের দেখতে নেই বুঝলে খুকিরা, ব্যাং, বারণ করো ওদের। বেড়াতে এসে কি বেঘোরে প্রাণটা দেবে?"

"নিশ্চয় বারণ করব ভূদেবদা। এই ছেলেমানুষদের কথা কি শুনলে

চলে?" বলেই ব্যাংকাকা "হয়নি, হয়নি" বলে ছুটে গেলেন গোলপোস্টের দিকে। একদিকের পোস্ট ইঞ্চিচারেক নেমে গেছে পোঁতার দোষে।

ভূদেব একটি ছেলেকে ডাকলেন, "হ্যাঁরে রতন, বিদ্যুৎপুরের টিমে কলকাতার ক'টা ছেলে খেলেছিল?"

"তিনটে। সবাই সুপার ডিভিশনের।"

"হুম্‌ম। সেমিফাইনালের গাঁটটা দেখছি বি এস সি-র আর পেরোনো হল না। ব্যাঙের এই এক গোঁ, হায়ার করে প্লেয়ার আনব না। আরে বাপু, সব টিমই কলকাতার প্লেয়ার আনে, ড্যাংডেঙিয়ে তারা শিল্ড নিয়ে গেছে আর আমরা ওই সেমিফাইনাল পর্যন্ত। বি. এস. সি. লাস্ট কবে শিল্ড জিতেছে?"

"কী জানি জ্যাঠামশাই, আমরা তো কখনও জিততে দেখিনি। বলুন না ব্যাংজ্যাঠাকে হাতটা একটু উপুড় করতে। সেমিফাইনাল আর ফাইনাল, দুটো ম্যাচে খেলে দেবে; জনাতিনেক হলেই হবে, গোলকিপার, স্টপার আর একটা স্ট্রাইকার। হাজার দশেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

আর একটি ছেলে বলল, "অত নীতিবাগীশ হলে কি টুর্নামেন্ট জেতা যায়? ঘরের ছেলে ছাড়া খেলাব না বললে কি চলে? মোহনবাগান কী করল? সেই তো ফরেন প্লেয়ার খেলাতে হল!"

"আমি বললে ব্যাং শুনবে না। ভূতের জমিতে কলেজ করা চলবে না বলার পর থেকে আমার ওপর চটে আছে। যদি বলি পঞ্চায়েত সমিতির আপত্তি নেই ভূতের জমিতে কলেজ করতে দিতে, তা হলে দশ কেন, বিশ হাজার বার করে দেবে। ওর কি টাকার অভাব!" ভূদেবের মুখ ব্যাজার, কণ্ঠে ক্ষোভ।

ভূত না থাকলে, ভূদেব মনে মনে ভেবে দেখলেন, জমিটা নিয়ে কোনও আপত্তিই উঠত না, তা হলে কলেজ করার যে স্বপ্ন বোলতাকে কেন্দ্র করে চারপাশের গ্রামের হাজার হাজার মানুষ দেখতে শুরু করেছিল সেই স্বপ্ন এতদিনে পূরণ হয়ে যেত। না হওয়ায় ভূতে অবিশ্বাসীরা তার বিরুদ্ধে চলে গেছে। তার এখন চিন্তা সামনের পঞ্চায়েত ভোটে তিনি প্রধানের পদটি রক্ষা করতে পারবেন কি না। অবশ্য ভূতে বিশ্বাসী ভোটারও কম নেই। তা হলেও— ভূতেরা না থাকলে জমিটা নিতে কারও কোনও আপত্তিই হত না, এতদিনে কলেজের শিলান্যাস হয়ে যেত, তাতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নামের নীচে মান্যবর ভূদেব খেটো নামটাও খোদাই করা থাকত, ভোটে তো জিততেনই, এমনকী ব্যাঙের হাতটাও উপুড় করিয়ে কলকাতা থেকে প্লেয়ার

আনিয়ে বংশীবদনকে বোলতায় রেখে দেওয়ার সাফল্যের ভাগিদার হতে পারতেন। এত কিছু হারাচ্ছেন শুধুই ভূতেদের জন্য। ভূদেব মনে মনে ভীষণ চটে উঠলেন ভূতেদের ওপর। হতভাগারা বিদায় হলে বাঁচা যায়।

ভূদেব যখন এইসব ভাবছেন তখন মাঠের পাশের রাস্তায় দুটো মোটরসাইকেল এসে থামল, দুটিতেই চালকের পেছনে একজন বসে। তাদের একজন বাইক থেকে নেমে ওদের দিকে এগিয়ে এল। বেঁটে, গাঁটাগোট্টা বছর কুড়ি-বাইশ বয়স। পরনে গোলগলা কালো স্পোর্টস শার্ট, জিন্‌স, পায়ে স্নিকার, বগলে যেন ফোড়া হয়েছে এমনভাবে হাত দুটি ফাঁক করে দুলে দুলে হেঁটে এসে ভূদেবকেই জিজ্ঞেস করল, "দাদু, স্বরাজ দাসের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?"

ছ'-সাতটি শব্দ মারফত কর্কশ উচ্চারণে ও বলার ভঙ্গিতে যুবকটি বুঝিয়ে দিল, সে অমার্জিত ও অশিক্ষিত। ভূদেব বিরক্ত স্বরে বললেন, "কে স্বরাজ দাস?"

"যে গতবছর ইউনিয়নে খেলেছে, ইন্ডিয়া জুনিয়ার টিমে খেলেছে। সরার তো আপনাদের এখানেই বাড়ি।"

তখন একটি ছেলে বলল, "তাকে আপনার কী দরকার?"

"দরকার আছে।" হিন্দি ফিল্মের খলনায়কদের মতো চোখ ও গলার স্বর হয়ে গেল যুবকটির। "জানো যদি বলো ওর বাড়িটা কোথায়।"

ছেলেটি বলল, "সরা-ফরা চিনি না। আপনি খুঁজে নিন।"

কালো শার্ট কয়েক সেকেন্ড মুখ কুঁচকে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "সরার বাড়ি কোথায় ঠিকই জানো তবে বলবে না। কেন?"

"জানি না, তাই বলতে পারব না।"

"বদু চলে আয়। বাড়ি খুঁজে নোব।" মোটরবাইকে বসা একজন চেঁচিয়ে বলল।

"জানো না, না?" নীচের ঠোঁট কামড়াল। একটা চোখ সরু হল। "ফেমাস হয়ে গেছে যে ফুটবলার তার বাড়ি কোথায় জানো না? ঠিক আছে। বাড়ি বার করে নিচ্ছি।" হাত ফাঁক করে দুলতে দুলতে ফিরে গিয়ে সে মোটরবাইকের পেছনে উঠল। বাইক দুটো গর্জন করে বাজারের দিকে চলে গেল।

"কী ব্যাপার বল তো ঘন্টু? সরার বাড়ি তো তুই চিনিস, ওকে বললি না কেন?" একজন বলল।

ভূদেব বললেন, "সরার ভাল নাম যে স্বরাজ, সেটাই আমি জানতুম না। ও তো দাসপাড়ার বিরাজ দাসের ছেলে। শুনেছি বটে উঠতি প্লেয়ারদের মধ্যে

খুব নাম করেছে।" তারপর চেঁচিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ব্যাং, সরা কি বোলতার মাঠ থেকে উঠেছে?"

"তা না হলে কোত্থেকে উঠবে!" অবাক স্বরে উত্তর এল।

কলাবতী আর সুশি সারাক্ষণ চুপ করে কথাবার্তা শুনছিল। কলাবতী এবার ঘণ্টু নামের ছেলেটিকে বলল, "আপনি স্বরাজ দাসের বাড়ি জানেন বলে মনে হল। কিন্তু সে-কথা লোকটাকে বললেন না কেন?"

"কারণ আছে।" বলেই ঘণ্টু ব্যস্তভাবে হনহন করে সেখান থেকে চলে গেল।

আর-একজন বলল, "ঘণ্টু হল সরার খুব বন্ধু। হয়তো কোনও ব্যাপার আছে তাই লোকটাকে বাড়ির হদিশ দিল না। তবে সরাকে এখানকার প্রায় কেউই চেনে না, ও তো গত আট বছর ধরে হাওড়ায় মামার বাড়িতে রয়েছে, মাঝে মাঝে এখানে আসে দু'-চারদিনের জন্য। খুবই গরিব ওরা। ঘণ্টু ছাড়া কারুর সঙ্গে মেশে না।"

ভূদেব বললেন, "লোকটার হাবভাব যেন কেমন কেমন ঠেকল। খারাপ মতলবে আসেনি তো?"

"হতে পারে। কাগ.. সেদিন দেখেছিলুম ট্রান্সফারের ব্যাপারে সরা নাকি ব্রাদার্স ইউনিয়ন আর শ্যামপুকুর দুটো ক্লাবের কাছ থেকেই অ্যাডভান্স নিয়েছে। হয়তো তাই নিয়ে গোলমাল পাকিয়েছে।" ছেলেটি আর দাঁড়াল না, তার সঙ্গে অন্য তিনজনও চলে গেল।

"আমিও যাই।" ভূদেব ব্যস্ত স্বরে বললেন, "দীক্ষা নিয়েছি হার্ট অ্যাটাকের পর, এখন সন্ধ্যাহ্নিকে বসতে হবে।"

সুশি বলল, "সন্ধে হতে তো এখনও অনেক দেরি।"

"কোথায় আর দেরি। দেখছ কেমন কালো হয়ে রয়েছে আকাশ। দুমদাম বাজ পড়তে পারে সেদিনকার মতো। খোলা মাঠে এখন থাকাটা ঠিক নয়, বাড়ি যাও।"

কলাবতী বলল, "ঠিক বলেছেন। শুধু বাজ কেন, গড়বাড়ির ভূতেরাও তো পাতালঘর থেকে উঠে আসতে পারে কি বেলগাছটা থেকে নেমে আসতে পারে!"

ভূদেব চোখ পিটপিটিয়ে কলাবতীর দিকে তাকালেন। "ভূতেদের আমি একদমই পছন্দ করি না, ওদের আমি ভয়ও পাই না। যাই, সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হয়ে গেল।"

তিনি আর দাঁড়ালেন না। ব্যাংকাকা এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। "আর যদি ঝড়টড় না হয় গোলপোস্ট দুটো মনে হয় দাঁড়িয়েই থাকবে। ভূদেবদা এমন করে চলে গেল যে?"

সুশি বলল, "উনি বললেন ভূতেদের ভয় করেন না।"

"করেন না? তা হলে গড়ের মাঠে কলেজ করায় বাধা দিচ্ছেন কেন? কী যে ছেলেমানুষি ভয় বুঝি না।"

কলাবতী বলল, "কাকা, ওঁর ভয়টা ভেঙে দেওয়া যায় না?"

"গা ছমছম করা এইসব প্রবাদ না ভাঙলে এদের ভূতে বিশ্বাস দূর হবে না।" ব্যাংকাকা মাথা নাড়লেন হতাশভাবে। "মোটরবাইকে কারা এসেছিল?"

সুশি বলল, "স্বরাজ বলে এক ফুটবলারের বাড়ি কোথায় জানতে চাইল।"

"স্বরাজ মানে সরা? ও তো ছোটবেলায় বি এস সি-তেই খেলত। ওই বয়সেই দারুণ ড্রিবল করত, দু'পায়ে শট ছিল দেখার মতো। শুনছি এখন নাকি খুব নাম করেছে। কত আর বয়েস, কুড়িটুড়ি হবে। সুশি তোরা তো এখন বাড়ি যাবি। আমার ঘরে টিভি আছে দেখতে পারিস। আমি একটু পরে ফিরব। পরশুর খেলার টিম নিয়ে একটু সমস্যায় পড়ে গেছি।"

বাড়ি ফেরার পথে মোটরবাইক দুটো ওদের পাশ দিয়ে ভটভট করে বেরিয়ে গেল। চারজন লোকের একজন বুড়ে আঙুল তুলে কলা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল ওরা যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে। কলাবতী বলল, "ওরা যাচ্ছে কোনদিকে বল তো? আমাদের বাড়ির দিকেই দেখছি গেল!"

সুশি বলল, "আমাদের বাড়ির কাছেই তো দাসপাড়া। বোধহয় সরাদের বাড়ির খোঁজ কোথাও থেকে পেয়ে গেছে তাই যাচ্ছে।"

"যাওয়ার কারণটা একদমই বোঝা গেল না। লোকটাকে কীরকম যেন মস্তান মস্তান বলে মনে হল। নিশ্চয় কোনও বদ মতলবে এসেছে।"

মেঘলা আকাশ। আলো পড়ে গেছে। বাড়িতে ঢোকার মুখে কলাবতী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গড়বাড়ির দিকে তাকিয়ে ম্লান আলোয় তার মনে হল ভাঙা দেওয়ালগুলো যেন প্রাচীন কোনও রহস্য আড়াল করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সত্যিই কি বর্গিরা পাতালপুরীতে লুকিয়ে-থাকা সুশির পূর্বপুরুষদের হত্যা

করেছিল? এত বছর পর তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। লোকের মুখে মুখে গল্প তৈরি হয়েছে তারা নাকি ভূত হয়ে পাতালঘরে বাস করছে।

তার ইচ্ছা করল শিবমন্দিরের দিকটা দেখে আসতে। সুশিকে সে বলল, "দূর থেকে শিবমন্দিরটা দেখব, তুই দাঁড়া এখানে।"

"দাঁড়াব কেন, আমিও যাব।"

দু'জনে এগিয়ে গেল গড়ের মাঠের দিকে। মাঠের কিনার ঘেঁষে বাবার সড়ক। একটি লোক সাইকেল চড়ে যেতে যেতে ওদের দেখে চেঁচিয়ে বলল, "হেই, মাঠে নেমো না, শনিবার আজ।"

"নামলে কী হয়েছে?" কলাবতীও চেঁচিয়ে জানতে চাইল।

"ওঁরা ভর করবেন, জানো না?"

লোকটি প্যাডেল করতে করতে চলে গেল। ওরা মাঠের আর-একটু ভেতরে এগোল। মন্দিরের একটা দিক দেখা যাচ্ছে। যেখানে একসময় দরজা ছিল সেই জায়গাটাকে কালো গুহার মতো দেখাচ্ছে। দেখলে গা-ছমছম করে ওঠে। তার চারদিক ঘিরে উঁচু চাতাল। মন্দিরের পেছনে সত্যিই একটা বেলগাছ। মন্দিরের ইটগুলো ক্ষয়া, জরাজীর্ণ। বাবার সড়ক থেকে গড়ের মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে মন্দিরের চাতালে পৌঁছোতে হলে দু'-তিন ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হবে, সেই সিঁড়িও ভেঙে গিয়ে একটা ঢিপির মতো হয়ে রয়েছে। অশ্বত্থগাছ থেকে বিশ্রী কর্কশ স্বরে একটা পাখি ডেকে উঠল।

"এইরকম ভাঙা শিবমন্দির বাংলার অনেক গ্রামেই পাবি। এমনকী কলকাতাতেও আছে।" সুশি বলল।

"কিন্তু তাতে কি ভূতপ্রেত বাস করে?"

"বাস করাটা নির্ভর করছে সেখানকার লোকেরা বিজ্ঞান মানে কিনা তার ওপর।"

"ফেরা যাক, কাল নৌকোয় চাপব," কলাবতী বলল।

"আমি মাছ ধরব। কাকার ছিপ আছে অনেকরকমের। আগেরবার এসে দিঘির ঘাটে বসে পুঁটি ধরেছি, একটা চারাপোনাও উঠেছিল।"

গল্প করতে করতে ওরা বাড়ি ফিরে এল। সেদিন ভোররাতে এক পশলা বৃষ্টি হল। কলাবতী নৌকোর বদলে বেছে নিল ছিপ। সে আর সুশি ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেল দিঘির ঘাটে। জনাদা জোগাড় করে দিয়েছে টোপের জন্য লাল পিঁপড়ের ডিম, শেতলের মা দিয়েছে দুটি পিঁড়ি, ভিজে জমিতে পেতে রাখার জন্য। ব্যাংকাকা বলে দিয়েছিলেন কলাবতীকে কীভাবে ফাতনাটাকে

লক্ষ করতে হবে। ভেসে থাকা ফাতনাটা খাড়া হয়ে উঠলে বুঝবে মাছ টোপ গিলেছে, তারপর সেটা ডুবে গেলেই টান মারবে। কলাবতী সব শুনে ঘাড় নেড়ে জানায়, বুঝেছে।

ঘাটের একধারে দু'জনে পাশাপাশি ছিপ ফেলে বসল। সাত-আট হাত তফাতে। সঙ্গে দুটো খালুই, ধরা মাছ রাখার জন্য। সুশির অভিজ্ঞতা আছে মিনিটদশেক পরেই ছিপে টান দিয়ে সে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "কালু, পেয়েছি। ফলুই।"

কলাবতী মুখ ঘুরিয়ে ইঞ্চিছয়েক লম্বা কালো রঙের মাছটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওটা তুই খাবি।" তারপর সে ফাতনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। মিনিট তিন পর সুশি আবার চিৎকার করল, "কালু, বাটা।" কলাবতী মুখ ফিরিয়ে দেখল, কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না। শুধু ভ্রূ কুঁচকে উঠল। ফাতনাটা মনে হল একটু কাঁপল। সে উবু হয়ে বসল। ক্রিকেট ব্যাট ধরার মতো দু'হাতে ছিপটা ধরে রইল এমনভাবে, যেন বোলার এবার একটা লংহপ বল দেবেই আর সে সপাটে পুল করবে। ফাতনাটা টুকটুক করে কাঁপছে। কলাবতীর মনে হল লংহপ বলটা এসে গেল বলে, এবার পুল— সপাটে সে হ্যাঁচকা টান দিল।

সুতোর প্রান্তে বাঁধা বঁড়শিটার দিকে কলাবতী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। বঁড়শিতে গাঁথা পিঁপড়ের সাদা ডিমের টোপটা নেই। বদমাশ মাছ খেয়ে পালিয়ে গেছে।

"কালু, আবার একটা বাটা।"

"তোর পাশে বসলে আমি একটাও পাব না। চললুম ওদিকে।"

খলুই আর পিঁড়িটা তুলে কলাবতী ঝোপঝাড় পেরিয়ে পঞ্চাশ হাত দূরে একটা খেজুরগাছের পাশে গিয়ে বসার উদ্যোগ করল। মুখ ঘুরিয়ে সে পেছন দিকটা দেখে নিতে গিয়ে চোখে পড়ল শিবমন্দিরটাকে। একটা বড় বেলগাছ ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে মন্দিরের দিকে। ডালে ঝুলন্ত দুটো বেল তার চোখে পড়ল। চিকচিক করে উঠল তার চোখ। পেকে হলুদ হয়ে আছে আর সাইজ কী! ছোটখাটো কুমড়োর মতো। অন্তত দশ গ্লাস বেলের পানা হয়ে যাবে। সুশি মাছ ধরছে ধরুক, সে চটপট ভেবে নিল। অমন দুটো বেল পেড়ে নিয়ে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। কলকাতার মেয়ে গাছেও চড়তে পারে এটা সে দেখিয়ে দেবে।

সুশি নিবিষ্ট চোখে ফাতনার দিকে তাকিয়ে। কলাবতী পা টিপে টিপে

কাদা মাড়িয়ে বেলগাছটার দিকে এগোল। গাছতলায় পৌঁছে চারদিক দেখল।, তার ভাগ্য ভাল, গাছের একটা ডাল বেশ নিচুতেই পেয়ে গেল। চটিটা খুলে সে হাত তুলে দু'বার লাফিয়েই ডালটা ধরে ফেলল। একটু দোল খেয়ে মেয়ে জিমন্যাস্টরা যেভাবে আনইভন বার-এর ওপর চড়ে বসে সেইভাবে সে ডালটার ওপর উঠে গেল। তারপর এই ডাল সেই ডাল করে সে এগোতে লাগল বেল দুটোর দিকে। বৃষ্টিতে ভিজে পিছল হয়ে রয়েছে ডালগুলো। সন্তর্পণে একটু একটু করে সে এগোচ্ছে। একটা সরু ডালে বেলদুটো। হাত বাড়াল সে। একটা বেল আঙুলে ঠেকল। ওটাকে ভাল করে ধরে মোচড় দিয়ে দিয়ে ছিঁড়তে হবে। ডালের ওপর উপুড় হয়ে সে আর একটু এগোতেই ডালটা বিপজ্জনকভাবে নুয়ে পড়ল। কলাবতী ভয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ডালটাকে, তাইতে সেটা আরও নুয়ে পড়ল।

কলাবতী বুঝতে পারছে সে এবার পড়ে যাবে। মট করে ডাল ভাঙার শব্দ হল, ডালটা ভেঙে ঝুলছে তাকে নিয়ে। সে টের পেল, ডালের ঘষা লেগে ব্যান্ডটা ছিঁড়ে ঘড়িটা হাত থেকে নীচে পড়ে গেল আর কয়েক সেকেন্ড পরেই সে নিজেও দুটো বেলসমেত ডালটা নিয়ে প্রায় কুড়ি ফুট নীচে পড়ল একটা নরম ঝোপের ওপর।

অন্তত তিন মিনিট সে চিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল সে মারা যায়নি, তার হাড়গোড় ভাঙেনি, সে দিব্যি বেঁচে আছে। অতঃপর সে উঠে দাঁড়াল। ঘড়িটা কোথায় পড়ল? দু'বছর আগে জন্মদিনে কাকা ওটা দিয়েছিল। তার কাছে অমূল্য জিনিস। ওটাকে উদ্ধার করতেই হবে।

সে ঝোপঝাড় সরিয়ে খুঁজতে শুরু করল। খুঁজতে খুঁজতে শিবমন্দিরের দিকে দশ-বারো হাত এগিয়েই তার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে গেল। পা অসাড়, শরীর ঠান্ডা এবং মাথার মধ্যে নাগরদোলা ঘুরতে শুরু করল।

তার চোখের সামনে মন্দিরের পেছন দিকের চাতাল। চাতালটা হাঁ হয়ে রয়েছে। গাছ থেকে পড়ার ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আর একটা। চাতালে গজানো ঘাস আর ঝোপের মধ্যে একটা লোহার দরজা শোয়ানো। সেটা মরচেয় জরাজীর্ণ এবং ভেঙে চৌচির। দরজার পাল্লাটা কোনও কিছুর আঘাতে ভেঙে গিয়ে ভেতর দিকে ঝুলে পড়েছে। কলাবতীর মনে পড়ল রিকশাওলার কথাটা, "দু'-দুটো বাজ পড়েছে।"

এই তা হলে সেই পাতালঘরের দরজা।

সে ঝুঁকে পড়ল চার হাত লম্বা তিন হাত চওড়া গর্তটার দিকে। ভেতরটা

অন্ধকার। স্যাঁতস্যাঁতে ভ্যাপসা গন্ধ ভেতর থেকে উঠে আসছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কলাবতী চমকে উঠল। তার মাথার খুলিতে হাজারদশেক পিঁপড়ে চলাফেরা শুরু করল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। ঘাড়ের কাছটা সুড়সুড় করছে। চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।... ভূত! সে চোখ বুজল। এবার নির্ঘাত তার ঘাড় মটকাবে, নয়তো রক্ত চুষে খাবে।

"কে তুমি?" একটা খসখসে ভয়ার্ত স্বর সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে থেকে উঠে এল।

এবার চোখ খুলে তাকাল কলাবতী, অন্ধকারের মধ্যে আবছা একটা মুখের আদল আর চিকচিক করছে দুটো চোখ। ভূতের চোখ?— "তুমি কি ভূত?"

"আমি মানুষ। কাল সন্ধে থেকে আমি এখানে।"

এইবার কলাবতী নিশ্চিন্ত হল। আর যাই হোক চোখ দুটো ভূতের নয়। কিন্তু মানুষ এই পাতালঘরে কেন?

"তুমি ঠিক বলছ ভূত নও? তা হলে তুমি কে?"

"আমি সরা, স্বরাজ দাস, ফুটবল খেলি।"

অন্ধকারের সঙ্গে এর মধ্যেই চোখ দুটো সইয়ে নিয়েছে কলাবতী। তার ভয় এখন কেটে গেছে। এখন সে কৌতূহলী। সে দেখতে পাচ্ছে একটা মুখ গর্তের মধ্যে থেকে তার দিকে তাকিয়ে।

"ভয় পেয়ো না।" কলাবতী বলামাত্র দুটো মোটরবাইকের গর্জন বাবার সড়ক দিয়ে ভটভটিয়ে উড়ে গেল।

"চারটে লোক কাল থেকে মোটরবাইকে ঘুরছে, সে কি তোমার জন্যে?"

"হ্যাঁ। বলেছে আমার হাঁটু ভেঙে দেবে, যাতে জীবনে যেন আর খেলতে না পারি। হাঁটু ভেঙে দিতে ওরা এসেছে।"

কলাবতী আর একটু ঝুঁকে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল, ঘুটঘুটে অন্ধকার। "তুমি উঠে আসতে পারবে না?"

"না। শিবমন্দিরে ঢোকার জন্য দৌড়ে আসছিলুম তখন এই গর্তে পড়ে গেছি। একটা সিঁড়িমতন ছিল। কিন্তু সেটা একদম ভেঙে গেছে। ভেতরটা খুব ঠান্ডা, শীত শীত করছে। মেঝেটা ভিজে ভিজে।"

"কত বড় ঘর?"

"বিরাট বড়। একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট হয়ে যাবে। তুমি একটা মোটা দড়ি জোগাড় করতে পারবে? তা হলে—" সরার কথা বন্ধ হয়ে গেল আবার মোটরবাইকের গর্জন ভেসে আসায়।

"আমার এখন বাইরে আসাটা ঠিক হবে না। ওরা দেখে ফেলতে পারে।"

কলাবতী বলল, "ওদের এত ভয় পাচ্ছ কেন? কী করেছ?"

"পরে বলব। তবে ওরা আমার ফুটবল কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারে। খুব খিদে পাচ্ছে, প্রায় তেরো-চোদ্দো ঘণ্টা এখানে রয়েছি।"

কলাবতী ভাঙা ডালে লেগে থাকা বেল দুটোর একটা মুচড়ে ছিঁড়ে আনল। গর্তটার পাশে হাঁটুগেড়ে বসে বেলসমেত হাতটা ঝুলিয়ে দিল। "ধরো। এটা খাও।"

"আমার হাত পৌঁছোচ্ছে না। তুমি ফেলে দাও আমি লুফে নোব।"

"তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি। তুমি একটা মেয়ে। তোমার নাম কী?"

"কলাবতী সিংহ। এখানে এসেছি আমার বন্ধু সুশিদের বাড়িতে। এবার বেলটা ধরো।"

কলাবতী আলতো করে বেলটা ছেড়ে দিল। শব্দ না হওয়ায় বুঝল লুফে নিয়েছে।

"আপাতত যতটা পারো খাও। মনে হচ্ছে বেশ মিষ্টিই হবে। দেখি খাবার ব্যবস্থা কী করা যায়।"

"আমার কথা কাউকে কিন্তু একদম বোলো না।"

"পাগল নাকি! তুমি আমার কী যে উপকার করলে ভূত না হয়ে, ভাগ্যিস তুমি মানুষ!"

"তাতে কী উপকার হল?"

"হল না?" কলাবতীর স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল। "যদি ভূত হতে তা হলে এতক্ষণে তো আমার ঘাড়টা মটকে দিতে। তার থেকেও বড় কথা বোলতার লোক আরও আড়াইশো বছর বিশ্বাস করবে গড়ের মাঠে ভূতে মড়ার খুলি দিয়ে অমাবস্যার রাতে ফুটবল খেলে।"

"কালুউ, কালুউ।" দূর থেকে ভেসে এল সুশির উদ্বিগ্ন চিৎকার। "কালু তুই কোথায়?"

"এই যে এখানে। শিগগির আয় সুশি।" কলাবতীও চেঁচিয়ে সাড়া দিল।

কয়েক সেকেন্ড পর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসতে দেখা গেল সুশিকে। "জলে ডুবিসনি তা হলে।"

"ডুবলে তো বেঁচে যেতুম। দেখে যা তোদের পাতালঘরের রহস্য। এবার একটা নতুন ভূত!"

সুশি পায়ে পায়ে গর্তটার কাছে এল। জমিতে শোয়ানো চুরমার লোহার দরজাটা দেখে সে আঁতকে উঠল।

"এটা কী রে!"

"এর ওপর বাজ পড়েছিল। এটাই পাতালঘরে নামার পথ।"

"এর ভেতর ভূত আছে?"

"আছে। দেখবি?" কলাবতী গর্তের দিকে ঝুঁকে বলল, "ওহে সরাবাবু, বেলটা খেতে কেমন লাগছে?"

গর্তের ভেতর থেকে ভেসে এল, "বেশ মিষ্টি। একটু জল খাব।"

সুশি বিস্ময়ে কাঠের মতো হয়ে গেল। থরথর কেঁপে উঠল তার দুই হাঁটু। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। "ক্কা... কালু, ভূত মানুষের মতো ক্ক-কথা বলে?"

"শুধু কথাই বলে না, জলও খায়!" কলাবতী গর্তের দিকে মুখ করে বলল, "সরা, এই হচ্ছে সুশি। শিবমন্দিরটা ওদের, যে বেলটা খাচ্ছ সেটাও ওদের।"

"ধন্যবাদ সুশি। আমি কিন্তু ভূত নই। পালাতে গিয়ে এখানে পড়ে গেছি।"

কলাবতী বলল, "ওখানে ভূত থাকার কথা, তুমি তাদের দেখতে পেয়েছ কি?"

"এখনও তো পাইনি। তবে আসল ভূতেরা এখন মোটরবাইকে চড়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটু আলোর ব্যবস্থা করতে পারো? একটা মোমবাতি। অন্ধকার আর সহ্য করতে পারছি না।"

"একটু ধৈর্য ধরো, আমি আর সুশি যতটা পারি ব্যবস্থা করছি। ভাল কথা তুমি কি খুব বড় ফুটবলার? বলরামের মতো?"

"বলরামের নখের যুগ্যি নই তবে এ-বছর আমার দর পাঁচ লাখ টাকায় উঠেছে। এত টাকা কুড়ি বছর বয়সে উনি একসঙ্গে চোখে দেখেছেন কিনা জানি না।"

"থাক, থাক, টাকার কথা বোলো না। ভটভট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ? আমাদের বাড়ির সামনে থামল।"

"ওরা আমাকে খোঁড়া করে দেবে বলেছে। কলাবতী, তুমি কি আমাকে বাঁচাবে? কাল ওরা আমাদের বাড়িতে গিয়ে পিস্তল দেখিয়ে শাসিয়েছে। বোকামি গাধামি, স্বীকার করছি লোভে পড়ে আমিই করেছি, দুটো ক্লাব থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছি। আমরা গরিব তো।"

"অত কথা শোনার এখন সময় নেই। তুমি যেমন আছ তেমনই থাকো। গুড বাই।" কলাবতী হাত নাড়ল।

সুশি এতক্ষণে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। সে বলল, "কালু এখন কী হবে?"

"ব্যাংকাকাকে সব বলতে হবে। এখন চল, সরার খাওয়াদাওয়ার, শোয়ার একটা ব্যবস্থা করি। বেচারার শীত করছে। আর একটা কথা, একদম জানাজানি যেন না হয়। ওই ভটভটিওলারা জানতে পারলে—।"

"সুশিদিদি, অ সুশিদিদি।" দিঘির ঘাট থেকে শেতলের মা'র পরিত্রাহি চিৎকার শোনা গেল। ওরা দু'জন দৌড়োল ঘাটের দিকে।

"কী হয়েছে শেতলের মা?" সুশি বলল।

"তিনটে লোক এসে কাকে যেন খুঁজছে। কী হম্বিতম্বি, যেন পুলিশ! কাকাবাবু বাড়ি নেই, তুমি এসে দ্যাকো।"

ওরা ছুটে গেল বাড়ির ভেতর। সদরঘরের বাইরের রকে তিনটি লোক। তাদের মধ্যে একজনকে ওরা চিনল। গতকাল মাঠে এসে লোকটা সরার বাড়ি কোথায় জানতে চেয়েছিল। অন্য দু'জন বসে ছিল মোটরবাইকে। দেখতে শান্তশিষ্ট, ভদ্র। একজনের চোখে চশমা। অন্যজনের গলায় সোনার চেন।

চোখে চশমা বলল, "কাল মাঠে তোমাদের দু'জনকে দেখেছি মনে হচ্ছে। তা হলে এটা তোমাদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ।" সুশি বলল।

দু'হাত ফাঁক করে কালো শার্ট বলল, "কাল সন্ধেবেলা সরা এ বাড়িতে ঢুকেচে আমাদের তাড়া খেয়ে। কোতায় সে, তাকে আসতে বলো।"

"কে সরা!" কলাবতী আকাশ থেকে পড়ল। তারপর যেন মনে পড়েছে এমনভাবে বলল, "ওহ্‌হো, কাল যার কথা বলছিলেন? স্বরাজ দাস? সে কেন এ বাড়িতে থাকবে?"

"নিজের চোখে দেখেচি মাটের মদ্দে ছুটে গেল। মাট দিয়ে তো এ বাড়িতে ঢোকা যায়। ওকে বেরিয়ে আসতে বলো, নয়তো আমরাই বার করে আনব। তা হলে কিন্তু ফল ভাল হবে না।"

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" চোখে চশমা শান্ত স্বরে বলল, "শ্যামপুকুর ক্লাবে খেলবে বলে সরার সঙ্গে পাঁচ লাখ টাকার চুক্তি হয়েছে। সাড়ে তিন লাখ টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছে কিন্তু তার আগেই ব্রাদার্সের অ্যাডভান্স নিয়েছে চার লাখ। ওদের সঙ্গেও চুক্তি পাঁচ লাখের। এবার তোমরাই বলো এটা স্রেফ

চিটিং কি না? দুটো ক্লাব থেকেই টাকা খেয়ে বসে আছে।"

কলাবতী অবাক হয়ে বলল, "কলকাতার ফুটবলে এরকম হয় নাকি? কী অদ্ভুত আশ্চর্যের কথা! একই সঙ্গে দুটো ক্লাবে কি খেলা যায়?"

"যায় না যে, সেটা তো সরা ভালই জানে," গলায় চেন ঠোঁট বেঁকিয়ে কঠিন গলায় বলল, "কোর্ট পেপারে সই করে অ্যাডভান্স নিয়েছে শ্যামপুকুর থেকে। অথচ ও থানায় ডায়েরি করল আমরা নাকি জোর করে ওকে সই করিয়েছি। টোকেন হারিয়ে গেছে বলেও শ্যামপুকুর নাকি ওকে দিয়ে জোর করে চিঠি লিখিয়ে নিয়েছে আই এফ এ-কে দেওয়ার জন্য। কী মিথ্যেবাদী ছেলে! সরা তো নাবালক নয় যে, জোরজবরদস্তি করে সই করানো যাবে। এ-কথা ও কাগজের রিপোর্টারকে বলেছে, কাগজে ছাপাও হয়েছে।"

কলাবতী বলল, "তা হলে এখন আপনারা কী করবেন?"

চোখে চশমা বলল, "টোকেন মোটেই হারায়নি। ওর কাছেই আছে, ওটা আমাদের চাই আর ব্রাদার্সের টাকা ফেরত দিয়ে শ্যামপুকুরে সই করুক। সই না করা পর্যন্ত ওকে আমাদের হেফাজতে থাকতে হবে।"

গলায় চেন বলল, "টোকেন যে ক্লাবের হাতে থাকবে প্লেয়ারকেও সেই ক্লাবে থাকতে হবে। আমরা সরার টোকেনটা চাই। হারিয়ে যাওয়া টাওয়া একদম বাজে কথা। ওকে আমরা ছাড়ব না। এর আগে বিজন চৌধুরী আমাদের এইভাবেই চিট করতে গেছল, পারেনি অবশ্য। লালবাজারে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে অ্যাডভান্স ফেরত দেয়। নইলে অ্যারেস্ট হত।"

"এই প্লেয়ারদের, বুজলেন চিতুদা, এমন সিক্কা দেওয়া উচিত যে জীবনে ভুলবে না। স্রেফ হাঁটুতে গুলি করে দিন।"

"ওরে বাবা!" সুশি শিউরে উঠল। "কিন্তু সরা তো আমাদের বাড়িতে নেই।"

"আমি খুঁজে দেখছি।"

কথাটা বলেই কালো শার্ট ওদের তোয়াক্কা না করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে একতলার ঘরগুলো আঁতিপাতি দেখল। তারপর রান্নাবাড়ি, গোয়ালঘর ইত্যাদি দেখে ফিরে এসে দোতলায় উঠল। সুশি আর কলাবতী এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারা বুঝে নিয়েছে আপত্তি জানিয়ে কোনও লাভ হবে না। তা ছাড়া সরার কীর্তির কথা শুনে তার পক্ষ নিয়ে দাঁড়াতেও আর তাদের ইচ্ছা করছে না। সারাবাড়ি ওরা দেখুক না। একটু পরেই কালো শার্ট নেমে এল।

"না চিতুদা, ছাদ পর্যন্ত দেখে এলুম। তবে একটা শিবমন্দির চোখে পড়ল, ওটা একবার দেখা দরকার।"

সুশি শিউরে উঠে চোখ বড় করে বলল, "ওরে বাবা, ওধার একদম মাড়াবেন না। দুশো বছর ওই মন্দিরে লোক যায় না। ভূতপ্রেত বাস করে। যে ওই মাঠে পা দিয়েছে তিনরাত্তিরও তার কাটে না, অবধারিত মরণ। আপনারা বোলতার যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।"

তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, চোখে ফুটে উঠল সন্দেহ, ভয়। ইতস্তত করে চোখে চশমা বলল, "ঠিক আছে, চল এবার। আশপাশটা আর একবার দেখা যাক।"

ওরা চলে যাওয়ার পর সুশি বলল, "যত দোষই করে থাকুক সরা এখন আমাদের আশ্রয়ে রয়েছে। আমরা যতটা পারি ওকে দেখব। কাকা কোথায় যে গেছে প্লেয়ার ধরতে, কাল তো সেমিফাইনাল ম্যাচ।" তারপরই জিভ কেটে সুশি দৌড়োল দিঘির ঘাটের দিকে, "অনেক মাছ রে কালু, কাক-চিলের পেটে গেছে কিনা কে জানে।"

কলাবতী চেঁচিয়ে বলল, "তোর তো মাছ, আমার যে ঘড়িটা গেল।"

সরা জল চেয়েছে। ভিজে মেঝেয় বসতেও পারছে না। বৃষ্টির জল নিশ্চয়ই ভাঙা দরজার গর্তটা দিয়ে পাতালঘরে ঢুকেছে। কলাবতী মনে মনে বলল, "এসব শাস্তি তো ওর প্রাপ্যই। লোকগুলোর কথা যদি সত্যি হয় তা হলে কোনওরকম সহানুভূতিই দেখানো উচিত নয়। তবে সুশি যা বলল, আশ্রিতকে দেখা উচিত।' এরপর সে ভেবে নিল দোতলায় শোওয়ার ঘরে জলভরা একটা কুঁজো আছে। লোডশেডিং হয় তাই তেলভরা একটা হারিকেন আর দেশলাই শোওয়ার ঘরে খাটের নীচে রাখা আছে। কিছু খাবারও দরকার। বেল খেয়ে তো আর সারাটা দিন কাটানো যায় না। একটা মাদুর কি চটের বস্তা চাই মেঝেয় পাতার জন্য। মেঝেটা কেমন কে জানে। দিঘির পাড়ে ফেলে আসা পিঁড়ি দুটো দিয়ে আসা যায়।

সুশি ফিরে এল। হাতে দুটো পিঁড়ি, দুটো ছিপ আর খালুইয়ে সাত-আটটা নানারকমের মাছ।

"এগুলো শেতলের মাকে দিয়ে আসি।"

"তার আগে সরার জন্য কী করা যায় সেটা ভেবে ঠিক কর। কুঁজোটা দিয়ে আসি, হারিকেনটাও। ধান রাখার বস্তা নিশ্চয়ই আছে। খাবার কী দেওয়া যায়? তার আগে শেতলের মাকে রান্নাঘরে ব্যস্ত রাখতে হবে, এদিকে যেন

না আসে। সকালে যে লুচি বেগুনভাজা খেলুম তার কিছু পড়েটড়ে আছে কিনা দ্যাখ।"

সুশি রান্নাঘরের দিকে চলে যাওয়ার পর কলাবতী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছুটে দোতলা থেকে হারিকেন আর জলভরা কুঁজো নামিয়ে আনল। একতলায় একটা ঘরে সারি দিয়ে থাক থাক বস্তভরতি ধান। খুঁজেপেতে দুটো ছেঁড়া চটের বস্তা বার করল, সেইসঙ্গে একটুকরো ত্রিপল। আপাতত এটুকু উপকারই করা যাক।

জিনিসগুলো নিয়ে গর্তের কাছে গিয়ে কলাবতী সরাকে ডাকল।

"কুঁজো আর হারিকেনটা তো বেল নয় যে ফেলে দেওয়া যাবে। এই বস্তায় ভরে একে একে ঝুলিয়ে দিচ্ছি ধরে নাও। হাত তুলে পাবে তো? তোমার হাইট কত?"

"পাঁচ-দশ। পেয়ে যাব বস্তা।"

প্রথমে কুঁজো নামল। সেটা পাওয়ামাত্র সরা অর্ধেক খালি করে দিয়ে বলল, "বাঁচলুম।"

"মোটেই বাঁচোনি। ওরা আমাদের বাড়ি ঢুকে তন্নতন্ন সার্চ করে গেছে। এখন তোমার খোঁজে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলেছে, পেলে তোমার হাঁটুতে গুলি করবে।... বস্তাটা ছুড়ে দাও হারিকেন আর দেশলাই নামাব।"

"হাঁটুতে গুলি? তা হলে তো খোঁড়া হয়ে যাব!"

"যাও না, তাতে লোকসান তো হবে না। তুমি তো ফুটবলার হতে চাও না, টাকা কামাতে চাও। চার-পাঁচ লাখ টাকা তো হাতিয়ে নিয়েছই, তা হলে আর প্লেয়ার হওয়ার দরকার কী?" স্বাভাবিক স্বরে কলাবতী বলল।

"তুমি ঠাট্টা করছ। জানো এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার, হাঁটুতে গুলি খেলে কী হতে পারে সেটা তুমি বুঝছ না।"

"তুমি বোধহয় এবার একটু একটু করে বুঝতে পারছ সেই প্রবাদটা 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'। যাক গে, বস্তাটা ছোড়ো।"

বস্তাটা ছুড়ে দিয়ে সরা ঢোক গিলে বলল, "আমার মৃত্যুর কথা শুনলে ভয় করে।"

কলাবতী জবাব দিল না। হারিকেনটা বস্তায় ভরে নামিয়ে দিয়ে বলল, "দেশলাই রয়েছে ওটা এবার জ্বালো আর এই তেরপলটাও নাও।"

একটু পরেই দেশলাই আর হারিকেনের আলো জ্বলে উঠল। কলাবতী দেখল, কালো ট্রাউজার্স পরা খালি গায়ে একটি বছর কুড়ি-একুশের ছেলে।

ভাল স্বাস্থ্য, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ের রং শ্যামলা, চোখা নাক।

"খুঁজে দ্যাখো তো আমার হাতঘড়িটা পাও কি না।"

ঘড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হল না। সরা ছুড়ে দিতেই কলাবতী লুফে নিল। "এবার তুমি পারলে ঘুমিয়ে নাও। খাওয়ার জোগাড় কীভাবে করব আমি জানি না, চেষ্টা করব।"

"আমার এখন আর খিদে পাচ্ছে না। ওরা কি সারাদিন বোলতায় থাকবে? তুমি কি একটু খোঁজ নিয়ে বলবে ওদের অ্যাডভান্সের টাকাটা বাবা ফিরিয়ে দিয়েছে কিনা।" সরার গলা দিয়ে কাতর মিনতি ঝরে পড়ল।

"পারলে খোঁজ নোব।" কলাবতী চলে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এল। "টোকেন হারিয়েছে বলে মিথ্যে ডায়েরি করেছ। ওটা তোমার কাছেই আছে।"

"হ্যাঁ। সবসময় ওটা পকেটে থাকে। এই দ্যাখো।" ট্রাউজার্সের হিপপকেট থেকে সরা টোকেন বার করে দেখাল।

হারিকেনের অল্প আলোয় কলাবতী একটা কালো চাকতি দেখে বলল, "ওটা দেখতে পাচ্ছি না, ছুড়ে দাও তো।"

"না, না, এটা হাতছাড়া করব না।"

"আরে, তুমি তো ডায়েরি করেছ। আই এফ এ থেকে নতুন টোকেন তো পেয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমি যে খবরের কাগজে বলে ফেলেছি জোর করে মিথ্যে ডায়েরি আমাকে দিয়ে করানো হয়েছে।"

"তা হলে টোকেনটা আমায় দেখতে দেবে না? বেশ, থাকো ওখানে। শ্যামপুকুরের লোকগুলো তো আবার আসবেই, আমি আর কথা বলব না, সুশিই বলবে। আর ও খুব মরালিস্ট, সবসময় সত্যি কথা বলে। হয়তো বলে ফেলবে স্বরাজ দাস কোথায় লুকিয়ে আছে।"

"না, না, না। এই নাও টোকেন।"

একটা কালো ধাতুর চাকতি গর্ত থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। এক হাতে কলাবতী লুফে নিল। বেশ ভারী, একশো গ্রাম তো হবেই, একপিঠে টোকেন নম্বর। এমন ধ্যাবড়া ভাবে খোদাই করা যে, কলাবতী পড়তে পারল না। শুধু 'ভ্যালিড ফ্রম ১৯৯৪' টুকু পড়া গেল। মধ্যিখানে খোদাই করা একটা ফুটবলার বলে লাথি মারছে, তলায় ঠিকানা ১১১ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট। অপর পিঠে লেখা ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, মধ্যিখানে তারা মার্কা লোগো

খোদাই করা, নীচে দুই সেক্রেটারির সই। পড়া গেল না নাম।

"আমার ক্যারামের স্ট্রাইকারটা হারিয়ে গেছে। এটা দিয়ে মনে হচ্ছে কাজ চালানো যাবে, একবার পরীক্ষা করে দেখব।"

"তার মানে তুমি ওটা নিয়ে নিচ্ছ?"

"আপাতত।" বলেই কলাবতী আর দাঁড়াল না। যেতে যেতে শুনতে পেল, "তুমি কিন্তু কথা বলবে, সুশি নয়।"

সুশি পাঁউরুটি কিনতে গেছে বাজারে। সরাকে তা ছাড়া আর কীই-বা খেতে দেওয়া যেতে পারে! শেতলের মাকে লুকিয়ে ডাল-ভাত রান্নাঘর থেকে বার করা সোজা ব্যাপার নয়। কয়েকটা আম অবশ্য দেওয়া যেতে পারে। ফেরার পথে সে ফুটবল মাঠের ধার দিয়ে আসছিল, তখন ক্লাবঘরের জানলা দিয়ে দেখল ভেতরে কয়েকজন, তার মধ্যে ব্যাংকাকা, ভূদেব খেটো, ঘণ্টুও রয়েছে।

সুশি ক্লাবঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"কাল সেমিফাইনাল রি-প্লে আর আজ বিপ্লব বলছে কিনা খেলব না?" ভূদেব খেটো টেবিলে চাপড় মারলেন। "ব্যাপার কী ব্যাং?"

"ভোরবেলাতেই কৃষ্ণপুরে গেছলুম, বিপ্লব তখন দাঁত মাজছে। বলল অ্যাঙ্কেলে চোট। ভাল করে পা ফেলতে পারছে না, হেঁটে দেখালও। একটু বেশি খোঁড়াল মনে হল।"

সুশি এবার ঘণ্টুর গলা পেল, "চোট না আর কিছু। ও একজনকে কাল বলেছে হাজার টাকা হাতে দিলে পায়ে বল ছোঁবে। খেলে তো কলকাতার সেকেন্ড ডিভিশনে।"

এবার ভূদেবের গলা, "আমার এলাকার ছেলে আমাদেরই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য কিনা টাকা চায়?"

ব্যাংকাকার গলা, "শেতলের মা'র ছাগলটাকে কাল নামাব, তবু ওকে নয়।"

ঘণ্টুর গলা, "সরাটা থাকলে আর ভাবনা ছিল না, কিন্তু কাল সন্ধে থেকে কোথায় যে গেল!"

ভূদেবের গলা, "স্থানীয় ছেলে, টাকাপয়সাও চাইত না। ব্যাঙের কোনও

আপত্তিও হত না। সরা খেললে সেমিফাইনাল কেন, ফাইনালও জিতে নোব। ওহ্‌হ, বেঁচে থাকতে থাকতে বংশীবদনকে ঘরে তোলা—!"

এই সময় সুশি দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, "কাকা একবার বাইরে শুনে যাও।"

ব্যাংকাকা একটু অবাক হয়ে বেরিয়ে এলেন, "কী বলবি, তাড়াতাড়ি বল। এখন জরুরি মিটিং হচ্ছে।"

"আমিও একটা জরুরি কথা বলব। যাকে চাইছ তাকে বন্দি করে রেখেছি আমরা।"

"কাকে?"

"শ্রীমান সরাকে।"

"অ্যাঁ! কোথায়?"

"পাতালঘরে।"

ব্যাংকাকা মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন, দরজার পাশে রাখা সাইকেলটা ধরে সামলে নিয়ে বললেন, "ওখানে তো ভূত আছে!"

"ঘোড়ার ডিম আছে। সরা ওখানে কাল সন্ধে থেকে ধরা দেখছে। ওর জন্যই তো এই পাঁউরুটি কিনে নিয়ে যাচ্ছি।"

সুশি এরপর সংক্ষেপে দ্রুত বলে গেল কলাবতী কীভাবে সরাকে আবিষ্কার করল, মোটরবাইক চড়া তিনজন বাড়িতে ঢুকে কীভাবে সরাকে খুঁজে গেছে। ওদের ভয়েই যে পাতালঘর থেকে সে বেরোতে চাইছে না, তাও বলল। "তোমরা তো ওকে বার করে এনে খেলাতে পারো, যদি ওর ভয় ভাঙাতে পারো।"

আর কথা না বলে ব্যাংকাকা ছুটে ক্লাবঘরে ঢুকলেন।

"পাওয়া গেছে, সরাকে পাওয়া গেছে। এখন সে পাতালঘরে বসে ধরা দেখছে।" ব্যাংকাকার উত্তেজিত গলা সুশি শুনতে পেল।

তারপর ভূদেবের গলা, "বলো কী? ওখানে তো ভূতের বাসা!"

ব্যাংকাকা বললেন, "সেটা দেখে এলে তো সব বোঝা যাবে। চলো তো সবাই।"

সুশি আর দাঁড়াল না। পড়িমড়ি ছুটতে শুরু করল বাড়ির দিকে। কলাবতী তখন নৌকোয় দাঁড় বেয়ে দিঘির মাঝামাঝি। সেখানে নৌকোটা রেখে চারদিকের গাছপালা, বাড়ি দেখছিল আর টেপ রেকর্ডার চালিয়ে শুনছিল লতা মঙ্গেশকর। ঘাট থেকে হাতছানি দিয়েই সুশির "কালু, কালু" চিৎকার শুনে

দুটো ক্লাব থেকে টাকা নিয়েছিলে? তোমাকে পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি ভাবার জন্য, ব্যাংকাকার অনুরোধ রাখবে কি রাখবে না সেটা ঠিক করো।"

পাতালঘর থেকে কোনও উত্তর এল না। ব্যাংকাকা হাতছানি দিয়ে ঘণ্টুদের ডাকলেন। পায়ে পায়ে ওরা এগিয়ে এল।

"আরে, এত ভয় পাচ্ছিস কেন, সত্যি সত্যিই স্বরাজ দাস রয়েছে পাতালঘরে। ভূতটুত কিস্‌সু নেই।" ব্যাংকাকা দু'জনকে হাত ধরে টেনে আনলেন। "ওই দ্যাখ, পাতালঘরে নামার গর্তটা। লোহার দরজাটা ঝরঝরে হয়ে গেছল, বাজ পড়ে ভেঙে গেছে। সিঁড়িটাও ভেঙে গেছে।"

ঘণ্টু ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে বলল, "সরা, এই সরা।"

"ঘণ্টু? আমাকে বাঁচা ভাই। এখান থেকে বেরোবার একটা ব্যবস্থা কর। আর কিছুক্ষণ থাকলে মরে সত্যি সত্যি ভূত হয়ে যাব।"

সরারই গলা বটে! ঘণ্টু নিশ্চিন্ত হল। তরুণ খোকনও এবার এগিয়ে এল। তাদের চোখেমুখে বিস্ময়। ফিসফিস করে খোকন বলল, "হ্যাঁরে ঘণ্টু, ভূতটুত তা হলে নেই? সত্যিই সরার গলা!"

কলাবতী বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? শুনবে ওর কথা?" তারপর সে গর্তের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "সরা শুনতে পাচ্ছ ভটভটির আওয়াজ?"

"কই না তো! ওরা কি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

ঘণ্টু উত্তর দিল, "সকাল থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছি না। বোধহয় চলে গেছে।"

"আমাদের বাড়ির খবর কী?"

"সবাই তোর জন্য খুব চিন্তায় আছে। ওরা চারবার তোদের বাড়ি ঘুরে এসেছে। তুই এখানে থেকে বেঁচে গেছিস, ওরা তোর বাবাকে বলেছে, ছেলেকে না পেলে দানা খাইয়ে দেবে। কথাটার মানে জানিস?"

"জানি, গুলি করবে। কিন্তু আমি তো টাকাটা শ্যামপুকুরকে ফেরতই দিতে চাই। তুই বাবাকে বল না ব্রাদার্সের পতিত ভটচাযের সঙ্গে দেখা করে ওকে দিয়ে শ্যামপুকুরের ব্রজদার সঙ্গে কথা বলে একটা মিটমাট করতে। তা নইলে এই অন্ধকার ঘরে না খেয়ে পচে মরতে হবে।"

"তুই নিজে গিয়ে কাকাবাবুকে বল। আমার কথা কানে তুলবেন না। দানা খাওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন।"

কলাবতী এবার বলল, "ঠিক আছে, আমি আর সুশি যাব তোমার বাবার কাছে। তুমি এই ম্যাচটা খেলে দাও।"

"ওরে বাবা! একটা দানা হাঁটুতে ছুড়ে দিলে তখন কী হবে?"

ব্যাংকাকা এইবার কথা বললেন, "সরা, তোমার কোনও ভয় নেই। ভূদেবদা তোমার সেফটির দায়িত্ব নিলে বোলতার মাটিতে কেউ তোমার কেশ স্পর্শ করতে পারবে না।"

"কেশ নয়, হাঁটু। ওদের ওটাই টার্গেট।"

"সারা বোলতার মানুষ তোমাকে ঘিরে পাহারা দেবে দিনরাত।"

"আমাকে নয়, ওই ভটভটিওলাদের পাহারা দিক।"

"তাই দেবে, তুমি দয়া করে ম্যাচটা খেলে দাও।"

"হ্যাঁরে ঘণ্টু, এই ভূদেবদা কে?"

"এখানকার জনমত। এখানকার পঞ্চায়েত সমিতির হেড। এখানকার যাবতীয় উন্নয়ন—।"

"থাম তুই," সরা চিৎকার করে ওকে থামিয়ে দিল, "ডেকে আন ওঁকে।"

সবাই বাড়ির দিকে ছুটল, যেখানে ভূদেব অপেক্ষা করছেন। যাওয়ার আগে সুশি অবশ্য কাগজে মোড়া পাঁউরুটিটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলল, "জল দিয়ে যাচ্ছি।"

ভূদেব উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাঝে দু'বার একটু এগিয়ে গোড়ালি তুলে গলা লম্বা করে ওদিকে কী হচ্ছে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিছু দেখতে না পেয়ে বুকের বাঁ দিকে হাত চেপে ধুকপুকুনি ঠিক ছন্দে হচ্ছে কি না বোঝার চেষ্টা করেছেন। জনাদাকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে একগ্লাস জলও খেয়েছেন।

সবাই প্রায় দৌড়েই এল। ঘণ্টুই প্রথম কথা বলল। "জ্যাঠামশাই, পাতালঘরে সত্যি সত্যিই সরা! আমি কথা বললুম!"

"আমিও বলেছি।" ব্যাংকাকা যোগ করলেন।

"বলেছ? ওর চেহারাটা দেখেছ?" ভূদেবের গলায় সন্দেহ।

"না। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।" ঘণ্টুর স্বর মিইয়ে পড়ল।

"এই তো! এই তো তোমাদের বুদ্ধি! ওরা তো শুধু ছদ্মবেশই ধরতে পারে না না, গলার স্বরও নকল করতে পারে।" ভূদেব নিশ্চিত গলায় বুঝিয়ে দিলেন পাতালঘরের ভূতের সঙ্গেই ওরা কথা বলেছে।

কলাবতী বলল, "জ্যাঠামশাই, ওকে তুলে এনে কাল যদি ম্যাচটায় খেলানো যায়, সেই ব্যবস্থা করুন না।"

"ভূত ফুটবল খেলবে, তাই কখনও হয়?"

"যদি হয়।" জোর দিয়ে কলাবতী বলল, "শুধু দেখতে হবে ওই মোটরবাইকে চড়া লোকগুলো যেন ওকে ধরতে না পারে।"

"ধরতে অবশ্য পারবে না, তার আগে লোকগুলোকেই ধরে ফেলবে বোলতার জনগণ। কিন্তু তার আগে পাতালঘরের লোকটা সরা না ভূত সেটার ফয়শলা হওয়া দরকার।"

সুশি বলল, "আমি এইমাত্র ওকে পাঁউরুটি দিয়ে এলুম। ভূতেরা কি পাঁউরুটি খায়? ভূতেরা তো রামনাম শুনলে পালিয়ে যায়, জ্যাঠামশাই আপনি শুনবেন চলুন নিজেই ও রামনাম করবে।"

অকাট্য যুক্তি সুশির। ভূদেবের থতমত অপ্রতিভ মুখ দেখে সবাই উৎসাহ ফিরে পেল। "চলুন, চলুন" বলে ওরা প্রায় টানতে টানতে ভূদেব খেটোকে শিবমন্দিরের কাছে নিয়ে এল।

সুশি গর্তের কাছে বসে বলল, "সরা, এখন তোমায় প্রমাণ করতে হবে তুমি ভূত নও। তা হলে তোমাকে তোলার ব্যবস্থা হবে। আর ওঠার পর কাল তোমাকে ম্যাচ খেলে বি এস সি-কে জেতাতেই হবে। নয়তো বোলতার জনগণ মানে ভূদেবজ্যাঠা তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন না শ্যামপুকুরের হাত থেকে। বুঝেছ ব্যাপারটা?"

"বুঝেছি। কিন্তু কী করে প্রমাণ করব আমি ভূত নই!"

"খুব সোজা কাজ। তুমি খুব চেঁচিয়ে রামধুন গাও যাতে ভূদেবজ্যাঠার কানে পৌঁছোয়। উনি এখানে কাছাকাছিই রয়েছেন। ভাল কথা, তুমি রামধুন জানো তো?"

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম তো? প্রথম লাইনটা শুধু জানি।"

"ফাইন, ওতেই দু'বার রাম শব্দটা আছে। ও কে। এবার গাও।"

গর্তের মধ্যে থেকে ভেসে উঠল সরার তারস্বরে চিৎকার, "রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম।"

সুশি দেখল, ভূদেবের মুখে ভয়, বিস্ময়, আনন্দ সবকিছু মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে উঠছে। তাই দেখে সুশি বলল, "সরা থামলে কেন। রিপিট করে যাও। কাজ হয়েছে। এই রামনামই তোমাকে পাতালঘর থেকে উদ্ধার করবে।"

সরা এরপর না থেমে প্রথম লাইনটা বারবার গাইতে লাগল। ব্যাংকাকা বললেন ভূদেবকে, "দাদা এবার কি বিশ্বাস হচ্ছে পাতালঘরে ভূত নেই। গড়ের মাঠেও ভূত নেই।"

"ব্যাং, তা হলে এতকাল যা বিশ্বাস করে এসেছে বাপ-ঠাকুরদারা, বোলতার জনগণ— সব মিথ্যে!"

ঘণ্টু বলল, "ভাগ্যিস, সরা পালাতে গিয়ে গর্ত দিয়ে পাতালঘরে পড়ে গেছল!"

খোকন বলল, "যদি না ওই ভটভটির লোকগুলো তাড়া করত তা হলে সরা কি শিবমন্দিরের দিকে ছুটত?"

তরুণ বলল, "ছুটলই বা, যদি না বাজ পড়ে দরজাটা ভেঙে যেত তা হলে কি এই গর্তটা তৈরি হত?"

কলাবতী বলল, "এত ঘটনা যে ঘটল, নিশ্চয় এর পেছনে শিবঠাকুরের কোনও ইচ্ছা আছে। ব্যাংকাকা এই শিবের নাম কী?"

ব্যাংকাকা আমতা আমতা করে বললেন, "অফিশিয়াল কোনও নাম আছে কিনা জানি না, তবে এখানকার লোকে বলে গড়ের শিব।"

"গড়ের শিবের ইচ্ছেটা আমার মনে হচ্ছে," কলাবতী থেমে গিয়ে পাঁচ সেকেন্ড পরে বলল, "উনি কলেজে পড়তে চান। ভূদেবজ্যাঠা আপনার কী মনে হয়?"

ভূদেব খেটোর মুখে তখন চাপ থেকে রেহাই পাওয়ার প্রশান্তি। তিনি ছেলেমানুষের মতো উৎসাহে ছটফট করে উঠে বললেন, "কলেজ পরে হবে, আগে চাই বংশীবদন। সুশি, ছেলেটা যে এখনও রঘুপতি করে চলেছে, ওকে থামতে বল। এবার ওকে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যাং, একটা মই জোগাড় করো।"

সুশি গর্তের দিকে মুখ করে বলল, "এই, এই এবার থামো। কাজ হয়েছে, এবার তোমাকে তোলার জন্য মই আসছে। জল তখনই বরং খেয়ো। মনে রেখো, বংশীবদনকে ফাইনালে তুলে দিতে না পারলে জনগণ তোমাকে আবার পাতালঘরে নামিয়ে দেবে।"

"আমি এখন কন্ডিশনে নেই, খেলব কী করে?"

বিরক্ত হয়ে সুশি বলল, "কন্ডিশন ফন্ডিশন বোলতায় চলবে না। ওসব বোলচাল কলকাতায় মেরো।"

ব্যাংকাকা মই আনতে ছুটলেন। একটু পরেই জনার্দন একটা বাঁশের মই ঘাড়ে করে আনল। মইটা গর্তে নামানো হল। উঠে এল স্বরাজ দাস। চারদিকে ভীত চোখে তাকিয়ে সে প্রথমেই বলল, "ওরা ধারেকাছে নেই তো?"

ভূদেব মুঠি শক্ত করে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "আরে, ভূতটুত এ-তল্লাটে

কোনওকালে ছিল না, এখনও নেই। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এই তো আমরা এখানে রয়েছি।"

"আজ্ঞে ভূত নয়, শ্যামপুকুর ক্লাবের ওরা। এই দেখুন আমার হাঁটু কাঁপছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।" বলতে বলতে সরা উবু হয়ে বসে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ওরা তাড়াতাড়ি তাকে তুলে বসাল, তারপর চ্যাংদোলা করে বাড়িতে এনে একতলার বৈঠকখানা ঘরের চৌকিতে শোওয়াল। ব্যাংকাকা সবাইকে সাবধান করে বললেন, "খবরদার, সরার কথা এখন বোলতার কাকপক্ষী কেন, মশামাছিরাও যেন জানতে না পারে। বিদ্যুৎপুরের কানে গেলেই ওরা কলকাতা থেকে এগারোটা প্লেয়ার এনে টিম করে ফেলবে।"

ঘণ্টু তাচ্ছিল্যভরে বলল, "জ্যাঠামশাই, সরা কত লাখ টাকার প্লেয়ার, জানেন? কলকাতার এগারোটা কেন, বাইশটা প্লেয়ার এলেও ওকে আটকাতে পারবে না।"

কাতরস্বরে সরা বলল, "কিন্তু ওই মোটরবাইক দুটো এলে আমি কী করব!"

জনার্দন একটা জাগে জল আনল। সরা প্রায় এক নিশ্বাসে জাগটা শেষ করে বলল, "আমার বাবাকে ডেকে আনবেন?"

"না, না, না।" ভূদেব আঁতকে উঠলেন, "বাবাটাবা এখন নয়। শুনলে না, মশামাছির কানে পর্যন্ত তোমার কথা যেন না পৌঁছোয়। তুমি এখন এই বাড়িতে থাকবে। কোনও ভয় নেই এখানে। ব্যাং সদর দরজা বন্ধ করে হুড়কোটা দিয়ে দাও।"

"আচ্ছা জ্যাঠামশাই," কলাবতীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেছে। "সরা যদি চেহারায় একটু ভোল পালটায় তা হলে তো ওকে চিনতে পারবে না শ্যামপুকুরের লোকগুলো।"

"তার মানে?" ধড়মড় করে চৌকিতে উঠে বসল সরা।

কলাবতী ওকে সাহস দেওয়ার জন্য বলল, "ধরো খেলা শুরুর দশ সেকেন্ড আগে তোমাকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হল ক্লাবঘর থেকে ঢেকেঢুকে আড়াল করে নিয়ে গিয়ে। মাঠে তুমি সবসময় মধ্যিখানে থেকে খেলার চেষ্টা করবে, মাঠের সাইডের দিকে একদম আসবে না। দূর থেকে তোমার হাঁটুকে দানাপানি খাওয়াতে গেলে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান শ্যুটার আনতে হবে। আমাদের দেশে তেমন চ্যাম্পিয়ান কেউ নেই। সুতরাং—"

সুশি এবার জুড়ে দিল, "তা ছাড়া তোমার ভোলটাও একটু পালটে দিলে

চট করে ওরা চিনতে পারবে না, এমনকী, কোলতার জনগণও নয়। তারা তো বলতে গেলে তোমাকে দেখেইনি শুধু নামটাই শুনেছে। আমরা রটিয়ে দোব কটক থেকে প্লেয়ার আনিয়েছি, দু'-চারটে ওড়িয়া কথা বলতে পারবে তো?"

"দারুণ বুদ্ধি তো তোদের।" ভূদেব আপ্লুত মুখে বললেন, "বাবা স্বরাজ, আর তুমি আপত্তি কোরো না।"

"করবে না জ্যাঠামশাই, ও খুব বাধ্য ছেলে, আপনার মতো বয়স্ক লোকের অনুরোধ ও ফেলবে না। তা ছাড়া আমি তো ওর বাড়িতে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে বলব শ্যামপুকুরের অ্যাডভান্সটা ফিরিয়ে দিতে। সেটা ফিরিয়ে দিলে সরার হাঁটু নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। অবশ্য শ্যামপুকুর নিতে রাজি হবে কি না জানি না। থানায় ডায়েরি করে বলেছে টোকেন হারিয়ে গেছে, আবার খবরের কাগজের লোককে বলেছে শ্যামপুকুর জোর ওকে দিয়ে মিথ্যে ডায়েরি করিয়েছে, এতে তো শ্যামপুকুরের লোকেরা খেপে রয়েছেই।"

"বাবা স্বরাজ, তোমার মতো এমন কীর্তিমান অকুতোভয় ছেলে সামান্য ওই চারটে লোকের ভয়ে মাঠে নামবে না তাই কি হয়?" ভূদেব সরার পিঠে হাত বুলোলেন। সরা মাথা নামিয়ে বসে ছিল। তার মুখে অনুশোচনা। মুখ তুলে সে কলাবতীকে বলল, "টোকেনটা ফেরত দেবে তো?"

"দোব।"

স্নান করে, পেটভরে ভাত আর সুশির ধরা মাছগুলোর ঝোল খেয়ে সরা চার ঘণ্টা টানা ঘুমোল। ওকে ব্যাংকাকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাত্রে আস্ত একটা মুরগির রোস্ট খাওয়াবেন। ঘুম থেকে সে যখন উঠল তখন ভয় অনেকটা কেটে গেছে। এখন সে এইটুকু অন্তত বুঝেছে যে-পরিস্থিতিতে সে পড়েছিল সেটা অতটা বিপজ্জনক অবস্থায় আর নেই। শ্যামপুকুরের লোকেরা আর বোধহয় তাকে খুঁজতে আসবে না। তবু সাবধানে থাকতে হবে। এই বাড়ির লোকেরা, বিশেষত মেয়ে দুটি তার বন্ধুই, তার ভাল করতেই চায়, তবে বড্ড চিমটি কেটে কথা বলে। কী আর করা যাবে, যে-কাজ সে করে ফেলেছে তাতে সারা দেশে যদি ছ্যা ছ্যা পড়ে যায় তাতে মাথা নিচু করে থাকা ছাড়া আর কী সে করতে পারে! তবে ওই কালো লম্বা মেয়েটার একটা কথা তার

মাথায় খটখট করে গাঁট্টা মেরে চলেছে— 'তুমি তো ফুটবলার হতে চাও না, টাকা কামাতে চাও।' একটা মেয়ের মুখে এমন কথা শুনলে লজ্জা করে।

ইতিমধ্যে কলাবতী ঘণ্টুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলেছে সরার ভোল পালটানোর ব্যাপারে কী করা যায়। ঘণ্টুই বুদ্ধিটা দিল। "ওকে পরচুলা পরিয়ে গোঁফদাড়ি লাগিয়ে খেলতে নামালে কেমন হয়? আমাদের এখানে 'বোলতার চাক' নামে একটা নাটকের দল আছে। রাঙাদা আমার খুড়তুতো দাদা, সে ওই চাকের মেকআপ ম্যান। ওর কাছে মেকআপের সব জিনিস আছে। রাঙাদাকে বললেই করে দেবে।"

শুনেই তো কলাবতী প্রায় লাফিয়ে উঠল। "ঠিক হ্যায়। লাগাও মেকআপ।" বলে সে সুশির পিঠে একটা কিল মেরে বসল। ঘণ্টু ছুটল রাঙাদার কাছে। কলাবতী বৈঠকখানা ঘরে এসে সরাকে বলল, "ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমাকে মেকআপ নিতে হবে।"

কথাটা সরার মাথায় ঢুকতে আধ মিনিট সময় নিল। "মেকআপ! কেন, আমায় কি যাত্রা করতে হবে?"

"প্রায় তাই।" গম্ভীর মুখে সুশি বলল, "তোমার হাঁটুর গঙ্গাযাত্রা বন্ধ করতে তোমাকে ফুটবল যাত্রা করতে হবে। খুব সামান্য ব্যাপার, দাড়ি-গোঁফ চুল পরতে হবে। কেউ তা হলে চিনতে পারবে না, তুমি সেফ থাকবে।'

গত চব্বিশ ঘণ্টায় সরার মুখেএই প্রথম হাসি দেখা দিল। "দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে একবার ছোটবেলায় স্কুলে থিয়েটার করেছিলুম। গোঁফটা ভীষণ সুড়সুড়ি দিচ্ছিল নাকে। এমন হেঁচে ছিলুম যে, খুলে পড়ে যায়। যদি সেরকম এবারও হয়?"

"হবে না, হবে না।" কলাবতী ওকে আশ্বস্ত করল। "রাঙাদার একটা স্পেশাল আঠা আছে। গোঁফ-দাড়ি এমন এঁটে থাকবে যে, কম করে তিনদিন তেলে চুবিয়ে রাখলে তবেই তোলা যাবে।"

"তিনদিন! আমার দাড়ি-গোঁফ থাকবে? না আমি মেকআপ নোব না।"

তাড়াতাড়ি সুশি বলল, "কালু ভুল বলেছে। তিনদিন নয় ঘণ্টাতিনেক জম্পেশ হয়ে এঁটে থাকবে। তুমি পারবে না তিনঘণ্টা চুল, দাড়ি-গোঁফ সহ্য করতে?"

সরা মাথা নেড়ে যেতে থাকল, ওরাও তাকে বুঝিয়ে যেতে লাগল যতক্ষণ না রাঙাদা হাতে একটা টিনের ছোট্ট বাক্স আর একটা পরচুল নিয়ে হাজির হল। খ্যাংরাকাঠির মতো দেহ, পুরু কাচের চশমা, ধুতির ওপর বুশশার্ট পরা

রাঙাদার বয়স তিরিশ না পঁয়তাল্লিশ বোঝা যায় না।

"পরচুল নিয়ে কী ঝামেলা রে বাবা।" ঘণ্টু হাঁফ ছাড়ল। "সবই বুড়োদের সাদা পরচুল, একটা ছিল কটা রঙের সাহেবের পার্টের জন্য। শেষকালে পাওয়া গেল একটা কালো চুল। সরা পরে দ্যাখ তো।"

সরা পরার আগেই রাঙাদা বলল, "আমার এটা তো ছোট্ট রাজপুত্তুরের মাথায় লাগাবার জন্য। কিন্তু এর মাথাটা যে দুর্বাসার মতো বড়, তার ওপর অত লম্বা চুল, এই পরচুল তো ওর মাথায় বসবেই না।" রাঙাদার প্রবল সন্দেহ মাথা নাড়ার মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

"তা হলে কী হবে?" কলাবতী হতাশ স্বরে বলল।

"কী আবার হবে। চুল কেটে মাথাটার সাইজ কমাতে হবে।" সুশি চটপট সমাধান করে দিল মাথা সমস্যার।

"না, না, চুল আমি কাটব না।" সরা আঁতকে উঠে বসল।

"কেন কাটবে না! একমাসের মধ্যেই যেমন ছিল তেমনই হয়ে যাবে। রাঙাদা, আপনার কাছে কাঁচি আছে?"

"নিশ্চয় আছে। ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, ব্লেড ছাড়া বড় বড় মেকআপ ম্যানদের কি চলে? একবার কেদার রায় পালা হচ্ছে। কার্ভালো বলল পিস্তল না হলে স্টেজে নামবে না। কোথায় পিস্তল! মনে পড়ল পঞ্চাননের ছেলের হাতে যেন টয় পিস্তল দেখেছি। দৌড়ে গেলুম। একটা হজমোলার শিশি দিয়ে নিয়ে নিলুম। ওটা আর ফেরত দিইনি।" বলতে বলতে রাঙাদা টিনের বাক্সটা খুলে একটা একবিঘত লম্বা কাঁচি আর চিরুনি বার করল। "এবার তুমি এই চেয়ারটায় বোসো। জাস্ট টু মিনিট লাগবে।"

রাঙাদা চিরুনি দিয়ে চুল টেনে মুঠোয় ধরে কাস্তে দিয়ে ধানকাটার মতো কাঁচি চালাল। শব্দ হচ্ছে কচকচ, গোছা গোছা চুল সরার কাঁধে, বুকে ঝরে পড়তে লাগল। হাত দিয়ে ঘাড়ের কাছ থেকে একগোছা চুল তুলে চোখের সামনে ধরেই সরা চেঁচিয়ে উঠল, "এ কী, আমার মাথা যে আপনি খালি করে দিলেন!" সে মাথায় হাত বুলিয়ে চুলের পরিমাণ মেপে প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, "একমাস কী, এ তো এক বছরের ধাক্কায় পড়ে গেলুম।"

সুশি ফিসফিস করে কলাবতীর কানে বলল, "কালু সর্বনাশ করেছে রে। এ কী চুলকাটা! ধানকাটার পর মাঠ যেমন দেখায় সরার মাথা তো তাই হয়ে গেছে!"

"চুপ কর। দেখার জন্য আয়না চাইলে মুশকিলে পড়ে যাব।"

রাঙাদা পরচুলাটা সরার মাথায় বসাল। মাথার মাপের থেকে সেটা এখনও ছোট। রাঙাদা ঠোঁট কামড়ে একমিনিট সরার মাথার দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁচিটা তুলে নিল। আঁতকে সরার চোখদুটো বড় হয়ে উঠল। রাঙাদা সরার ডাইনে বাঁয়ে পেছনে ঘুরে ঘুরে ওর মাথাটাকে জরিপ করতে করতে বলল, "মাথাটাকে যদি ঝুনো নারকোলের সাইজে আনা যায় তা হলে—" কথা শেষ না করেই কাঁচি দিয়ে কচকচ করে কিছু চুল উচ্ছেদ করে দিল।

সরা সটান দাঁড়িয়ে উঠল। দাঁত চেপে বলল, "আপনার কাছে আয়না আছে?"

"অবশ্যই।" রাঙাদা গর্বিত স্বরে বলল, "বড় বড় মেকআপ ম্যানদের কাছে আয়না থাকবে না, এ কি একটা জিজ্ঞেস করার মতো কথা হল?" বাক্স থেকে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো এক্সারসাইজ খাতার মাপের আয়না বার করে সরার হাতে দিল। মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আয়নায় দেখতে দেখতে সরার চোখ জলে ভরে উঠল।

কলাবতী ফিসফিস করে বলল, "সুশি, এবার কেটে পড়।"

কেটে পড়ার আগেই সরা দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা গর্জন করল, "এই, তোমরা দু'জন আমার এই সর্বনাশটা করালে। তোমাদের জন্যই আমার মাথাটা গেল।"

"আহাহা, রাগছ কেন, মাথাটা তো তোমার অনেক আগেই গেছে। এখন ওটাকে বাঁচাবার চেষ্টা চলছে।" সুশি সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলল।

"কী এমন খারাপ দেখাচ্ছে! চমৎকারের মাথা। আরও ভাল দেখাবে যদি ন্যাড়া হয়ে যাও, তা হলে পরচুলটাও ফিট করবে, তাই না রাঙাদা?"

কলাবতীর পরামর্শে ঝকঝক করে উঠল রাঙাদার চোখ। "নিশ্চয় নিশ্চয়। ন্যাড়া হলে দারুণ খুলে যাবে মাথার রূপ। পরচুলটাও এঁটে যাবে।"

কলাবতী জানতে চাইল, "আপনার কাছে ক্ষুর আছে?"

"কী যে বলো, বড় বড় মেকআপ ম্যানদের—"। রাঙাদা বাক্স থেকে একটা ক্ষুর বার করল। "জল আনো, মাথাটা ভেজাতে হবে।"

সুশি ছুটল জল আনতে। সরা আয়নায় বারবার মাথাটা দেখে বুঝে গেল, চুলের এই অবস্থা দেখলে লোকে হাসবে, পাগল বলবে। তার থেকে বরং ন্যাড়া হয়ে যাওয়াই ভাল। তবু এত যত্নে তৈরি করা চুলের শোভা এভাবে ধ্বংস হলে মন খারাপ না হয়ে যায় না। সরা যারপরনাই মনমরা হয়ে পড়ল।

সরার মুখের করুণ অবস্থা দেখে কলাবতী বলল, "দুঃখ হচ্ছে? আরে পৃথিবীর সবথেকে দামি ফুটবলার ব্রাজিলের রোনাল্ডোও তো ন্যাড়া, টিভিতে ওর খেলা দ্যাখোনি?"

"দেখেছি, কার সঙ্গে কার তুলনা করছ। আমি ন্যাড়া হলে কি রোনাল্ডো হয়ে যাব?"

"খানিকটা তো হয়ে যাবে। কলকাতার মাঠে সেটাই যথেষ্ট। ন্যাড়া রোনাল্ডো পঞ্চাশ কোটি পেলে, ন্যাড়া স্বরাজ পাঁচ লাখ তো পেতেই পারে।"

রাঙাদা ক্ষুরে শান দিচ্ছিল। সুশি জগভরতি জল এনে সরার মাথায় ঢেলে দিল। সরা ভয়ে ভয়ে বলল, "আপনি ক্ষুর চালাতে জানেন তো?"

"কী যে বলো। মেকআপ ম্যানদের ক্ষুর ব্লেড কাঁচি—" বলতে বলতে রাঙাদা কাজ শুরু করে দিল। মিনিটদশেকের মধ্যেই সরার মাথা সাফ হয়ে গেল। আয়নাটা মুখের সামনে ধরে বিড়বিড় করে সরা বলল, "সত্যিই পাপ করেছিলুম তা নইলে কি আজ এই অবস্থা হয়!"

"আচ্ছা কালু, সরাকে পরচুল পরাবার আর দরকার কী? এই তো দিব্যি ওকে অচেনা লাগছে।" সুশি দু'পা পিছিয়ে চোখ দুটো সরু করে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল।

"কিন্তু আমি তো এখনও ওকে চিনতে পারছি। আমার কাকা একবার বলেছিল ভুরু কামিয়ে দিলে মানুষকে নাকি একদম চেনা যায় না। ক্রিমিনালরা লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তাই করে। এজন্যই ভুরু কামানো লোক দেখলেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করে। অবশ্য সরাকে করবে না। এখন থেকে তো ও ইন্ডিয়ার রোনাল্ডো, কে ওকে অ্যারেস্ট করবে!"

সরা চোখ পিটপিট করে কলাবতীর কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "তুমিই হচ্ছ পালের গোদা। যত বদবুদ্ধি বেরোয় তোমার মাথা থেকেই। চুল গেছে, এবার ভুরু দুটোকেও লোপাট করাতে চাও। এই বলে দিচ্ছি, আর একটা কথাও আমি শুনব না, তাতে যদি দানা খেতে হয় খাব।... এই যে দাদা, পরচুলটা মাথায় আঁটুন তো।"

রাঙাদা পরচুল সরার মাথায় টেনেটুনে বসাল। কিন্তু ঠিকমতো আঁটল না, সামান্য ছোট হয়েছে। সরা হাত দিয়ে চেপে বসাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "হেড করতে পারব তো?"

কলাবতী বলল, "এখানে তো বল নেই, তা হলে ট্রায়াল দিয়ে দেখা যেত।"

সরা ডান দিক থেকে উঁচু হয়ে আসা একটা কাল্পনিক বল বাঁ দিকের গোলের দিকে হেড করার জন্য লাফিয়ে উঠে বাঁ দিকে সজোরে মাথাটা ঝটকা দিয়ে ঘোরাল। মাথা থেকে পরচুলটা ছিটকে উড়ে গেল। লুফে নিল কলাবতী।

মাথা নেড়ে সরা বলল, "চলবে না। একদম অচল। শেষে মাঠের মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

কলাবতী বলল, "তা হলে দাড়িটা—"

"একদম নয়। কেউ যদি দাড়ি টেনে দেয়?" সরা ভ্রূ তুলে বলল।

"তা হলে ভুরু দুটো—" রাঙাদা ক্ষুরটা বাগিয়ে এগোল।

পিছিয়ে গিয়ে সরা বলল, "আমি তো বলেইছি ক্ষুর আর শরীরে ঠেকাতে দোব না। এই ন্যাড়া মাথা নিয়েই কটকের প্লেয়ার হয়ে নামব। যতদিন না ভালমতো চুল গজায় একটা টুপি পরতে হবে। হ্যাঁরে ঘণ্টু আছে কিছু? আর আমায় পরার মতো কিছু এনে দে, খালি গায়ে আর কতক্ষণ থাকব।"

ঘণ্টু বলল, "বাড়ি গিয়ে দেখছি, আমার মাপের প্যান্টশার্ট হয়ে যাবে বোধহয়।"

"আর কলাবতী, কালই কিন্তু বাবার সঙ্গে দেখা করে টাকাটা শ্যামপুকুরের ব্রজদাকে ফেরত দিয়ে কোর্ট পেপারটা ফিরিয়ে আনতে বোলো। এই হয়েছে এক যন্ত্রণা। টোকেনটা ঠিকমতো রেখে দিয়েছ তো?"

কলাবতী বলল, "রেখেছি। ফাইনাল খেলার পর পাবে।"

"সে কী!" সরা প্রায় চিৎকার করে উঠল। "কথা ছিল একটা ম্যাচ, শুধু সেমিফাইনালটা। এখন বলছ ফাইনালের পর?"

"বংশীবদন না পেলে কলেজ হওয়া আটকে যেতে পারে। এখানকার লোকজন এখন মেতে রয়েছে এই শিল্ড নিয়ে। বোলতার টুর্নামেন্ট কিন্তু বোলতা একবারও জেতেনি। তুমি যদি জিতিয়ে দাও এরা তা হলে এত খুশি হবে যে, কেউ আর জমিটায় কলেজ করতে আপত্তি করবে না। তুমি জানো না, শিবমন্দিরের সামনের জমিটা সুশিরা দান করতে চেয়েছিল কলেজ করার জন্য। ভূত আছে বলে এখানকার বহু লোকের আপত্তিতে জমিটা নিতে সাহস করেনি কলেজ কমিটি। ভূতের বাসা যে ওখানে নেই তা তো কমিটির চেয়ারম্যান ভূদেবজ্যাঠা নিজেই দেখেছেন। পাতালঘরে রাত কাটিয়ে তুমি তা প্রমাণও করে দিয়েছ। এখানকার কেউ এখনও সেটা জানে না কিন্তু জানিয়ে দিতে হবে। তুমি তা নিজের মুখে জানাবে।... প্লিজ সরা একটা ভাল কাজ

করো। যে অন্যায় করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত হবে।" মৃদু গভীরস্বরে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে কলাবতী হাতজোড় করে সরার দিকে তাকিয়ে রইল।

সরা মুখ নিচু করে কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে মুখ তুলে বলল, "ঠিক আছে, আমি দুটো ম্যাচই খেলব, অবশ্য যদি সেমিফাইনালটা জিততে পারি। ঘণ্টু একজোড়া বুট কারও কাছ থেকে চেয়ে এনে দে আর শর্টস।"

ঘণ্টু বলল, "কাল সকালেই পেয়ে যাবি।"

পরদিন সকালে ঘণ্টু আর ব্যাংকাকার সঙ্গে সুশি গেল সরাদের বাড়ি দাসপাড়ায়। রাত্রে কলাবতী সুশির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে, সে বাইরের মেয়ে, সুশি বোলতার। এই ব্যাপারে বাইরের কারুর নাক গলানোর থেকে স্থানীয় কেউ কথা বললে সেটা বেশি গুরুত্ব পাবে। সরার কাছে ওরা শুনেছে নগদ সাড়ে তিন লাখ টাকা একটা বড় অ্যাটাচি কেসে ভরে শ্যামপুকুরের ব্রজদা এই বোলতায় এসে তার বাবা বিরাজ দাস আর মা সুখদা অর্থাৎ সুখি দাসের হাতে দিয়ে গেছে। তখন সরা ছিল ইন্ডিয়া ক্যাম্পে সল্টলেকের সাই হস্টেলে। ব্রজদা টোকেনটা চেয়েছিল, সরা বলেছিল টোকেন ব্রাদার্সের পতিত ভট্চাযের কাছে রয়ে গেছে। আসলে মিথ্যে বলেছিল, মিথ্যে ডায়েরি করেছিল, ওটা তখন তার কাছেই ছিল, এখন সেটা কলাবতীর হেফাজতে।

কলাবতী ছিপ নিয়ে নৌকোয় বসে ছিল ঘাট থেকে কিছুটা দূরে, দিঘিতে। দু'বার ছিপে টান দিয়ে একটাও মাছ পায়নি। বিরক্ত হয়ে দাঁড় বেয়ে ঘাটের দিকে আসছে, তখন সুশির ডাক সে শুনতে পেল।

"কী হল, রাজি?" নৌকো থেকে নেমে ব্যগ্র কলাবতী জানতে চাইল।

"রাজি। কোনওমতে পালিয়ে বেঁচেছি।" সুশি হাঁপ ছাড়ার ভাব দেখিয়ে বলল, "কী একখানা মহিলা রে বাবা! বলে 'টাকাফাকা ফেরত হবে না। আমাদের ভয় দেখিয়ে গেছে ছোট বন্দুক দেখিয়ে বলেছে দানা খাইয়ে দেবে। ঠিক আছে আমরাও ঘোলের পানা খাইয়ে ছাড়ব।'... টাকা ছাড়বে না কালু। সরার বাবা মনে হল নিমরাজি কিন্তু মা একদম নয়।"

কলাবতী বলল, "তোরা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিলি?"

"ব্যাংকাকা যতটা সম্ভব বলার বলেছেন। লোকগুলো আমাদের বাড়িতে এসে সরাকে খুঁকে গেছে, ওদের সন্দেহ, সরা আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে

আছে। আমরা এখন বিপদে পড়েছি, বলে গেছে টাকা ফেরত না পেলে সরার হাঁটুতে গুলি করে চিরতরে ওর খেলার জীবন শেষ করে দেবে। ব্যাংকাকা অনেক করে বোঝাল কিন্তু সরার মা কিছুতেই বুঝবে না। দুটো ক্লাব থেকে সাড়ে সাত লাখ টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছে, এত টাকা ওরা হাতে পেয়ে কীরকম যেন আধাপাগল হয়ে গেছে। ছেলের হাঁটু যাবে তো যাক তবু টাকা ছাড়বে না।" সুশি এক নিশ্বাসে বলে গেল।

"ওদের বাড়িতে আর আছে কে?"

"দুটো দিদি, বিয়ে হয়নি।" ঘণ্টু বলল।

সুশি যোগ করল, "বাড়িটা টালির চালের। প্লাস্টার খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে, দু'খানা মাত্র ঘর আর একটা রক। তার মেঝেতে সিমেন্ট নেই। আমরা ভেতরে আর ঢুকিনি। সরার মা আরও কী বলল জানিস, পরের বছর ছেলে শ্যামপুকুরে খেলবে এই টাকা তারই অ্যাডভান্স, এ বছর ছেলে খেলবে ব্রাদার্সে!"

কলাবতী বলল, "যদি সরাকে সামনের বছর শ্যামপুকুরের দরকার না হয় তা হলে সাড়ে তিন লাখ টাকা তো ফেরত দিতে হবে।"

সুশি বলল, "ব্যাংকাকা তাও বলেছেন। সরা যদি বড় কোনও চোট পায়, ওর খেলা যদি পড়ে যায় তা হলে শ্যামপুকুর তো ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু মহিলার এক কথা, যে টাকা ঘরে একবার ঢুকেছে আর তা বেরোবে না।"

ঘণ্টু বলল, "সুখিকাকিমা খুব কষ্ট করে সংসার চালান। বিরাজকাকা শ্যাওড়াফুলিতে একটা মিষ্টির দোকানে কাজ করেন। বড় মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে, পাত্র প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়, চেয়েছে মোটরবাইক, কালার টিভি আর একটা ঘর তোলার টাকা।"

কলাবতী কিছুক্ষণ ঘণ্টুর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "চলো, সরার সঙ্গে একবার কথা বলি। ওর বুট আর প্যান্ট জোগাড় হয়েছে?"

"হয়েছে।"

ব্যাংকাকা কথা বলছিলেন সরার সঙ্গে, আজকের খেলা প্রসঙ্গে। লোক লাগিয়ে জেনেছেন, কলকাতার প্লেয়াররা রি-প্লে খেলার জন্য যে টাকা চেয়েছে বিদ্যুৎপুর তা দিতে পারবে না তাই কলকাতা থেকে কেউ আসছে না। এটা রীতিমতো সুখবর। আরও বললেন তিনি রটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন

কটক থেকে ওড়িশার সন্তোষ ট্রফি প্লেয়ার সরানন্দ মহাপাত্র তারকেশ্বরে মানতের চুল দিতে এসেছিল, ওখানকার এক পাণ্ডাকে ধরে তিনি সরানন্দকে বোলতায় এনে ফেলেছেন। আজ সে বি এস সি-র স্ট্রাইকার খেলবে।

কলাবতীদের দেখে ব্যাংকাকা বললেন, "সরার মা যা বলল তা আমি ওকে বলেছি। মোটরবাইক অর যখন আসেনি মনে হয় আর আসবে না। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাটা তো রয়েই গেল।"

"তা তো রইলই।" সরার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

চিন্তিত মুখে কলাবতী বলল, "অত টাকা বাড়িতে রাখাটাও তো বিপজ্জনক। বাড়িও তো খুব শক্তপোক্ত নয়। যে-কোনওদিন ডাকাতি হয়ে যেতে পারে।"

সুশি বলল, "ডাকাতরা এখন যা সাহসী হয়েছে. কলকাতায় দিনের বেলা ভিড় বাসেও ডাকাতি হচ্ছে, ভিড় ট্রেনে গুলি করে দিব্যি পালিয়ে যাচ্ছে।" বলতে বলতে সে শিউরে উঠল। "দরজার যা অবস্থা দেখলুম একটা টোকা দিলেই ভেঙে পড়বে। তারপর বাক্স ভেঙে টাকা বার করে নিতে দু'মিনিট।" সে দুটো আঙুল তুলে দেখাল।

"টাকা পাওয়া অত সোজা নয়।" সরা তাচ্ছিল্যভরে বলল। "ব্রাদার্সের টাকা পলিথিনের চারটে ব্যাগে মুড়ে মা পেছনের ডোবায় ইট বেঁধে ডুবিয়ে রেখেছে।"

"আর শ্যামপুকুরের টাকা?" কলাবতী উৎকণ্ঠিত হয়ে জানতে চাইল।

"তারও ব্যবস্থা হয়েছে। রান্নাঘরের মাচায় চেলাকাঠের ভেতর থলেয় ভরে অ্যাটাচিটা রাখা আছে। ডাকাতের বাবাও খুঁজে পাবে না।" সরার দু'চোখে চাপা গর্ব। "বুদ্ধিটা আমারই।"

"যাক, ডাকাতরা তা হলে খুঁজে পাবে না।" কলাবতী হাঁফ ছাড়ল। "কিন্তু তুমি বাঁচবে কী করে? শ্যামপুকুর বলছে তুমি তাদের। ব্রাদার্সও ক্লেম করছে। এই টানাপোড়েনে তুমি তো কোনওদিকেই যেতে পারবে না।"

সরা মুষড়ে পড়ল। "একটা ক্লাবের টাকা ফিরিয়ে না দিলে এ বছরটা আমার নষ্ট হবে। আই এফ এ আমায় ট্রান্সফার দেবে না। মা যে কী সর্বনাশ আমার করতে বসেছে তা জানে না।" সরা মাথা নিচু করে দু'হাতে কপাল চেপে ধরল।

ঘরের সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সরার মানসিক যন্ত্রণা দেখে। কলাবতী ফিসফিস করে সুশির কানে কয়েকটা কথা বলে সরাকে বলল,

"তুমি এই নিয়ে আর ভেবো না, আজকের ম্যাচটা খোলা মনে খেলে দাও। টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারটা আমি দেখছি। পতিত ভট্‌চাযের ফোন নম্বর আর ঠিকানাটা দাও। উনি করেন কী?"

"হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।"

"তাই নাকি! আমার কাকাও তো হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে। সরানন্দ মহাপাত্র, এবার ম্যাচের কথা ভাবো। সুশি, আয় তো একটু কথা আছে।" কলাবতীর সঙ্গে সুশি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দোতলায় শোওয়ার ঘরে এসে কলাবতী বলল, "আবার সেই স্কুল স্পোর্টসের গো অ্যাজ ইউ লাইকের মতো ব্যাপারটা করলে কেমন হয় বল তো? সেদিন গুন্ডা সেজেছিলুম, এবার ডাকাত। বিখ্যাত মেকআপ ম্যান রাঙাদাকে দরকার, আর ঘণ্টুকেও।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সুশি বলল, "তার মানে!"

"বলছি।"

কলাবতী বুঝিয়ে বলতে শুরু করল।

* * *

যত ভিড় হওয়ার কথা তার দ্বিগুণ ভিড় হয়েছে বোলতার ফুটবল মাঠে শুধু ওড়িশার সরানন্দকে দেখার জন্য। ব্যাংকাকার কেরামতি আছে, সকালে কয়েক ঘণ্টা সাইকেল রিকশায় মাইক আর চোঙা দিয়ে যে প্রচার তিনি ক্লাবের দুটি ছেলেকে দিয়ে চালিয়েছেন তাতেই দর্শকসংখ্যা হাজারতিনেক বেড়ে প্রায় ছ'হাজারে পৌঁছে গেছে। এটা বোলতার মাঠের রেকর্ড।

খেলা শুরুর দশ মিনিট আগে একটা বেডকভারে মাথা আর শরীর মুড়ে সরা পৌঁছোল ক্লাবঘরে। ড্রেস করে বুট পায়ে দিতে গিয়ে ঝামেলা হল। বুটটা ছোট। বুড়ো আঙুল দুটো কুঁকড়ে গুটিয়ে না রাখলে জুতোর মধ্যে পায়ের পাতা ছড়ানো যাচ্ছে না। কী করা যায়। ভূদেব খেটো একজনকে ডেকে বললেন, "দৌড়ে ফণী চাটুজ্যের বাড়িতে যা। বুটের বুড়ো আঙুলের জায়গা দুটো বঁটি দিয়ে এক্ষুনি কেটে নিয়ে আয়।" রেফারি তখন মাঠে টিম নামার জন্য হুইসল বাজাচ্ছেন।

যার বুট ধার করা হয়েছে সে বেঁকে বসল। বুট সে কাটতে দেবে না। ব্যাংকাকা আর ভূদেব একান্তে ছোট্ট একটা বৈঠক সেরে তাকে জানিয়ে

দিলেন, নতুন বুট কিনে দেওয়া হবে। বিদ্যুৎপুর টিম মাঠে নেমে পড়েছে। রেফারি ঘনঘন হুইসল দিচ্ছেন বি এস সি-কে মাঠে নামার জন্য কিন্তু নামবে কী করে, সরানন্দের কাটা বুট তখনও যে ফিরে আসেনি।

ক্লাবঘরের সামনে দড়ি দিয়ে ঘেরা ভি আই পি এনক্লোজার। সেখানে চেয়ারে বসে কলাবতী, সুশি আর ঘণ্টু। তাদের কিছুটা উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে। বি এস সি দল মাঠে নামল সরানন্দকে ছাড়াই। বুট তখনও এসে পৌঁছোয়নি। ব্যাংকাকা মাঠে গিয়ে রেফারিকে অনুরোধ করলেন পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে খেলা শুরু করতে। জেলার পাশকরা রেফারি অনুরোধ রক্ষা না করে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেতে কিক-অফের হুইসল দিলেন। তিন মিনিটের মাথায় বি এস সি সেমসাইড গোল খেয়ে বসল। স্টপার একটু জোরেই আচমকা ব্যাক পাস করেছিল প্রথম পোস্টে। গোলকিপার ছিল দ্বিতীয় পোস্টে। এরপরই মাঠ ঘিরে তুমুল হাততালি উঠল ওড়িশার সরানন্দ মহাপাত্রকে মাঠে নামতে দেখে। ওরা তিনজন নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে হাততালি থামার আগেই চুপিসারে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল।

সুশি বলল, "কালু তাড়াতাড়ি কর, দৌড়ো।"

ঘণ্টু বাধা দিয়ে বলল, "একদম নয়, লোকের চোখে পড়ে যাবে, বরং একটু জোরে হাঁটো। রাঙাদা রেডি হয়ে থাকবে বলেছে।"

রাস্তায় জনমানুষ নেই যে ওরা চোখে পড়বে। মানুষজন তো এখন ফুটবল মাঠে। সুশিদের বাড়িতে পৌঁছোতে মিনিট পাঁচেক পাগল। রাঙাদা সত্যিই রেডি হয়ে ছিল মেকআপের বাক্স খুলে। "আসছি।" বলেই কলাবতী ছুটে দোতলায় শোয়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। একটু পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল অন্য এক কলাবতী। পরনে নীল জিন্‌স, পায়ে স্নিকার, ঘণ্টুর এনে দেওয়া ঢলঢলে কালো ফুলশার্ট, চোখে সানগ্লাস, চুল টেনে গোছা করে রাবার ব্যান্ড দিয়ে প্রাচীন জাপানি যোদ্ধা সামুরাইদের মতো বাঁধা। মাথায় ক্রিকেটারদের ক্যাপ। বারান্দার দু'ধার দেখে নিয়ে ছুটে নেমে এল পাতলা গড়নের শ্যামলারঙের ছিপছিপে একটা ছেলে।

নীচের ঘরে ঢুকতেই কলাবতীকে দেখে ঘণ্টু আর রাঙাদার চক্ষু চড়কগাছ। সুশি বলল, "হাই।"

"কেয়া হাই হাই করতা।" কর্কশ চোয়াড়ে স্বরে কলাবতী বলল। "জানতা হাম কৌন হ্যায়? ভাগলপুরকা কালুপ্রসাদ পাসোয়ান হ্যায়। হাই মাই করেগা

তো এক ঝাপ্পড় লাগায়গা।" বলে সে সুশির দিকে এগিয়ে চড় মারার জন্য হাত তুলল।

"কালুজি মুঝে মাফ কিজিয়ে।" সুশি মুখে ভয় ফুটিয়ে হাত জোড় করল।

রাঙাদা বলল, "তা হলে কার্ভালোর দাড়িটা লাগিয়ে দিই।"

কলাবতী বলল, "না, না, সাহেবের কটা দাড়ি নয়।"

"তা হলে শাজাহানের দাড়ি?"

"ফ্রেঞ্চকাট নেই?" সুশি বলল।

"কী যে বলো, বড় বড় মেকআপ ম্যানদের কাছে—"

থুতনিতে দাড়ি লাগাবার পর সবাই নানান দিক থেকে কলাবতীকে দেখল। ঘণ্টু বলল, "গাল দুটো বড্ড প্লেন, নরম নরম দেখাচ্ছে, একটা লম্বা ঝুলফি হলে ভাল হয় আর পাতলা একটা গোঁফ, চিনেদের মতো।"

তিন মিনিটের মধ্যে কলাবতীর গোঁফ ও ঝুলফি গজিয়ে গেল।

"পিস্তল?" সুশি বলল।

রাঙাদা একটা খেলনা পিস্তল বাক্স থেকে বার করল, একটা ফোল্ডিং ছোরাও। স্প্রিং টিপতেই বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে ছ'ইঞ্চি ফলা। কলাবতী পিস্তলটা কোমরের কাছে প্যান্টে গুঁজে ছোরার ফলাটা মুড়ে হিপপকেটে রাখল।

"রেডি। সরার বাবা এখন শ্যাওড়াফুলিতে কাজে গেছে। বাড়িতে এখন মা আর দুই মেয়ে। ঠিক আছে। এবার অ্যাকশন।" স্বাভাবিক স্বরে কলাবতী বলল।

কিন্তু কিন্তু করে ঘণ্টু বলল, "এই ড্রেসে কলকাতায় হাঁটলে কেউ তাকাবে না কিন্তু বোলতায় লোকে তাকাবে। মিনিট চার-পাঁচ তো এখান থেকে দাসপাড়া হেঁটে যেতে লাগবে।"

সুশি সমস্যাটা মিটিয়ে দিল, "এর ওপর একটা শাড়ি পরে নিলেই হবে। আমরা তো দাসপাড়া পর্যন্ত সঙ্গে যাচ্ছি। ঘণ্টু দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিলে কালু শাড়ি খুলে ওর হাতে দিয়ে এগিয়ে যাবে। ঘণ্টু, তুমি ব্যাংকাকার সাইকেলটা নাও। কাজ হয়ে গেলেই কালুকে সাইকেলে পাঁইপাঁই পালাতে হবে। আমি শাড়ি আনছি।"

দোতলা থেকে সুশি তার ধনেখালি ডুরে শাড়ি নিয়ে এল। আটপৌরে ভাবে পরে কলাবতী ক্যাপ আর সানগ্লাস খুলে ঘোমটা দিয়ে সেটা টেনে রইল এমনভাবে যাতে দাড়ি ও জুলফি ঢাকা পড়ে। জুতোটা অবশ্য ঢাকা গেল না।

"হর হর মহাদেও।" সুশি স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে চাপা গলায় বলল। "এবার নয়া বর্গির হানা শুরু হবে।"

ওরা বাড়ি থেকে বেরোনোমাত্র শুনল মাঠ থেকে ভেসে আসা "হোওওও" শব্দে প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি। ঘণ্টু আনন্দ চেপে বলল, "বোলতা গোল দিল।"

বাবার সড়কে ওরা দেখা পেল শুকনো ডালপালা মাথায় নিয়ে চলা এক বুড়ির। একটি কুকুর, দুটি ছাগল আর যাত্রীভরতি এক ট্রেকারের। দাসপাড়ায় ঢোকার মুখে আবার "হোওওও" শব্দ বোলতার আকাশ ভরিয়ে দিল। সুশি বলল, "বোধহয় সরানন্দর অ্যাকশন শুরু রয়েছে।" ঘণ্টু হাসি চেপে মাথা নাড়ল। কলাবতী গম্ভীর। সে এখন মনোনিবেশ করছে আসন্ন অ্যাকশনের জন্য।

"ওই যে নিমগাছের পেছনে, টালির চালের বাড়িটা।" ঘণ্টু প্রায় সত্তর গজ দূর থেকে উত্তেজিত চাপা গলায় দ্রুত কথা বলে আঙুল তুলে দেখাল। "শাড়িটা খুলে দাও। আমি আর সুশি সড়কে দাঁড়াচ্ছি।"

গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ম্যাক্সি পরা, গোলগাল মুখ মাঝারি আকৃতির সরার ছোড়দি ঘর থেকে সবে বাইরের রকে বেরিয়েছে, হাতে একটা বালতি। বেড়ার দরজা সরিয়ে বিদঘুটে সাজের একটা লোককে ঢুকতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

"কাকে চাই?"

"সব কোই কো।" কলাবতী একলাফে সিঁড়ির দুটো ধাপ পেরিয়ে রকে উঠল। "ঘর মে কৌন কৌন হ্যায়?" ওর স্বরে যথাসম্ভব পুরুষালি রুক্ষতা আনার চেষ্টা।

"অ্যাঁ, কী বলছেন?" অবাক এবং ভীত গলা আর চোখ।

"ঘরে কৌন কৌন আছে?"

"মা আর আমি।"

"তুমারা বহেন কাঁহা?" ধমকে উঠল কলাবতী।

"বহেন? মানে দিদি?" ঢোক গিলল। "দিদি মাঠে খেলা দেখতে গেছে।"

"বহুত আচ্ছা। ঘরমে ঘুসো।" কলাবতী আঙুল দিয়ে ঘরের দরজা দেখাল। মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"খাড়া হ্যায় কিঁউ। কেয়া কালা হো গিয়া। ঘুসসো।" কলাবতী কাঁধে একটা ধাক্কা দিল বেশ জোরেই। মেয়েটি টলে গিয়ে দরজা ধরে ফেলল। ঝট করে পকেট থেকে ছোরাটা বার করে সে স্প্রিং টিপল। ছিটকে বেরোনো

ফলাটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে মেয়েটির মুখ দিয়ে "আঁ আঁ" একটা আওয়াজ হল তারপর চিঁ চিঁ করে "মা... মা" বলে উঠল।

"কী রে সুমি?" ভেতর থেকে গলা শোনা গেল। "কার সঙ্গে কথা বলছিস?"

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কৌতূহলী চোখে শোওয়ার ঘরে ঢুকেই লম্বা, রুগ্‌ণ চেহারার সুখি দাসের চোখ স্থির হয়ে গেল। ডাকাত!

"কী, কী চাই?"

"তোম ভালাই জানতা কী চাই। কাঁহা হ্যায় ওয় অ্যাটাচি কেস? লে আও,... জলদি করো..." কলাবতী ছোরাটা ঠেকাল সুমির পেটে।

"কী বলছেন? কীসের অ্যাটাচি কেস?" সুখি দাসের প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে এখন বোধশক্তি ফিরে এসেছে। গলার স্বরে জোর এসেছে।

"কীসের অ্যাটাচি কেস? দেখেগে?" কলাবতী ছোরার ডগাটা সুমির পেটে ঠেকিয়ে চাপ দিল।

"ওমা গো, পেটে ঢুকিয়ে দিচ্ছে গো।" সুমি আর্তনাদ করে উঠল।

"আভি তক নেহি ঢুকায়া লেকিন অ্যাইসি মাফিক ঢুকায় গা।" কলাবতী সুমির পেটের সামনে বাতাসে ছোরাটা বিঁধিয়ে এপাশ ওপাশ ডাইনে-বাঁয়ে আড়াআড়ি চালিয়ে বুঝিয়ে দিল তার পরের কাজটা কী হবে। সুমি দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। "মা আমার নাড়িভুঁড়ি বার করে দেবে গো।"

"জলদি করো, জলদি করো, বার করো অ্যাটাচি। বাহার মে হামকো দো দোস্ত সুশীলপরসাদ অউর ঘণ্টালাল বম হাতে খাড়া হায়। হামকো দেরি দেখেগা তো ও লোক অধৈরজ হো যায়েগা।... সমঝা হাম কেয়া বোলতা? ও দোনো লোক বম মারেগা, আগ লাগায়গা এই কোঠিমে। সমঝা?"

"অ্যাটাচি ফেটাচি এ-বাড়িতে নেই।" সুখি দাস মরিয়া হয়ে বলল। তবে গলায় তেমন জোর নেই। কলাবতী "হা হা হা" করে হিন্দি ফিল্মের খলনায়কদের মতো কুড়ি সেকেন্ড ধরে হাসতে হাসতে কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বাঁ হাত দিয়ে বার করে সুখি দাসের রগে ঠেকাল। তেরিয়া ভাবের বদলে এইবার ভয় ফুটে উঠল তার দু'চোখে।

কলাবতী সুখি দাসের কানের কাছে মুখ এনে খসখসে চাপা গলায় বলল, "হামি সাতদিন ধরে সব খবর লিয়েছি। অ্যাটাচি কোথায় আছে হামি জানি। চলো রান্নাঘরমে, চলো।" পিস্তলের নল দিয়ে সে সুখি দাসের মাথায় একটু

জোরেই টোকা দিল। "হামি ইয়ে ভি জানি পিছে কা ডোবামে, পলিথিনমে প্যাক করকে কেয়া রাখা হায়।"

"কে, কে বলেছে ডোবায় টাকা রেখেছি?" সুখি দাসের চোখেমুখে রাগ, গলায় তেজ।

গোঁফে আঙুল বুলিয়ে কলাবতী বলল, "হাম শিউ মহারাজকা ভকত্ হায়। পাতালঘরকা ভূত হামকো পাতা দিয়া, হামকে বোলা এহিন রান্নাঘরমে, পিছে কা ডোবামে তনখা হায়।" বলেই সে বিকট স্বরে গব্বর সিং মার্কা হাসি হাসতে শুরু করল।

এইবার সুখি দাসের ভেতরের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। তার এত গোপন কাজ কিনা এই ডাকাতটা জেনে ফেলেছে! এ তো সোজা বদমাশ নয়। শিবভক্ত, পাতালঘরের ভূতেদের সঙ্গে ভাবও আছে।

উবু হয়ে বসা সুমির মাথায় ছোরার ফলাটা চাঁটির মতো মেরে কলাবতী বলল, "অ্যাই ছুকরি উঠো, রান্নাঘর চলো।"

সুমি উঠে দাঁড়াল, সুখি দাসের গলায় পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচা মেরে কলাবতী বলল, "রান্নাঘর, রান্নাঘর।"

দু'জনকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে কলাবতী চট করে মাচার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল লম্বা লম্বা চেলা কাঠের স্তূপের ওপরে রয়েছে একটা চটের থলি। হাঁফ ছাড়ল সে। এত ঝুঁকি নিয়ে ডাকাত সাজা তা হলে বৃথা হয়নি। সময় আর হাতে বেশি নেই। ফুটবল ম্যাচটা শেষ হওয়ার আগেই তাকে পালাতে হবে।

"পিছু ফিরো, পিছু ফিরো।" কলাবতী কর্কশ গলায় ধমক দিল। সে ছোরার খোঁচা দিল সুখির পেটে। "দেওয়ালকা দিক মে মুখ ফিরাও।"

সুখি দাস দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে থরথরিয়ে সে কাঁপছে আর বিড়বিড় করে কীসব বলছে। চোখে জল। সুমির বাহুতে ছোরার ফলাটা শান দেওয়ার মতো দু'বার ঘষে কলাবতী বলল, "তুমি ভি দেওয়াল দেখো।" সুমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। কলাবতী পিস্তলটা প্যান্টে গুঁজে রাখল। একটা ছোট টুল ঘরের কোনায় রয়েছে দেখে টেনে আনল। সুমি মুখ ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল, কলাবতী 'অ্যাই' বলে চিৎকার করতেই সে নিমেষে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ছোরাটা দাঁতে চেপে ধরে টুলে উঠে দু'হাতে থলিটা পেড়ে নিয়ে সে ফাঁক করে দেখে নিল জিনিসটা আছে কি না। তার মুখে সাফল্যের হাসি ফুটে উঠল। বেশ মোটাসোটা অ্যাটাচি কেসটা। এবার সে পায়ে পায়ে পিছু হটে

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিল। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। তখন আর একটা 'হোওওও' বোলতার আকাশে পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে পাক দিচ্ছে।

"কালু শিগগিরি, এদিকে, এদিকে।" সুশির চাপা গলা শোনা গেল। তখন বাবার সড়কে জনমানব নেই। চশমা আর ক্যাপ চটপট খুলে, ছোরাটার ফলা ভাঁজ করে নিয়ে কলাবতী পকেটে ভরল। রান্নাঘরের দরজা ধাক্কাবার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে। সাইকেল হাতে ঘণ্টু দাঁড়িয়ে। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে, মুখ টসটসে। কারও তখন কথা বলার মতো অবস্থা নয়।

ঘণ্টু সাইকেল ধরে রয়েছে। কলাবতী উঠে বসে ভারী অ্যাটাচি কেসটা ডান হাতে ঝুলিয়ে বাঁ হাতে হ্যান্ডেল ধরে প্যাডেলে পা রাখল। ঘণ্টু সাইকেলটা ধরে ঠেলতে ঠেলতে কিছুটা ছুটে গিয়ে ছেড়ে দিল। প্রথমে টলোমলো হওয়ার পরই ব্যালান্স ঠিকমতো পেয়ে গিয়ে সাইকেল সোজা হয়ে গেল। সুশি আর ঘণ্টু তাকিয়ে দেখল দূরে একটা বাঁক ফিরে কলাবতী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এবার তারা বাড়ির দিকে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। রান্নাঘরের দরজায় দুমদাম কিল আর লাথির শব্দ, সেইসঙ্গে হাউমাউ চিৎকার তখন তাদের পেছনে। ওরা যখন বাড়িতে পৌঁছোল তখন "হোওওও"-র বদলে আওয়াজ উঠল "হাআআআ"। ঘণ্টু বলল, "খেলা শেষ হল। আমরা জিতেছি।"

উঠোনের রকের গায়ে হেলান দিয়ে সাইকেলটা রেখেই হাঁফাতে হাঁফাতে কলাবতী দোতলার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল। অ্যাটাচি কেসটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে, ঝুলফি, গোঁফ, দাড়ি খুলে পাখাটা চালিয়েই বিছানায় নিজেকে ছুড়ে দিল। শারীরিক পরিশ্রমের থেকেও ধকল বেশি নিয়েছে মন। মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ ঘুরছে একটা টেবিল ফ্যান। স্কুলের স্পোর্টসে গুন্ডা সেজে শ'খানেক লোককে ভড়কি দেওয়া এক ব্যাপার। আর ডাকাত সেজে সত্যি সত্যি ডাকাতি করা— ধরা পড়লে তো জেল হয়ে যাবে! এখনও সে বুঝে উঠতে পারছে না কাণ্ডটা এত মোলায়েম ভাবে সে ঘটাল কী করে? সবই কীরকম ঠিকঠাক ভাবে হয়ে গেল! ওরা দু'জন যে এত ভিতু হবে সে ভাবেনি। বাইরের কেউ তখন এসে পড়তে পারত! আসেনি। সরা যদি না বলে দিত তা হলে ওর মাকে দিয়ে কীভাবে অ্যাটাচি কেসটা বার করাত?

ঠিকই বার করত তবে একটু সময় লাগত, একটু খোঁচাখুঁচিও করতে হত। ভাগ্যি ভাল। সেই অপ্রিয় কাজটা তাকে করতে হয়নি। একটা সরল অঙ্কের মতো শেষপর্যন্ত অ্যানসারটা রাইট হয়ে গেল।

দরজায় টোকা আর "কালু, কালু" ডাক শুনে সে দরজার খিল খুলল। সুশি উত্তেজিত। ঘরে ঢুকেই এধার ওধার তাকিয়ে বলল, "কোথায় রেখেছিস?"

কলাবতী আঙুল দিয়ে খাটের তলা দেখাল। তখন ঘণ্টু এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। কলাবতী তাকে বলল, "রাঙাদার জিনিসগুলো দিয়ে এসো। জামাটা পরে দিচ্ছি। আর একটা কথা, তোমাদের এখানে তো এসটিডি ফোন আছে, আমি কলকাতায় কাকার সঙ্গে কথা বলব। টাকাটা ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"এসটিডি আছে বাজারে বোলতা বস্ত্রালয়ে। তবে মাঝে মাঝেই লাইন খারাপ থাকে।"

"আজ খারাপ থাকবে না। গড়ের শিবের আশীর্বাদে আজ সব কাজই পার হো যায়গা। ম্যাচের রেজাল্ট কী? সরানন্দ মহাপাত্র কী করল?"

"রাস্তায় তো দেখা হল দুটো মুনিষ আর একটা সাইকেলচড়া লোকের সঙ্গে, জিজ্ঞেস করার মতো একজনকেও পেলুম না, তবে জিতেছি যে সেটা শিয়োর।"

"এই ডাকাতির ব্যাপারটা কেউ যেন জানতে না পারে, সরাও নয়। জানাজানি হলে সবার হাতে হাতকড়া পড়বে। মা-দিদি হেনস্থা হয়েছে এটা সরা ভালভাবে নিতে পারবে না।"

সুশি অ্যাটাচি কেসটা খাটের ওপর রেখে বলল, "তুই ছোরা দিয়ে ওদের রক্তটক্ত বার করে দিসনি তো?"

"মাথা খারাপ!" তারপরই ডাকাতের গলায় কলাবতী বলল, "বাহার মে হামকো দো দোস্ত, সুশীলপরসাদ আউর ঘণ্টেলাল বম হাতে খাড়া হায়। কোঠিমে আগ লাগায় গা। এইসব বলতেই কাজ থ্রি-ফোর্থ হয়ে গেল। বাকিটা একটু খোঁচাটোঁচা। এরা দু'জন বড়দির থেকেও ভিতু। একটু যদি চেঁচামেচি করত তা হলে পালাবার পথ পেতুম না। গড়ের শিব আমাকে আজ পার করে দিয়েছেন।" সে জোড় হাত কপালে ঠেকাল।

আর তখনই একসঙ্গে বহু লোকের হইচইয়ের শব্দ ভেসে এল। তার মধ্যে স্লোগান দেওয়ার মতো জয়ধ্বনি উঠছে। ওরা সবাই ছুটে গেল বারান্দায়। অন্তত শ'দুয়েক নানান বয়সি লোক মিছিল করে আসছে। মিছিলের সামনে

দু'জনের কাঁধে বসে রয়েছে ন্যাড়ামাথা সরানন্দ। গলায় গাঁদাফুলের মালা।

"বোলতাকে ফাইনালে তুলল কে।"

"সরানন্দ, আবার কে।"

"বাকি একটা ম্যাচ মাত্র।"

"বংশী বাজাবে মহাপাত্র।"

স্লোগান এগিয়ে এসে বাড়ির দরজায় থামল। সরা নামল কাঁধ থেকে। ভূদেব খেটো ব্যস্ত হয়ে ভিড় সামলাচ্ছেন। "যাও, যাও, তোমরা, এবার ওকে বিশ্রাম নিতে দাও। ছ'-ছ'টা গোল করার ধকল কি কম! এখন ওকে রেস্ট নিতে দাও।"

কে একজন বলল, "দাদু, ওকে ফাইনালেও পাব তো?"

"ফাইনালেও আজকের মতো ডবল হ্যাটট্রিক কিন্তু চাই।"

ভূদেব জবাব দেওয়ার আগেই অপ্রত্যাশিত বিশুদ্ধ বাংলায় সরা বলল, "যদি তিনদিনের মধ্যে গড়ের মাঠে কলেজ তৈরির ডিসিশন আপনারা নেন, যদি এই জমিতে কলেজ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি লিখিতভাবে আমাকে দেন তবেই আমি ফাইনালে খেলব, নয়তো খেলব না।"

বিশাল জনতা চুপ। অবাক কলাবতী ফিসফিস করে বলল, "শাবাস স্বরাজ দাস।"

সুশি বলল, "ওর সব অন্যায় ধুয়েমুছে গেল।"

জনতার মধ্যে থেকে প্রশ্ন ভেসে এল। "আপনি কি জানেন ওখানে একটা পাতালঘর আছে, সেখানে প্রেত বাস করে, তাদের হাতে অনেক মানুষ মরেছে।"

সরা পালটা প্রশ্ন করল, "আপনারা কেউ কি পাতালঘরটা দেখেছেন?"

জনতা চুপ।

"তা হলে আসুন আমার সঙ্গে। পাতালঘরটা দেখে যান।"

সরা কয়েক পা এগিয়ে গেল। ওর সঙ্গে কেউ যেতে চাইল না। তখন ভূদেব খেটো এগিয়ে গেলেন। "আমি যাব।" রণক্ষেত্রের সেনাপতি তলোয়ার তুলে যেভাবে সৈন্যদের আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান, ভূদেব সেইভাবে ছাতা তুলে বললেন, "বোলতার জনগণ এসো আমার সঙ্গে। পাতালঘর চলো।"

ভূদেব খেটোর সঙ্গে গেল জনাদশেক।

ব্যাংকাকা ব্যস্ত হয়ে ভিড়ের মধ্যে জনাকে খুঁজে বার করলেন। "মই, মই।"

বিরক্ত হয়ে জনা বলল, "এখন কোথায় খই পাব?"

"সিঁড়ি সিঁড়ি।" হতাশ ব্যাংকাকা কপাল চাপড়ালেন। হইহট্টগোলের মধ্যে জনা চেঁচিয়ে বলল, "পিঁড়ি এনে দিচ্ছি।"

ব্যাংকাকা এবার নিজেই মই আনতে ছুটলেন।

কলাবতী বলল, "অ্যাটাচি খুলে দেখে নিতে হবে সাড়ে তিন লাখ ঠিক ঠিক আছে কিনা।"

"খুলবি কী করে," সুশি বলল, "ওটায় তো চাবি দেওয়া। লকটা তা হলে ভাঙতে হবে, ভাঙব?"

"না, না, এখন থাক, পরে দেখা যাবে। ঘণ্টু তো নীচে চলে গেল, যাবি ওদের সঙ্গে পাতালঘর দেখতে?"

"না। এখন একটু আড়ালে থাকাই ভাল। এসটিডি করতে যাবি তো? শাড়িটা পরে নে। টিপ পর, আমার চুড়ি দুটো হাতে গলা। ডাকাতের চিহ্ন যেন কোথাও না থাকে," সুশি পরামর্শ দিল। "সরাদের বাড়ি থেকে নিশ্চয় থানায় খবর দেবে। সাবধানে থাকতে হবে।"

নিখুঁত মেয়ে সেজে কলাবতী বারান্দায় এসে দাঁড়াবার পর কথা বলতে বলতে পাতালঘর দেখে ওরা ফিরে আসছে।

"সরানন্দ কীরকম সরসর করে নেমে গেল মই দিয়ে, একটুও ভয় করল না।"

"যেভাবে নামল, যেন জায়গাটা ওর খুব চেনা।"

"শুধু কি নামা? সরসর করে কেমন বাংলা বলল!"

"শ্যামপুকুর কি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ডেফিনিটলি ওকে তুলে নেবে, দেখে নিস।"

"এতকাল কীসব বাজে কথা আমরা বিশ্বাস করে এসেছি!"

বাইরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে ফলাফল জানার জন্য। ওরা বাড়ি থেকে বেরোতেই, "কী দেখলি রে... পাতালঘর সত্যি আছে?" এইসব বলে ওদের ঘিরে ধরল। কলাবতী শুনল একজন চেঁচিয়ে বলছে, "ভূতপ্রেত সব বাজে কথা। কালকেই সরানন্দ মহাপাত্রকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক। আমাদের দাবি, মাঠ চাই, কলেজও চাই।"

ভিড়ের থেকে কে বলল, "বংশীবদনও চাই।"

স্লোগান উঠল, "মাঠ নাও, কলেজ দাও।"

"বোলতা তুমি বংশী বাজাও।"

নীচের থেকে ঘণ্টু উঠে এল। "তোমরা রেডি। ভিড়টা চলে যাক তারপর বেরোব। যাক, সরা এবার ছাড়া পাবে। টাকাটা তো ফেরত দিতেই হত, যাদের পাওয়ার কথা তারাই পাবে।"

সুশি বলল, "কোনও অন্যায় করিনি, করেছিল সরার মা। টাকাটা ধরে রেখে ছেলেরই ক্ষতি করছিল। ওর ট্রান্সফার নেওয়াও আটকে গেছে দুই ক্লাবের দাবিতে।"

কলাবতী বলল, "তার থেকেও বেশি, বোলতার এতদিনকার ভূতের ভয়টা তো ভাঙল। কলেজও হবে।"

ঘণ্টু বলল, "বলাবলি হচ্ছিল, এবারের গাজন মেলাটা গড়ের মাঠেই বসাবে। শিবমন্দিরটাও সরিয়ে শিবপ্রতিষ্ঠা করবে।"

মিনিটদশেক পর ভিড় সরে যেতে ওরা তিনজন বাজারের দিকে রওনা হল। বোলতা বস্ত্রালয় বেশ বড় দোকান। নানারকম শাড়ি, শার্টিং সুটিংয়ের কাপড়ও বিক্রি হয়। টানা কাউন্টারের পেছনে কাচের আলমারি। দোকানে ঢোকার মুখেই এসটিডি-র কাচের বুথ, ফোন করছে খাকি শার্ট প্যান্ট পরা একজন। ভুঁড়ি দেখেই বোঝা যায় পুলিশের কেউ।

ঘণ্টু মালিকের কাছে গিয়ে বলল, "কলকাতায় একটা ফোন করবে ব্যাংজ্যাঠার ভাইঝি।" সে আঙুল দিয়ে কলাবতীকে দেখাল।

"থানার ফোন খারাপ, এখন এসপি-কে জরুরি ফোন করছেন মেজবাবু, ওঁর করা হয়ে যাক। একটা বড় ডাকাতি হয়ে গেছে ঘণ্টাখানেক আগে।" মালিক বলল।

ঘণ্টু অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি? কোথায়?"

"দাসপাড়ায়।"

কলাবতী আর সুশি শুনতে পাচ্ছে চেঁচিয়ে বলা মেজবাবুর কথাগুলো।

"হ্যাঁ সার, বাবার সড়ক সিল করে দেওয়া হয়েছে। বড়বাবু এখন ডাকাতির স্পটে রয়েছেন। মোটরসাইকেলে দু'দিন আগে এসে থ্রেট করে গেছল... বোধহয় তাদেরই কাজ। একটা বড় গ্যাং এসেছিল জনাসাত-আটের। বাইরে অপেক্ষা করছিল।... বাড়িতে ছিল শুধু মা আর মেয়ে... ডাকাতটা দু'জনের নাম বলেছে সুশীলপরসাদ আর ঘণ্টেলাল।... হ্যাঁ সার ইউ-পি কি বিহারের... শুধু পিস্তল আর ছোরা... এ কে ফর্টিসেভেন ছিল না। খবরটবর নিয়েই মনে হচ্ছে ডাকাতিটা করেছে।.. না সার থানার জিপের গিয়ার বক্সটা চারদিন হল ভেঙে রয়েছে তবে সাইকেল রিকশায় দু'জন কনস্টেবল টহল দিচ্ছে

আর দু'জন পাড়ার সব বাড়িতে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে।... ডেসক্রিপশন যা দিয়েছে তাতে মনে হয় রেলডাকাতি করে, অন্তত ডজনখানেক মার্ডার করেছে। কাল আপনি আসছেন?... বাড়িতে পুলিশ পোস্টিং? বড়বাবুকে নিশ্চয় বলে দোব। হাঁ সার, এত বড় ডাকাতি এখানে আগে হয়নি।... নমস্কার, নমস্কার।"

রুমালে কপালের ঘাম মুছে মেজবাবু দোকানির দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, "আজ আসতে পারবেন না, রাইটার্সে পুলিশমন্ত্রীর কনফারেন্স থেকে এইমাত্র ফিরলেন, টায়ার্ড!" তারপর ঘণ্টুর দিকে ফিরে বলল, "বিকেলে মোটরবাইকে কালো জামা, কালো চশমা পরা, ছাগল দাড়িওলা কাউকে বাবার সড়কে যেতে দেখেছ?"

"আমি তো মাঠে খেলা দেখছিলুম।" নিরীহ ভীতমুখে ঘণ্টু বলল। মেজবাবু সুশির দিকে তাকাতেই সে বলল, "বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা ওইরকম কালো জামা পরা লোককে বাইকে চড়ে পুবদিকে যেতে দেখেছি।"

মেজবাবু উৎসাহে দু'হাতের তালু ঘষে উৎফুল্ল স্বরে বলে উঠলেন, "এই তো ক্লু পেয়ে গেছি। পুবদিকে গেছে? তার মানে রসবেড়িয়া থানার এলাকায় ঢুকেছে। ওদের তা হলে অ্যালার্ট করে দিতে হবে।"

মেজবাবু লাফ দিয়ে ফোনের বুথে ঢুকে ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কলাবতী ফিসফিস করে বলল, "আবার ঝামেলা বাড়াতে গেলি কেন?"

"মজা দ্যাখ না!"

"হ্যালো, হ্যালো, রসবেড়িয়া থানা? আমি বোলতা থানার মেজবাবু। এখানে সাড়ে তিন লাখ টাকার ডাকাতি হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। মোটরবাইকে টাকাসমেত পালিয়েছে আপনাদের এলাকার দিকে। কালো জামা, কালো চশমা, দাড়িও আছে। অ্যাঁ কত বড় দাড়ি? রামছাগলের মতো... ফায়ার আর্মস? পিস্তল, ছোরা...।"

সুশি চেঁচিয়ে বলল, "পিঠে একটা মোটাসোটা বন্দুক দেখেছি বাঁধা ছিল।"

"হ্যালো, হ্যালো, একজন বলছে, সঙ্গে এ কে ফর্টিসেভেন আছে।...অ্যাঁ? আপনি এখন ভীষণ ব্যস্ত? গোরুচোরকে জেরা করছেন!" মেজবাবুকে হতাশ দেখাল। রিসিভারটা রাখতে রাখতে বলল, "এ কে ফর্টিসেভেন না বললেই হত।"

মেজবাবু চলে যাওয়ার পর কলাবতী বুথে ঢুকল। মাত্র দু'বারের চেষ্টায় লাইন পেয়ে সে সত্যশেখরকে তার সেরেস্তায় পেল।

"কাকা, আমি কালু, বোলতা থেকে বলছি।... খুব ভাল আছি। দাদু চলাফেরা কেমন করছে?... নীচে নামছে! এবার কাজের কথা, একটা সাহায্য চাই। তুমি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট পতিত ভট্চাযকে চেনো? ব্রাদার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারি... চেনো? খুব আলাপ! তা হলে তো ভালই হল। এবার শোনো—।"

কলাবতী খুব দ্রুত গতকাল থেকে সরাকে নিয়ে যা-যা ঘটেছে বলে গেল। "এখন যা করতে হবে সরাকে নিয়ে দুটো ক্লাবে যে জট পাকিয়েছে সেটা ছাড়ানো অর্থাৎ মিটমাট।" কলাবতী দেখে নিল দোকানদার কত দূরে, সুশি তাকে ব্যস্ত রেখে আলমারি থেকে শাড়ি পাড়াচ্ছে। একটু গলা নামিয়ে কলাবতী বলল, "টাকাটা ফেরত দেওয়ার জন্য রেডি। সরার মন ব্রাদার্সে পড়ে আছে ওকে নিয়ে শ্যামপুকুরের কোনও লাভ হবে না, ওকে ওরা ছেড়ে দিক। মনপ্রাণ দিয়ে শ্যামপুকুরে খেলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। শ্যামপুকুরের ব্রজকে এটা বুঝিয়ে বলুক পতিত ভট্চায। মনে হয় রাজি হয়ে যাবে। ওরা টাকাটি ফিরিয়ে নিয়ে ওর সই করা যে সব কাগজপত্তর আছে ফিরিয়ে দিক। তরশু এখানে ফাইনাল ম্যাচ। সরা খেলবে। তার আগেই ব্যাপারটা চুকে গেলে ও খোলা মনে খেলতে পারবে। এগেনস্টে তারকেশ্বর ইয়ুথ, খুব কড়া টিম। বোলতার বংশীবদন শিল্ডটা জেতা খুব দরকার নয়তো ভূতের বাসা ভাঙা যাবে না। ব্রজদা বা ওদের কেউ পরশুই সুশিদের বাড়িতে এসে, বাড়িটা ওদের লোক চেনে, সব কিছু চুকিয়ে দিয়ে যাক।"

আরও দু'-চারটে কথা বলে ফোন রেখে কলাবতী বুথ থেকে বেরিয়ে এসে দেখল সুশি দুটো ধনেখালি তাঁতের শাড়ি বেছে রেখেছে।

"টাকা তো সঙ্গে আনিনি, আপনি আলাদা করে রেখে দিন, কাল এসে নিয়ে যাব।" সুশি বলল দোকানিকে। "কালু, কাকার সঙ্গে সব কথাবার্তা হয়ে গেছে?"

কলাবতী ঘাড় নেড়ে এসটিডি-র জন্য ব্যাগ থেকে টাকা বার করছিল, সুশি বাধা দিল। "কী কথা হয়েছিল মনে নেই? কাঁকুড়গাছিতে না ফেরা পর্যন্ত সব খরচ আমার। ঘণ্টু, এখানে কোন দোকানে সন্ধেবেলায় গরম গরম রসগোল্লা পাওয়া যায়?"

"মহাদেবের দোকানে।"

তিনজনে মহাদেবের দোকানে এসে শুনল রসগোল্লা শেষ হয়ে গেছে। বোলতা স্পোর্টিং ফাইনালে ওঠার সুখ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে জনগণ, ভূদেব খেটোর দাক্ষিণ্যে।

বাড়ি ফিরেই ওরা জনাদার কাছে শুনল সরা উধাও। কে যেন ওকে বলেছে বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। তাই শুনেই সে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

"যাক, তা হলে, হাঁটুর জন্য ভয়টা আর নেই।" সুশি আশ্বস্ত গলায় বলল, "তবে টাকাটার জন্য সরা আবার আর এক দুর্ভাবনায় পড়বে। ওকে কি বলা উচিত কে ডাকাতি করেছে?"

কলাবতী আঁতকে উঠে বলল, "একদম নয়। শ্যামপুকুর টাকা ফেরত নেওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুতেই নয়।"

"আমি একবার সরাদের বাড়ি ঘুরে আসি," ঘণ্টু কথাটা বলেই বেরিয়ে গেল।

আধঘণ্টা পর ঘণ্টু হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল।

"করেছ কী?" কলাবতীকে সে বলল। রেকর্ডারে বাজছিল হ্যারি বেলাফন্টের ক্যাসেট। সেটা বন্ধ করে কলাবতী ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, "কী করেছি?"

"এত বড় হাঁ করে হা হা হা করে হেসেছিলে? তুমি জানো না তোমার ডান কষের ওপরের পার্টির একটা দাঁত নেই?"

কলাবতী ডান গালে হাত দিয়ে বলল, "নেই। নড়ছিল তাই একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় টান মেরে ফেলে দিয়েছি।"

"এখন সেই টান মারার হ্যাপা সামলাও। সরার ছোড়দি দেখেছে তোমার একটা দাঁত নেই। তোমার নাকের ওই নাকছাবি পরার ফুটোটাও ওর চোখে পড়েছে। যখন ছোরাটা পেটে চেপে রেখেছিলে তখন ছোড়দি লক্ষ করেছে তোমার ডান বুড়ো আঙুলের নখটা খুব বড়।"

কলাবতী আঙুল তুলে চোখের সামনে ধরে শিউরে উঠে বলল, "সত্যিই তো! অনেক কাজে লাগে বলে নখটা বড় রেখেছি।"

অধৈর্য সুশি বলল, "তারপর কী হল? ওরা কালুকে সন্দেহ করেছে?"

ঘণ্টু বলল, "ওরা করেনি, করেছে সরা। ওরা তো কালুকে চেনে না,

জানে না, আগে কখনও দ্যাখেওনি। কিন্তু কালুর দাঁত, নাক, নখ তো সরা দেখেছে। তার ওপর সুশীলপরসাদ ঘণ্টেলাল শুনেই ওর মাথায় সুশি-ঘণ্টু নাম দুটো ধাক্কা দিয়েছে।"

"ইসস, খুব বোকামি হয়ে গেছে। সরা এখন কী করবে?" আফশোসে কলাবতীর গলা বসে গেছে। "যদি পুলিশকে বলে দেয়?"

"দেয় কী, দিয়েছে!" ঘণ্টুর স্বরে আতঙ্ক।

"তা হলে তো পুলিশ এখানে আসবে।" কলাবতী বলল। "সুশি, কী করা যায়?"

"কী আর করার, তুই হাওয়া হয়ে যা। আমরা দু'জন থেকে যাচ্ছি। সন্দেহটা তো তোকেই।"

"কীভাবে এই রাত্তিরে হাওয়া হব! আমি তো রাস্তাঘাট চিনি না। সড়ক তো বন্ধ করে দিয়েছে!"

সুশি চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত ভেবে শান্ত গলায় বলল। "পাতালঘর।"

"তার মানে!"

"মানে অ্যাটাচি কেস, মাদুর-বালিশ, টর্চ এইসব নিয়ে তুই পাতালঘরে নেমে পড়। মইটা এখনও গর্তে লাগানো আছে বোধহয়। চটপট কর। তুই এগো, আমি জিনিসপত্তর নিয়ে যাচ্ছি। আর ঘণ্টু শিগগির রাঙাদার কাছে যাও, ওর মেকআপ বক্স থেকে ছোরা পিস্তল দাড়ি ঝুলপি সব সরিয়ে ফেলতে বলো। বলা যায় না পুলিশ ওর কাছেও যেতে পারে।"

কলাবতী পাতালঘরে নেমে যাওয়ার মিনিট দুই পরই থানার বড়বাবু, মেজবাবু আর দু'জন কনস্টেবল হাজির হল, সঙ্গে ব্যাংকাকা। তাঁকে ক্লাবঘর থেকে ওঁরা প্রায় গ্রেফতারই করে এনেছেন।

"কী অদ্ভুত কাণ্ড দ্যাখ তো সুশি। বড়বাবু বলে কিনা বাড়িতে ডাকাত রয়েছে, সাড়ে তিন লাখ টাকা ডাকাতি করেছে, বাড়ি সার্চ করবে।" মাথায় হাত দিয়ে তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন।

"তোমার নাম কী?" সুশিকে বড়বাবুর প্রশ্ন।

"সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"কলাবতী কার নাম?" বড়বাবু ধমকের সুরে জানতে চাইলেন।

"আমার বন্ধুর নাম।"

"কোথায় সে?"

"ওর খুব ভূত দেখার শখ, তাই গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গেছে।"

বড়বাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। "কী বললে? গড়ের মাঠে? ওখানে দিনের বেলাতেই লোকে যায় না, আর রাত্তিরে হাওয়া খেতে গেছে? বললেই হল?" তিনি মেজবাবুকে নির্দেশ দিলেন, "তন্নতন্ন করে সার্চ করুন। বড় অ্যাটাচি কেস। আলমারি খুলে দেখবেন, খাটের তলা দেখবেন। তারপর গোয়ালঘর, তারপর রান্নাঘর। ব্যাংবাবু আপনিও ওদের সঙ্গে যান।"

মেজবাবু দুই কনস্টেবলকে নিয়ে সার্চে যাওয়ার আগে বললেন, "সার এই মেয়েটি, এর সঙ্গে আর একটি মেয়ে আর ছেলেকে কাপড়ের দোকানে দেখেছি ফোন করার সময়। বোধহয় ফোন করতে গেছলে।"

বড়বাবু নীচের ঠোঁট কামড়ে বললেন, "আর-একটা ক্লু পাওয়া গেল। কাকে ফোন করতে গেছল?"

সুশি গম্ভীর মুখে বলল, "কালু ফোন করতে গেছল ওর কাকাকে। কাকার বন্ধু পুলিশের ডি জি, তাঁকে একটা খবর দিতে।"

বড়বাবুর দেহ সটান হয়ে গেল। চোখের পাতা ঘনঘন পড়ল। গলার স্বর বদলে গেল। "ডিই জিই! কেন, কীজন্য, কী খবর দিতে?"

"এত বড় একটা ডাকাতি হল আর কিনা থানার ফোন খারাপ, জিপ ভাঙা!"

"তা আমি কী করতে পারি। আমি তো আর খারাপ করে রাখিনি বা ভেঙে দিইনি।"

"আমিও ঠিক তাই বললুম কালুকে। বড়বাবু তো আর কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এসব করে রাখেননি। উনি খুব কাজের লোক।'

"এটা কি কলাবতী ডি জি-কে বলেছে?"

"অবশ্যই বলেছে। আরও বলেছে, ডাকাতরা ক'দিন আগেই সরাদের বাড়িতে গিয়ে থ্রেট করে বলে গেছে টাকা না পেলে দানা খাইয়ে দেবে। সেটা কি আপনি জানেন?"

"আজ জানলুম স্বরাজ দাসের মায়ের কাছে।"

"কেন, সেইদিনই থানায় গিয়ে জানায়নি? এত বড় একটা হুমকি দিয়ে গেল সেটা কি পুলিশকে না জানিয়ে থাকা যায়? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে না? আসলে ডাকাতরা সরাদের খুবই পরিচিত তাই থানাকে জানায়নি।"

"হুমম।" বড়বাবু ঘোরতর চিন্তায় পড়ে গেলেন। "সেদিনই জানালে

আমরা ওয়াচ রাখতে পারতুম, পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করতুম।"

"ঠিক এই কথাগুলোই কালু বলেছে ওর কাকাকে। কাকা বলেছেন কালই ডি জি-কে জানিয়ে দেবেন, সরার বাড়ির সবাইকে আচ্ছাসে জেরা করার জন্য বোলতার বড়বাবুকে যেন ইনস্ট্রাকশন দেন।"

"দেবেন কী করে, ফোনই তো খারাপ। তবে ফোন না করলেও জেরা তো অবশ্যই করব। আমার এলাকায় ডাকাতরা এসে দানা খাওয়াবে বলে গেল আর আমি কিনা জানতে পারব না? হুঁউউ মনে হচ্ছে রহস্য আছে।" বড়বাবু নাক টিপে ধরে চোখ বুজে মাথা নাড়লেন।

সুশি এবার গলা নামিয়ে বলল, "আর একটা কথা কি আপনার মনে হয়নি, সত্যি সত্যিই কি আজ ডাকাতি হয়েছে ওদের বাড়িতে? কালুর কাকা বড় ব্যারিস্টার, তিনিই প্রশ্নটা তুললেন।"

"অ্যাঁ!" বড়বাবু যেন অগাধ জলে পড়লেন। "ডাকাতি হয়নি?"

"শ্যামপুকুর ক্লাবকে ফল্‌স দেওয়ার জন্য মিথ্যে করে বানিয়ে বলতেও তো পারে, পারে কিনা বলুন?"

"হুমহুম।"

"ডাকাতিটা নিজেরাও তো কাউকে দিয়ে করাতে পারে, পারে কিনা বলুন? মা আর মেয়ে ছাড়া বাইরের কোনও লোক কি দেখেছে?"

"হুমম।"

"স্বরাজ দাস ফল্‌স নামে, মাথা ন্যাড়া করে আজ খেলল কেন? এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে।"

বড়বাবু আর থই পাচ্ছেন না। ফ্যালফ্যাল করে সুশির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মেজবাবু সদলে ফিরে এলেন। "সার, কোথাও কিছু পেলাম না।"

"পাবেন কী করে!" বড়বাবু হতাশ স্বরে বললেন, "ডাকাতি সত্যি সত্যি হয়েছে কিনা সেটা কি আপনি জেনেছেন?"

"না তো!" মেজবাবু থতমত।

"জানা উচিত। একজন বড় ব্যারিস্টার, ডি জি-র বন্ধু পয়েন্টটা তুলেছেন। তবে এসেছি যখন কলাবতীর সঙ্গে অভিযোগের বর্ণনার মিল কতটা সেটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। ওকে ডাকো তো।" বড়বাবু সুশিকে বললেন।

"এই রাত্তিরে আমি গড়ের মাঠে যাব ডাকতে? আপনিই তো বললেন দিনের বেলাতেও লোকে যায় না।"

"তা হলে বলাই তুমি গিয়ে ডেকে আনো।" বড়বাবু একজন কনস্টেবলকে নির্দেশ দিলেন।

"আমি সার!" বলাই ঢোক গিলল। "এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকব?"

"এখান থেকে নয়, সদর দরজার বাইরে গিয়ে ডাকো।"

বলাই বাইরে গিয়ে দু'হাতের চেটো মুখের দু'পাশে রেখে "কলাবতী, কলাবতী" বলে পাঁচবার চিৎকার করে ফিরে এল।

মেজবাবু বললেন, "সার, ডাকাতিটা জেনুইন কিনা সেটা কখন জানব?"

"কাল সকালে। কলাবতীর গড়ের মাঠে ভূত দেখতে যাওয়াটাও রহস্যময় ঠেকছে। ব্যাংবাবু, কাল সকালে আমি আসছি, ওকে বাড়িতে থাকতে বলবেন। এখন আমরা যাচ্ছি।"

বড়বাবুরা চলে যাওয়ার পর ব্যাংকাকা জিজ্ঞাসা করলেন, "কলাবতী কোথায় রে, সুশি?"

"পাতালঘরে। তোমার টর্চটা দাও তো ওকে ডেকে আনি। রাতটা মিছিমিছি কেন আর ওখানে কাটাবে?"

"হঠাৎ পাতালঘরে কেন?" বিভ্রান্ত ব্যাংকাকা হাঁ করে রইলেন।

"পরে বলব।"

রাতটা কলাবতী দোতলার পালঙ্কে শুয়েই কাটাল। সকালে চিঁড়ে দুধ আম ফলার করে পাতালঘরে যাওয়ার আগে সে বলল, "সুশি, একটা গল্পের বই দে তো। সময় কাটাতে বড় কষ্ট হয়।"

"কাকা তো গল্পের বইটই পড়ে না। একটা অভিধান আছে দেখেছি, বাংলা থেকে বাংলা, ওটাই নিয়ে যা, অনেক শব্দ শিখতে পারবি।"

কলাবতী অভিধান হাতে পাতালঘরে নেমে গেল। সুশি ছিপ নিয়ে বসল মাছ ধরতে। বড়বাবু সকালে আসবেন বলেছিলেন, তার বদলে এল সরা।

"কলাবতী কোথায়?" সুশিকে সে জিজ্ঞেস করল। "জানো, আজ ভোরবেলা থানা থেকে আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিল। বলে কিনা ডাকাতি যে হয়েছে তার প্রমাণ কই? আরে ডাকাতরা কি প্রমাণ রেখে ডাকাতি করে? কোথায় কলাবতী? প্রমাণ করে দেব কে ডাকাতি করেছে।"

সুশি তেরিয়া গলায় বলল, "কলাবতীকে কী দরকার? তুমি কি বলতে চাও একটা মেয়ে তোমাদের বাড়িতে ডাকাতি করেছে?"

"মেয়ে ডাকাত কি হয় না? ফুলনদেবী? আমি একশো পার্সেন্ট শিয়োর

কলাবতী ডাকাত সেজে টাকাটা নিয়ে গেছে। ও মেয়ে সব পারে। ওর দাঁত, ওর নাক, ওর নখই প্রমাণ।"

"একটা মিথ্যেবাদীর কথা পুলিশ বা কোর্ট মানবে ভেবেছ? তুমি মিথ্যে ডায়েরি করে বলোনি টোকেন হারিয়ে গেছে?" কথাটা বলে সুশি চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে রইল সরার দিকে। কী একটা বলতে গিয়ে সরা ঢোক গিলল।

"টোকেনটা কালুর কাছে তুমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছ। তেমনই কালুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ওকে দিয়ে ডাকাতি করিয়েছ। অ্যাটাচি কেসটা তুমি কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। কলাবতীকেও তুমি কোথাও সরিয়ে দিয়েছ কিংবা গুম করেছ। এসব কথা তো এখনও পুলিশকে বলিনি।" সুশি মাছ ধরার সময়ই ভেবে ঠিক করেছে কলাবতীকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সরাকেই পালটা ধাক্কা দিতে হবে। এজন্য একটা-দুটো মিথ্যে কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয় যদি হোক। সে ভেবে ঠিক করে ফেলে, সব দোষ সরার ঘাড়ে চাপিয়ে ওকে কোণঠাসা করে দেখবে চুপসে যায় কিনা। এটা তো সত্যি, সরা দুটো মারাত্মক অন্যায় করেছে— মিথ্যে ডায়েরি আর দুটো ক্লাব থেকে অ্যাডভান্সের টাকা নেওয়া।

সরা চুপসে গেল না, ভেঙে পড়ল। রকের উপর উবু হয়ে বসে দু'হাতে ন্যাড়া মাথাটা চেপে ধরল। "এইসব ডাহা মিথ্যে কথা তুমি বলবে?"

"বলব। যদি তুমি কালু সম্পর্কে পুলিশকে আর একটা কথাও বলো, তা হলে বলব।"

সরা একদৃষ্টে উঠোনে পাঁচিলের ধারে নয়নতারা গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মনে কী আলোড়ন চলছে সুশি তা বোঝার চেষ্টা করতে করতে নরম গলায় বলল, "আমরা তো তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই চাই। কালু যা কিছু করেছে সব তো তোমার ভালর জন্যই। তোমার বাবা-মা তো টাকা দিতে চাইছিল না। তাই তো ডাকাত সেজে টাকাটা ও এনেছে, শ্যামপুকুরকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই। কালই ও কাকাকে ফোন করেছে। ব্রাদার্সের পতিত ভট্চায কাকার খুব পরিচিত। তাকে দিয়ে শ্যামপুকুরের সঙ্গে মিটমাট করে টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে তো কালুই। এবার কি ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে?"

সরার চোখ ছলছল করে উঠল। ধরা গলায় সে বলল, "এত সব কাণ্ড করেছে আমি কিছু জানতুম না। এখন আমি বড়বাবুকে কী বলব?"

"বলবে, টাকাটা পাওয়া গেছে। ডাকাতটা অ্যাটাচি কেসটা গড়ের মাঠে ফেলে ভূতের ভয়ে পালিয়ে গেছে। কলাবতী সেটা কুড়িয়ে পেয়েছে।"

শুনতে শুনতে সরার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটল। "বুঝেছি, কলাবতী তা হলে ওখানে।" কথাটা বলেই সে তিরবেগে ছুটল পাতালঘরের দিকে, তার পিছু পিছু সুশি।

পাতালঘরের গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে সরা, "কলাবতী, কলাবতী।" বলে তিন-চারবার ডাকল। কোনও সাড়া এল না। মইটা লাগানোই রয়েছে। সরা নেমে গেল পাতালঘরে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে বলল, "আমি পুলিশকে কিছু বলব না কলাবতী, তুমি বেরিয়ে এসো।" কিন্তু কলাবতীর কোনও সাড়া নেই। সে অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে কুঁজোয় ঠোক্কর খেল। তারপর পায়ে লাগল টর্চটা। সেটা তুলে নিয়ে জ্বালল, চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, কয়েকটা চামচিকে ছাড়া আর কোনও প্রাণী নেই।

সে ওপরে উঠে এসে অবাক স্বরে সুশিকে বলল, "ভেতরে কেউ নেই। গেল কোথায়?"

দুর্ভাবনা ফুটে উঠল সুশির চোখে, গলার স্বরে। "ওর তো এখানেই থাকার কথা! যাবে কোথায়? অ্যাটাচিটা দেখলে কি?"

"না, নেই।"

ওরা গড়ের মাঠে ঘুরে ঘুরে ঝোপঝাড় দেখল। গড়ের বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের এধার-ওধার খুঁজল। কয়েকবার নাম ধরে ডাকল। তারপর দিঘির পাড় ধরে এগিয়ে গেল, যদি জলে পড়ে গিয়ে থাকে।

"কী রে সুশি, বড়বাবু আসবে কখন?"

দু'জনেই চমকে উঠে দিঘির দিকে তাকাল। জলে নলখাগড়ার বনের মধ্যে নৌকোয় বসে কলাবতী। হাতে অভিধানটা।

"অনেকক্ষণ নৌকোয় বসে 'অ'-টা এখনও শেষ হল না। অক্ষত মানে আতপ চাল, অয়স মানে লোহা, অবরু মানে শত্রু, অষ্টাপদ মানে সোনা— আর শুনবি? কী দারুণ ইন্টারেস্টিং বই, এতদিন জানতুমই না।... বড়বাবু চলে গেলে বলিস।"

"তুমি এবার ডাঙায় ওঠো।" সরা হাত নেড়ে ডাকল। "আমি এখনই থানায় যাচ্ছি। গিয়ে বলব অ্যাটাচি কেসটা তুমি গড়ের মাঠ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছ। ডাকাতি নিয়ে আর আমাদের কোনও অভিযোগ নেই।"

কলাবতী দাঁড় বেয়ে নৌকোটাকে ঘাটে নিয়ে এল। অ্যাটাচি কেস হাতে

পাড়ে নেমে সরাকে সে বলল, "চাবিটা আছে নাকি তোমার কাছে? তা হলে খুলে দেখতুম। একসঙ্গে সাড়ে তিন লাখ টাকা কখনও দেখিনি তো!"

"ঠাট্টা পরে করবে। সত্যিকারের ডাকাত কিন্তু এসে পড়তে পারে। এটা নিয়ে ওপরে চলে যাও। আমি থানায় যাচ্ছি।"

ওরা দু'জন দোতলায় উঠে যাওয়ার পরে সরা বেরোতে যাচ্ছে, তখনই বড়বাবু, মেজবাবু আর কনস্টেবল বলাই বাড়িতে ঢুকল। তাদের পেছনে একটা ভিড়, নেতৃত্বে ভূদেব খেটো। বোলতার লোক ইতিমধ্যে জেনে গেছে সরানন্দ মহাপাত্র আসলে স্বরাজ দাস।

গম্ভীর চালে বড়বাবু সরাকে বললেন, "শুনলুম তুমি প্রমাণ করেছ গড়ের মাঠে, পাতালঘরে ভূত নেই। এটা কি সত্যি?"

একগাল হেসে সরা বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। এটাও সত্যি, ভূতেই টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।"

"তা হলে মিথ্যে ডাকাতির অভিযোগ করেছিল। জানো এর ফল কী হতে পারে?"

"কী আবার হতে পারে।" গর্জন করে ভূদেব এগিয়ে এলেন। "বংশীবদন আগে ঘরে উঠুক, তারপর ফলটল দেখাবেন।" মুঠোকরা হাত তুলে জনতার দিকে তাকিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন, "কী বলো হে তোমরা?"

হইহই করে উঠল জনগণ।

"পুলিশের জুলুম চলবে না।"

"থানা ঘেরাও করব।... দাদু কালই বোলতা বন্ধ ডাকুন।"

"এসব বোলতাকে হারাবার জন্য ছ'গোল খাওয়া বিদ্যুৎপুরের চক্রান্ত। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বড়বাবু।"

"বড়বাবুর কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।"

এক পা এক পা করে পিছু হটে যাচ্ছেন বড়বাবু। দরদর ঘাম গড়াচ্ছে কপাল থেকে গাল বেয়ে। জনতাও এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর দিকে।

মেজবাবু ফিসফিস করে বললেন, "সার, বংশীবদনের আহ্বানে, বোলতার জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য—"

"আঃ, কী খটোমটো বাংলা বলছ।" বড়বাবু ধমক দিলেন। তারপর হাত জোড় করে জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন, "স্বরাজ দাস বলেছে ভূতে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ব্যস, আর কোনও সমস্যা নেই। তা হলে এবার আমাদের যেতে দিন।"

"যেতে দাও, যেতে দাও," বলে ভিড় পথ করে দিল। ওঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এসেই বড়বাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, "পাবলিকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি? এইজন্যই তো পুলিশের এত বদনাম।" পরশু ফাইনাল খেলা লিচুতলা সহযাত্রীর সঙ্গে। সরা বাড়ির দিকে রওনা হতেই জনতা তার সঙ্গ নিল।

"যাক বাবা, একটা ফাঁড়া কাটল," দোতলার বারান্দায় সুশি বলল।

সাদা মারুতি গাড়িটা সরাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে থামল, চালাচ্ছেন পতিত ভট্চায, তাঁর পাশে সত্যশেখর, পেছনে কালো শার্ট পরে সেই যুবকটি, যার হাঁটা দেখলেই মনে হয় বগলে ফোড়া হয়েছে। ওর নাম বদু। আর আছে বিশ্বনাথ ওরফে বিশুবাবু, শ্যামপুকুর ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ। বদু এবং বিশুবাবু সরাদের বাড়িতে আগে এসেছে।

গাড়ি থেকে সবাই নামল। বিশুবাবুর হাতে পাতলা একটা অ্যাটাচি কেস। সে বলল, "বদু, তুই যাসনি, গাড়িতে থাক। দরকার হলে ডাকব।"

"কেন বিশুদা, দানাটানা খাওয়াবার কথা বলতে হবে না? সঙ্গে করে এনেচি।"

"না, না, ওসব আজ নয়।" বিশুবাবু ওকে থামাল।

বদু বলল, "চলো, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।"

সামনে দু'জন পেছনে তিনজন বাবার সড়ক থেকে সরু একটা রাস্তা ধরে এগোল। তখন সুমি সামনের বাড়িতে এক বউকে ডাকাতির গল্প শোনাচ্ছিল। তিনজন সরাদের বাড়িতে ঢুকে যাওয়ার পর বদু রাস্তায় পায়চারি শুরু করল। গল্প করতে করতে জানলা দিয়ে তাকিয়ে সুমির চোখে পড়ল কালো জামাপরা সেই লোকটাকে, যে কয়েকদিন আগে তাদের পিস্তল দেখিয়ে দানা খাওয়াবে বলে গেছল।

"বউদি, ওই তো সেই ডাকাতটা। আবার আমাদের বাড়িতে এসেছে। ওরে বাবা, এখন কী হবে! কেউ নেই বাড়িতে দিদি আর মা ছাড়া।"

বউটি জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে বদুকে দেখে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, "ডাকাত, ডাকাত... ওগো কে কোথায় আছ, ডাকাত পড়েছে... বাঁচাও, বাঁচাও।"

পাড়ায় সবাই জানে দু'দিন আগেই ডাকাতি হয়ে গেছে। পাড়ায় এত বাড়ি, এত লোক থাকতেও কিনা পরিচ্ছন্নভাবে ডাকাতিটা করে সটকে পড়ল! ডাকাতটাকে ধরা গেল না। এজন্য সারা পাড়ার নারীপুরুষ খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ে। বউটির চিৎকার শুনে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে লোক বেরিয়ে এল, তবে তারা পুরুষ নয়। তখন বেলা প্রায় দশটা বাজে, পুরুষরা কাজেকর্মে বেরিয়ে গেছে। নানান বয়সি মেয়ে, তাদের হাতে খুন্তি, কাটারি, চ্যালা কাঠ, লোহার শিক। এমনকী ইটের খণ্ড, মাটির ঢেলা।

বদু প্রথমে বুঝতে পারেনি রে রে করে যারা তেড়ে আসছে তাদের লক্ষ্য সে নিজেই। একটা মাটির ঢেলা তার মাথায় লেগে ভেঙে যেতে সে সচকিত হয়ে পালাবার জন্য এধার-ওধার তাকাল।

"ডাকাত, ডাকাত," চিৎকারে দাসপাড়া মুখর। তার মধ্যেই একজন বলে উঠল, "শিগগিরি থানায় গিয়ে খবর দে।"

ফ্রকপরা দুটি মেয়ে ছুটল থানার দিকে। আর বদু ছুটল বাবার সড়ক ধরে। এখানে সে কিছুই না চিনলেও এখন তার মনে পড়ছে সুশিদের বাড়িটা। সেখানে গিয়ে আপাতত লুকিয়ে থাকা যায়। তাই সে ছুটল সুশিদের বাড়ির দিকে।

সত্যশেখররা সরাদের বাড়ির মধ্যে তখন। তাদের দেখে তো সরার মা সুখির মুখ গম্ভীর।

শ্যামপুকুর ক্লাবের বিশুবাবু দু'হাত জোড় করে বলল, "চিনতে পারছেন। আমিই এসে অ্যাডভান্সের টাকা দিয়ে গেছলুম। পতিতবাবু কাল বললেন সরা ওটা ফেরত দিতে চায়। তাই ফেরত নিতে এসেছি। কোর্টের স্ট্যাম্পপেপারটাও ফেরত দোব বলে এনেছি। সরা কোথায়?"

সরার দিদি অমিতা বলল, "সরা বাজারে গেছে। বাবা গেছে শ্যাওড়াফুলিতে, কাজে।"

পতিত ভট্চায বলল, "দুটো ক্লাব থেকে টাকা নিয়ে সরা খুবই অপরাধ করেছে। এজন্য ও শাস্তি পেতে পারে। যাই হোক, শ্যামপুকুরের ব্রজবাবু অদ্দূর আর যেতে চান না। আমাদের অনুরোধে সরাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। বিশুবাবু এসেছেন টাকা ফেরত নিতে। ওঁকে দিয়ে দিন।"

সুখি দাসের থমথমে মুখে এবার কান্না ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, "সে টাকা কি আর আছে, সে তো পরশুদিন ডাকাতে এসে নিয়ে গেছে।"

সত্যশেখর অবাক স্বরে এবার বলল, "তা কী করে হয়! আমার ভাইঝি

কালু এখান থেকে টেলিফোন করে পরশুই বলল টাকাটা রেডি করা আছে। কখন ডাকাতি হয়েছে?"

অমিতা বলল, "বিকেলে, যখন ফুটবল খেলা চলছিল।"

সত্যশেখর বলল, "আর কালু তো আমায় ফোনে বলল সন্ধেবেলায়!"

বিশু বলল, "এখানে একটা বাড়িতে গেছলুম সেখানে ছিপছিপে লম্বা কালো রঙের একটি মেয়েকে দেখেছি নাম কলাবতী, সেই কি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ভাইঝি।"

"চলুন তো, মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি।"

বিশুবাবু কথাটা সবে শেষ করেছেন তখনই পাড়া কাঁপিয়ে "ডাকাত, ডাকাত" রব উঠল।

এদিকে বদু ছুটতে ছুটতে সুশিদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। কলাবতী তখন ঘণ্টুদের বাড়িতে ঢেঁকিতে ধানভানা দেখতে যাওয়ার জন্য দোতলা থেকে নামছে। ঢেঁকি সে কখনও দ্যাখেনি। দাদুর কাছে শুনেছে দেশ থেকে নাকি ঢেঁকি তাড়িয়ে দিয়েছে রাইস মিল। হঠাৎই বদুকে ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে সে পথ আটকে বলল, "এ কী! কোথায় যাচ্ছেন? আজও কি বাড়ি সার্চ করবেন নাকি?"

"আমাকে ডাকাত বলে তাড়া করেছে সরার পাড়ার মেয়েরা। হাতে বঁটি, কাটারি, আরও কত কী, মেরেই ফেলে দেবে। সরার বাড়িতে আমরা গেছলুম টাকাটা ফেরত নিতে।"

"আমরা কারা?"

"ব্রাদার্সের পতিতদা, শ্যামপুকুরের বিশুদা আর সত্য বলে একটা লোক।"

"ওহ্‌হো, কাকাকে তো বলাই হয়নি টাকাটা কোথায়!"

"থানায় খবর দিতে গেছে। আমাকে কিছুক্ষণ ঘাপটি দিয়ে থাকতে হবে। এখনও তিনটে পুলিশ কেস ঝুলছে। কী বিপদে যে পড়লুম ক্লাবের জন্য সার্ভিস দিতে এসে।"

"লুকিয়ে থাকতে চান? আচ্ছা আসুন, লুকোবার খুব ভাল জায়গা আছে।"

দ্রুত পায়ে কলাবতী নীচে নেমে এল। পেছনে বদু। খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে দিঘির ধার দিয়ে শিবমন্দিরের পেছনে হাজির হল। পাতালঘরের গর্তে মইটা লাগানোই রয়ে গেছে। সে আঙুল দেখিয়ে বলল, "শিগগির নেমে পড়ুন।

থানার বড়বাবুর ডাকাত ধরার খুব শখ, এক্ষুনি এসে পড়বেন।"

বদু ইতস্তত করে বলল, "এই গর্তটা কীসের?"

"পাতালঘরের, ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন।" কলাবতী তার পিঠে ধাক্কা দিল। দূরে বাবার সড়ক দিয়ে কয়েকটি লোক উত্তেজিত ভাবে লাঠি হাতে যাচ্ছে। বদু আর একটিও কথা না বলে মই বেয়ে নীচে নেমে গেল। সে নামামাত্রই কলাবতী মইটা টেনে তুলে নিল।

"এ কী, এ কী! পাতালে নামিয়ে মই কেড়ে নিলে কেন? আমি উঠব কী করে?" বদুর আর্তস্বর গর্ত থেকে উঠে এল।

"মই না থাকলে পুলিশও নামতে পারবে না। এটাই কি ভাল হল না?"

"তোমার খুব বুদ্ধি আছে। পরে মই লাগিয়ে দেবে তো?"

"নিশ্চয় দোব।" কলাবতী মইটা গর্তের পাশে রেখে ফিরে এল। তাকে দেখে সুশি বলল, "কোথায় গেছলি? চল ঘণ্টুদের বাড়ি।"

"পরে যাব। এদিকে একটা খুব মজা হয়েছে।" কলাবতী তারপর যা ঘটেছে সুশিকে বলল।

সুশি শুনে বলল, "বাছাধন এখন ভূতেদের দানা খাওয়াক।"

কলাবতী সবে সদরে পৌঁছেছে। তখনই সদলবলে বড়বাবু বাড়িতে ঢুকলেন। সঙ্গে সরা, সত্যশেখররা এবং প্রায় সারা বোলতাবাসী।

"এখানে ডাকাত ঢুকেছে?" সুশিকে সামনে পেয়ে বড়বাবুর প্রথম প্রশ্ন।

সুশি আকাশ থেকে পড়ল। "ডাকাত! কই, না তো!"

"তুমি কতক্ষণ এখানে আছ?"

ছেলেমানুষি গলায় সুশি বলল, "সকাল থেকেই। কাউকে তো বাড়িতে ঢুকতে দেখিনি। আপনি শুধু আমাদের বাড়িতেই ডাকাত ঢুকতে দেখেন।"

মেজবাবুর দিকে তাকিয়ে বড়বাবু বললেন, "তা হলে কোথায় গেল ডাকাত?"

"পাশের বাড়ি, তার পাশের বাড়ি সার্চ করে দেখব সার?"

"চলুন।"

ওর বেরিয়ে যেতেই কলাবতী জড়িয়ে ধরল সত্যশেখরকে। "কাকা, যা সব কাণ্ড এখানে হচ্ছে।"

"খুব বেঁচে গেছি রে কালু। এ কোথায় এসে পড়লুম! মেয়েরা ঘিরে ধরে পেটাতে শুরু করে দিল। ভাগ্যিস এই স্বরাজ দাস এসে পড়ে আমাদের বাঁচাল।"

বিশুবাবু বলল, "হতভাগা বদুটাই যত নষ্টের গোড়া। কেন যে সঙ্গে করে আনলুম। এত টাকা নিয়ে মোটরে যাব, পথে যদি কিছু ঘটে তাই ভাবলুম সঙ্গে একটা গার্ড থাকা ভাল।"

সত্যশেখর বলল, "কিন্তু গার্ডটি গেল কোথায়?"

পতিত ভট্চায বলল, "গার্ড চুলোয় যাক, টাকাটা যে ডাকাতি হয়ে গেছে।"

কলাবতী আর সুশি মুখ টিপে হাসছিল। সরা তাই দেখে পকেট থেকে একটা চাবি বার করে দেখিয়ে বলল, "আমার টোকেনটা এবার দেবে তো?"

ছোঁ মেরে সুশি চাবিটা সরার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "ফাইনালটা খেলে দেওয়ার পর টোকেন। আপনারা বৈঠখখানা ঘরে বসুন, টাকা আনছি।" বলেই সুশি ছুটল দোতলায়।

তিনজনেই যথেষ্ট অবাক। যে টাকা ডাকাতি হয়েছে বলে তারা শুনেছে সেই টাকা আনতে গেল কিনা এই মেয়েটি।

সত্যশেখর বলল, "ব্যাপার কী রে কালু?"

কলাবতী জবাব দেওয়ার আগেই সরা বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়, ডাকাতরা ভূতের তাড়া খেয়ে অ্যাটাচি কেসটা মাঠে ফেলে পালিয়ে যায়, কলাবতী সেটা কুড়িয়ে পেয়েছে।"

"বাবা বলছিল এখানে ভুত আছে বলে লোকে বিশ্বাস করে। তা হলে সত্যি সত্যিই আছে। তোকে তাড়া করেনি তো কালু?"

মুখটাকে গম্ভীর করে কলাবতী বলল, "করবে কী করে, বড়দি পইপই করে বলে দিয়েছিল বেলগাছ, শ্যাওড়াগাছের দিকে না যেতে। আমি একদম যাইনি। বলে দিয়েছিল ভূতেদের পা খুব লম্বা হয়, তাড়া করলে শাড়ি পরে ছুটতে পারবে না। আমি শাড়ি পরিনি।"

সুশি অ্যাটাচি কেস নিয়ে এল। চাবি দিয়ে ঢাকনাটা খুলতেই দেখা গেল বান্ডিল করা হাজার টাকার নোট থরে থরে বিছানো। বিশুবাবু তার অ্যাটাচি থেকে কোর্টের স্ট্যাম্প পেপার বার করে সরার হাতে তুলে দিল। তার মুখে জ্বলজ্বল করে উঠল মুক্তি পাওয়ার আনন্দ। কৃতজ্ঞ চোখে সে কলাবতী, সুশির দিকে তাকাল।

"তা হলে বাবা কাল বংশীবদন বি এস সি-র ঘরে উঠছে!"

সবাই ফিরে তাকাল দরজার দিকে। ব্যাংকাকা দাঁড়িয়ে।

"জান লড়িয়ে খেলব," সরার গলায় প্রতিজ্ঞার সুর। "প্রত্যেক বছর আমি খেলে দিয়ে যাব, যদি কলেজটা হয়।"

"তা হলে এবার যাওয়া যাক।" বিশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "পতিতদা আমাদের 'নো অবজেকশন' চিঠিটা কলকাতায় গিয়েই দোব।"

"এ কী, এখুনি যাচ্ছেন কী, একটু মিষ্টিমুখ না করলে হয়!" ব্যাংকাকা আপত্তি তুললেন। "ইকড়ির সুবল সামন্তর মাখা সন্দেশ এই অঞ্চলের বিখ্যাত মিষ্টি। আনতে লোক পাঠিয়েছি।"

"বটে, বটে।" সত্যশেখর চেয়ারে বসে পড়ল। "আগে তো কখনও শুনিনি অথচ আমি কিনা হুগলিরই সন্তান।" তাকে মর্মাহত দেখাল।

মিষ্টিমুখ সেরে, ফেরার জন্য গাড়িতে বসে পতিত ভট্চায বলল, "হ্যাঁরে সরা, তুই ন্যাড়া হলি কেন?"

কলাবতী বলল, "কলকাতার রোনাল্ডো হবে বলে।"

বিশুবাবু চিন্তিত স্বরে বলল, "বদুটা যে গেল কোথায়!"

সত্যশেখর বলল, "দু'কিলো মাখা নিয়ে যাস রে কালু।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শেতলের মা পড়িমরি দোতলায় ছুটে উঠে এল। ভয়ে তার চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে। "ও দিদিমণিরা, কেমন যেন আওয়াজ হচ্ছে শিবমন্দিরের ওদিক থেকে। তোমরা যে বললে ভূতটুত সব মিচে কতা? কই আগুতে তো এমন আওয়াজ হতনি?"

সুশি বলল, "হতনি তার কারণ তখন ভূতেদের খিদে পেতনি। কালু এবার চল দুটো দানাপানি খাইয়ে আসি ভূতটাকে।"

"ক'দ্দিন ওকে আটকে রাখবি?"

"বংশীবদন ঘরে উঠলে ওকে ছাড়ব।"

বংশীবদন শিল্ড প্রথমবার জিতল বোলতা স্পোর্টিং ক্লাব। স্বনামেই খেলেছে স্বরাজ দাস। দর্শক সমাগমে কেউ কেউ দাবি করেছে এটা মহকুমার রেকর্ড। এম এল এ এবং রাজ্যের এক প্রতিমন্ত্রীর হাত দিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়। ভূদেব খেটো ঘোষণা করেন, গড়ের মাঠে কলেজ স্থাপন করা হবে। ম্যাচে সরা ডাবল হ্যাটট্রিক করতে পারেনি। কিন্তু বোলতার লোকেরা তাতে অখুশি নয়। তারা দেখল ম্যাচ শেষ হওয়ার সাত মিনিট আগে পর্যন্ত বি এস সি দু'গোলে হারছিল, তারপর স্বরাজ দাস অলৌকিক খেলা খেলে তিনটি গোল দিল। এমন রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় তারা আগে কখনও পড়েনি বা এমন শিহরন

তারা আগে কখনও অনুভব করেনি। তারা পটকা ফাটাল, হাউই ওড়াল, আবির মাখল। বোলতা হাইস্কুলের হেডমাস্টার ঘোষণা করলেন, কাল স্কুলের ছুটি থাকবে।

ভি আই পি এনক্লোজারে বসা সুখি দাস গজগজ করে বলে, "দুটো কেন, তিনটে ক্লাব থেকে সরা অ্যাডভান্স নেওয়ার মতো খেলেছে।"

সুশি কলাবতীর কানে কানে বলল, "সরাকে যেন ভূতে পেয়েছিল। সত্যিই দারুণ খেলল।"

ঘণ্টুকে ডেকে কলাবতী তার হাতে টোকেনটা দিয়ে বলল, "এটা সরাকে দিয়ে এসো। ম্যান অব দ্য ম্যাচের প্রাইজ।"

বাড়ি ফিরে কলাবতী আর সুশি পাতালঘরের গর্তের কাছে গেল। মইটা গর্ত দিয়ে নামিয়ে সুশি বলল, "এবার উঠুন, আর ভয় নেই। সারা বোলতা এখন নাচানাচি করছে, কেউ আর আপনার দিকে তাকাবে না।"

উঠে এল বদু ধুঁকতে ধুঁকতে। "আমি এখন সেফলি যেতে পারব তো?"

কলাবতী বলল, "পারবেন, তবে ওই কালো জামাটা খুলে।"

আরও সাতদিন বোলতায় থেকে ওরা কলকাতায় ফিরে আসে। আসার দিন সকালে ব্যাংকাকা একটা প্যাকেট কলাবতীর হাতে দিলেন। কলাবতী সেটা খুলে দেখল দুটো শাড়ি। এই দুটোই সুশি বেছেছিল বোলতা বস্ত্রালয়ে। শাড়িতে পিন দিয়ে কাগজ আঁটা। তাতে লেখা: "বোলতার জনগণের কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা তোমরা গ্রহণ করো। আবার এসো। ইতি, ভূদেব খেটো।"

কলাবতী ও খয়েরি

খয়েরির সঙ্গে কলাবতীর পরিচয় হয় রাস্তায়। সেদিন স্কুল থেকে সে প্রতিদিনের মতো হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। পিঠে স্কুলব্যাগ, তার মধ্যে টিফিন বক্স, কাঁধে ঝুলছে ওয়াটার বট্‌ল। সেদিন টিফিন বক্সটা খোলার তার দরকার হয়নি, খাবার যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। তাদের ক্লাসের মিঞ্চুর মা এন্তার পাটিসাপটা বাড়িতে তৈরি করেছিলেন, তারই অনেক পলিথিন ব্যাগে ভরে মিঞ্চু নিয়ে এসেছিল তাই খেয়েই কলাবতীর টিফিন করা হয়ে যায়।

দুপুরে টিফিনে পাঁউরুটি চিবোতে তার একদমই ভাল লাগে না। জেলি আর মাখন লাগানো রুটির স্লাইস সে প্রায় রোজই মিঞ্চুকে দিয়ে দেয়। পাঁউরুটি খেতে মিঞ্চুর খুব ভাল লাগে, স্কুল থেকে বাড়ি আসার পথে স্কুটার-মোটরবাইক সারাবার দোকানটার পাশে পাঁঠার মাংসের একটা দোকান, তার পেছনে টিনের এবং টালির চালের অনেক বাড়ি। মাংসের দোকানের সামনে ফুটপাথে কয়েকটা ষণ্ডামার্কা কুকুরকে কলাবতী রোজই দু'বেলা দেখে, ওরা রাস্তা দিয়ে যাওয়া লোকজনের দিকে ফিরেও তাকায় না। বেশ নিরীহ বলেই মনে হয়। তবে দোকান থেকে হাড় বা মাংসের ছাল ছুড়ে দিলে সেটা খাওয়ার জন্য ওরা নিজেদের মধ্যে তুলকালাম ঝগড়া ও কামড়াকামড়ি শুরু করে দেয়।

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় কলাবতী ওই কুকুরগুলোর থেকে একটু তফাতে নতুন একটি কুকুরকে বসে থাকতে দেখল। তার রং খয়েরি কিন্তু মাথার তালুর লোম সাদা, খুবই রুগ্‌ণ, কোমরের ও বুকের হাড় প্রকট। মাংসওলা একটা ছোট হাড় ওর দিকে দয়াপরবশ হয়ে ছুড়ে দিল। সে হাড়টা মুখে নিতে যাচ্ছে তখন দুটো ষণ্ডা কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তাকে ফুটপাথে

ফেলে একটা কুকুর ঘাড় কামড়ে দিতেই সে পরিত্রাহি আর্তনাদ তুলে লেজটা দু'পায়ের ফাঁকে গুটিয়ে ছুটে পালাল সেইদিকে যেদিকে কলাবতী যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে কলাবতী সব লক্ষ করল। তার মনে হল, কুকুরটা বোধহয় অন্য এলাকার, খিদের জ্বালায় এই এলাকায় খাবার খুঁজতে এসেছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে কুকুরটিকে আবার দেখতে পেল সত্যানন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে ফেলে দেওয়া মালসা থেকে দই চেটে খাচ্ছে। বেচারা! নিশ্চয় সারাদিন খাওয়া জোটেনি।

কলাবতী দাঁড়িয়ে পড়ল। স্কুলব্যাগ থেকে টিফিন বক্স বার করে তাই থেকে মাখন লাগানো পাঁউরুটির দুটো স্লাইস নিয়ে হাতে ধরে ওকে ডাকল, "আয় আয়" বলে জিভ দিয়ে "চুক চুক" শব্দ করল। কুকুরটি হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইল। কলাবতীর মনে হল, ও বিশ্বাস করতে পারছে না মাখন লাগানো রুটি নেওয়ার জন্য তাকেই ডাকা হচ্ছে। কলাবতী আবার ডাকল। এবার সে ছোট্ট করে ল্যাজ নাড়ল। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটা 'কুঁই' শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে এল, বোধহয় বুঝতে পেরেছে তাকেই খেতে ডাকছে। কিন্তু তাই বলে মাখন-রুটি! তার অবিশ্বাসের ঘোর তখনও কাটেনি। কলাবতী দু'পা এগিয়ে গেল। "আয়, আয়," মিষ্টি নরম স্বরে সে আবার ডাকল।

কয়েকজন পথিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চলে গেল। একজন যেতে যেতে মন্তব্য করে গেল, "মানুষ খেতে পায় না, কুকুরকে খাওয়াচ্ছে!" কথাটা কানে যেতেই তার মাথা গরম হয়ে উঠল। লোকটা দূরে চলে গেছে নইলে সে বলত, "মানুষ তো তার নিজের খাবার ভিক্ষে করেও জোগাড় করে নিতে পারে। কিন্তু কুকুর কি তা পারে?"

কলাবতী আরও দু'পা এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। কুকুরটি দুটো কান ঘাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মুখটা নামিয়ে ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল! কলাবতী একটা স্লাইস ওর মুখে ঠেকাল। কপ করে সেটা কামড়ে নিয়ে মুখে ঢুকিয়ে ফেলল এবং দুই ঢোকে গিলে নিল। অন্য স্লাইসটারও একই অবস্থা হল। টিফিন বক্সে আছে আপেল আর ছানা। কুকুর আপেল খায় কিনা কলাবতীর জানা নেই। ছানা বোধহয় খেতে পারে, এই ভেবে সে মুঠোয় ছানা নিয়ে খয়েরির মুখের সামনে ধরল। একবার গন্ধটা শুঁকে নিয়ে তার তালু থেকে ছানা খেয়ে তালুটা চেটেও দিল। সুড়সুড়ি লাগতে কলাবতী মজা পেয়ে হাত বাড়িয়ে রইল, খয়েরি আরও তিন-চারবার চাটল। টিফিন বক্স কিছুটা হালকা করতে পেরে সে স্বস্তি পেল। বক্স খুলে অপুর মা যদি দেখে

সে টিফিন খায়নি তা হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার গজগজানি থামবে না।

কুকুরটিকে পাঁউরুটি আর ছানা খাইয়ে কলাবতী বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন রেকর্ডে ছাপমারা কুকুরটির মতো দুটো পা সামনে রেখে উবু হয়ে বসে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কলাবতীকে তাকাতে দেখে সে লেজ নেড়ে উঠে দাঁড়াল, কিছুটা গিয়ে কলাবতী আবার মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল কুকুরটি তাকে অনুসরণ করে পিছু পিছু আসছে। বাড়ির ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাগান পেরিয়ে বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলাবতী ফটকের দিকে তাকিয়ে রইল, সাত-আট সেকেন্ড পরে কুকুরটি ফটকের সামনে এসে হাজির হয়ে ভেতর দিকে তাকিয়ে কলাবতীকে দেখতে পেয়ে লেজ নেড়ে যেতে লাগল কিন্তু ভেতরে ঢুকল না।

"ভাগো এবার।" চেঁচিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত নেড়ে চলে যেতে বলল, "অনেক দিয়েছি, আর দিতে পারব না।"

কলাবতী বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল, দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল মুরারি। সে বলল, "কাকে কী দিতে পারবে না কালুদি?" কলাবতী বলল, "একটা কুকুরকে, খাবার। ..... দ্যাখো তো মুরারিদা, এখনও গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিনা, খয়েরি রঙের।" উঁকি দিয়ে দেখে মুরারি বলল, "কই কেউ নেই তো!"

'খয়েরি' শব্দটি মুখ থেকে বেরোতে তখনই কলাবতী মনে মনে নামকরণ করে ফেলে— খয়েরি!

এইভাবেই খয়েরির সঙ্গে কলাবতীর প্রথম আলাপ। পরদিন স্কুলে টিফিন খাওয়ার সময় কলাবতীর মনে ভেসে উঠেছিল খয়েরির ক্ষুধার্ত চাহনি। আর খাবার পেয়ে কৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে থাকার ছবিটা। সে পাঁউরুটির দুটো স্লাইস না খেয়ে রেখে দেয় যদি আবার দেখা হয় রাস্তায় তা হলে খেতে দেবে।

আবার তাদের দেখা হল সত্যানন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে। উবু হয়ে বসে ছিল খয়েরি, তাকে দেখেই লেজ নাড়ল। কলাবতী ওকে না-দেখার ভাণ করে পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। মুখটা সামান্য ফিরিয়ে আড়চোখে দেখল খয়েরি বসেই আছে এবং তাকে লক্ষ করে যাচ্ছে। কলাবতী ঘুরে তাকাল। খয়েরিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এগোবে কি এগোবে না, ইতস্তত করছে। তারপর অনুভূতি থেকে কী বুঝল খয়েরি প্রায় পা টিপে টিপে কলাবতীর

দিকে এগিয়ে এল। কলাবতীর ভাল লাগল ওর কাছে আসাটা। একটা পশু তাকে ভাল লোক হিসেবে বুঝেছে বলেই তো তার কাছে আসছে। ওরা মানুষ চেনে। স্বার্থপর, নিষ্ঠুর লোক দেখলে পশুপাখি দূরে সরে যায়। দাদুর কাছে শুনেছে মানুষের থেকে ওদের নাকি একটা বাড়তি ইন্দ্রিয় আছে, খয়েরিরও তা হলে আছে।

খয়েরি কলাবতীর কাছে এসে মুখ তুলে লেজ নাড়তে লাগল। তার মনে হল খয়েরি যেন বলছে, "তোমার ওই ব্যাগের মধ্যে কৌটোটায় কিছু আছেটাছে নাকি? থাকলে বার করো না, খুব খিদে পেয়েছে।" কলাবতী বলল, "এখানে দেব না, আয় আমার সঙ্গে।" এই বলে কলাবতী বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। তার পিছু নিল খয়েরি।

কলাবতীর মজা লাগল একটা কথা ভেবে, তার মনে হচ্ছে, কুকুরের মনে মনে বলা কথা সে বোধহয় বুঝতে পারে। নয়তো 'এখানে দেব না' বলে হাঁটতে শুরু করামাত্র খয়েরি তার পিছু নিল কেন! সে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল, খয়েরিও তার কথা বুঝতে পারে। বোঝাপড়াটা হল খাওয়ার অর্থাৎ পেটের টানে।

ফটকের কাছে এসে কলাবতী রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে বাড়ির দিকে তাকাল কেউ তাকে দেখছে কিনা দেখার জন্য। অপুর মা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফটকের দিকে আসছে, হাতে ঝুলছে বাজার করার প্লাস্টিকের ব্যাগ।

কলাবতী বলল, "চললে কোথায় অপুর মা?"

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অপুর মা দশাসই মাঝবয়সি বিধবা। অপু তার একমাত্র ছেলে। কলাবতীদের আটঘরাতেই দেশ। দেশের বাড়িতে অপু থাকে মামাতো ভাইবোনেদের সঙ্গে। অপুর মা'র ভাগের পুকুর, সামান্য জমিজমা তারাই ভোগ করে। এই বাড়িতে সে যা মাইনে পায় সবই দেশে পাঠিয়ে দেয়। মাতৃহারা কলাবতীকে কোলেপিঠে না হোক যত্নে ও যতদূর সম্ভব শাসনে সে দেখাশোনা করে। রান্নাঘরটা অপুর মা'র নিজস্ব সাম্রাজ্য। অসম্ভব সুস্বাদু তার রান্নার হাত। প্রথম প্রথম মুরারি রান্নার বিষয়ে তাকে অযাচিত পরামর্শ দিতে গিয়ে এমন দাবড়ানি খেয়েছিল যে, সঙ্গে সঙ্গে রাজশেখরের কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে নালিশও করেছিল।

"কত্তাবাবু আপনার দেশের এই মেয়েটার জিভ বড্ড খরখরে। বললুম ধোঁকায় অত লঙ্কাবাটা দিস না। তা কী বলল জানেন, এ-বাড়ির লোকের কার কেমন জিভের তার আমার জানা আছে। এই বলে আরও এক খাবলা

লঙ্কাবাটা দিয়ে বলল, এটা ছোটবাবুর জন্য। কর্তাবাবু আজ রাতে আপনাদের কিন্তু ঝালের চোটে বাপ রে মা রে বলে টেবিল থেকে উঠে পড়তে হবে। রসগোল্লা কিনে এনে রেখে দেব?''

''কিনবি?'' রাজশেখর সেকেন্ড দশেক চিন্তা করে বললেন, ''আটঘরার মেয়ে, ঝালের হাত একটু বেশি তো হবেই, তবে কী জানিস আটঘরার লোকেরা ঝাল একটু বেশিই খায়, তেমনই মিষ্টিটাও। ঠিক আছে, রসগোল্লা এনে রাখ।''

''কতটা আনব?''

''আমার আর কালুর জন্য গোটা আষ্টেক আর সতুর জন্য কুড়িটা হলেই চলে যাবে।''

সেদিন রাতে খাওয়ার টেব্‌লে রান্না করা খাবার রেখে অপুর মা ঘরের বাইরে সিঁটিয়ে থেকে দুরুদুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইল। মুরারিদা তাকে রসগোল্লাভরা মালসা দেখিয়ে বলেছে, ''এই দ্যাখ, তোর ধোঁকা খেয়ে সবাই যখন বাবা গো-মা গো করবে তখন এটার দরকার হবে।''

ধোঁকার ডালনার বাটি থেকে চৌকো একটা খণ্ড তুলে প্রথমে সত্যশেখর দাঁতে একটা টুকরো ভেঙে মুখে পুরল। কয়েকবার চিবোল। দুটো চোখ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। রাজশেখর তার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে, মুরারি এবং কলাবতীও।

রাজশেখর দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ''সতু খুব ঝাল কি? রসগোল্লা আছে খাবি?''

সত্যশেখর ধোঁকার বাকিটুকু মুখে পুরে চোখ বুজে চিবোতে চিবোতে মাথা নাড়তে লাগল, ''ফাসক্লাস, ফাসক্লাস, কালু খেয়ে দ্যাখ। বাবা একটা মুখে দাও, ডিলিসাস। কতদিন পর যে রান্নার মতো একটা রান্না খাচ্ছি।'' বলতে বলতে সত্যশেখর একটা আস্ত ধোঁকা মুখে চালান করল।

কলাবতী তখন খুবই ছোট, কাকার দেখাদেখি সেও ধোঁকায় কামড় দিয়ে মন্তব্য করল, ''ঝাল কোথায়! এ তো আমাদের বিরিঞ্চির ঘুগনি আর লালুপ্রসাদের আলুকাবলির মতোই।'' কথাটা শুনে সত্যশেখর ভাইঝির দিকে সপ্রশংস চোখে তাকায়।

মুরারি ব্যাজার মুখে খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়েই পড়ল অপুর মা'র সামনে। উদ্বিগ্ন স্বরে সে জানতে চাইল, ''হ্যাঁগো মুরারিদা, ছোটবাবু যে ফাসক্লাস ফাসক্লাস বলল, কথাটার মানে কী?''

"মানে, জঘন্য জঘন্য।" মুরারি মুখবিকৃত করে মানেটা আরও স্বচ্ছ করে বুঝিয়ে দিল।

অপুর মা ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে বলল, "ওম্মা ছোটবাবু তো সবটাই খেয়ে নিল।"

সিংহিবাড়িতে লোকজন কম, কেউ গলা চড়িয়ে কথা বলে না তাই শান্ত শব্দহীন থাকে কিন্তু এর পর থেকে অপুর মা'র দাপুটে গলা একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পৌঁছোতে লাগল।

এহেন অপুর মা সেদিন প্লাস্টিকের বাজার করার ব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় স্কুল-ফেরত কলাবতীর মুখোমুখি হয়ে পড়ল। কলাবতী একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে নিল খয়েরি কোথায়, তারপর বলল, "অপুর মা, এমন সময় কোথায় যাচ্ছ?"

"ছোটবাবু টেলিফোন করে বলল, অপুর মা, কাবলে ছোলার ঘুগনি খাব, বিরিঞ্চির থেকেও বেশি ঝাল দিয়ে। ঘরে তো কাবলে ছোলা নেই, মুরারিদা যে কোথায় গেছে দুপুর থেকে, যাই আমিই কিনে আনি। ওম্মা এ কুকুরটা কোথা থেকে এল!" কলাবতীর পাশে এসে দাঁড়ানো খয়েরিকে দেখে অপুর মা বলল। তার স্বরে প্রশ্রয়ের আভাস পেয়ে কলাবতী উৎসাহিত হয়ে বলল, "দ্যাখো না, কাল ওকে আমার টিফিনটা খাইয়েছি, আজও আমার পিছু নিয়েছে, আজও ওর চাই।"

"টিপিনটা খাইয়েছ মানে? তুমি খাওনি?"

অপুর মা'র স্বরে ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে কলাবতী ঢোক গিলে বলল, "অত অত টিফিন দিলে কি সব খাওয়া যায়, একটু পড়ে ছিল সেটাই দিয়েছি। রোজ রোজ পাঁউরুটি-মাখন কি ভাল লাগে? কাল বরং ঘুগনি দিয়ো।"

"তা দেব, এখন এটাকে কী খেতে দেবে?"

"কিচ্ছু না। অ্যাই ভাগ ভাগ।" কলাবতী ফুটপাথে ক্রুদ্ধভাবে পা ঠুকে এগিয়ে গেল খয়েরির দিকে। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে খয়েরি দাঁড়িয়ে রইল' লেজটা নড়ছে। জেনে ফেলেছে কলাবতীর রাগটা নকল।

"ও এখন তোমায় ছাড়বেনি। রান্নাঘরে বাসি রুটি আছে, তাই দুটো এনে দাও।" এই বলে অপুর মা মুদির দোকানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল।

অপুর মা একটু দূরে যেতেই কলাবতী "আয়।" বলে ফটক পার হয়ে পাঁচিলের ধারে লুকিয়ে দাঁড়াল। খয়েরি ফটকের সামনে এসে ভেতর দিকে

তাকিয়ে কলাবতীকে দেখতে না পেয়ে মৃদু স্বরে "ভুক ভুক" শব্দ করে উবু হয়ে বসে পড়ল। মিনিটখানেক পরে কলাবতী উঁকি দিল। খয়েরি তাকে দেখতে পেয়েই "ঘৌওউওউ" করে ডেকে উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে শুরু করে দিল।

"ভেতরে আয়।" কলাবতীর ডাক শুনেও খয়েরি ইতস্তত করল। "আয় আয়, ভয় কী। এই দ্যাখ," কলাবতী স্কুলব্যাগ থেকে টিফিন বক্সটা বার করে বাগানের চাঁপা গাছের তলায় ঘাসে বসল।

মাথা নিচু করে পায়ে পায়ে খয়েরি এই প্রথম ফটক পার হল। গুটিগুটি সে কলাবতীর সামনে এল। মাখন লাগানো পাঁউরুটি খপ করে কামড়ে ধরে কোঁত কোঁত করে দুই ঢোঁকে পেটে চালান করে দিল। পরের পাঁউরুটির টুকরোটা কামড়ে ধরে ঘাসে উপুড় হয়ে পা দুটো সামনে ছড়িয়ে টুকরোটা দুই থাবায় চেপে ধরে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খেল।

জিভটা দুই ঠোঁটে চাটাচাটি করে খয়েরি আরও কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে তাকিয়ে রইল। কলাবতী বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে নাড়তে বলল, "আর তো কিছু নেই, এবার কেটে পড়ো, তবে বাসি রুটি যদি খেতে চাও তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো বসে থাকো, আমি এনে দিচ্ছি। তার আগে তুমি আমার আপেল খাওয়া দ্যাখো।"

টিফিন বক্সে ছিল চার টুকরো করে কেটে রাখা একটা আপেল। এই ফলটি খেতে একদমই তার ভাল লাগে না। কিন্তু দাদুর নির্দেশ, "আপেল মাস্ট। দারুণ ভিটামিন আছে।" কলাবতী আমতা আমতা করে বলেছিল, "বড়দি বলেছেন ডাঁসা পেয়ারায় আপেলের থেকেও ভিটামিন বেশি আছে।"

বড়দি অর্থাৎ আটঘরার সিংহিদের বংশপরম্পরা প্রতিদ্বন্দ্বী (এবং এখনও) পাশের গ্রাম বকদিঘির জমিদার হরিশঙ্কর মুখুজ্জের একমাত্র মেয়ে মলয়া, যে ডক্টরেট করতে অক্সফোর্ডে যায়। (তখন সত্যশেখরও ব্যারিস্টার হতে লন্ডনে ছিল), যে ডক্টর হয়ে ফিরে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজে অধ্যাপনা না করে কাঁকুড়গাছি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে হেডমিস্ট্রেসের চাকরি নেয়। মাতৃহীনা কলাবতীকে অবিবাহিতা মলয়াই রাজশেখরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের স্কুলে ভরতি করায়।

কলাবতী সিংহকে হেডমিস্ট্রেস একটু বেশি স্নেহ করেন, শিক্ষিকা মহলে এমন একটা কথা চাউর হয়। কথাটা মলয়ার কানে পৌঁছোতেই সে স্কুলে কলাবতীর যাবতীয় ব্যাপারে এত কড়া হয়ে যায় যে অ্যানুয়াল পরীক্ষার খাতা আনিয়ে নিজে স্ক্রুটিনি করে প্রতি সাবজেক্টে পাঁচ নম্বর কমিয়ে দিয়েছিল।

গতবছর মলয়ার স্কুলের বিরাশিটি মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়, আশিজন ফার্স্ট ডিভিশন, একজনও ফেল হয়নি। পঞ্চাশটি স্টার পাওয়া স্কুলের বড়দির রংচটা অ্যাম্বাসাডার মোটরটা যখন কাঁকুড়গাছির মোড়ের আইল্যান্ডটা ঘোরে তখন ট্র্যাফিক হোমগার্ডও গাড়িটাকে স্যালিউট ঠুকে দেয়।

এহেন বড়দি বলেছে আপেলের থেকে পেয়ারায় ভিটামিন বেশি আছে। রাজশেখর কথাটার প্রতিবাদ না করে দোতলায় লাইব্রেরিতে চলে যান। খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কিত গোটাদুয়েক বই খুলে পড়ে, কলাবতীকে জানান, "হরির মেয়েটা এত সব জানল কী করে বল তো? ওদের তো মুখ্যুর বংশ।" রাজশেখর দু'চক্ষে হরিশঙ্করকে দেখতে পারেন না বটে কিন্তু মলয়া বা মলুকে স্নেহ করেন নিজের মেয়ের মতো।

কলাবতী আপেলের একটা টুকরোয় কামড় দিয়ে মুখবিকৃত করল, টক। মুখ থেকে টুকরোটা বার করে ঘাসে ছুড়ে ফেলতেই খয়েরি এগিয়ে গিয়ে সেটা মুখে পুরে চিবিয়ে খেয়ে নিল। কলাবতী তো অবাক! কুকুর মাংসাশী প্রাণী বলেই সে জানে। এরা যে নিরামিষভোজীও সেটা এবার জানল, আপেলের বাকি টুকরোগুলো সে ছুড়ে ছুড়ে দিল। খয়েরি চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিল।

দোতলার গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে রাজশেখর যে অনেকক্ষণ ধরেই তাদের লক্ষ করে যাচ্ছিলেন, কলাবতী সেটা দেখেনি।

"কালু ওকে কোথায় পেলে?" রাজশেখরের গম্ভীর গলার প্রশ্নে কলাবতীর বুক দুরদুর করে উঠল। নিশ্চয় বকুনি দেবেন।

"আমার সঙ্গে সঙ্গে এল দাদু। ওর খুব খিদে পেয়েছিল তাই খেতে দিলুম। এই এবার ভাগ।" কলাবতী হাত তুলল। খয়েরি এক-পা পিছিয়ে গিয়ে আড়চোখে কলাবতীর দিকে দু'বার তাকিয়ে ধীরে ধীরে ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কলাবতী দোতলায় উঠে আসতেই রাজশেখর বললেন, "এ বাড়িতে এই দ্বিতীয়বার কুকুর ঢুকল। তোর জন্মের আগে সতুর একটা অ্যালসেশিয়ান ছিল, হিটলার। নামের মতো মেজাজটাও ছিল হিটলারি। সারারাত বাগানে ঘুরে বেড়াত। একবার একটা চোরের পিঠ থেকে কামড়ে এক খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়েছিল। দিনের বেলায় একতলার সিঁড়ির নীচে চেন দিয়ে বাঁধা থাকত। তবু বাইরের লোক ঢুকতে ভয় পেত। সতু ছাড়া কাউকে গায়ে হাত দিতে দিত না। সেই চোরটার দলের লোকেরা, এই আমাদের পেছনেই মালোপাড়া বস্তিতে থাকে, প্রতিশোধ নিতে একদিন রাতে বিষমাখা মাংস খাইয়ে হিটলারকে

মেরে ফেলল। সতু সাতদিন কিছু মুখে দেয়নি, বিছানায় শুয়ে ছিল। তারপর থেকে বছর পঁচিশ এ-বাড়িতে আর কুকুর পোষা হয়নি। হিটলারের এক বোন ছিল লিজা, এলিজাবেথ। তাকে নিয়েছিল মলয়া। এখন লিজার নাতনি আছে মুখুজ্জেবাড়িতে।''

কলাবতী বলল, ''হ্যাঁ দেখেছি, মঙ্গলা, খুব ঠান্ডা স্বভাবের। ওকে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু ওর দিদিমা না ঠাকুমা, হিটলারের বোন ছিল এটা তো জানতুম না!''

একটু পরেই অপুর মা ফিরল।

''কালুদি কুকুরটাকে রুটি দিয়েছ? দেখলুম ফটকের বাইরে পাঁচিল ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে। বাব্বা, কী মেঘ করেছে! পশ্চিমের আকাশটা মোষের মতো কালো হয়ে গেছে।''

''সে কী!'' কলাবতী ছুটে বারান্দায় গিয়ে আকাশ দেখে এসে বলল, ''পাঁচ মিনিট আগেও তো আকাশ পরিষ্কার ছিল। খুব ঝড় আসবে মনে হচ্ছে। জানলাগুলো বন্ধ করে দাও শিগ্‌গির।''

মুরারি, অপুর মা, কলাবতী তিনজনে মিলে গোটা তিরিশ জানলা ও দরজা বন্ধ করতে-না-করতেই প্রবল ঝড় আছড়ে পড়ল বাড়িটার ওপর। মিনিটদশেক হাওয়ার মাতামাতি চলার পরই নামল তোড়ে বৃষ্টি। মিনিট কুড়ি পর হাওয়া আর বৃষ্টির দাপট কমে এলে কলাবতী ছাতা মাথায় গাড়িবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চাঁপাগাছের কচি ডালগুলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে আছে। রাস্তার ওপারে ডেকরেটরের দোকানের সাইনবোর্ড আর দুটো লাইটপোস্টে বাঁধা ওয়ান ডে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফেস্টুন ঝুলে রয়েছে। একটা পুরনো টিনের চালা কোথা থেকে উড়ে এসে বাগানে পড়েছে। টগরগাছটা পাঁচিলে ঠেস দিয়ে কোনওক্রমে দাঁড়িয়ে।

কলাবতী গাড়িবারান্দার পশ্চিম দিকে সরে গেল। বাগানের এই দিকটা বহু বছর ধরে অবহেলিত। একসময় রাজশেখরের একটা ফিটন ছিল। প্রায়ই তিনি স্ত্রী আর দুই ছেলে, কলাবতীর বাবা দিব্যশেখর ও সত্যশেখরকে নিয়ে বিকেলে গঙ্গার ধারে ফিটনে চড়ে হাওয়া খেতে যেতেন। বাগানের পশ্চিম দিকে ফিটন ও ঘোড়া রাখার জন্য পাকা একটা ঘর তৈরি করেছিলেন। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ফিটন ও ঘোড়া বিক্রি করে দেন। ঘরটা ফাঁকা পড়ে থাকতে থাকতে ওর অস্তিত্বটাই সবাই ভুলে যায়। বাগানের ওদিকটায় বহু বছর কেউ না যাওয়ায় বড় বড় ঘাস আর ঝোপ গজিয়ে গেছে। বাগানের পাঁচিল ফিটনের

ঘরটার পেছনের দেওয়াল আর দু'ধারের দেওয়ালে দুটো মাত্র জানলা। এখন তার কোনও পাল্লা নেই, গরাদও নেই, আছে শুধু জীর্ণ দুটো কাঠের ফ্রেম। ঘরের সামনের দিকে ছিল দুই পাল্লার চওড়া দরজা, যা দিয়ে ফিটনটা ঢুকত ও বেরোত। পাল্লা দুটোর একটা নেই, অন্যটার থেকে অর্ধেক কাঠ খসে পড়েছে। মেঝের সিমেন্ট ভেঙেচুরে ইট ও মাটি বেরিয়ে রয়েছে।

আকাশে ঘোলাটে মেঘ, আলো খুবই কম, সন্ধ্যা নামার সময় এগিয়ে আসছে। বারান্দা থেকে কলাবতী আলতো দৃষ্টিতে তাকাল ফিটন রাখার ঘরটার দিকে। ঘরের দরজার ভাঙা পাল্লার কাছে কী যেন একটা নড়ে উঠল বলে তার মনে হল। কৌতূহলী চোখে সে তাকিয়ে রইল। ঘরের মধ্যে আলো এত কম, যে সে কিছুই বুঝতে পারল না। কাকার ঘর থেকে বায়নাকুলার এনে চোখে লাগিয়ে সে খয়েরিকে দেখতে পেল। ঝাঁকুনি দিয়ে গা থেকে জল ঝরিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করছে।

কলাবতীর এতক্ষণ ওর কথা মনেই ছিল না। অপুর মা বলেছিল ফটকের বাইরে পাঁচিল ঘেঁষে শুয়ে আছে। ঝড়-বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় খুঁজতে ফিটনের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তার মনে হল, ভালই করেছে। বৃষ্টি ধরার কোনও লক্ষণ নেই সারারাত যদি ওখানেই থাকে তো থাকুক।

মাস্টারমশাই ক্ষুদিরামবাবুর কাছে কলাবতী অঙ্ক বুঝে নিচ্ছিল যখন সত্যশেখর বাড়ি ফিরল। কাকার সেরেস্তার পাশেই তার পড়ার ঘর। হঠাৎ তার কানে এল কাকা সদর দিয়ে ঢুকেই চেঁচাচ্ছে, "আরে আরে এটা আবার এল কোত্থেকে। মুরারি, মুরারি শিগ্‌গির এটাকে তাড়া, অ্যাই ভাগ, ভাগ।" এর পরই 'কেঁউ, কেঁউ' শব্দ উঠল আর্তনাদের। কলাবতী বুঝল কাকা কিছু একটা দিয়ে আঘাত করেছে খয়েরিকেই।

"আসছি সার।" কলাবতী ক্ষুদিরামবাবুর অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করেই ছুটে ঘর থেকে বেরোল। সদর দরজায় পৌঁছে দেখল ফটক দিয়ে খয়েরি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে ডাকল, "আয়, আয়।" খয়েরি থমকে পেছন ফিরে তাকাল। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কলাবতী ছুটে গেল। ততক্ষণে খয়েরি ফটক পার হয়ে গেছে।

বিষণ্ণ মনে ফিরে এল কলাবতী। অপুর মা'র দেওয়া কাবলি ছোলার ঘুগনি সে মুখে দিল না। ক্ষুদিরামবাবু এক চামচ মুখে দিয়েই "উহ্‌হ্‌, কী ঝাল।" বলে প্লেটটা সরিয়ে রাখলেন। একটু পরে খালি প্লেট নিতে এল

মুরারি। "এ কী! কেউই তো খাননি, খুব ঝাল হয়েছে বুঝি! অপুর মা'র হাতের রান্না তো!"

মুরারি প্লেট দুটো তুলে মুচকি হেসে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কলাবতী বলল, "কাকা খেয়েছে?"

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে মুরারি বলল, "খেয়েছে মানে! চেয়ে চেয়ে দু'বার খেয়েছে। তারপরই "আঃ উঃ করতে করতে সেরেস্তায় দৌড়োল, এক ঘণ্টা ধরে মক্কেল বসে।"

ক্ষুদিরামবাবু চলে যাওয়ার পর অপুর মা'র কাছ থেকে দুটো রুটি চেয়ে নিয়ে কলাবতী ফটকের বাইরে এসে দু'দিকে তাকাল, কাদা আর গাছের পাতায় ফুটপাথ নোংরা হয়ে রয়েছে। ঝড়ের দাপটে রাস্তার আলো জ্বলছে না। সে খয়েরির কোনও চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে, "আয় আয় আয়, চুক চুক" করে ডাকল দু'-তিনবার। হঠাৎ দেখল অন্ধকার ফুটপাথ ধরে খয়েরি এগিয়ে আসছে। কলাবতী উবু হয়ে বসে রুটি ছিঁড়ে ওর মুখের সামনে ধরল। খয়েরি ল্যাজ নাড়তে লাগল কিন্তু রুটি কামড়াল না। "খুব হয়েছে আর রাগ করতে হবে না। কাকাটা খুব পাজি, আমি বকে দেব, এখন খা।"

রুটির টুকরোটা সে খয়েরির মুখে ঠেকাল। খয়েরি কামড়ে ধরে সামনে দু'পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেল। "এই তো লক্ষ্মী মেয়ে।" রুটি দুটো খাইয়ে কলাবতী খয়েরিকে জিজ্ঞেস করল, "রাতে থাকবি কোথায়? যদি আবার বৃষ্টি আসে!" খয়েরি কী বুঝল কে জানে, ল্যাজ নেড়ে যেতে লাগল।

"আয় আমার সঙ্গে, যে ঘরটায় বিকেলে শেল্টার নিয়েছিলি সেখানেই রাতটা কাটিয়ে দিবি, তারপর সকালে যেখানে তোর ইচ্ছে সেখানে চলে যাবি। আয়।"

কলাবতী ফটক দিয়ে বাড়িতে ঢুকল, তার সঙ্গে খয়েরিও। বাগানটা অন্ধকার। পশ্চিমে ফিটন রাখার ঘরটা আরও অন্ধকার দেখাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে। সে খয়েরির কোমরে চাপ দিয়ে ঠেলে দিল। "যা এবার কোনও ভয় নেই।" খয়েরি দু'-তিন পা গিয়ে ফিরে তাকাল। "যা, যা, ভয় কী?"

গাড়িবারান্দায় আলো জ্বলে উঠল। আলোয় বাগানের অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে। রাজশেখরের গলা শোনা গেল, "কালু, কী করছিস বাগানে এই অন্ধকারে?"

"ওর থাকার ব্যবস্থা করছি দাদু।"

"ও-টা কে?"

"দেখতে পাচ্ছ না, ওই তো দাঁড়িয়ে।" আঙুল তুলে কলাবতী দেখাল। রাজশেখর দেখতে পেলেন।

"ওর থাকার কথা তোকে ভাবতে হবে না, চলে আয়।" গলার স্বর একটু কঠিন করে রাজশেখর বললেন। কলাবতী বার দুই খয়েরির দিকে তাকিয়ে ফিরে এল বাড়ির মধ্যে। খয়েরি মিনিটখানেক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে পায়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কলাবতী পরদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় খয়েরিকে যেখানে দেখবে ভেবেছিল, সেই সত্যানন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার এপার-ওপার চোখ বোলাল। দেখতে পেল না। টিফিন বক্সে জেলি মাখানো দু'স্লাইস পাঁউরুটি রাখা আছে। মিনিট দুই অপেক্ষা করে সে বাড়ির দিকে রওনা হল। পথে যত গলি পড়ল সে থমকে দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায় গলির মধ্যে তাকাল। দেখতে পেল না। বাড়ির ফটকে পৌঁছে পাঁউরুটির স্লাইস দুটো ফটকের ধারে রেখে দিল। যদি খয়েরি আসে!

পরদিন ভোরে কলাবতী ছুটে গিয়ে দেখল পাঁউরুটির স্লাইস দুটো যেভাবে রাখা ছিল তেমনই রয়েছে। এইভাবে পাঁচটি দিন কেটে গেল। সে খয়েরির দেখা আর পেল না। তখন সে মনে মনে বলল, রাস্তার কুকুর তো, কত আর ভাল হবে! আস্তাঁকুড়ের খাবার না পেলে ওদের পেট ভরে না। ভেবেছিলুম দাদুকে বলে খালি ফিটনের ঘরটায় ওকে থাকতে দেব। তা তো পছন্দ নয়। যাক গে, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াক। আর কখনও দেখা হলে ওকে কিছু খেতে দেব না।

শুক্রবার রথযাত্রা, স্কুলের ছুটি। তার আগের দিন ছুটির পর কলাবতী যখন স্কুল থেকে বেরোচ্ছে, গেটে তাকে ধরল ধূপছায়া ওরফে ধুপু।

"এই কালু, তোর জন্যই দাঁড়িয়ে, কথা আছে। চল, হাঁটতে হাঁটতে বলছি।" ধুপু একই ক্লাসের, তবে অন্য সেকশনে পড়ে। একটু মোটাসোটা কিন্তু অসম্ভব চটপটে, সবসময় হাসিখুশি মুখ। স্কুলে ছোট-বড় সবার সঙ্গে

ওর ভাব। স্কুলের স্পোর্টসে ১০০, ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থান ওর বাঁধা। দড়ি-টানাটানি আর ক্রিকেট বল ছোড়ায় ধুপু ছাড়া প্রথম আর কাউকে ভাবাই যায় না। ওর গায়ে যেমন জোর মনটিও তেমনই নরম।

"তুই জানিস পূর্ব কলকাতা ক্রিকেট ক্লাবে আমি খেলি।" হাঁটতে হাঁটতে ধুপু বলল।

কলাবতী বলল, "শুনেছি, তবে কখনও খেলতে দেখিনি।"

"এবার আমাদের পাড়ায় মেয়েদের নিয়ে একটা ক্রিকেট টিম তৈরি করা হবে, তুই খেলবি?"

কলাবতী দাঁড়িয়ে গেল, অবাক হয়ে বলল, "আমি! আমি তো জীবনে ব্যাটই ধরিনি, টিভিতে শুধু ওয়ান-ডে দেখেছি।"

"তার মানে ক্রিকেটে তোর ইন্টারেস্ট আছে, ওতেই হবে। এবার খেলাটা শিখে নে, তারপর খেলতে খেলতে ক্রিকেটার হয়ে যাবি। আমিও তো কিছু জানতুম না। এখন আমি ব্যাটে ওপেন করি, লেগব্রেকও দিতে পারি। তবে গুগলিটা এখনও পারি না, চেষ্টা করছি।"

শুনে ধুপুর প্রতি সমীহ জাগল কলাবতীর। স্কার্টের পকেট থেকে চুইংগাম বার করে ধুপুকে একটা দিয়ে নিজে একটা মুখে পুরল।

"তুই গুগলির চেষ্টা করছিস! আমার দাদুও দিত। দেওয়া নাকি খুব শক্ত।"

ধুপু গম্ভীর মুখে বলল, "ভীষণ শক্ত। গাদা গাদা অফব্রেক বোলার পাবি কিন্তু ভাল লেগব্রেক গুগলি বোলার মেরেকেটে একটা-দুটো। বেঙ্গলে একটাও মেয়ে নেই, যে গুগলি দিতে পারে।"

"তুই কবে পারবি?" কলাবতী খুবই সম্ভ্রমভরে জানতে চাইল।

ধুপু আকাশের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, "পাঁচ বছর যদি একনাগাড়ে প্র্যাকটিস করি তা হলে পারব।"

"তোদের ক্লাবের মাঠটা কোথায়?"

"মানিকতলা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মাঠে প্র্যাকটিস হত। ওরা আর বাইরের ক্লাবকে মাঠ দেবে না তাই আমরা সল্টলেকের একটা মাঠে এবার থেকে খেলব। তবে এই যে নতুন ক্রিকেট সেন্টারটা নভিসদের জন্য করা হবে সেটা রেল লাইনের ধারে সি আই টি কোয়ার্টারের ভেতরের মাঠে। ওটা তুই চিনিস?" ধুপু প্রশ্ন করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখান থেকে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে গেলে তার বাড়ি।

কলাবতী বলল, "হ্যাঁ চিনি। খুব আলোয় সাজিয়ে দুর্গাপুজো হয় মাঠে।"

"ওখানে প্রগতি সঙ্ঘ বলে কোয়ার্টারের একটা ক্লাব আছে, ফুটবল ক্রিকেট খেলে। ফণীদা ওদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে মেয়েদের শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাকে বলেছেন কিছু মেয়ে জোগাড় করে দিতে। স্কুলে অনেককে বললুম, কেউ রাজি নয়।"

কলাবতী জিজ্ঞেস করল, "ফণীদা কে?"

ধুপু চুইংগাম মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বলল, "একজন রিটায়ার্ড লোক, দেখে বয়স বোঝা যায় না। পঞ্চাশ হতে পারে, আবার সত্তরও। কোয়ার্টারেই চারতলায় থাকেন। শুধু বউ আছে, ছেলেপুলে নেই। অনেক ক্লাবে খেলেছেন, শেষ খেলেছেন সান স্পোর্টিং-এর হয়ে ফিফটি নাইনে। চল তোর সঙ্গে আর একটু হাঁটি।"

কলাবতী বলল, "আমার দাদুও তো ওই সময়ে টাউন ক্লাবে খেলতেন। দেখেছিস আমার দাদুকে? গায়ের রং ঠিক আমার উলটো, খুব ফরসা, সাড়ে ছ'ফুট, তেমনই স্বাস্থ্য, ভীষণ খাইয়ে কিন্তু ভুঁড়ি নেই, রোজ জগ করেন। খুব মজা করে কথা বলেন।"

কথা বলতে বলতে দু'জনে কলাবতীদের ফটকের সামনে পৌঁছোল। কলাবতী বলল, "ভেতরে আয় না, দাদুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

ধুপু বলল, "আজ থাক, এখন যাব রাধারানিদের বাড়ি। ওর খুব ক্রিকেট শেখার ইচ্ছে কিন্তু মা পারমিশান না দিলে খেলতে পারবে না। মাসিমার সঙ্গে কথা বলব। উনি চান মেয়ে মাধ্যমিকে প্রথম দশজনের মধ্যে যেন থাকে। ওঁর ধারণা খেলাধুলো করলে পড়ার ক্ষতি হবে। রাধু আমায় ধরেছে ওর মাকে গিয়ে বোঝাতে। কী বোঝাব বল তো? বছর বছর ফার্স্ট হয়ে রাধু তো নিজের সর্বনাশ নিজেই করেছে। মা বলেছে দশজনের মধ্যে না থাকলে বিষ খেয়ে মরবে, বাবা বলেছে ঝি ছাড়িয়ে ওকে দিয়ে বাসন মাজাবে, ঘর মোছাবে। আমি বলেছি, এখনও মাধ্যমিকের জন্য তিন বছর হাতে আছে, তুই রেজাল্ট খারাপ করতে শুরু কর, বাবা-মা'র পাগলামিটাকে আস্তে আস্তে নর্ম্যাল করে দে।"

কলাবতী বলল, "আমার দাদু কি কাকা ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়ার জন্য একটুও চাপ দেন না। দাদু বলেন, ভালমতন একটা মানুষ হয়ে ওঠো আগে, সেজন্য খেলাধুলোটা খুবই জরুরি। ক্রিকেট খেলতে চাই শুনলে দাদু খুশিই হবেন। আমি কাল যাব। আচ্ছা ধুপু এই জুন মাসের গরমে কেউ ক্রিকেট খেলে? এখন তো ফুটবল সিজন!"

"হোক না ফুটবল সিজ্‌ন। মেয়েরা তো দুপুরে ম্যাচ খেলতে মাঠে নামছে না। ফণীদা বলেছেন, এখন শুধু সকালে এক ঘণ্টা ব্যাট বল নিয়ে নাড়াচাড়া করা, একটা ধারণা পাইয়ে দেওয়া। এজন্য ক্রিকেট সিজ্‌নের অপেক্ষায় থাকার কোনও দরকার নেই।"

সেদিন রাতে খাওয়ার টেব্‌লে বসেই কলাবতী ঘোষণা করে দিল, "দাদু, কাকা, আমি কাল থেকে ক্রিকেট শিখব।"

সত্যশেখর ডিমের কালিয়ার বাটিতে তর্জনী ডুবিয়ে ঝোল চাখবার জন্য আঙুলটা মুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, থমকে গেল। "কী বললি, ক্রিকেট? কেন পৃথিবীতে কি আর খেলা নেই? স্কুকার আছে, বিলিয়ার্ডস আছে, রাইফেল শুটিং আছে, শেখার আরও কতরকমের খেলা রয়েছে, তা নয়—" সত্যশেখর আঙুলটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে চুষতে শুরু করল।

"নিশ্চয় নিশ্চয় আরও কতরকমের খেলা রয়েছে—ব্যাগাটেলি, লুডো, তাস, দাবা, ক্যারম।" রাজশেখর খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, "সতু, এগুলোতেও তো ছোটাছুটি করে ঘাম ঝরাবার দরকার হয় না, বেশ আরামেই খেলা যায়।" রাজশেখর চোখ পিটপিট করে হাসি চেপে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সত্যশেখর কালিয়ার ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মুখটা বাটির ওপর নামাল।

"কোথায় শিখবি?" রাজশেখর জিজ্ঞেস করলেন কলাবতীকে।

কলাবতী এরপর ধুপুর কাছে যা যা শুনেছে সবিস্তারে দাদুকে বলল।

"ফণীদাটা কে?" সত্যশেখর জানতে চাইল।

"দাদু তুমি বোধহয় চিনতে পারো। নাইনটিন ফিফটি নাইনে উনি সান স্পোর্টিং-এ শেষবার খেলেছেন, তখন তো তুমি টাউন ক্লাবে।"

"ফণী ঘোষ!" রাজশেখর টেব্‌লে জোরে থাবড়া মেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। "ফণীদা যদি সেই ফণী ঘোষ হয় তা হলে চিনি। বাপ্‌স কী ছয় হাঁকাত। আমার ছ'টা বলে ছ'টা ওভার বাউন্ডারি মেরেছিল গ্রিয়ার মাঠে। এই রোগা লম্বা চেহারা।" রাজশেখর ডান হাতের তর্জনীটা নাড়ালেন। "অদ্ভুত টাইমিং ছিল আর ব্যাটের ঠিক শাঁসে বল লেগে বুলেটের মতো যেত বাউন্ডারিতে। আর সেই এক ওভারে ছত্রিশ রান নেওয়ার খবর কী করে যেন তোর বড়দির বাবা হরিশঙ্করের কানে পৌঁছে যায়। কানে ঠিক নয়, চোখে পড়ে যায়, পরদিন সব কাগজে খবরটা বেরিয়েছিল। অবশ্য বেরোবার মতোই খবর—একটা ছোট ম্যাচে ব্র্যাডম্যান বাইশ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।

আর ফণী ঘোষ সেদিন বাইশ বলে নিরানব্বুই করে বোল্ড হয়।''

''কে বোল্ড করল?''

''আর, সিন্‌হা।'' রাজশেখর নিস্পৃহ স্বরে নামটা বলে মুখ নিচু করে রুটি ছিঁড়ে কালিয়ার বাটিতে ডোবালেন।

''তারপর হরিকাকা কী করল? নিশ্চয় বাড়িতে কেত্তন লাগিয়ে দিল।'' সত্যশেখর দ্বিতীয় ডিম শেষ করে তৃতীয়টা হাতে নিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল।

''না, কেত্তন বসায়নি। চারটে খবরের কাগজের কাটিং একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেয়, সঙ্গে একবাক্স ভীমনাগের সন্দেশ। বাক্সের মধ্যে ছিল একটা চিরকুট, তাতে লেখা: ''সার ডনের তরফ থেকে এই উপহার।''

''উফ্‌ফ কী সাংঘাতিক লোক এই মলয়ার বাবা হরিশঙ্কর মুখুজ্জে।'' সত্যশেখর দাঁতে দাঁত চেপে বলল। ''আমার সঙ্গে যখনই দেখা হয় খালি খাওয়ার কথা তোলে—সতু ফুচকার ইনিংসে হায়েস্ট স্কোর তোমার কত? সতু আলুর চপের ম্যারাথনে তোমার বেস্ট টাইম কত? সতু মিহিদানার পাওয়ার লিফটিং-এ কত কেজি তুলেছ?''

''যাক গে হরির কথা।... কালু আমি তোর সঙ্গে সকালে গিয়ে দেখব লোকটা সেই ফণী ঘোষ কি না। কিন্তু তোর তো ক্রিকেটের ড্রেস নেই, ব্যাট প্যাড গ্লাভ্‌সও নেই। ওগুলো তো কিনতে হবে।'' রাজশেখর উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন কলাবতীর দিকে।

''কেন, আমার তো জিন্‌স আর টপ রয়েছে, তাই পরেই নেট প্র্যাকটিস চলে যাবে, যাবে না?'' কলাবতী যতটা হালকা সুরে বলল, ততটাই গম্ভীর স্বরে রাজশেখর বললেন, ''একদম নয়। ওয়ান ডে ক্রিকেট দেখে দেখে তোর রুচিটা বদলে গেছে। ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে কখনওই সেটা ক্ল্যাসিক হয়ে উঠতে পারে না। লাল নীল হলুদ ট্রাউজার্স, চকরাবকরা জামা, সাদা বল দিয়ে ধুমধড়াক্কা ব্যাট চালিয়ে কি ক্রিকেট খেলা হয়? পা থেকে গলা পর্যন্ত ধবধবে সাদা, সেটাই হল ক্রিকেটারের পোশাক, হ্যাঁ নেটেতেও ওই পোশাকে প্র্যাকটিস করতে হয়।''

''দাদু, ফণী ঘোষের বাইশ বলে নিরানব্বইটা কোন ধরনের ক্রিকেট ছিল?'' কলাবতী চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে রইল।

রাজশেখরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল শান্ত হাসি। ''ক্লিন অ্যান্ড ক্ল্যাসিকাল হিটিং। প্রত্যেকটা স্ট্রোকে ছিল ব্যাটিং-এর গ্রামার।

এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফণী ঘোষের লম্বা রোগা শরীরটা এক পা বেরিয়ে এসে গুডলেংথ বলটা তুলে দিচ্ছে একস্ট্রা কভারের মাথার ওপর দিয়ে। মার খেয়েছি বটে, কিন্তু ওর ব্যাটিং দেখে সুখও পেয়েছি।''

পরদিন সকালে জগ করতে করতে দাদু আর নাতনি প্রগতি সঙ্ঘের মাঠে পৌঁছোল। মাঠটির তিনদিকে টানা বারান্দার তিনটি চারতলা বাড়ি। বারান্দার সঙ্গেই পাশাপাশি এক কামরার ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট আছে মোট আশিটি। মাঠের আর একদিক পাঁচিল ঘেরা, তারপরই রেল লাইন। কলাবতীদের বাড়ি থেকে মাঠটি প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। মাঠের একধারে একটা ছোট ঘর তাতে ট্যাঙ্কে জল তোলার জন্য পাম্প আছে। তার পাশে কম্যুনিটি হল। এটাই ক্লাবঘর। নাটক হলে এখানেই হয় রিহার্সাল। দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে এই হলঘরে টেব্‌ল পেতে আশিটি ফ্ল্যাটের লোক খিচুড়ি খায়। মাঠটিতে সিক্স-আ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট হয় প্রতি বছর।

কোয়ার্টারের দুই লোহার পাল্লার চওড়া বড় একটা প্রধান দরজা আছে। অধিকাংশ সময়ই সেটা বন্ধ থাকে। বাইরে থেকে মাঠে আসার জন্য আছে ছোট্ট লোহার গেট, যা দিয়ে একজন মানুষ ঢুকতে বা বেরোতে পারে। ওরা দু'জন মাঠে এসে দেখল লম্বা রোগা মাথাভরা পাকা চুল, সাদা ট্রাউজার্সে গোঁজা সাদা টি শার্ট, সাদা কেড্‌স, কুচকুচে কালো গায়ের রং, একটি লোক তাকে ঘিরে জনাপনেরো কিশোরী। বেশিরভাগ মেয়ের পরনে স্কার্ট ব্লাউজ। দু'-তিনজন পরেছে সালোয়ার কামিজ। লোকটির হাতে একটি ক্রিকেট ব্যাট। তিনি মেয়েদের কী যেন বলছেন। কলাবতী ধুপুকে দেখতে পেল না।

রাজশেখর উত্তেজিত চাপা গলায় বললেন, ''কালু, এই লোকটাই ফণী ঘোষ।'' বলেই তিনি এগিয়ে গেলেন।

''তোমরা কেউ কি কখনও ক্রিকেট খেলেছ?'' ফণী ঘোষ মেয়েদের জিজ্ঞেস করলেন।

সবাই চুপ। শুধু একজন বলল, ''বারান্দায় ছোট ভাইকে গড়িয়ে গড়িয়ে বল করেছি।''

ফণী ঘোষ সবার মুখে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, ''আগে সবাই ব্যাট হাতে নিয়ে ফিল করে দ্যাখো জিনিসটা কেমন। তারপর শিখবে কেমন করে ব্যাট ধরতে হয়, কেমন করে ব্যাট হাতে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু সবার আগে দৌড়োনোটা শিখতে হবে, একটু ব্যায়াম করে নিতে হবে।'' ফণী ঘোষ ব্যাটটা সামনের মেয়েটির হাতে তুলে দিলেন।

"আরে ফণী। তুমি এখানে?" রাজশেখর এগিয়ে মুখোমুখি হলেন ফণী ঘোষের।

"দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল লোকটাকে ঠিক যেন রাজুর মতো দেখতে। তুমি কিন্তু মোটা হয়ে গেছ।" ফণী ঘোষ দু'হাত দিয়ে রাজশেখরের ডান হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন।

"তুমি দেখছি আর একটু রোগা হয়েছ।"

"কত বছর পর দেখা হল!" ফণী ঘোষ আপ্লুত গলায় বললেন, "ভাবতেই পারছি না সত্যি সত্যিই দেখা হয়ে গেল।"

কলাবতী অবাক হয়ে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মেয়েদের হাত ঘুরে ঘুরে ব্যাটটা তার হাতে এল। জীবনে এই প্রথম সে ক্রিকেট ব্যাট হাতে নিল। বেশ ভারী ভারী লাগল। পুরনো ব্যাট তাতে দু'-তিনটে লাল ছোপ। হ্যান্ডেলের রাবারটা জীর্ণ হয়ে গেছে। ব্লেডের তলার দিকটায় সামান্য চকলা ওঠা। ব্যাটটা দাদুর হাতে তুলে দিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "ধুপুকে দেখছি না যে?"

ফণী ঘোষ বললেন, "ধুপু কাল সন্ধেবেলা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকেছে। বিছানায় শুয়ে। আজ এক্স-রে হবে, ওর যমজ ভাই ধুজু রাতে জানিয়ে গেছে।"

"ফণী এটা কি সেই ব্যাট, যেটা দিয়ে ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছিলে?"

ফণী ঘোষ হেসে মাথাটা হেলালেন শুধু। "তুলে রেখেছিলুম আজ বার করলুম।"

রাজশেখর ব্যাটটা কলাবতীর হাত থেকে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। ফণী ঘোষ পকেট থেকে পুরনো একটা ক্রিকেট বল বার করলেন।

"এবার তোমরা এটা হাতে নিয়ে দ্যাখো কেমন লাগে।"

বলটা হাতে হাতে ঘুরল।

"কেমন লাগল?"

"বড্ড শক্ত ফণীদা," একজন বলল। "গায়ে লাগলে হাড় ভেঙে যাবে।"

"গায়ে লাগবে কেন? লাগার আগেই সরে যাবে নয়তো লুফে নেবে। সেজন্য আগে লোফাটা শিখে নিতে হবে। প্রথমে শুরু করবে রাবারের বল দিয়ে। সবাই একটা করে রাবারের বল কিনে নাও। দেওয়ালে বল মেরে সেটা

ক্যাচ করো। কীভাবে ধরবে সেটা তোমাদের দেখিয়ে দেব। আচ্ছা, এবার তোমরা মাঠটায় চক্কর দিয়ে চারপাক দৌড়োও দেখি, আস্তে আস্তে, বেশি জোরে নয়। তারপর কিছু এক্সারসাইজ, এসব কিন্তু রোজ তোমাদের করতে হবে।'' বলেই ফণী ঘোষ নিজে প্রথম দৌড় শুরু করলেন তাঁকে অনুসরণ করে মেয়েরা ছুটতে শুরু করল, তার মধ্যে কলাবতীও আছে। ওরা যখন প্রায় চল্লিশ মিটার এগিয়েছে তখন রাজশেখর আর থাকতে পারলেন না। চনমন করে উঠে দৌড়োতে শুরু করলেন। দৌড় মানে জগিংই প্রায়।

বাড়ি থেকে জগ করে মাঠে এসেছেন তারপর আবার এই পরিশ্রম, রাজশেখর দু'পাকের পর দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফণী ঘোষ একই তালে পা ফেলে, ছোটার গতি একটুও না কমিয়ে চারপাক শেষ করে রাজশেখরের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

''তোমার ছোটা দেখে মনে হচ্ছে তোমার অভ্যেস আছে।'' রাজশেখর প্রশংসা মেশানো গলায় বললেন বুকে বাতাস টানতে টানতে। শুনে ফণী ঘোষ শুধু বললেন, ''রাজু এই মেয়েরা কিন্তু একদমই দৌড়োতে জানে না। দৌড়োনোটা শেখার জিনিস। এমনকী হাঁটাও। প্রায়ই চোখে পড়ে লোকে কী বিশ্রীভাবে হাঁটছে। কেউ ঝুঁকে, কেউ বেঁকে, কেউ ডাইনে-বাঁয়ে দুলে দুলে, কেউ থপ থপ করে। এজন্য দশ-বিশ বছর পর হাড়ের রোগ হয় সেটা কেউ ভেবে দেখে না। দৌড়োনো কি হাঁটা, সে আবার শিখতে হবে নাকি; এই হচ্ছে মনোভাব!'' ফণী ঘোষ বললেন একটু গলা তুলে, যাতে মেয়েরা শুনতে পায়।

রাজশেখর বললেন, ''ঠিক একই ব্যাপার আমাদের বাংলা শেখার ক্ষেত্রেও ঘটে। বাঙালি আমরা, জন্ম থেকেই বাংলায় কথা বলি, বাংলা বই পড়ি, আমাদের আবার এটা শিখতে হবে নাকি? অথচ কী গাদা গাদা ভুল বাংলায় যে লিখি, কত যে বানান ভুল করি তার ঠিকঠিকানা নেই। ব্যাকরণটাও ভাল করে পড়ি না। যাক গে এসব কথা, তোমায় বলি এই মেয়েদের মধ্যে আমার নাতনিও আছে তবে সে কোনজন তা কিন্তু তোমায় বলব না।''

''না বললেও আমি জানি, তোমার সঙ্গে যে কালো মেয়েটি এল, সেই তো? ওর চালচলন অ্যাথলিটদের মতো, সবার মধ্যে আগে চোখে পড়ে যায়।''

এই সময় একটি মেয়ে ফণী ঘোষকে জিজ্ঞেস করল, ''ফণীদা নেট তো লাগানো হয়নি। আমাদের প্র্যাকটিস কখন শুরু হবে?''

"আগে দৌড়োতে শেখো, এক্সারসাইজ করে মাস্‌লগুলোকে চাঙ্গা করে তোলো, দু'হাতে বল ধরতে শেখো, থামাতে শেখো, ছুড়তে শেখো, ধৈর্য ধরতে শেখো, তারপর বল করতে ব্যাট করতে শিখবে, তারপর নয় নেটের কথা ভাবা যাবে। আজ তোমাদের শুধু দেখে নিলাম, কাল ঠিক ছ'টায় আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব, তোমরা আসবে, দৌড় শেখাব। যা বলেছি, সঙ্গে একটা রবারের বল আনবে। কেড্‌স পরে আসবে। সালোয়ার কামিজ চলবে না।"

একটি ছোট্ট মেয়ে বলে উঠল, "ফণীদা, ছবিতে দেখেছি ইন্ডিয়ান টিম হাফপ্যান্ট পরে দৌড়োচ্ছে। আমি হাফপ্যান্ট পরে আসব?"

"বাড়িতে আপত্তি না থাকলে সবাই পরে আসতে পারো। গরমে সেটাই তো ভাল। আপত্তি থাকলে স্কার্ট পরবে। আজ তোমরা বাড়ি যাও। মনে রেখো কাল ছ'টায়।"

মেয়েরা সবাই চলে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে ফণী ঘোষ রাজশেখরকে বললেন, "বাচ্চাদের উৎসাহটা দেখলে, এখনই নেট চাই! গাছে না উঠেই এককাঁদি, এই মনোভাবটা বদলানো দরকার। ক্রিকেট ধৈর্যের খেলা, গাওস্করের একটা ইনিংস যদি এদের দেখাতে পারতুম।" ফণী ঘোষ আফশোসে মাথা নাড়লেন।

রাজশেখর বললেন, "এই মনোভাবটাই শেষ করে দিয়েছে একদিনের ক্রিকেট। ক্রিকেট এখন দেড় ঘণ্টার ফুটবল ম্যাচের মতো খেলা হচ্ছে। আরে বাবা বিজয় হাজারের হাত জমাতেই তো দেড় ঘণ্টা লেগে যেত।"

দুই বৃদ্ধ যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরনো আমলের গৌরব রোমন্থনে ব্যস্ত তখন কলাবতীর চোখ পড়ল কমিউনিটি হল ও পাম্পঘরের মাঝে তিন হাত চওড়া গলির মতো ফাঁকা জায়গাটার দিকে। মিশরের পিরামিডের পাশে দুটি পা সামনে রেখে বসে থাকা সিংহের দেহ আর মানুষের মাথাওলা স্ফিংসের মতো বসে কিছু একটা মুখে নিয়ে চিবোবার চেষ্টা করছে যে কুকুরটি তাকে সে দূর থেকেই চিনতে পারল মাথার সাদা টুপিটি দেখে— খয়েরি। খয়েরিকে যে সে আবার দেখতে পাবে কখনও মনে হয়নি। তাই সে খুব অবাক হল। তার মনে হল এটা যেন ভাগ্যের লুকোচুরি খেলা।

সে দ্রুত হেঁটে খয়েরির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখ নিচু করে খয়েরি সাদা একটা হাড় কামড়ে ভাঙার চেষ্টা করছে। হাড়টা একটা পাঁঠার টেংরি, তাতে

এককণাও মাংস লেগে নেই। কলাবতী বুঝল খিদের জ্বালায় ওই হাড়টাই ভেঙে খাওয়ার চেষ্টা করছে। হাড়টা মোটা তাই পারছে না। হঠাৎ একজনকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে খয়েরি চোখ কপালের দিকে তুলে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড পর চিনতে পেরে ল্যাজ নাড়ল, উঠে বসল। কলাবতী দেখল খুব রোগা হয়ে গেছে খয়েরি। কোমরের দুটো হাড় প্রকট হয়ে উঠেছে। বুকের পাঁজরের হাড়ও দু'-তিনটে গোনা যায়।

খয়েরির সামনে উবু হয়ে হাঁটু ভেঙে বসল কলাবতী। ডান হাত ওর মাথায় রাখতেই আহ্লাদে কান দুটো ঘাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে জোরে জোরে ল্যাজটা নাড়তে লাগল। মুখ দিয়ে 'কুঁই কুঁই' শব্দ বেরিয়ে এল। তারপর সে মাথায় রাখা কলাবতীর হাত চাটার জন্য মুখটা এপাশ-ওপাশ করতে লাগল।

"খুব খিদে পেয়েছে?" কলাবতী জানতে চাইল। "আয় আমার সঙ্গে। বাড়িতে রুটি আছে। মাখন, জেলি, ডাল, ভাত, মাছ, দুধ সব আছে। খাবি তো আমার সঙ্গে আয়।" এই বলে সে হাঁটতে শুরু করল দাদুকে লক্ষ করে। কয়েক পা গিয়ে সে ফিরে তাকিয়ে দেখল খয়েরি আসছে না।

"আয়, আয়" বলে সে কয়েকবার ডাকল। খয়েরি ল্যাজ নাড়ল কিন্তু এগিয়ে এল না। কলাবতী দাদুর কাছে এসে বলল, "দুটো টাকা দাও তো।"

"কী হবে টাকা?" রাজশেখর বললেন।

"দাও না, দেখতেই পাবে।" বায়নাধরা আদুরে গলায় কলাবতী বলল।

রাজশেখর ট্রাউজার্সের পকেট থেকে কয়েকটা নোট বার করে তার থেকে একটা নোট নাতনির হাতে দিলেন। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কলাবতী তিরবেগে কোয়ার্টারের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। এখানে আসার সময় সে দেখেছে কোয়ার্টারের পাঁচিলের লাগোয়া একটা ছোট্ট স্টেশনারি দোকানের কাউন্টারে থাক দিয়ে পাঁউরুটি সাজানো।

যাওয়ার মতোই তিরবেগে সে ফিরে এল। খয়েরি আবার হাড়টা নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করেছে।

"থাক ওটা আর খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে না, এবার এটা খা।" মোড়ক থেকে পাউরুটি বার করে আধখানা ভেঙে সে খয়েরির মুখের সামনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা পেটের মধ্যে চালান হয়ে গেল। বাকি আধখানারও একই হাল হল। এরপর খয়েরি জুলজুল করে তাকিয়ে আছে দেখে কলাবতীর মন কষ্টে ভরে গেল। বেচারা, এখনও খিদে যায়নি। সে ভাবল, আবার একটা পাঁউরুটি কিনে আনবে কি?

তখনই রাজশেখর চেঁচিয়ে ডাকলেন, "কালু এবার বাড়ি চল।"

"আয় আমার সঙ্গে, কিনে দেব আর একটা"— কলাবতী চাপাস্বরে বলল খয়েরিকে। খয়েরি বুঝতে পারল কলাবতীর মমতাভরা কথার মানেটা। তাকে অনুসরণ করে সে রাজশেখরের কাছে এসে কলাবতীর পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

"আবার এসো রাজু। বাচ্চাদের সঙ্গে দৌড়োলে ওরা উৎসাহ পাবে, সিরিয়াস হবে, তোমারও উপকার হবে।" ফণী ঘোষ বললেন।

"উপকার মানে তো খিদে বাড়বে।" রাজশেখর বললেন, "আসব, তবে রোজ আসতে পারব না।"

ফণী ঘোষ কলাবতীকে বললেন, "তুমি কিন্তু রোজ আসবে। বাড়িতে এমন এক দাদু থাকতে তোমাকে আমি আর কী ক্রিকেট শেখাব। গোড়ার ব্যাপারগুলো ওর কাছেই শিখে নিয়ো। কী গো রাজু, শেখাতে পারবে না?"

রাজশেখর হাসলেন, "চল কালু, বেলা বাড়ছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।"

ওরা কোয়ার্টারের গেট থেকে বেরোচ্ছে, তখন খয়েরি ছুটে এল। রাজশেখর আগেই খয়েরিকে লক্ষ করেছিলেন, বললেন, "সেই কুকুরটা মনে হচ্ছে। ওকে তো খাওয়ালি, এবার আর তোকে ছাড়বে না। ও তোকে বুঝে গেছে।"

"কী বুঝে গেছে?" কলাবতী জানতে চাইল।

"তুই ওকে ভালবাসিস। জন্তু-জানোয়ার, পাখিরা মানুষ চেনে। কে ভাল, কে দুষ্টু ওরা ঠিক বুঝতে পারে।" রাজশেখরের মুখে হাসি ফুটে উঠল। "তুই পাশ করে গেছিস।"

দাদুর কথায় কলাবতীর মন আনন্দে ভরে গেল। খয়েরি জানিয়ে দিয়েছে সে ভাল লোক। "দাদু ওকে আর একটা পাঁউরুটি কিনে দাও না! একটা খেয়ে ওর খিদে যায়নি। দেখছ কী রোগা হয়ে গেছে না খেতে পেয়ে।"

নাতনির চোখেমুখে দয়া করুণা মমতা উপচে উঠছে দেখে রাজশেখর মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি এটাই তো দেখতে চান, কলাবতী সুন্দর একটা মন পাক, চমৎকার স্বাস্থ্য পাক।

বাড়ি ফেরার পথে আর একটা দোকান থেকে রাজশেখর বড় সাইজের একটা পাঁউরুটি কিনলেন।

"রাস্তায় নয়, বাড়ি গিয়ে ওকে খেতে দেব।"

"ওকে বাড়ি নিয়ে যাব?" অবিশ্বাসের সুর কলাবতীর প্রশ্নে গোপন রইল না।

"ওকে পুষতে তোর ইচ্ছে করছে?"

"হ্যাঁ।" কলাবতী মাথাটা হেলিয়ে কাঁধে ছুঁইয়ে দাদুর হাত ধরল।

ক্ষুধার্ত খয়েরি ওদের দু'জনের সঙ্গে এবং পাঁউরুটির পিছু নিয়ে সিংহীবাড়ির ফটক পেরিয়ে ঢুকল। বাড়ির সদর দরজার সামনে পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"বাড়ির মধ্যে ঢোকাসনি, গায়ে ভীষণ নোংরা। এখানেই খেতে দে।" রাজশেখর মোড়কে মোড়া পাঁউরুটিটা কলাবতীর হাতে দিয়ে বললেন, "সবটা খাইয়ে দিসনি।"

"দাদু ওকে চান করাব?" কলাবতী মোড়ক খুলে পাঁউরুটির খানিকটা ছিঁড়ে খয়েরির মুখের সামনে ধরে বলল।

"রাস্তার কুকুর, চান করার অভ্যেস তো নেই। গায়ে জল ঢাললেই ছুটে পালাবে। ধরেবেঁধে করাতে গেলে চেঁচামেচি করবে, কামড়ে দিতেও পারে। বাচ্চা কুকুর তো নয়!"

পাঁউরুটির আর একটা টুকরো ছিঁড়ে কলাবতী বলল, "বড়দির মঙ্গলার মতো একটা বকলেশ আর চেন কিনে দেবে দাদু?"

"চেন দিয়ে বেঁধে রাখার মতো কুকুর তো এরা নয়, এরা ছাড়া থাকলেই ভাল থাকে। তবে একটা বকলেশ পরালে লোকে জানবে ও বাড়ির পোষা কুকুর, আচ্ছা কিনে এনে দেব।" এই বলে রাজশেখর বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে থেমে গেলেন। "আর একটা রবারের বল।"

সত্যশেখর সকালে একবার সেরেস্তায় বসে কোর্টে বেরোনোর আগে। সেদিন যার মামলা পড়েছে এমন দু'-তিনজন মক্কেল তখন আসে। দোতলা থেকে নেমে সেরেস্তায় ঢোকার সময় খোলা সদর দরজার দিকে তার চোখ পড়ল।

"আরে কালু, ওটা আবার এসেছে আর তুই ওকে খাওয়াচ্ছিস?"

"আমি নয়, দাদু খাওয়াচ্ছে। দাদুই তো পাঁউরুটি কিনে ওকে ডেকে আনল।" কলাবতী জানে চুলে পাক ধরলেও কাকা এখনও ভয় পায় দাদুকে। সে তাই বর্মের মতো দাদুকে সামনে রেখে খয়েরিকে আড়াল করল।

"বাবা, ডেকে আনল!" সত্যশেখর ভ্রূ কুঁচকে সেরেস্তায় ঢুকে গেল।

মুরারি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। কলাবতী তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "চললে কোথায় মুরারিদা?"

"মুদির দোকানে। আজ রথযাত্রা, ছোটবাবু তেলেভাজা খাবে। পাঁপড় আর ব্যাসম কিনতে যাচ্ছি।" মুরারির চোখমুখ কুঁচকে গেল খয়েরিকে দেখে। "রথের দিন প্রাণীকে খাওয়ালে পুণ্যি হয়। খাওয়াও। জগন্নাথ বাবা খুশি হবেন।"

"শুধু আজ নয়, খয়েরি রোজ দু'বেলা খাবে। ও এবার থেকে এখানেই থাকবে, আমি ওকে পুষব।"

"অ্যা!" মুরারি প্রায় বজ্রাহতের মতো সাত-আট সেকেন্ড তাকিয়ে রইল খয়েরির দিকে। "এই চিমড়ে রাস্তার নেড়ি কুকুরটাকে পুষবে তুমি? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! কত ভাল ভাল লোমওলা সুন্দর সুন্দর বিলিতি কুকুর থাকতে শেষে কিনা— কত্তাবাবু জানে?"

"জানে মানে। দাদুই তো ওকে নিয়ে এল। খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে দেব। দেখবে তখন বিলিতি কুকুরের থেকেও সুন্দর হয়ে যাবে, তাই না রে খয়েরি?" কলাবতী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, খয়েরি লেজ নাড়ল।

"ও বাব্বা, নামকরণও হয়ে গেছে, খয়েরি!" আকাশের দিকে তাকিয়ে মুরারি বলল, "বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে, যাই দোকানটা সেরে আসি।"

"এখানে বোস। জল এনে দিচ্ছি।"

খয়েরিকে বসতে বলে কলাবতী ভেতরে গেল। অপুর মা রান্নাঘরে।

"একটা বাটিতে জল দাও তো, খয়েরি খাবে।"

অপুর মা অবাক হয়ে বলল, "খয়েরি কে?"

"সেই কুকুরটা, যাকে সেদিন তুমি গেটের কাছে দেখেছিলে।"

"আবার এসেছে। জানতুম আসবে। ডেকে খাইয়েছ যখন, তখন রোজ আসবে। প্লেলাসটিকের ওই মগটায় করে জল দাও।"

"খয়েরি মোটেই হ্যাংলা নয়। ও তো আসতেই চাইছিল না। দাদুই তো ওকে সঙ্গে করে আনতে বলল।"

"কত্তাবাবু বলেচেন! ভালই হল। বাগানটা ফাঁকা পড়ে থাকে। রেতে পাহারা দেবে। আটঘরায় আমাদের ময়রা পাড়ায় এই কুঁদো কুঁদো পাঁচ-ছ'টা কুকুর আছে। দিনের বেলা ঘুমোয় আর রেতে জেগে ঘোরাঘুরি করে। চোর-ছ্যাঁচোড় ভয়ে ও পাড়ার ধারেকাছে ঘেঁষে না। কিন্তু পাড়ার মানুষকে ঠিক চেনে। কিচ্ছু বলে না। কালুদিদি তোমার মতো বয়সে আমার একটা সাদা কুকুর ছিল, নাম রেখেছিনু সায়েব। আমার হাতে ছাড়া কারুর হাতে ভাত খেতনি।" হঠাৎ অপুর মা'র গলা ধরে এল। "বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি চলে

গেনু। সায়েব আমাকে দেখতে না পেয়ে খাওয়া বন্দো করে দিল। তিন দিন খায়নি।" অপুর মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। "বুঝলে গো বড্ড মায়া পড়ে যায়।"

"তারপর ভাতটাত খেত?" কলাবতীর স্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল।

"খাবেনি কেন। তবে আগের মতো আর ছেল না। লাপানি ঝাঁপানি, চিৎকার চেঁচামেচি কমে গেছল। আমি বাপের বাড়ি এলে তখন সবসময় আমার কাছে কাছে থাকত। বুড়ো হয়ে দু'দিনের অসুখে সায়েব মরে গেল। খবর পেয়ে আমি দু'দিন খেতে পারিনি।" অপুর মা আবার চোখে আঁচল দিল।

"এবার তুমি আমার খয়েরিকে দেখো।"

"দেখব।"

নাতনিকে ক্রিকেটের অ আ ক খ শেখাতে গিয়ে রাজশেখরের বয়স যেন পঞ্চাশ বছর কমে গেল। প্রতিদিন কলাবতীর সঙ্গে প্রগতি সঙ্ঘের মাঠে যান। মেয়েদের সঙ্গে থপ থপ করে একপাক দৌড়েই হাঁফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। ফণী ঘোষকে ঘিরে মেয়েরা দশ মিটার দূরত্বে গোল হয়ে দাঁড়ায়, তাদের সঙ্গে রাজশেখরও থাকেন। ফণী ঘোষ এক-একজনকে রবারের বল ছুড়ে দেন। প্রথম প্রথম বেশিরভাগ মেয়েরই হাতে লেগে বল ছিটকে যেত, রাজশেখরেরও তাই হত। পরে মেয়েরা ক্যাচ ধরাটা রপ্ত করে ফেলে, এমনকী তিনতলা উঁচু বল ছুড়ে দিলে এখন প্রায় সব মেয়েই লুফতে পারে। যারা পারে না ফণী ঘোষ তাদের দেখিয়ে দেন দুটো তালু ক্যাচ ধরার সময় কেমনভাবে রাখতে হবে, শরীরের অবস্থান তখন কেমন হবে আর বারবার বলে দেন বলের থেকে একদম নজর সরাবে না।

বল লোফা, জোরে গড়িয়ে দেওয়া বল ছুটে এসে কুড়িয়ে তুলে ছুড়ে ফেরত দেওয়া আর ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম কিছুদিন করার পর একটি মেয়ে সবার হয়ে একদিন বলল, "ফণীদা, আমরা কবে ব্যাট করব?"

ফণী ঘোষ ওদের আশ্বস্ত করে বললেন, "হবে হবে। আগে ব্যাট ধরা, ব্যাট হাতে ক্রিজে দাঁড়ানো, ব্যাট তোলা, এগিয়ে পিছিয়ে বল থামানো এগুলো না শিখলে ব্যাট করা যায় না। তোমাদের কারুর ব্যাট আছে ?"

সবাই চুপ, কলাবতীও। দাদুর ছিল পঞ্চাশ বছর আগে। এক বন্ধুর ছেলেকে সেটি দিয়ে দেন খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর।

একটি ছোট্ট মেয়ে বলল, "আমার দাদার ব্যাট আছে। আমাকে একদম হাত দিতে দেয় না। ছাদে একা-একাই ব্যাট চালায় আর বলে এই দ্যাখ শাস্ত্রীর চাপাটি শট, এই দ্যাখ কপিলদেবের নটরাজ শট।"

ফণী ঘোষ বললেন, "তুমি যেন এখনই চাপাটি-নটরাজ করতে যেয়ো না। আগে অ-য় অজগর আসছে তেড়ে, তারপর রাখাল অতি সুবোধ বালক, তারপর ঐক্য বাক্য মাণিক্য— এইভাবে ধাপে ধাপে শিখতে হবে।"

কমিউনিটি হলের সামনেটা সিমেন্ট করা একটা চাতালের মতো। ফণী ঘোষ একদিন একটা টেনিস বল আর নিজের ব্যাটটা নিয়ে শুরু করলেন সেই চাতালে ব্যাটিং শেখানো। কয়েক মিনিটেই হতাশ হয়ে পড়লেন। ব্যাটটা ওদের পক্ষে বড়। লম্বা কলাবতী এবং আর একটি মেয়ে ছাড়া আর একজনও ব্যাট সোজা রেখে খেলতে পারছে না। অনেকের পক্ষে ব্যাটটা ভারীও।

ব্যাটিং শেখানো বন্ধ করে ফণী ঘোষ বললেন, "রবারের বল খেলার জন্য কম দামি ছোট সাইজের চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার ব্যাট দোকানে পাওয়া যায়। তোমরা তাই কিনে আনো।"

তিনদিন পরে একটিমাত্র মেয়ে ব্যাট হাতে এল। একজন জানাল, "বাবা বলেছে এই তো জুতো প্যান্ট কিনে দিলুম, এখন আর ব্যাট কিনে দিতে পারব না।" অন্যরা প্রায় একই ধরনের কথা বলল।

একদিন রাজশেখরের খেয়াল হল শুধু ব্যাট, বল, ফিল্ডিং করে তো একটা টিম খেলতে পারে না, একজন উইকেটকিপারও তো চাই। কথাটা ফণী ঘোষকে বলতে, তাঁরও ভ্রূ কুঁচকে উঠল। "এটা আমি অনেকদিন আগেই ভেবেছি।" ফণী ঘোষ বললেন, "গোলকিপারের মতো উইকেটকিপারও জন্মায়। ওদের তৈরি করা যায় না। আমি লক্ষ করেছি তোমার নাতনিটির মধ্যে উইকেটকিপার হওয়ার গুণগুলো আছে, ওকে উইকেটকিপিং প্যাড আর গ্লাভ্‌স কিনে দাও আর বাড়িতে প্র্যাকটিস করাও আলাদা ভাবে।"

রাজশেখর অসহায়ভাবে বললেন, "কিন্তু আমি তো উইকেট কিপিং-এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।"

ফণী ঘোষ বললেন, "কালীঘাটের মনা ভটচাযকে মনে আছে? গোটা দশেক রঞ্জি ম্যাচে উইকেটকিপ করেছে। এখন লাঠি নিয়ে হাঁটে, বাতে পঙ্গু। টেকনিক্যালি সাউন্ড ছিল। ফিফটি নাইনে পুনা ক্যাম্পে একটা ট্রায়াল ম্যাচে

সুভাষ গুপ্তের বলে দাত্তু গায়কোয়াড়ের স্টাম্পিং মিস করে ওর ইংল্যান্ড ট্যুরে যাওয়া হয়নি, গেল নানা জোশি। মনার টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি, ওর সঙ্গে কথা বলে নাতনিকে নিয়ে ওর কাছে যাও। খুব খুশি হবে।''

সেদিনই সন্ধ্যায় রাজশেখর ফোন করলেন মনা ভটচাযকে।

''আমি রাজশেখর সিঙ্গি বলছি। মনে পড়ছে, টাউন ক্লাবের রাজু সিঙ্গি!''

মনা ভটচায উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। ফণী আজ দুপুরে ফোন করেছিল। তোমার নাতনিকে উইকেট কিপার করাতে চাও। এটা তো একটা থ্যাঙ্কলেস জব, তাও আবার মেয়েদের ক্রিকেট! মাঠে খেলা দেখার লোক হয় না, কাগজে রিপোর্টও করে না। আমি তো ভাল করে হাঁটতে পারি না, ওকে নিয়ে কাল বিকেলে আমার বাড়িতে এসো, যা বলার বলে দেব, করে দেখাতে তো পারব না। হাঁটু মুড়তে পারি না। আমার ঠিকানাটা লিখে নাও।''

রাজশেখর ঠিকানা লিখে নিয়ে বললেন, ''কাল বিকেলেই যাচ্ছি। খুঁজে বার করতে অসুবিধে হবে না, পার্ক সার্কাসের ওদিকটা আমার চেনা। আমার ছেলে সতু ডন বস্কোয় পড়ত।''

পরদিন কলাবতী স্কুল থেকে ফিরে পোশাক বদল করেই বেরিয়ে পড়ল। ১৯২৮ সালে তার ঠাকুরদার বাবার কেনা হুড খোলা লম্বা পাদানি থাকা নিয়মিত ঝাড়মোছ করা ফোর্ড গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে রাজশেখর, তাঁর পাশে গিয়ে বসল কলাবতী।

রাজশেখর ''পঁক পঁক'' শব্দে বল হর্ন বাজাতেই মুরারি ছুটে গিয়ে ফটকের দুটো পাল্লা খুলে দিল। গাড়ি বেরিয়ে গিয়ে থামল। মুরারি আবার ফটক বন্ধ করে গাড়ির পেছনের সিটে এসে বসল। মানিকতলার মোড়ের কাছে রাজশেখর মোটর থামিয়ে পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে কলাবতীর হাতে দিয়ে বললেন, ''ওই যে ছোট্ট মিষ্টির দোকানটা দেখছিস, কড়াপাক নিয়ে আয়, মুরারি সঙ্গে যা।''

কলাবতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ''একশো টাকার?''

জবাব দিল মুরারি, ''তবে না তো কী?''

দোকানের দিকে যাওয়ার সময় মুরারি চাপা গলায় বলল, ''কত্তাবাবু যখন বলে দেননি কত টাকার কিনতে হবে তখন ধরে নেবে সব টাকারই কিনতে হবে।''

দোকানটা সত্যিই ছোট্ট। একটা লম্বা কাচের শোকেস। ওপরের তাকে স্টিলের ট্রে-তে থরে থরে সাজানো সন্দেশ। নীচের তাকে গামলায় রসগোল্লা, রাজভোগ, ছোট একটা ক্যাশবাক্স নিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে চেয়ারে বসে শীর্ণকায়, সাদা কদমছাঁট চুল, ফতুয়া গায়ে এক প্রৌঢ় বসে।

মুরারি তাকে বলল, "নমস্কার ঘোষমশাই, কত্তাবাবু পাঠালেন। কড়াপাক দিন একশো টাকার। উনি গাড়িতে বসে। এই ওঁর নাতনি, দোকানটা চেনাতে পাঠালেন।"

ঘোষমশাই দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন শশব্যস্ত। গাড়ির কাছে এসে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ালেন।

রাজশেখর বললেন, "কেমন আছ গো ফেলু।"

ফেলু ঘোষ জানালেন, "ভগবান আর আপনাদের দয়ায় ভালই আছি। আপনি ভাল তো? ছোটকর্তার বিয়ে হয়েছে?"

"হলে তো তুমিই আগে জানতে পারতে।"

"সন্দেশটা আজ নেবেন না বড়কর্তা। ছানাটা টিউকলের জলে কাটানো, বরং ক্ষীরের চন্দ্রপুলি আছে, সেটাই দিয়ে দিই।"

"চন্দ্রপুলি! এ আবার জিজ্ঞেস করে? দাও দিয়ে দাও, সন্দেশ থাক।"

এক-একটা পাঁচ টাকা। কুড়িটা চন্দ্রপুলির বাক্স একটা পলিথিন ব্যাগে হাতে ঝুলিয়ে মুরারি কলাবতীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরল। মনা ভটচাযের বাড়ি খুঁজে নিতে ওদের অসুবিধে হল না। কোলাপসিবল গেটের পাশে কলিং বেলের বোতাম। গাড়ি থেকে নেমে মুরারি সেটা টিপতেই ভেতর থেকে ভারী গম্ভীর গলায়, "ঘৌ ঘৌ ঘৌ" শব্দ উঠল। শুনলেই বোঝা যায় বড় বিদেশি কুকুরের ডাক। কেউ একজন চুপ করতে বলছে ওকে। আর কুকুরের ডাক শোনা গেল না।

মুরারি বলল, "নির্ঘাত বিলিতি কুকুর। তাই এত সভ্য, চুপ করতে বললে চুপ মেরে যায়।"

কলাবতী বুঝল কথাটা খয়েরিকে ঠেস দিয়ে বলা হল। রাতে এক-একদিন ফটকের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে খয়েরি তারস্বরে চিৎকার করে রাস্তার কুকুরদের বাড়ির সামনে থেকে তাড়ায়। মুরারির ধমকানিকে সে তখন গ্রাহ্য করে না।

ভেতর থেকে গেটে এসে যে দাঁড়াল তাকে দেখেই বোঝা যায় সে এই বাড়ির মুরারি। গাড়িতে বসেই রাজশেখর ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

"এটা কি মণীন্দ্র ভটচাযের বাড়ি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অপেক্ষা করছেন।"

কলাবতী বুঝল, তারা যে আসবে সেটা বলে রাখা আছে। মুরারি পলিব্যাগটা হাতে নিয়ে দু'জনের পেছনে থেকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে বৈঠকখানার দরজা পর্যন্ত এসে ব্যাগটা কলাবতীর হাতে দিয়ে গাড়িতে ফিরে গেল।

"এসো রাজু, এসো, কতকাল পরে—" মনা ভট্চায সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালেন লাঠিতে ভর দিয়ে, দু'হাত বাড়ালেন। মাঝারি উচ্চতা, টাক মাথা, বড় ভুঁড়ি, থলথলে চেহারা। কলাবতী হতাশ হল প্রাক্তন উইকেটকিপারের বপু দেখে। রাজশেখর ওঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর তো হল।"

কলাবতী চন্দ্রপুলির বাক্স ভরা ব্যাগটা টেব্‌লে রেখে মনা ভট্চাযকে প্রথমে তারপর দাদুকে প্রণাম করল।

"এই বুঝি নাতনি, কী নাম গো তোমার?"

"কলাবতী সিংহ।"

"উইকেটকিপিং শিখবে? কিন্তু আমি তো ভাই, দেখছই, নড়াচড়া করতে পারি না লাঠি ছাড়া। এটা কী আনলে?"

পলিব্যাগ থেকে বাক্সটা বার করে রাজশেখর বললেন, "তোমাকে কালুর প্রণামী— চন্দ্রপুলি। খেয়ে দেখো।"

"চন্দ্রপুলি! ওহ্‌হ্‌, এ তো আজকাল চোখেই দেখা যায় না। খোঁজ করেছি, আমাদের এদিককার একটা দোকানেও নেই। নারকেলের মিষ্টি খাওয়ার লোক নাকি এখন আর পাওয়া যায় না।"

গলায় চাপা গর্ব মাখিয়ে রাজশেখর বললেন, "থাকবে কী করে, এসব পুরনো কলকাতার আদি জিনিস। সকালবেলায় মাথায় হাঁড়িতে চন্দ্রপুলি, তিলকুট নিয়ে হাজির হত কেশবচরণ। বাবা খুব খেতেন। তাঁর কাছ থেকেই খাওয়াটা শিখেছি।"

"পুরনো কলকাতা, আমাদের ছোটবেলার দিনকালের কথা, রাজু, মাঝে মাঝে ভাবি। আর অবাক হয়ে যাই। তোমার কি মনে আছে ইডেন গার্ডেন্‌স আগে কীরকম ছিল? দেবদারু গাছে ঘেরা খোলা মাঠ। গঙ্গা থেকে বয়ে আসত বাতাস, কাঠের প্যাভিলিয়ন, বিরাট একটা গোল ঘড়ি, তার তলা দিয়ে

প্লেয়াররা মাঠে নামত। একটা কাঠের দোতলা স্কোরবোর্ড, তার একতলায় ছোট একটা ট্রেডল মেশিন নিয়ে ছাপাখানা, সেখানে স্কোর কার্ড ছাপা হত খেলা শুরুর আগে, লাঞ্চের সময় আর টি-এর সময় স্কোর ছাপা কার্ড বিক্রি হত। মোটা কাছির রোপ-এর ধারে ঘাসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আমি জীবনে প্রথম রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ দেখি। মেজকাকা নিয়ে গেছলেন তখন আমার বয়স বারো বছর।'' একটানা বলতে বলতে মনা ভট্চায ষাট বছর পিছিয়ে গিয়ে তাঁর প্রথম দেখা রঞ্জি ম্যাচটাকে চোখের সামনে ভাসিয়ে তোলার চেষ্টায় চোখ মুছলেন। কলাবতী লক্ষ করল তার দাদুর চোখ অন্যমনস্কের মতো মনা ভট্চাযের হাতের লাঠিতে তাকিয়ে।

''মনা, সেটায় বেঙ্গল খেলেছিল কার সঙ্গে বলো তো?''

''সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার সঙ্গে।''

''আরে আমিও তো ম্যাচটা দেখেছি। তিনদিনের ম্যাচ আড়াই দিনেই শেষ, থার্ড ডে লাঞ্চের পর। মুস্তাক আলির ওভারের শেষ বলে এক রান নিয়ে কার্তিক বোস এ-ধারে এল। বেঙ্গলের তখন জিততে দুটো রান দরকার, হাতে আটটা উইকেট। ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি বল করতে এল। কার্তিক বোস পুল করলে শর্ট স্কোয়্যার লেগে বিজয় হাজারে বলটা থামাল। পরের বলেই লেট কাট— বল থার্ডম্যান বাউন্ডারিতে যাচ্ছিল, ভায়া পয়েন্ট থেকে ছুটে গিয়েছিল বলটা ধরতে। অ্যালেক হোসি চিৎকার করে বলছিল, 'বোস রান।' ছুটে ওরা দুটো রান নেয়। ভায়া বলটা উইকেটকিপারের হাতে ছুড়ে দেওয়ার আগেই।'' বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাজশেখরের মুখ। কলাবতী ভাবল, ছোটবেলা কী অদ্ভুত সময়, এত বছর পরও দুই বুড়ো হুবহু সব মনে রেখেছে। তাকেও সব মনে রাখতে হবে, এদের কথাবার্তাও। কে হাজারে, কে মুস্তাক আর ওয়াজির আলি সে জানে না তবে দাদু যেরকম সম্ভ্রম করে নামগুলো উচ্চারণ করলেন তাতে তার মনে হল তিনজন খুবই বড় খেলোয়াড় ছিলেন।

''জানো রাজু, এই ম্যাচ দেখেই আমার ইচ্ছে হয়, উইকেটকিপার হব। বাংলার কিপার ছিল ভ্যান্ডারগুচ সাহেব। রোগা, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। মনে হত একটা সারস উইকেটের পেছনে উবু হয়ে বসে। ফার্স্ট ইনিংসে সুঁটে ব্যানার্জির বলে হাজারের যে ক্যাচটা ডান দিকে ঝাঁপিয়ে নিল, দেখে মনে হয়েছিল সারস উড়ল। সেকেন্ড ইনিংসে হাজারেকে স্টাম্পড করল টম লংফিল্ডের মিডিয়াম পেস বলে, ভাবতে পারো! আর একটা স্টাম্পড করল

কমল ভট্‌চাযের বলে ওয়াজির আলিকে।" বৃদ্ধ মনা ভট্‌চায উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন লাঠি না ধরেই। রাজশেখর তাঁকে টেনে বসালেন।

"বোসো তো, মনা তোমার স্মৃতিশক্তি কেমন এবার তার পরীক্ষা নেব। বলো তো ওই ম্যাচে ক'টা বাঙালি খেলেছিল? বাংলা আট উইকেটে জিতে পরে কার সঙ্গে খেলে?"

মনা ভট্‌চায মুখভরা হাসি নিয়ে বললেন, "এ আর বলতে পারব না, ম্যাচটা হয়েছিল জানুয়ারির গোড়ায় আর পরের ম্যাচ জানুয়ারির শেষে ইডেনেই হায়দরাবাদের সঙ্গে, সেটা রঞ্জি সেমিফাইনাল। আর সেন্ট্রাল ইন্ডিয়ার সঙ্গে ম্যাচে তো বাঙালি ছিল। কার্তিক বোস, কমল ভট্‌চায আর সুঁটে ব্যানার্জি, তিনজন। এ কামাল নামে একজন ছিল, তবে বাঙালি নয়। পরের ম্যাচেও ছিল এই তিন বাঙালি, আর এক সাহেবকে বাদ দিয়ে এল সুশীল বোস, চারজন।"

"এই হায়দরাবাদ ম্যাচেই বাংলার পক্ষে প্রথম একটা ব্যাপার হয়েছিল, বলতে পারো সেটা কী? আমার অবশ্য তখন অতশত বোঝার মতো বয়স ছিল না, পরে বাবার কাছে শুনি।" রাজশেখর মিটমিট হেসে তাকিয়ে রইলেন মনা ভট্‌চাযের দিকে। তিনি চোখ কুঁচকে মুখ তুলে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। দশ সেকেন্ড পর মুখ নামিয়ে আনলেন চন্দ্রপুলির বাক্সে। আনমনে বাক্সের ঢাকনা রাবার ব্যান্ড থেকে মুক্ত করে খুললেন। কিশমিশ বসানো আধফালি চাঁদের মতো থাক দেওয়া পুলির একটা তুলে তিনি রাজশেখরের দিকে এগিয়ে ধরলেন। রাজশেখর আড়চোখে লাজুকভাবে নাতনির দিকে তাকিয়ে চন্দ্রপুলিটা হাতে নিলেন। কলাবতী আগে কখনও এইভাবে কারও হাত থেকে দাদুকে খাবার জিনিস নিতে দেখেনি।

বাক্সটা কলাবতীর সামনে ধরে মনা ভট্‌চায বললেন, "নাও।" সে দাদুর দিকে তাকাল।

রাজশেখর তখন চন্দ্রপুলিতে কামড় দিচ্ছেন। মাথা নেড়ে বললেন, "তুলে নে। ফেলু ঘোষ দারুণ বানিয়েছে। মনা তুমিও তোলো।"

কলাবতী চন্দ্রপুলি তুলে নিয়ে তার একটা কোণ দাঁতে কাটল। মিহি করে বাটা নারকেল, ছানা আর ক্ষীর দিয়ে তৈরি পুলি মুখের মধ্যে দিয়ে চুষতেই মিলিয়ে গেল। কলাবতী অবাক হয়ে ভাবল, এমন একটা জিনিস আগে কখনও কেন খাইনি! সে অন্য দু'জনের দিকে তাকাল। মনা ভট্‌চাযের হাতেরটা আধখানা, দাদুর হাত শূন্য।

"রাজু বসে আছ কেন, হাত চালাও।" নিজেরটা শেষ করে মনা ভট্চায বাক্সের দিকে হাত বাড়ালেন। "আমি কিন্তু আর খাব না, ডায়বিটিসটা একটু বেশির দিকেই।"

"মনা, আমার প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু এখনও পেলাম না।"

"দেব, দেব, একটু ভাবতে দাও। নাও, আর একটা তোলো। কলাবতী লজ্জা কোরো না। আর একটা নাও। এত চন্দ্রপুলি খাবে কে? বাড়িতে তো আমি আর আমার বউ, তিনি তো মেয়ের বাড়ি গেছেন।... নাহ্ মনে পড়ছে না, তুমিই বলো।" মনা ভট্চায হাল ছেড়ে দিলেন।

"ওই এ কামাল একটা সেঞ্চুরি করেছিল, ন'নম্বরে ব্যাট করতে নেমে। বাংলার পক্ষে ওটাই প্রথম রঞ্জি সেঞ্চুরি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে রাজু। সুঁটে ব্যানার্জি ছিল দশ নম্বরে। দারুণ একটা স্ট্যান্ড দিয়েছিল কামালকে। সুঁটেদা নট আউট ছিল, তিন রানের জন্য হাফ সেঞ্চুরিটা হয়নি। কী, ঠিক বলেছি?" মনা ভট্চাযের মুখ ঝলমল করে উঠল নিজের স্মৃতিকে আবার সবল করে তুলতে পেরে। "আরও বলছি, বাংলা সেই প্রথম ফাইনালে উঠে খেলতে গেল বোম্বাইয়ে নওনগরের সঙ্গে। ভিনু মানকাদ তখন অল্পবয়সি ছেলে। কী মারটাই না দিল বেঙ্গলের বোলারদের। প্রথম দিনেই একশো পঁচাশি করে কমল ভটচাযের বলে ক্যাচ আউট হল। কাগজে মানকাদের ছবি দেখেছি। ব্লেজার পরা, গলায় সিল্কের স্কার্ফ। তখন ওটাই স্টাইল ছিল।" কথা শেষ করে মনা ভট্চায বাক্সের দিকে হাত বাড়ালেন, রাজশেখরও পিছিয়ে রইলেন না।

"রোজ সকালে কাগজ এলেই ঝাঁপিয়ে পড়তুম। চার দিনের ম্যাচটা যেন চার ঘণ্টায় শেষ হল বলে তখন মনে হয়েছিল।" রাজশেখর স্মৃতি এবং চন্দ্রপুলি রোমন্থন করতে করতে বললেন। "মনা, তোমার ভ্যান্ডারগুচ ফাইনালে ছিল বাংলার ক্যাপ্টেন, আর নওনগরের ক্যাপ্টেন ছিল আর এক সাহেব, যার কাছে মানকাদ বোলিং শিখেছিল, বার্টি ওয়েন্সলি। ফার্স্ট ইনিংসে ভ্যান্ডারগুচ দারুণ ব্যাট করে প্রায় আশি রান করেছিল। তবু বাংলা একশোরও বেশি রানে পিছিয়ে পড়েছিল। সেটা খানিকটা সামলায় সেকেন্ড ইনিংসে স্কিনার সাহেব একটা সেঞ্চুরি করায়। তবু আড়াইশোর মতো রানে বাংলা হেরেছিল।"

মনা ভট্চাযের সঙ্গে রাজশেখরেরও চোখে বিষাদের ছায়া পড়ল। কলাবতীর মনে হল দু'জনে যেন বোম্বাইয়ে মাঠের ধারে বসে এইমাত্র বাংলাকে হেরে মাঠ থেকে ফিরতে দেখছেন।

রাজশেখর বললেন, ''সুঁটে ব্যানার্জি খেললে অবশ্য শেষ পর্যন্ত কী হত বলা যায় না। নওনগর ওকেই ভয় পাচ্ছিল তাই জামসাহেব ভাল চাকরির টোপ দিয়ে ওকে ফাইনালের ঠিক আগেই তুলে নিয়ে গেল। সুঁটে বলল ফাইনালে বাংলার এগেনস্টে খেলব না। জামসাহেব বলল, ঠিক আছে তবে বাংলার পক্ষেও খেলতে পারবে না। তখন তো এখনকার মতো আইনের বাঁধাবাঁধি ছিল না। যখন-তখন স্টেট বদল করা যেত।''

ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কলাবতী একঘেয়ে বোধ করল। দু'জনে যেসব ঘটনার কথা বলে যাচ্ছে তার কিছুই সে বুঝতে পারছে না। কে মানকাদ, কে স্কিনার, কে সুঁটে, তারা কেমন খেলত তার বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। তাদের কথা শুনতে তার একটুও আগ্রহ হচ্ছে না। বরং যেজন্য তার এখানে আসা সেই উইকেটকিপিং নিয়ে তো একটা কথাও এখন পর্যন্ত হল না।

এই সময় বাইরের দরজায় বেল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ''ঘৌ ঘৌ'' ডাক শোনা গেল। মনা ভট্চায ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, ''কোয়ায়েট, কোয়ায়েট।'' ডাক থেমে গেল।

কৌতূহলে কলাবতী বলল, ''মনাদাদু, আপনার কুকুরটা কোন জাতের?''

''ডোবারম্যান।'' মনা ভট্চায ভারী গলায় জানালেন। ''এক বছর বয়স, দেখতে চাও যদি দেখে এসো, এই পাশের প্যাসেজেই বাঁধা আছে।''

কলাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে উঠোন, তার ধার ঘেঁষে সাদা পাথরের একটা রোয়াক ভেতর দিকে চলে গেছে দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত। তার মনে হল সিঁড়ির পেছনে অন্ধকারপ্রায় জায়গাটায় কুকুরটা বোধহয় বাঁধা রয়েছে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। একটা ''গর্‌র গর্‌র'' আওয়াজ শুনেই সে আর এগোল না। উঁকি দিতেই চোখাচোখি হল কুকুরটার সঙ্গে। লম্বা পা, ছিপছিপে কিন্তু স্বাস্থ্যবান, চকোলেট রঙের শরীর, লোম মখমলের মতো ঝকঝকে, ল্যাজটা কাটা। দুটো চোখের ঠান্ডা চাহনির আড়ালে যেন ভর করে রয়েছে নিষ্ঠুরতা। ভয়ে গা শিরশির করল কলাবতীর। মোটা চেন দিয়ে বাঁধা থাকলেও সে আর কাছে গেল না।

তার মনে পড়ল খয়েরিকে। কাকার কাছে তো কত মক্কেলই আসে, সবাই খয়েরির অচেনা। গেট থেকে বাড়ির সদরের মধ্যের রাস্তাটায় ও বসে বা শুয়ে থাকে। অচেনা লোকেরা ওর পাশ দিয়ে নির্ভয়ে যাতায়াত করে। একদিন সকালে সে গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল এক মক্কেল গেট দিয়ে ঢুকে ওকে

দেখে অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। খয়েরি এখন অপুর মা'র যত্নে নাদুসনুদুস তাগড়াই হয়ে উঠেছে। নতুন কেউ ওকে প্রথম দেখলে ভয় পাওয়ারই কথা। কিন্তু আশ্চর্য ওর বোধশক্তি, ঠিক বুঝে যায় কে ভাল আর কে দুষ্ট লোক। সেদিন মক্কেলটি আড়ষ্ট হয়ে যেতে খয়েরি একটু একটু ল্যাজ নেড়ে জানিয়ে দিল, ভয় নেই গো আমি কামড়াব না। লোকটি তারপর সদর দরজার দিকে এগোলে খয়েরি তার পিছু নিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে।

কলাবতী ঘরে ফিরে আসতেই মনা ভট্চার্য জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন দেখলে?"

"দারুণ। এত ভাল কুকুর আমি আগে দেখিনি।" কলাবতী গলায় আন্তরিকতা ঢেলে দিয়ে বলল।

"সে কী দেখোনি! কলকাতায় বহু লোকই তো পুষছে। যেমন ইন্টেলিজেন্ট তেমনই ফেরোশাস আবার ডিসিপ্লিন্ডও। দেখলে তো, বেল বাজতেই ডেকে উঠল, আবার 'কোয়ায়েট' বলতেই চুপ করে গেল। আমি খুব সস্তায়ই পেয়েছি, তিন হাজারে।"

"আপনি ওকে আদর করেন?"

"আমি! না না, আমার কাজের লোক মৃত্যুঞ্জয় ওকে দেখাশোনা করে, খেতেটেতে দেয়। অ্যাঞ্জেলার গায়ে ও ছাড়া আর কেউ হাত দেয় না, দিতে দেয় না।"

কলাবতীর মনে পড়ল পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করার জন্য মুরারিদা একটা লোককে ডেকে এনেছিল। তার পিঠে ছিল থলি। ওজন করে সেগুলো থলিতে ভরে, মুরারিদার হাতে টাকা দিয়ে লোকটি থলি কাঁধে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন কোথা থেকে খয়েরি ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল লোকটার দিকে। ভয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। খয়েরিও তার তিন হাত দূরে থেমে গিয়ে হিংস্রভাবে ডেকে যেতে লাগল। মুরারিদা চেঁচিয়ে লোকটিকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "ভয় পেয়ো না, এ হচ্ছে নেড়িকুত্তা, এরা থলে হাতে লোক দেখলেই অমন করে ছুটে আসবে। আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগিয়ে যাও।" লোকটি তাই করল। খয়েরি চিৎকার করতে করতে গেট পর্যন্ত গেল কামড়াবার ভয় দেখাতে দেখাতে, কিন্তু কামড়ায়নি।

কলাবতী একতলার ঘরের জানলা থেকে সব দেখছিল। মুরারির তাচ্ছিল্যে বলা 'এ হচ্ছে নেড়িকুত্তা' শুনে তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ছুটে বেরিয়ে এসে সে খয়েরির গলার বকলশ ধরে তাকে এলোপাতাড়ি

চড়চাপড় মারতে মারতে 'নেড়ি, নেড়িকুত্তা' বলে চেঁচিয়ে যেতে লাগল। খয়েরি প্রথমে অকারণ প্রহারে হকচকিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে 'আঁউ আঁউ' শব্দ করে কলাবতীর হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাইল। কিন্তু এত শক্ত করে কলাবতী বকলশটা ধরে ছিল যে, সে পারল না। এক্ষেত্রে অন্য কুকুর হলে মুখ ঘুরিয়ে কলাবতীর কবজির কাছে হাতটায় কামড় দিত। তা না করে খয়েরি তার পা মাটিতে ছড়িয়ে বসে পড়ে মাথায় পিঠে চড় খেয়ে যেতে লাগল আর "উঁ উঁ" আওয়াজ করে গেল। মুরারি ছুটে এসে কলাবতীর হাত চেপে ধরে বলল, "করছ কী কালুদিদি, থামো।" কলাবতী তখন বকলশ ছেড়ে দেয়। ছাড়া পেয়েই ছুটে ফটক দিয়ে বেরিয়ে যায় রাস্তায়।

রাত্রে অপুর মা ফটকের বাইরে থেকে খয়েরিকে বকলশ ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে।

"কালুদিদি এই নাও তোমার খয়েরিকে। রাগ করে ফটকের বাইরে বসে ছিল। ওকে তুমি নিজে হাতে খেতে দাও। মুরারিদা বলল, তুমি নাকি ওকে চোরের মার মেরেছ! করেছিল কী?"

"কিছু নয়। ও কেন বিলিতি কুকুর হয়ে জন্মাল না। তা হলে সবাই ওকে খাতির করত, ভয় পেত, ওকে 'নেড়ি' বলে তাচ্ছিল্য করার সাহস পেত না।" কলাবতী ঝাঁঝালো স্বরে বললেও, গলায় ছিল অভিমান আর অকারণে মারার জন্য অনুশোচনা।

কলাবতী সেদিন রাতে নিজের হাতে রুটি খাইয়েছিল এক হাতে খয়েরির গলা জড়িয়ে ধরে। খাওয়ার পর তার হাতটা বাড়িয়ে দেয় খয়েরির দিকে চাটার জন্য। অবশ্যই সে চেটেছিল, কেননা এভাবেই সে আদর জানায়।

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলেন রাজশেখর। তিনি পাশে দাঁড়ানো সত্যশেখরকে তখন বললেন, "ঠিক যেন মা আর মেয়ে।"

কলাবতী অন্যমনস্ক হয়ে গেছল খয়েরির কথা ভাবতে ভাবতে। মনা ভট্চাযের কথায় তার হুঁশ ফিরে এল।

"তুমি পুষবে? অ্যাঞ্জেলার বাচ্চা হলে তোমায় একটা দেব।"

"দরকার নেই, আমার আছে।" কলাবতী ছোট্ট জবাব দিয়ে হাসল।

"বটে, বটে, কী জাতের?" মনা ভট্চায উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

"নেড়ি।"

মনা ভট্চাযের মুখ দেখে কলাবতীর মনে হল এমন জাতের নাম কখনও

শোনেননি। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইলেন।

"ওকে কিনতে হয়নি। নিজের থেকেই এসেছে। ওকে বেঁধে রাখা হয় না, ও বাঁধা থাকতে চায় না। যে কেউই ওর গায়ে হাত দিতে পারে।" চাপা একটা গর্ব কলাবতীর স্বরে ফুটে উঠল। রাজশেখর প্রসঙ্গটা ঘোরাতে বলে উঠলেন, "মনা, যেজন্য আসা। তুমি কালুকে কিছু টিপ্‌স দাও, যাতে ও উইকেটকিপার হতে পারে।"

"দ্যাখো, আমাদের সময়ে এখনকার মতো কোচিংটোচিং ছিল না। ব্যাট বা বলের জন্য তবু কোচ পাওয়া যেত কিন্তু উইকেটকিপারদের জন্য কিছুই ছিল না। একটু-আধটু যেটুকু শেখার শিখেছি ভাল উইকেটকিপারদের দেখে দেখে। আর বাকি বেশির ভাগটাই নিজের বোধবুদ্ধি দিয়ে আর অনবরত প্র্যাকটিস করে করে। উইকেটকিপিং-এর ছকবাঁধা কোনও নিয়ম নেই। সুভাষ গুপ্তের বলে কোনদিকে কীভাবে ক্যাচ উঠবে কেউ জানে না ; মুহূর্তের জন্যও কনসেনট্রেশন হারাবে না, বল থেকে চোখ সরাবে না। দিনে পঞ্চাশ ওভারের খেলায় একস্ট্রা বল বাদ দিয়ে তিনশো বল করা হয়, তার মানে তিনশো ওঠবোস। এজন্য আগে পায়ের, কোমরের জোর চাই। সারা ইনিংসে পাবলিক তোমার কথা ভুলে থাকবে, যেই একটা ক্যাচ কি স্টাম্প মিস করবে তখন তাদের তোমাকে মনে পড়বে আর সাতদিন ধরে খোঁটা শুনে যেতে হবে। আর একটা শক্ত ক্যাচ নিলে বা স্টাম্প করলে জুটবে শুধুমাত্র কিছু হাততালি। যাক তোমাকে এইসব বলে নিরুৎসাহ করব না। দেখি তো উইকেটের পেছনে তুমি কীভাবে স্টান্স নাও।"

কলাবতী ঘরের ফাঁকা জায়গায় গিয়ে উবু হয়ে বসে, দু'পায়ের ফাঁকে মেঝের ওপর দুই হাতের মুঠি ঠেকিয়ে রাখল ঠিক সেইভাবে টিভি-তে যেরকমটি দেখেছে দেশি ও বিদেশি উইকেটকিপারদের। মনা ভট্‌চায চোখ দুটো সরু করে ওর বসার ভঙ্গি দেখে বললেন, "নড়াচড়া চট করে করতে তোমার সুবিধে হয় এমনভাবে বসবে। পা দুটো অত কাছে রাখলে ডাইনে কি বাঁয়ে কুইক সরে যেতে পারবে না, দেরি হয়ে যাবে। আর ব্যাটিং-এর সময় যেমন স্টান্স নেয় তেমনই শরীরের ভর থাকবে পায়ের পাতার সামনের দিকে, গোড়ালি দুটোর ওপর ভর থাকলে ফুট ওয়ার্কে দেরি হয়ে যাবে। আচ্ছা এবার গ্লাভ্‌সে বল ধরাটা দেখি।"

কলাবতী দু'হাতের চেটো পাশাপাশি জড়ো করে দেখাল।

"আঙুলগুলো আর একটু ফাঁক করে বল জমানোর জায়গাটা বড় করো

আর একটা হাতের কড়ে আঙুলের ওপরে অন্য কড়ে আঙুলটা রাখলে বল গলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আঙুল কখনও বল রিসিভ করার সময় বলের দিকে উঁচিয়ে রাখবে না, গ্লাভ্‌স জোড়া পেতে রাখবে, বলটাকে গ্লাভ্‌সে আসতে দেবে, জমা পড়লে হাত পেছন দিকে টেনে নিয়ে বলটা জমতে দেবে।'' বলার সঙ্গে সঙ্গে মনা ভট্‌চায সোফায় বসেই যথাসাধ্য দেখালেন। ''তোমাকে কিন্তু প্যাড আর গ্লাভ্‌স পরে বাড়িতে দু'হাত দিয়ে বল ধরার জন্য ডাইনে-বাঁয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াটা প্র্যাকটিস করে যেতে হবে। প্রথমে ক্যাম্বিস কি রবারের বলেই কোরো, তারপর ক্রিকেট বলে।''

কলাবতী মন দিয়ে শুনল। রাজশেখর জানতে চাইলেন, ''মনা এই যে বললে যেটুকু শিখেছি দেখে দেখে। কাকে দেখে শিখেছিলে?''

''খোকনদাকে।''

কলাবতী জিজ্ঞেসা করল, ''কে খোকনদা?''

রাজশেখর জানালেন, ''প্রবীর সেন, ডাকনামেই সবাই চিনত। প্রথম বাঙালি যিনি টেস্ট ম্যাচ খেলেন তাও আবার অস্ট্রেলিয়ার ব্র্যাডম্যানের টিমের এগেনস্টে।''

কলাবতী এবার লক্ষ করল বাক্সে চন্দ্রপুলি তলানিতে এসে ঠেকেছে। দুই বুড়োই কথার সঙ্গে মুখ চালিয়ে গেছে। সে হাত বাড়িয়ে বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে বলল, ''মনাদাদুর জন্য এনে তুমি নিজেই শেষ করে দিচ্ছ, আর নয়।''

বিব্রত এবং লজ্জিত রাজশেখর বললেন, ''শুনলি না মনা বলল ওর ডায়বিটিসটা বেশির দিকে, তাই যাতে আর বেশির দিকে না যায় সেজন্য চন্দ্রপুলি কমিয়ে দিলুম। বাড়িতে তো খাবার লোক নেই।''

ফণী ঘোষ সমস্যায় পড়েছেন। বোধহয় মেয়েদের কোচিং করা আর সম্ভব নয়। ক্রিকেটের মতো খরচের খেলার জন্য প্রাথমিক যা-যা দরকার—বুট, ট্রাউজার্স, ব্যাটিং গ্লাভ্‌স, সম্ভব হলে নিজের ব্যাট এগুলো কিনে দেওয়ার মতো আর্থিক অবস্থা দু'-তিনজন ছাড়া কোনও মেয়ের পরিবারের নেই। প্রগতি সঙ্ঘ তাদের মাঠ ব্যবহার করতে দিচ্ছে, তিনটে স্টাম্প, পুরনো একজোড়া ব্যাটিং প্যাড, গ্লাভ্‌স, দুটো পার্চমেন্ট মোড়া ফাটা প্র্যাকটিস ব্যাট আর দুটো পুরনো ক্রিকেট বল, যা বহুবার ব্যবহারে নরম এবং ফুলে বড়

হয়ে গেছে, মেয়েরা পাঁচ আঙুলে ভাল করে ধরতে পারে না। প্রগতি সঙ্ঘের আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। সিনেমা শো, যাত্রাপালা, দুর্গাপুজোর সুভেনিরের বিজ্ঞাপন ও কয়েকজন ডোনারের টাকায় তাদের নেতাজি ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব এবং ফুটবল ও ক্রিকেট বিভাগ চলে। সিজনের সময় একজন পার্টটাইম মালি রাখা হয়। স্থানীয় কাউন্সিলারের বদান্যতায় দুর্গাপুজোর পর কর্পোরেশনের রোড রোলার এসে মাঠের মাঝখানটা রোল করে দেয়। সারা সিজন তাতেই চলে যায়। ম্যাচের দিন লাঞ্চের পাঁউরুটি-আলুর দম দেওয়া হয় কোয়ার্টার থেকে চাঁদা তুলে।

ক্লাবের সচিব তপন ওরফে তপা বাগচি পরিশ্রমী এবং কাটখোট্টা ধরনের মানুষ। একদিন ফণী ঘোষকে বললেন, "ফণীদা, মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা তুলুন। ওদের বলুন বিনা পয়সায় কিছু শেখা যায় না। ক্লাবই সব দেবে তা তো হয় না, স্কুলে পড়ার জন্য মাইনে দিতে পারে, ক্লাবে শেখার জন্য চাঁদাও দিতে হবে। ছেলেদের ব্যাট প্যাড গ্লাভ্স বেশিরভাগ মেয়েরই তো দেখছি ভারী হয়ে যাচ্ছে, ওরা তো ব্যাট তুলতেই পারছে না, প্যাড পরে ছুটতেও পারছে না। সবকিছুই একটু ছোট সাইজের কিনতে হবে, সেজন্য টাকার দরকার। যেমন-তেমন একজোড়া ব্যাট, দু'জোড়া করে প্যাড আর গ্লাভ্স কিনতেই তো আড়াই-তিন হাজার টাকা লাগবে । তার ওপর আছে বল। এতসব দেওয়া আমার ক্লাবের পক্ষে সম্ভব নয়, আপনি টাকা তুলুন, ডোনার খুঁজুন।"

ফণী ঘোষ অতঃপর স্থির করলেন যে-ক'টি মেয়ে এখনও আছে তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলবেন, চারশো টাকা করে প্রত্যেকের কাছে চাইবেন। চারদিন ধরে তিনি তিনজন বাবা, একজন দাদু, একজন মায়ের সঙ্গে কথা বললেন। বাবারা সোজা বলে দিলেন, দিতে পারবেন না। একজন বাবা বললেন, "ভেবে দেখি। ক্রিকেট খেলতে গিয়ে লেখাপড়ার কতটা ক্ষতি হবে সেটা তো আগে ভেবে দেখা দরকার।"

আর একজন বললেন, "প্রাইভেট টিউটরের মাইনে, তার ওপর ক্রিকেটের খরচ। না দাদা, পারব না।"

এক মা বললেন, "অত শক্ত বলে খেলা! সেদিন মেয়ের আঙুলে বল লাগল, আজ তিনদিনেও ভাল করে আঙুল বাঁকাতে পারছে না। কলম ধরতে পারছে না। না বাপু ক্রিকেট খেলে কাজ নেই তার থেকে বরং টেনিস মেনিস খেলা শেখাতে পারেন যদি তার ব্যবস্থা করুন। সেদিন টিভি-তে স্টেফিকে

দেখছিলুম, কী সুন্দর যে লাগছিল! আপনি ডোনেশনের জন্য ভাববেন না।"

দাদু বললেন, "ক্রিকেট খেলে কী হবে, মেয়েদের ক্রিকেটে কি টাকা আছে? চাকরি পাওয়া যাবে? ছেলেদের যত নাম বেরোয় কাগজে কই মেয়েদের নাম তো দেখি না? না মশাই, টাকাফাকা দিতে পারব না, যতটুকু শিখেছে তাই যথেষ্ট।"

অবশ্য একজন বাবা এককথায় দিতে রাজি হলেন, আর একজন বললেন, "জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে একটু টানাটানির মধ্যে পড়ে গেছি। বড় জামাইবাবুর বাইপাস সার্জারিতে অনেক টাকা দিতে হল। হাত এখন একদম খালি। তবে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে চার মাসে দিতে পারি।"

ফণী ঘোষ আর কোনও অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহ বোধ করলেন না। সকালে মেয়েরা মাঠে আসতে তিনি তাদের জড়ো করে বললেন, "ক্রিকেট কী করে খেলতে হয় সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা আশা করি তোমাদের হয়েছে। একদমই খেলতে জানতে না, এখন তবু ব্যাট ধরা, বল করা, ফিল্ড করাটা তোমরা শিখেছ। এটা হল ভিত। এর ওপর একতলা, দোতলা তৈরি করতে করতে উঁচু বাড়ি তৈরি করা। এজন্য আসল ক্রিকেট সরঞ্জাম নিয়ে আসল প্র্যাকটিস করে যেতে হবে। সেই জিনিসগুলো পেতে হলে টাকা দিয়ে কিনতে হবে, কিন্তু টাকা আমাদের নেই। আমি চেষ্টা করেছি টাকা জোগাড়ের। তা তো তোমরা জানোই। তোমাদের বাড়ি বাড়ি গেছি কিন্তু—" ফণী ঘোষ মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। তিনি নিজেও বিষণ্ণ বোধ করছেন। উৎসাহে টগবগ করা, খেলা শিখে বড় খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা উজ্জ্বল চোখগুলিকে ঝিমিয়ে যেতে দেখে তাঁর মন দুঃখে ভরে গেল।

মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল কলাবতীও। শুনে তারও মন খারাপ হয়ে গেল, শুধু টাকার অভাবে ক্রিকেট খেলার এই সুযোগটা, এত মেয়ের বন্ধুত্ব তাকে হারাতে হবে ভেবে। ক্রিকেট তো একা খেলা যায় না, একটা দল থাকতে হবে। দল না থাকলে তার খেলাও নেই। সেই দল গড়ে উঠছিল কিন্তু গড়ার মুখেই ভেঙে যেতে বসেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, "ফণীদা, কত টাকা হলে আমাদের আসল প্র্যাকটিস শুরু করা যাবে?"

ফণী ঘোষ মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে বললেন, "তিন হাজার হলেই এখন চলবে।"

কলাবতী আর কিছু জিজ্ঞেস করল না, শুধু ভ্রূদুটো একবার ওপরে তুলে, কী যেন ভাবল।

রাজশেখরের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে শুনেছিলেন ফণী ঘোষ। জিজ্ঞেস করলেন, "কালু, এখন রাজু কেমন আছে?"

"সেরে গেছেন, তবে বেশ দুর্বল। আজ বলছিলেন আসবেন, আমি বারণ করলুম। এতটা পথ হেঁটে আসার জন্য শরীরে যথেষ্ট জোর এখনও ফিরে পাননি।"

"আজ বিকেলের দিকে রাজুকে দেখতে যাব আর সেইসঙ্গে দেখে আসব তোমাদের বাগানে তুমি কীরকম উইকেটকিপিং প্র্যাকটিস করছ।"

সিংহিবাড়ি ও বাগান প্রায় দু'বিঘে জমিতে। কলকাতা শহরে এতবড় জমিসমেত বাড়ি খুব কমই আছে। বাড়িতে থাকেন মাত্র পাঁচটি লোক। আর সবই ঠিকে ঝি- চাকর। বাড়ির সঙ্গের বাগানটি অযত্নেই পড়ে ছিল এতদিন। কলাবতীর প্র্যাকটিসের জন্য ঝোপঝাড় কেটে, ইটকাঠ সরিয়ে রাস্তার দিকের পাঁচিলের কাছে চাঁপাগাছের ধারে প্রায় দশ বর্গফুট জমি থেকে জনমজুর লাগিয়ে কাঁকর বেছে তুলে ফেলে, বড় বড় ঘাস ছাঁটাই করে এবং জল ঢেলে মাটি দুরমুশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে ক্রিকেট পিচ বানানোর চেষ্টা হয়েছে। সেখানে দশটা বল পড়লে অন্তত তিনটে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে ছিটকে যাবে, দুটো লাফিয়ে বুকের কাছে আসবে, দুটো আসবে জমি ঘষড়ে। বাকি তিনটে আসবে ঠিক উচ্চতায়। এই পিচেই তিনটি স্টাম্প পুঁতে কলাবতী উইকেটকিপিং প্র্যাকটিস করে আসল ক্রিকেট বল দিয়ে। প্রথম দিন রাজশেখর নিজে আটটা লেগ ব্রেক বল করে হাঁফিয়ে পড়েন। আটটার মধ্যে চারটে কলাবতীর মাথার অনেক ওপর দিয়ে গিয়ে পাঁচিলে ঠকাস করে লাগে। বাকি চারটের মধ্যে দুটো রাজশেখরের থেকে পাঁচ হাত দূরে পিচ পড়ে তিনটে ড্রপ খেয়ে উইকেটকিপারের কাছে পৌঁছোয়। আর দুটো গালির দিকে যেতে যেতে চাঁপাগাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মারে।

মুরারি, অপুর মা কাছেই দাঁড়িয়ে 'কিরকেট' নামক এই অদ্ভুত খেলাটা দাদু ও নাতনি কেমন করে খেলে তাই দেখছিল। পাশে ছিল আর এক দর্শক, খয়েরি। ওদের শুনিয়ে লাজুক স্বরে রাজশেখর জানালেন, "নাহ্ শরীরটা দুর্বল লাগছে। পঁয়তাল্লিশ বছর খেলা ছেড়েছি তারপর ক্রিকেট বল তো আর

ছুঁইনি। ..... মুরারি পারবি বল করতে? যা, কালুদিদিকে প্র্যাকটিস দে।''

আদেশটা প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি মুরারি। সে শুধু দাঁত বার করে হেসে দাঁড়িয়ে রইল।

''মুরারি, কথাটা কানে গেল কি? বলটা নিয়ে এইভাবে কালুদিদির দিকে ছুড়ে ছুড়ে দিবি। ঠিক ওই জায়গাটায় যেন পড়ে।'' এই বলে রাজশেখর বলটা ঢিল ছোড়ার মতো জোরে ছুড়ে কলাবতীর প্রায় দশ ফুট সামনে ফেললেন। উইকেটের পেছনে উবু হয়ে বসা কলাবতী অফস্টাম্পের এক হাত বাইরে পরিচ্ছন্ন ভাবে কোলের কাছে বলটা গ্লাভ্‌সে জমিয়ে নিল।

''দেখলি তো, এইভাবে ছোড় ঠিক ওইখানটায়।'' রাজশেখর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কলাবতী বলটা গ্লাভ্‌সে ধরে বোলারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য উঁচু করে তুলে ছুড়ে দিয়েছে। বলটা রাজশেখরের দিকে না গিয়ে উঠল মুরারির মাথার ওপর। সে 'হাই হাই' বলে দু'হাত মাথার ওপর তুলল হরিনাম সংকীর্তন করার মতো। বলটা তার মাথার ওপর পড়ত কিন্তু পড়ল কাঁধে, সেখান থেকে ছিটকে খয়েরির পাশ দিয়ে যেতেই, খয়েরি তাড়া করে বলটা কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে লেজ নেড়ে যেতে লাগল।

কলাবতী হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকল, ''আয়, খয়েরি আয়, বলটা দে।''

বল মুখে নিয়ে খয়েরি ছুটে এল কলাবতীর কাছে। ওর মুখ থেকে ক্রিকেট বলটা বার করে নিয়ে কলাবতী সেটা গড়িয়ে দিয়ে ''ধর ধর'' বলে চেঁচিয়ে উঠল। খয়েরি বলের পেছনে ছুটল। বারো-চোদ্দো মিটার বলটা গেছে তখন গিয়ে বলটা মুখে ধরল যেভাবে সে তাড়া করে ইঁদুর ধরে বাগানে। বল মুখে সে ফিরে এল কলাবতীর কাছে। বলটা মুখ থেকে জমিতে নামিয়ে রেখে সে লেজ নাড়তে থাকল। লেজ নাড়াটা তার খুশির প্রকাশ। এখন সে একটু বাহবা চায়। অপুর মা ওর মাথা নেড়ে দিল।

উচ্ছ্বসিত কলাবতী বলল, ''দাদু, দেখো একটা ফিল্ডার পেয়ে গেছি।

সে বলটা এবার আলতো করে তুলে দিল দাদুর দিকে। রাজশেখর লুফলেন। খয়েরি ধরবে বলে ছুটে গেল বল অনুসরণ করে। বল না পেয়ে খয়েরি দু'-তিনবার ''ভৌ ভৌ'' করে ডেকে বলটা চাইল। রাজশেখর খয়েরির মাথা চাপড়ে দিলেন। ''কী রে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন!'' তিনি ধমক দিলেন মুরারিকে।

মুরারি দু'বার ঢোক গিলে, অপুর মা'র আঁচল চাপা মুচকে হাসা মুখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে রাজশেখরের হাত থেকে বলটা নিল।

চোখ সরু করে রাজশেখরের দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটার দিকে দশ সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলটা মিডিয়াম পেসে ছুড়ল। ঠিক জায়গাতেই পড়ে অফ কাটারের মতো লেগের দিকে বলটা প্রায় এক ফুট সরে গেল। কলাবতী বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে বলটা ধরে রাখতে না পারলেও থামিয়ে ফেলল।

রাজশেখর অবাক হয়ে বললেন, "আরে, মুরারি তো ভালই বলটা করল! নে, আবার কর।"

কত্তাবাবুর প্রশংসা শুনে মুরারির এক বুক শ্বাস নিয়ে ছাতি ফুলে গেল। প্রায় একই জায়গায় সে পরপর চারটে বল ফেলল। কলাবতী এবার সবকটাই গ্লাভ্‌সে ধরে রাখল। সে চেঁচিয়ে বলল, "দারুণ মুরারিদা, দারুণ। করে যাও, আরও করে যাও।"

মুরারি মুখ করুণ করে বলল, "কত্তাবাবু, এসব কাজ করা তো ওবোস নেই। কাঁধে ব্যথা লাগছে।"

রাজশেখর বললেন, "ব্যথা না হওয়ার ওষুধ দিচ্ছি, কালুদিদিকে যতবার বল করবি, প্রত্যেক বলের জন্য পাঁচ পয়সা করে পাবি। যা, এবার বল কর।"

মাথা চুলকে মুরারি বলল, "আজ্ঞে, ওটা ছ'পয়সা করুন।"

রাজশেখর একটুও না ভেবে বললেন, "ঠিক আছে। দিনে তা হলে ক'টা করে বল ছুড়বি?"

"চল্লিশ-পঞ্চাশটা তো পারবই।" মুরারি নিশ্চিত স্বরে বলল।

সন্ধেবেলায় অপুর মা জিজ্ঞেস করল মুরারিকে, "চল্লিশ-পঞ্চাশটা বল ছুড়ে ক'পয়সা পাবে মুরারিদা?"

মুরারি বলল, "সে মেলা পয়সা, হিসেব না করে বলতে পারব না।"

"তুমি তো দেখছি ভাল বল ছুড়তে পারো।"

"পারব না কেন! ছেলেবেলায় ঢিলিয়ে কত আম পেড়েছি জানিস? এক টিপে এক-একটা আম পড়ত!"

এরই চারদিন পর ফণী ঘোষ সকালে কলাবতীকে বলেন, "আজ বিকেলের দিকে রাজুকে দেখতে যাব।" তিনি বিকেলে সিংহিবাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকেই দেখলেন রাজশেখর একটা টুলে বসে তার পাশে গলায় বকলশ দেওয়া একটা খয়েরি কুকুর সামনের দু'পা জমিতে ছড়িয়ে বসে, ধুতি আর গেঞ্জি পরা একটি কাঁচাপাকা চুলের লোক ক্রিকেট বল ছুড়ছে কলাবতীকে। তিনটে স্টাম্পের পেছনে গ্লাভ্‌স আর প্যাডে সজ্জিত ট্রাউজার্স পরা কলাবতী

বল ধরতে ডান দিকে ঝাঁপাল। ফণী ঘোষ আর না এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দূর থেকেই দেখার জন্য।

রাজশেখরের হাতে ফর্দের মতো লম্বা কাগজ আর কলম। মুরারি একটা করে বল ছুড়ছে আর ফর্দে তিনি টিক দিচ্ছেন। তেরো নম্বর টিক দিয়েছেন যখন কলাবতী চেঁচিয়ে উঠল, "দাদু দেখো দেখো কে এসেছেন!"

রাজশেখর মুখ ফিরিয়ে দেখে বললেন, "আরে ফণী, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, এসো এসো। কেমন দেখছ বলো।"

ফণী ঘোষ কাছে এসে বললেন, " কালু তো ভালই কালেক্ট করছে। তবে একটা মুশকিল কী জানো রাজু, ম্যাচে যখন কিপ করবে তখন তো সামনে ব্যাট হাতে একজন থাকবে। তখন কিন্তু কিপিংটা এমন সোজা ব্যাপার হবে না। কিন্তু তোমার এখানে তো কারুর ব্যাট করা সম্ভব নয়, ওকে এবার মেয়েদের ভাল ক্লাবে দিতে হবে যেখানে সত্যিকারের প্র্যাকটিস হয়।"

"মেয়েদের ক্লাব! কোথায় পাব?" রাজশেখরকে অসহায় দেখাল। তারপরই তাড়া দিলেন মুরারিকে। "হাঁ করে কথা গিলছিস কী? বল ছোড়। অপুর মা এটা ধরো।" রাজশেখর বল ছোড়ার ফর্দ আর কলমটা ওর হাতে দিয়ে বললেন, "যেভাবে টিক দিয়েছি, গুনে গুনে সেইভাবে দিয়ে যাও। আমি বৈঠকখানায় যাচ্ছি।"

ফণী ঘোষকে নিয়ে রাজশেখর বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

"ঠিক করে টিক দিবি।" মুরারি হুঁশিয়ার করে দিল অপুর মাকে। একটা বড় কাজের দায়িত্ব পেয়ে অপুর মা'র মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। মুরারি একটা করে বল ছোড়ে আর বলে, "টিক মার।" অপুর মা একটা টিক দেয় দুটো বল ছোড়ার পর।

আধঘণ্টা পর কলাবতী ফিরল। তখন ফণী ঘোষ বলছেন, "ধুপুদের ক্লাবটা ভাল। টাকাকড়িও আছে, নইলে নেট খাটিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারে? এই যে কালু, শোনো তুমি ধুপুদের ক্লাবে জয়েন করো। প্রগতি সঙ্ঘে থাকলে তোমার কিছু হবে না। উইকেট কিপিং-এ তোমার একটা সহজাত ঝোঁক মানে—" বোঝাবার জন্য সঠিক কথাটা তিনি খুঁজতে শুরু করলেন।

রাজশেখর বললেন, "সহজাত দখল আছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি দেখছিলুম ওর বডি মুভমেন্ট। এটা তো কেউ ওকে শেখায়নি কিন্তু ঠিক বলের লাইনে মুভ করছিল।" ফণী ঘোষ তারিফের ভঙ্গিতে চোখ বুজে মাথা হেলালেন।

রাজশেখর বললেন, " কালু, ফণী আজ প্রথম এল, মিষ্টিমুখ তো করাতে হবে।"

কলাবতী মুখ টিপে হেসে জানাল, "মুরারিদাকে আমি বলে দিয়েছি।"

সিংহিবাড়ির দুটো ফ্রিজ সবসময়ই ভরতি থাকে মরসুমি ফল আর নানাবিধ মিষ্টান্নে। একটু পরেই ট্রে হাতে মুরারি এল। প্লেট ভরা কাটা ল্যাংড়া আম আর কড়াপাকের সন্দেশ।

"চা দেব না লস্যি?" মুরারি রাজশেখরের কাছে জানতে চাইল।

"লস্যিই দিক।" রাজশেখর অনুমোদনের জন্য ফণী ঘোষের দিকে তাকালেন, মাথা হেলিয়ে তিনি সম্মতি জানালেন।

পরদিন স্কুলে টিফিনের সময় কলাবতী খুঁজে বার করল ধুপুকে। "তোর সঙ্গে একটা কথা আছে, চালতাতলায় আয়।" স্কুলের উঠোনে একটা চালতাগাছ আছে, তার গুঁড়ি ঘিরে সিমেন্টের রক। সেটাই চালতাতলা।

দু'জনে এসে রকে বসল। কলাবতী টিফিন বক্স খুলে ধুপুর সামনে ধরে বলল, "নে তোল।" ধুপু খুঁটিয়ে দেখে সিদ্ধ ডিমটা তুলে নিয়ে আধখানা কামড়ে চিবোতে চিবোতে বলল, "বল এবার।"

ভণিতা না করে কলাবতী বলল, "তোদের ক্লাবে ভরতি হব, উইকেটকিপিং প্র্যাকটিস করব।"

ধুপু বলল, "আমাদের ক্লাবে একজন উইকেটকিপার আছে।"

"দু'জন থাকলে অসুবিধে হবে কি? একজন যদি কোনও কারণে না খেলতে পারে?" কলাবতী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

ধুপু ভ্রূ কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত ভেবে বাকি ডিমটা মুখে পুরে বলল, "আমাদের সেক্রেটারি ইন্দুদিকে জিজ্ঞেস করে পরশু তোকে বলব। তুই বলটল ধরতে বা থামাতে পারিস তো?

"আজ বিকেলে আয় না আমাদের বাড়িতে, তোকে দেখিয়ে দেব বল ধরতে পারি কি না। আর কিছু খাবি না?" কলাবতী টিফিন বক্সটা আবার এগিয়ে ধরল। ধুপু ইতস্তত করে চমচমটা তুলে নিল।

বিকেলে কলাবতী বাগানে মুরারির ছোড়া বল ধরছে। টুলে বসে রাজশেখর, তার পাশে খয়েরি। অপুর মা অনুপস্থিত। সে তখন বাড়ির মধ্যে বাসন মাজার ঠিকে কাজের লোকের সঙ্গে কী একটা ব্যাপারে হেস্তনেস্ত করায় ব্যস্ত। তখন ধুপু এল। ফটক দিয়ে ঢুকে এধার-ওধার তাকিয়ে কলাবতীকে চোখে পড়তেই এগিয়ে গেল। খয়েরি এগিয়ে এসে ধুপুর জুতো শুঁকল। একটা হাই তুলে

আগের জায়গায় ফিরে এল।

"দাদু, এই আমার বন্ধু ধুপু, ভাল নাম ধূপছায়া। ব্যাটে ওপেন করে। দাদুর কথা তো তোকে বলেইছি।"

ধুপু বলল, "বাহ্, প্র্যাকটিসের তো ভাল ব্যবস্থা। গ্লাভ্স প্যাড সবই নিজের! দেখি তো কেমন ফিল্ড করিস।" এই বলে ধুপু মুরারির কাছ থেকে বলটা চেয়ে নিল। কলাবতী উইকেটের পেছনে গেল। খুবই স্লো লেগব্রেক কিন্তু বল ভালই ঘুরল জমি থেকে। দুটো স্টাম্পে লাগল। চারটে মিড্‌ল স্টাম্প থেকে অফের দিকে গেল, কলাবতী ধরল এবং লেগ স্টাম্পের বাইরের তিনটেও।

চমৎকৃত ধুপু বলল, "বাহ্, তুই তো সবকটা বলই ধরলি! ধরে আবার স্টাম্পও করলি। শিখলি কোত্থেকে?"

"টিভিতে দেখে দেখে উইকেটকিপারের কাজটা বুঝে গেছি, তারপর প্র্যাকটিস।" কলাবতী হাসতে শুরু করল। "কী রে, আমাকে দিয়ে তোদের চলবে?"

"সেটা ঠিক করবেন বাবুদা, ভাল নাম সুবীর ব্যানার্জি। রঞ্জি ট্রফি খেলেছেন, এখন আমাদের কোচ। আমাদের নেট হয় একদিন অন্তর দু'বেলা এক ঘণ্টা করে, কাল হবে সকাল সাতটায় আর বিকেল চারটেয়, তারপর আবার তরশু হবে। ছুটির দিনে একবেলা সকালে তিন ঘণ্টা হয়। আমি কালই সেক্রেটারিকে বলব, হাসিদির একজন বদলি থাকা দরকার।"

কলাবতী জিজ্ঞেস করল, "হাসিদি কে?"

"আমাদের উইকেটকিপার। থাকে বাগুইহাটিতে। তুই আয়, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, খুব ভাল মেয়ে।"

পরদিন স্কুল শুরুর আগে কলাবতী অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে স্কুলের ফটকে অপেক্ষা করছিল ধুপুর জন্য।

"কী বললেন, ইন্দুদি?" কলাবতী শ্বাস বন্ধ করে ধুপুর দিকে তাকিয়ে ওর মুখভাব লক্ষ করে যেতে লাগল। মুখটা গম্ভীর লাগছে যেন। ধুপু না দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

"বল কী বললেন?" কলাবতী হাত চেপে ধরে ধুপুকে থামাল।

"বললেন পরশু সকালে যেতে, তোকে দেখবেন।"

হতভম্ব কলাবতী বলল, "দেখবেন? আমাকে দেখে কী হবে!"

"বাঃ, দেখবেন না, তুই ব্যাকস্টপার না সত্যিকারের উইকেটকিপার?"

"আমি তো এখনও উইকেটকিপারই হইনি। ভাল করে শেখার জন্য ভাল বোলারদের বলে প্র্যাকটিস করতে চাই ভাল উইকেটে। দেখেছিস তো আমাদের বাগানে কীরকম এবড়োখেবড়ো জমিতে কীরকম বোলিং-এ শিখি। এই বিদ্যে নিয়ে কি উইকেটকিপিং পরীক্ষায় পাশ করা যায়!" কলাবতীকে নিরুৎসাহ দেখাল।

ধুপু ওর কাঁধে হাত রেখে শান্ত নরম স্বরে বলল, "এটাকে ক্লাসের পরীক্ষা ভাবছিস কেন, স্কুলে ভরতি হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দিতে হয় এটা সেইরকম। আমাকেও দিতে হয়েছিল। অনেক এলেবেলে আসে তো, সবাই বলে দারুণ ব্যাট করি, দুর্দান্ত বল করি। বাবুদা তাদের এক ওভার দেখে নিয়েই ইন্দুদিকে বলে দেন, 'এর কোনওকালে হবে না', কারুর সম্পর্কে বলেন, 'তিন বছর রগড়ালে যদি কিছু হয়', কিংবা বলেন, 'এই মেয়েটার ক্রিকেট সেন্স আছে, একে রেখে দিন, খাটলে দাঁড়িয়ে যেতে পারে।' বাবুদা একজন উইকেটকিপার চাইছেন, যে হাসিদির স্ট্যান্ডবাই থাকবে।"

"তোর কথা শুনে তো ভয় লাগছে, যদি বাবুদা বলে দেয় এর কোনওকালে কিসসু হবে না কিংবা তিন বছর রগড়াতে হবে!"

"তা বলে দিতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষায় না নেমেই তুই ধরে নিচ্ছিস কেন ফেল করবি? কাল ঠিক সকাল সাড়ে ছ'টায় তোদের বাড়ির সামনের বাসস্টপে দাঁড়াবি, আমি এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ব্যাট গ্লাভ্‌স প্যাড নিতে ভুলিসনি।"

ধুপু ক্লাসে চলে গেল, কলাবতীও। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে অন্যদিনের মতো মুরারির ছোড়া বল ধরার প্র্যাকটিসে সে নামল না। তার বদলে বাগানে ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়াম আর পাঁচশো স্কিপিং করল দড়ি দিয়ে। দাদুকে বাড়ি ফিরেই বলেছে সকালে সল্টলেকে যাবে পূর্ব কলকাতার নেটে পরীক্ষা দিতে। রাতে খাবার টেব্‌লে রাজশেখর ছেলেকে বললেন, "সতু কাল সকালে তোর একটা কাজ আছে, কালুকে সল্টলেকে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবি, ও পরীক্ষা দিতে যাবে।"

সত্যশেখর অবাক হয়ে বলল, "পরীক্ষা! কীসের?"

"উইকেটকিপিং-এর। এ-কে ব্লকের পার্কে পূর্ব কলকাতার নেট পড়ে, সেখানে কালু পরীক্ষা দিতে যাবে, সাড়ে ছ'টায় বেরোবে।"

সত্যশেখর বলল, "সল্টলেকের রাস্তা আমার গুলিয়ে যায়, ব্লক-ট্‌লকও আমি চিনি না। ওখানে তো জলের ট্যাঙ্কের নম্বর দিয়ে পাড়া চিনতে হয়।"

কলাবতী বলল, "ধুপু চেনে। ও সঙ্গে যাবে।"

মাঝরাত পর্যন্ত কলাবতী বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করল। তার মাথায় শুধু ঘুরছিল কথাগুলো 'এর কোনওকালে হবে না হবে না হবে না।' স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার দিনও সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, এমন অস্থির কখনও হয়নি। অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়িটা সাড়ে পাঁচটায় তার ঘুম ভাঙিয়ে না দিলে হয়তো সে সাতটা পর্যন্ত ঘুমোত।

সত্যশেখর চা খেয়ে গাড়ি বার করল ঠিক সাড়ে ছ'টায়। ভোজনপটু, অলস কাকাকে শর্টস, কেড্‌স আর টি-শার্ট পরা দেখে কলাবতী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, তুমি দৌড়োবে নাকি?"

"ভাবছি একটু ছুটলে টুটলে কেমন হয়। খিদেটা একটু বাড়ে তা হলে। কাল পাঁচু রায় হাইকোর্টের বার লাইব্রেরিতে আমাকে কুলপি মালাই খাওয়ার চ্যালেঞ্জ দিল, বলল দু'ঘণ্টার একটা সেশনে ও নাকি পনেরোটা খেয়েছে বড়বাজারের কোন এক দোকানে। নে ওঠ।"

পাশবালিশের খোলের মতো একদিকে দড়ি লাগানো একটা কাপড়ের থলিতে ব্যাট প্যাড গ্লাভ্‌স ইত্যাদি নিয়ে কলাবতী গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে তখন লেজ তুলে ঘৌ ঘৌ করে ডাকতে ডাকতে ফিটনের ঘর থেকে ছুটে এল খয়েরি। ওর গলা জড়িয়ে আদর করে কলাবতী বলল, "এখন যা, আমি বেরোব।" খয়েরি শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু লেজ নেড়ে যেতে লাগল।

"লোমগুলোয় চেকনাই ধরেছে, কালু তোর কুকুরটা দেখছি বেশ তাগড়াই হয়েছে, খুব খাওয়াচ্ছিস!" সত্যশেখর মন্থর গতিতে গাড়িটাকে ফটক থেকে বার করার সময় বলল।

"কুকুর নয় কাকা, ওর একটা নাম আছে।" গম্ভীর মুখে কলাবতী বলল, খয়েরিকে কেউ কুকুর বললে তার রাগ হয়। "আমরা যা খাই, ডাল ভাত তরকারি, খয়েরিও তাই খায়। ওর জন্য আলাদা করে কিছুই কেনা হয় না। ও তো বিলিতি মেমসাহেব নয়। ওই যে ধুপু দাঁড়িয়ে।"

একটা ব্যাট হাতে নিয়ে সাদা ট্রাউজার্স পরা ধুপু বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটা ওর সামনে এসে দাঁড়াতে অবাকই হল।

কলাবতী বলল, "উঠে আয়, কাকার খিদে হচ্ছে না তাই একটু ছুটতে যাবে।"

"ভালই হল।" গাড়িতে উঠে ধুপু বলল, "একটু আরাম করে আজ যাওয়া যাবে।"

সকালে রাস্তা ফাঁকাই। গাড়ি সাত-আট মিনিটেই পৌঁছে গেল এ-কে ব্লকের পার্কে। কোমর সমান উঁচু পাঁচিলে সারা পার্কটা ঘেরা। মাঠে কোনও লোক নেই। ওরা ছোট লোহার ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকল। মাঠের একধারের পাঁচিলের দিকে কুড়ি গজের একটা জালকে লম্বা করে ছড়িয়ে বাঁশে বেঁধে দাঁড় করানো।

কলাবতী বলল, ''আমরা একটু আগেই এসে পড়েছি। ধুপু নেটটা এভাবে খাটানো কেন রে?''

ধুপু বলল, ''বাবুদা ব্যাট্‌সম্যানের দু'ধারে নেট রাখতে চান না। বলেন, যেভাবে ম্যাচে খোলা মাঠে ব্যাট করবে, বল করবে, উচিত নেটেও সেইভাবে খেলে যাওয়া। ফাইন লেগ থেকে থার্ডম্যান পর্যন্ত জাল, বল ফসকালে জালে আটকে যাবে।''

জালের চার-পাঁচ গজ সামনে স্টাম্প পোঁতার গর্ত আর পপিং ক্রিজ চুন দিয়ে দাগানো। কলাবতী দেখল মাটির মসৃণ পিচ, তাতে ঘাস নেই। একটি-দুটি করে মেয়েরা এসে পৌঁছোতে শুরু করল। মাঠটাকে পাক দিয়ে মন্থর গতিতে তারা যখন ছুটছে ধুপু বলল, ''কালু দাঁড়িয়ে থাকিসনি, আয়।'' কলাবতী ওদের সঙ্গে যোগ দিল।

সত্যশেখরও তার খিদে-বাড়াবার-দৌড় মেয়েদের পঞ্চাশ মিটার পেছনে থেকে শুরু করে দিল। একটা পাক শেষ হতে দেখা গেল মেয়েদের থেকে তার ব্যবধান সত্তর মিটার, দেড় পাক সম্পূর্ণ হওয়ার সময় সেটা দাঁড়াল প্রায় একশো মিটারে, অবশেষে সত্যশেখর হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল। কলাবতী নজরে রেখেছিল কাকাকে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, ''কাকা; চ্যালেঞ্জ নিতে হলে আর একটা রাউন্ড দিতে হবে।'' শুনেই সত্যশেখর ছোটা শুরু করে দশ পা গিয়েই হাঁটতে লাগল।

ইন্দুদি অর্থাৎ ইন্দিরা বসাক মাঠে এলেন, উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ ফুট, ওজন কম করে আশি কেজি, ঘোর কৃষ্ণ গায়ের রং, বয়স চল্লিশের মাঝামাঝি। চোখে চশমা, মিষ্টি মুখশ্রী। তাঁর পেছনে চাকরের পিঠে বড় একটা ক্যানভাসের খোল, তাতে আছে প্র্যাকটিসের জন্য ব্যাট, প্যাড, স্টাম্প, গ্লাভ্‌স আর বল।

''ধুপু ইনি কে রে?''

''ইন্দুদি, আমাদের ক্লাবের সব খরচ ইনিই দেন, কাছেই থাকেন। গিয়ে একটা প্রণাম কর।''

কলাবতী পায়ে পায়ে ইন্দুদির সামনে গিয়ে বলল, ''আমার নাম কলাবতী

সিংহ। আমাকে আপনি আসতে বলেছেন, আমি উইকেটকিপিং প্র্যাকটিস করব।'' এই বলে সে প্রণাম করল। ইন্দুদির মুখে প্রসন্নতার ছায়া ভেসে উঠল।

''ভাল কথা, প্র্যাকটিস করো, আমাদেরও একজন সেকেন্ড উইকেটকিপার দরকার।'' ইন্দুদির কণ্ঠস্বর তাঁর মুখের মতোই মিষ্টি। ''তোমার উইকেটকিপিং গ্লাভ্স, প্যাড আছে?''

''সঙ্গে করে এনেছি।''

''রেডি হয়ে নাও।'' ইন্দুদি একটি মেয়েকে বললেন, ''সাবিনা প্যাডআপ।'' তিনি চারটে বল গড়িয়ে দিলেন চারটি মেয়ের দিকে। বাকি মেয়েরা ছড়িয়ে দাঁড়াল ফিল্ড করার জন্য।

কলাবতী প্যাড আর গ্লাভ্স পরে তিনটে স্টাম্পের পেছনে দাঁড়াল, সামনে সাবিনা। তার বুকের মধ্যে দুরুদুরু কাঁপন শুরু হয়ে গেছে, উবু হয়ে উইকেটের কতটা পেছনে বসতে হবে বুঝতে পারছে না। যে বল করবে সে কী ধরনের বোলার— পেসার না স্পিনার সে জানে না। সাবধান হওয়ার জন্য সে উইকেট থেকে প্রায় দু'গজ পিছিয়ে দাঁড়াল, প্রথম বোলারটি বল করল ফ্লাইট করিয়ে, অফ স্পিনার, অফ স্টাম্পের দেড় ফুট বাইরে, সাবিনা স্কোয়ার কাট করতে গেল, ব্যাট বলে লাগল না, বলটা স্পিনও করেনি, ব্যাটের তলা দিয়ে এসে দ্বিতীয়বার পিচ খেল কলাবতীর দেড় গজ সামনে। সে তড়িঘড়ি সামনে ঝাঁপিয়ে ধরতে গিয়ে ফসকাল। উঠে দাঁড়িয়ে সে আড়চোখে ইন্দুদির দিকে তাকাল। মুখে একচিলতে হাসি ফুটে রয়েছে দেখে সে বোঝার চেষ্টা করল হাসিটা সহানুভূতির না হতাশার।

এবার সে এগিয়ে গিয়ে স্টাম্পের পেছনে বসল। মেয়েটি দশ কদম ছুটে এলে বল করল। সাবিনার লেগের দিকে পিচ পড়ল। বলটা বেশ জোরেই এসেছে এবং ওভারপিচ। সাবিনা ব্যাট চালাল কিন্তু বলে তা লাগল না। কলাবতী বাঁ হাত বাড়াল বলটা ধরতে বা থামাতে। সে দেখল হুস্‌স করে বলটা বেরিয়ে গেল গ্লাভ্সের পাশ দিয়ে। অপ্রতিভ হয়ে সে জালের নীচে পড়ে থাকা বলটা কুড়িয়ে আনতে গেল।

''উইকেটের অত কাছে থাকলে তো ফসকাবেই।''

জালের ওধারে দাঁড়িয়ে থাকা যে লোকটি কথাগুলো বলল কলাবতী তাকে এই প্রথম দেখল।

''কে কী ধরনের বোলার তা তো আমি জানি না।'' কলাবতী কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে বলল।

"আজ প্রথম?"

"হ্যাঁ।"

লোকটি জালের এধারে আসার জন্য হাঁটতে শুরু করল। ফরসা গায়ের রং, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। নাতিদীর্ঘ, দোহারা, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পরনে সবুজ টি-শার্ট সাদা টাউজার্স ও স্নিকার। কলাবতীর মনে হল, ইনিই বোধহয় সেই বাবুদা।

বোলারদের কাছে গিয়ে বাবুদা দুটি মেয়ের কাছ থেকে বল চেয়ে নিয়ে অন্য দুটি মেয়েকে দিলেন। তারপর চেঁচিয়ে কলাবতীকে বললেন, "সবাই মিডিয়াম পেসে বল করে।" শুনে সে এবার চার গজ পিছিয়ে গেল। মনে মনে বলল, কপিলদেব তো আর নয়, কত জোরে আর বল করবে!

সাবিনা আবার ব্যাট নিয়ে দাঁড়াল, একটা বল পিছিয়ে এসে আটকাল, পরেরটা পুল করল, তৃতীয়টা ফুলটস, কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল কলাবতীর দু'গজ সামনে, সে বলের লাইনে সরে এসেছিল। পিচ পড়ে বলটা লাফিয়ে তার কপালে লেগে ছিটকে উঠল। 'ঠকাস' একটা শব্দ হল। ছুটে গেল সাবিনা, ইন্দুদি, ধুপু ও বাবুদা।

কপাল ফাটেনি, রক্ত বেরোয়নি, আঘাতের জায়গাটা ফুলে উঠেছে, একটা টনটনে ব্যথা শুরু হয়েছে কিন্তু এটা ছাপিয়ে কলাবতীর শুরু হল লজ্জা পাওয়ার যন্ত্রণা। কী ভাবছে সবাই! বড় প্লেয়ারের মতো সাজগোজ করে নেমে শেষে কিনা বলই ধরতে পারল না। চাল মারতে ক্রিকেট খেলছে। সবাই মুখে আহা উহু করবে কিন্তু মনে মনে নির্ঘাত মুচকি হাসবে। প্রথম দিনে চার-পাঁচটা মাত্র বল হতেই এই লজ্জায় ফেলে দেওয়ার মতো ব্যাপারটা ঘটে গেল, তাও যদি একটা বলও সে ঠিকমতো ধরতে পারত!

ইন্দুদি আলতো করে কপালে আঙুল বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "লাগছে?"

কলাবতী মুখে হাসি টেনে মাথা নাড়ল, "একটুও না।"

বাবুদা বলল, "আজ থাক, আর উইকেটের পেছনে গিয়ে কাজ নেই।"

"না, না, আমি ঠিক আছি, একটু-আধটু তো ক্রিকেট খেলতে গেলে লাগবেই।" কলাবতী তাচ্ছিল্য দেখিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল। কপালে টনটনে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। কিন্তু সে ঠিক করেই ফেলেছে লজ্জা নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে না।

ধুপু এসে ফিসফিস করে বলল, 'তোর কপালে তো একটা ছোট্ট আলু

ফলেছে রে! কালু, আজ তুই চলে যা।''

''না।'' কঠিন গলায় কথাটা বলে কলাবতী উইকেটের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ইন্দুদি একটি মেয়েকে বললেন, ''দৌড়ে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে এসো।'' বাবুদা আগাগোড়া কলাবতীর ভাবভঙ্গি লক্ষ করে যাচ্ছিল। বলল, ''ঠিক আছে, তুমি কিপ করো।'' সত্যশেখর দূরে বসে ছিল ঘাসের ওপর। ভাইঝিকে ঘিরে একটা জটলা দেখে সে অবাক হয়ে উঠে পড়ল। কিন্তু আবার কলাবতী উইকেটের পেছনে যাওয়াতে সে বসে পড়ল।

সাবিনা ব্যাট হাতে ক্রিজে স্টান্স নিল। কলাবতী অনেকটা পিছিয়ে দাঁড়াল। অফস্টাম্পে বল, সাবিনা ড্রাইভ করল, ব্যাটের কানায় লেগে বল সেকেন্ড স্লিপের দিকে যাচ্ছে। কলাবতী ডান হাত বাড়িয়ে ঝাঁপাল এবং একবার জমিতে শরীরটা গড়িয়ে বল হাতে নিয়ে উঠল। বলধরা হাতটা তুলে চেঁচিয়ে উঠল, ''হাউস দ্যাট!''

ধুপু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। ইন্দুদির মুখ ভরে গেল হাসিতে। বাবুদা নীচের ঠোঁট কামড়ে মাথা নেড়ে যাচ্ছে। আর কলাবতীর সারা দেহ গরম হয়ে উঠেছে লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠায়। তার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছে একটা কথাই, ''দেখিয়ে দিতে হবে, দেখিয়ে দিতে হবে।''

এর পর সে আরও কয়েকটা বল ধরল এবং ফসকালও। মেয়েটি একটা রুমালে বেঁধে বরফ এনেছে। কলাবতী সেটা কপালে ঘষল। চারজনের ব্যাটিং হয়ে যাওয়ার পর বাবুদা বলল, ''ব্যাট করতে পারবে?''

''পারব।''

নিজের থলি থেকে ব্যাট আর ব্যাটিং গ্লাভ্‌স বার করে নিয়ে কলাবতী ক্রিজে এল। মাথার মধ্যে এখনও আগুন জ্বলছে। উইকেটকিপারকে ব্যাটটাও করতে হয়। যার বল তার কপালে লেগেছে সে প্রথমেই তাকে বল করতে এল। অফ স্টাম্পে শর্ট পিচ। একটু পেছনে হেলে মারার জন্য জায়গা করে নিয়ে কলাবতী কাট করল। বল গেল গালির দিকে। পরের বলটাকে প্রচণ্ড আক্রোশে এক পা বেরিয়ে গিয়ে তুলে দিল বোলারের মাথার ওপর দিয়ে। পরের বলটারও একই অবস্থা হল। চতুর্থ বলটাকে পুল করল, একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েও হাত টেনে নিল। সে ষোলোটা বল খেলল, ষোলোটাই তার মার মার করা ব্যাটের ধাক্কায় মাঠের সর্বত্র ছিটকে ছিটকে গেল, একটা বল গেল পয়েন্টে যেখানে সত্যশেখর বসে ছিল। সে বলটা কুড়িয়ে ছোড়ার জন্য হাতটা তুলে বুঝল বলটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারবে

না। বল হাতে সে বোলারের কাছে এসে আলতো করে ছুড়ে দিল।

"সতু না?" বাবুদা চোখ কুঁচকে বলল, "তাই বলি! কুমড়োর মতো বসে থাকা লোকটাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল! এখানে কী করতে?"

"আমি কিন্তু অনেকক্ষণ আগেই তোকে চিনতে পেরেছি। ওই মেয়েটা, যে তোর বোলারদের ছাতু করছে, আমার ভাইঝি।" সত্যশেখর ক্রিজে থাকা কলাবতীর দিকে আঙুল তুলল।

"তোর ভাইঝি!" বাবুদার গলায় সুস্পষ্ট অবিশ্বাস। "এমন একটা অ্যাথলিট মেয়ে তোর ভাইঝি? বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"বিশ্বাস না হয় তুই মলুকে জিজ্ঞেস করিস, ওর স্কুলেই পড়ে।"

"মেয়েটার দিকে নজর রাখিস, দারুণ সম্ভাবনা আছে। বহু বছর পর তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এখনও আগের মতো খাচ্ছিস?" বাবুদা সত্যশেখরের পেটে হাত বোলাল।

"কুড়ি বছর পর দেখা আর অমনই খাওয়ার কথা! তোর কি আর কিছু মনে পড়ে না?" অভিযোগের সুরে সত্যশেখর বলল।

"মনে পড়বে কী করে, তোর সঙ্গে শেষ দেখা তো মামিমার, মানে মলুর মা'র শ্রাদ্ধে। তোর পাশে খেতে বসেছিলুম নিয়মভঙ্গের দিন, তখন দু'জনেই কলেজে পড়ি। খাওয়া শেষ হওয়ার পর তুই বাজি ধরলি তিরিশটা রাজভোগ খাবি, প্রত্যেকটার জন্য দশ পয়সা। তিনটে টাকা আদায় করে ছেড়েছিলি। দেখ দেখ, তোর ভাইঝি চালাচ্ছে কেমন। কপালে একটা বল ভালই লেগেছিল কিন্তু বসে যায়নি। মেয়েটা খুব রোখা।" বাবুদার স্বর তারিফে ঘন হয়ে উঠল। "ওর নাম কী?"

"কলাবতী। কালু বলে ডাকি। তুই থাকিস কোথায় রে?"

"এই তো বি-জে ব্লকে। আয় না একদিন।"

ঠিক আটটায় প্র্যাকটিস শেষ হল। বিদায় নেওয়ার সময় বাবুদা কলাবতীকে বলল, "তুমি কিন্তু রেগুলার এসো। বিকেলের প্র্যাকটিসে আসতে যদি বেরোতে দেরি হয় তা হলে মলুকে বলে তোমাকে লাস্ট পিরিয়ডে ছুটির ব্যবস্থার চেষ্টা করব, ধুপুর জন্যও।"

ইন্দুদি বললেন, "তোমার কিট্‌সগুলো এখানেই রেখে যাও, রোজ রোজ বয়ে আনবে কেন! কপালটা বড্ড ফুলেছে, বাড়িতে গিয়ে বরফ দিয়ো।"

ফিরে আসার সময় কলাবতী জিজ্ঞেস করল, "কাকা তুমি বাবুদাকে চেনো?"

"চিনব না? ও তো মলুর পিসতুতো ভাই, মলুদের কলকাতার বাড়িতে থেকেই তো কলেজে পড়েছে।"

ধুপুকে বাসস্টপের কাছে নামিয়ে দিয়ে ওরা বাড়ি ফিরল। প্রতিদিনের মতো কলাবতী রান্নাঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "খয়েরিকে দুধ দিয়েছ অপুর মা?"

থোড় কাটতে কাটতে ঝাঁঝিয়ে উঠল অপুর মা, "না দিইনি, অপুর মা নিজেই সব গিলেছে।" এরপর মুখ তুলে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোখ স্থির হয়ে গেল। "কপালে তোমার ওটা কী কালুদি?"

"কিছু না, বল লেগেছে।"

"ওম্মা গো, এ কী কাণ্ড গো।" প্রায় মড়াকান্নার মতো চিৎকার করে উঠল, অপুর মা। ঠিকে ঝি, চাকররা, মুরারি, এমনকী দোতলার বারান্দায়ও রাজশেখর ছুটে এলেন। সবার মুখে এক কথা, "কী হল, কী হয়েছে অপুর মা?"

"ওই দ্যাকো।" আঙুল তুলে সে কলাবতীর কপালটা দেখাল।

সবাই দেখল, ঠিকে ঝি বলল, "মাথাটা কোথাও ঠুকেটুকে গেছল হয়তো, জলপটি দাও।" এই বলে সে কাপড় কাচতে কলঘরে চলে গেল।

"চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দাও গো অপুর মা।" মুরারি বিজ্ঞের মতো বলল।

"হয়েছে কী?" উদ্বিগ্ন স্বর রাজশেখরের, "কালু ওপরে আয়।"

কলাবতী ওপরে এসে বলল, "কিসসু হয়নি দাদু, একটু যা টনটন করছে।" আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে আলতো করে কপালের ফুলো জায়গাটায় আঙুল ছুঁইয়ে একটু চাপ দিল। মুখটা ব্যথায় বিকৃত করল। রাজশেখর সেটা লক্ষ করে বললেন, "আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই, ধাক্কাটাক্কা লাগতে পারে। ডাক্তার বোসকে ফোন করি, ওষুধ খেতে বলেন যদি।"

কলাবতী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়িতে রইল। ডাক্তার যে ট্যাবলেট খেতে বলেছেন তাই খেয়ে দুপুরে শুয়ে রইল। বিকেল চারটে নাগাদ স্কুল থেকে বড়দির ফোন এল।

"আজ স্কুলে আসোনি কেন? তনিমা বলল আজ সে তোমাকে ক্লাসে

দেখতে পায়নি, মিসেস ঘোষও তাই বললেন, হয়েছে কী?'' মলয়ার স্বরে উদ্বেগ। ''আমার পিসতুতো দাদা একটু আগে ফোন করেছিল, বলল ধূপছায়া আর তোমাকে লাস্ট পিরিয়ডে ছুটি দিতে পারি কিনা ক্রিকেট প্র্যাকটিসের জন্য। কেউ খেলতে চাইলে আমি বাধা দেব না। কিন্তু তারপর ও বলল, আজ সকালে তোমার কপালে খুব জোরে একটা বল লেগেছিল তা সত্ত্বেও তুমি উইকেটকিপিং করেছ, ব্যাটও করেছ। অন্য মেয়ে হলে বসে পড়ত। কিন্তু তুমি ইনজুরির পরোয়া না করেই নাকি খেলে গেছ। বাবুদা তোমার জেদ আর রোখ নিয়ে প্রশংসা করলেও আমি কিন্তু প্রশংসা করতে পারছি না। আমি তোমাকে ছুটি দিতে পারব না আর ক্রিকেট খেলতে বারণই করব। জানো, ওরকম লোহার মতো শক্ত বল দেড়শো গ্রাম ওজন, ঘণ্টায় তিরিশ মাইল স্পিডেও যদি এসে লাগে তা হলে মানুষ মারাও যেতে পারে। না, তোমাকে খেলতে হবে না।'' মলয়ার শেষ বাক্যে যে দৃঢ়তা ফুটে উঠল তাতে কলাবতী প্রমাদ গুনল। দু'জনের কথা সে অমান্য করতে পারে না, দাদু আর বড়দির। তার যত কিছু আবদার আর অনুরোধ এই দুটি মানুষের কাছে এবং তা পূরণ হয়।

কলাবতী বুঝল খুব হুঁশিয়ার হয়ে তাকে এখন কথা বলতে হবে, আবদার টাবদার চলবে না।

''বড়দি, মঙ্গলা এখন কেমন আছে? শুনেছিলাম ওর সর্দি হয়েছে।''

''হঠাৎ মঙ্গলার খবর জানতে তোমার ইচ্ছে হল কেন? ওর তো তিন মাস আগে একটু ঠান্ডা লেগেছিল, তোমায় কে বলল?''

''কাকা।''

''কোর্টে মিথ্যে কথা বলে বলে ওটাই ওর স্বভাবে দাঁড়িয়েছে।''

''বড়দি, অনেকদিন মঙ্গলাকে দেখিনি, খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, আজ যাব?''

''এসো। তবে মাথা ঘুরলে কি যন্ত্রণা হলে আসতে হবে না। ডাক্তার দেখিয়েছ?''

''দাদু ট্যাবলেট এনে দিয়েছেন। এখন একদম ব্যথা নেই। একটু শুধু ফুলে রয়েছে।''

''ক্ষুদিরামবাবু পড়িয়ে যান কখন?''

''আটটায়।''

''ঠিক আটটায় আমি গাড়ি পাঠাব। ভাল কথা, তুমি নাকি একটা কুকুর পুষেছ? দিশি কুকুর।''

"খয়েরি, ওর গায়ের রঙে নামটা রেখেছি।" এরপর গলায় উচ্ছ্বাস ঝরিয়ে কলাবতী বলল, "বড়দি ওকে আপনি দেখবেন? তা হলে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

"নিয়ে এসো।"

ঠিক আটটায় মলয়ার পাঠানো গাড়ি এল। কলাবতী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখল সদর দরজা থেকে একটু দূরে খয়েরি গোল হয়ে শুয়ে রয়েছে। গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে কলাবতী ডাকল, "আয় আমার সঙ্গে।" খয়েরি ওর পিছু নিল।

গাড়ির পেছনের দরজা খুলে কলাবতী বলল, "ওঠ।"

খয়েরির কথাটা বোধগম্য হল না, সে লেজ নাড়ল শুধু। কখনও সে মোটরগাড়িতে চড়েনি। কলাবতী আবার বলল, "ওঠ ওঠ।" খয়েরি লেজ নেড়েই চলল, কলাবতী ওর কোমর দু'হাতে ধরে খোলা দরজার দিকে ঠেলল, "ওঠ, ভেতরে চল।" খয়েরি শক্ত হয়ে পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। এবার কলাবতী ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠেই দরজা বন্ধ করে দিল, যাতে খয়েরি নেমে যেতে না পারে।

ড্রাইভার রামভরোসা হাসছিল, বলল, "মংলাকে নিয়ে কোনও তকলিফ হয় না, দিদি গাড়িতে বসে একবার ডাকলেই উঠে আসে।"

"ওর অভ্যেস আছে গাড়ি চড়ার।" কলাবতী শুকনো স্বরে বলল।

গাড়িতে তিন মিনিটের পথ। খয়েরিকে সিটের পাশে বসিয়ে কলাবতী জড়িয়ে ধরে রইল। খয়েরি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দ্রুত সরে যাওয়া দোকানের উজ্জ্বল আলো দেখতে দেখতে, আর পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়ির হর্ন শুনতে শুনতে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে করুণ চোখে কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অভিজ্ঞতাটা তার কাছে ভীতিকর ঠেকছে।

মলয়দের বাড়ি আকারে-প্রকারে সিংহিবাড়ির মতো বড় না হলেও, বেশ বড়। ফটক থেকে ঢুকেই সিমেন্টের চওড়া পথ। বাঁ দিকে লম্বা পাঁচিল, ডান দিকে বাড়ি। বাড়ির সদরে গিয়ে গাড়ি থামল। রামভরোসা নেমে পেছনের দরজা খুলে দিল। কলাবতী নেমে ডাকল, "আয়।"

খয়েরি গাড়ি থেকে সবেমাত্র নেমেছে আর তখনই একটা "ঘৌ" নির্ঘোষ সদর দরজার ওপরের বারান্দা থেকে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। কলাবতী মুখ তুলে দেখল চার নম্বর ফুটবলের আকারের মঙ্গলার মাথাটা বারান্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে। আরও তিনটে "ঘৌ" শোনা গেল। খয়েরি সরে এল কলাবতীর পেছনে।

বাড়িতে ঢোকার জন্য পা বাড়িয়ে কলাবতী ডাকল, "আয় আমার সঙ্গে।" আসার কোনও ইচ্ছা খয়েরির ভঙ্গিতে ফুটল না। কলাবতী আর ডাকাডাকি না করে ওর বকলশটা শক্ত করে ধরে অনিচ্ছুক খয়েরিকে হিঁচড়ে টেনে দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেল। এভাবে সিঁড়ি দিয়ে তোলা যাবে না তাই খয়েরিকে সে কোলে তুলে উঠতে শুরু করল। বাঁক নিয়েই দেখল মঙ্গলা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে। কান দুটো খাড়া, প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা জিভটা ঝুলছে। পাঁশুটে আর কালো রঙের ঘন বড় বড় লোম, দীর্ঘ লেজ, বিশাল ভারী শরীর। ওদের দেখে সে আবার ডেকে উঠল এবং তা সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হল।

কলাবতী ভয় পেল খয়েরির কথা ভেবে। অচেনা একটা কুকুর তার নিজের এলাকায় ঢুকেছে এটা হয়তো মঙ্গলা সহ্য নাও করতে পারে। যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে খয়েরিকে কামড়ে মেরে ফেলে! খয়েরি আঁকুপাকু করছে কলাবতীর কোল থেকে নামার জন্য।

"বড়দি, বড়দি!" কলাবতী চেঁচিয়ে উঠল।

ঘর থেকে মলয়া বেরিয়ে এল। "দাঁড়িয়ে আছ কেন, ওপরে এসো। এই তোমার খয়েরি, বাঃ বেশ দেখতে তো!"

"মঙ্গলাকে সরান বড়দি, খয়েরি ভয় পাচ্ছে।"

মলয়া মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে ডাকল, "মঙ্গলা.....কাম হিয়ার।" শোনামাত্র সে মলয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। "সিট ডাউন।" মঙ্গলা উবু হয়ে বসে খয়েরির দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে ছোট্ট একটা "ঘৌ" করল।

এগিয়ে এসে মলয়া কলাবতীর কোল থেকে খয়েরিকে দু'হাতে নিয়ে বলল, "মাথার সাদাটা খুব সুন্দর। বয়স কত?"

"তা তো জানি না বড়দি! রাস্তায় পেয়েছি, খুব রোগা ছিল। অপুর মা খাইয়ে দাইয়ে ওকে নাদুসনুদুস করে দিয়েছে। কী ঝকঝকে হয়েছে ওর লোমগুলো!"

কথা বলতে বলতে ওরা ঘরে এসে খাটে বসল। যেখানে বসতে বলা হয়েছিল, মঙ্গলা সেখানে বসেই রইল।

"তোমার কপাল তো এখনও ফুলে রয়েছে। ইস্‌স ঠিক রগের কাছটায়, যদি ওখানে লাগত?"

হালকা সুরে কলাবতী বলল, "লাগলে কী আর হত অজ্ঞান হয়ে যেতুম। তারপর হাসপাতালে দু'দিন পরে মরে যেতুম।" বলতে বলতে সে মলয়ার কোলে থাকা খয়েরির পিঠে হাত বুলোল। মঙ্গলা ঘরের দরজা থেকে উসখুস

করে "আঁউ আঁউ" করে উঠল। কলাবতী তাকে ডাকল, "আয় মঙ্গলা।" মঙ্গলা ইতস্তত করে ঘরে ঢুকল।

কলাবতীর কথা শুনে রেগে মলয়া বলল, "ফাজলামো করতে হবে না। ক্রিকেট একটা মারাত্মক খেলা।"

"বড়দি, হাজার হাজার ছেলে ক্রিকেট খেলছে কিন্তু ক'জন মরছে?"

"একজনও মরছে না, কেমন?" মলয়া উত্তেজিত হয়ে বলল, "কিন্তু তুমি এখনও এই খেলার উপযুক্ত হওনি। হাজার হাজার ছেলে রবারের বল দিয়ে খেলছে। এই তো সেদিন কীসের জন্য যেন একটা বন্ধ হল, রাস্তায় ছেলেরা রবারের বলে ক্রিকেট খেলছিল। তুমিও তো রবারের বলে খেলতে পারো।"

"কিন্তু বড়দি, আমি সত্যিকারের ক্রিকেটার হতে চাই। রবারের বল খেলে কখনওই তা হওয়া যাবে না।" বলতে বলতে কলাবতী লক্ষ করল মঙ্গলা দু'পা এগিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিল বড়দির কোলে গুটিয়ে থাকা খয়েরির মুখের দিকে। খয়েরি ভয়ে "কুঁই কুঁই" করে উঠে মুখটা গুঁজে দিল বড়দির কোলে। এতবড় একটা অ্যালসেশিয়ানকে সে জীবনে কখনও এত কাছ থেকে দেখেনি। মঙ্গলা খয়েরির কানের কাছে শুঁকল। জিভ দিয়ে কানটা চাটল। বড়দি কলাবতীকে জবাব দিতে গিয়ে মঙ্গলার কাণ্ডটা নজর করে ঠোঁট টিপে হাসল।

"ভাব করতে চাইছে।" মৃদু গলায় মলয়া বলল।" ভয় কী খয়েরি, দিদি হয় তোমার, কিচ্ছু বলবে না।" খয়েরিকে সে একটু ঠেলে ধরল মঙ্গলার দিকে। মঙ্গলা খয়েরির নাকের কাছে নিজের নাকটা নিয়ে গিয়ে শুঁকল। নাক ঝাড়ার মতো "ফোঁত ফোঁত" শব্দ করল, খয়েরি ভয়ে ভয়ে ট্যারা চোখে ওর দিকে তাকাল। মঙ্গলা দু'বার চেটে দিল ওর মাথা।

কলাবতীর মনে হল খয়েরির ভয়টা কেটে গেছে, কেননা মুখটা নামিয়ে সে মঙ্গলার দেওয়া আদর নিরুদ্বেগে মাথায় নিয়ে চলেছে।

"ক্রিকেটে খেলা ছাড়া আরও অনেক কিছু আছে, সেসব তো করতে পারো।" মলয়া আবার ক্রিকেটের কথায় ফিরে এল।" স্কোর লেখাও তো একটা বড় কাজ। মাঠে নামতে হবে না অথচ খেলার সঙ্গেও রইলে। আমি বরং বাবুদাকে বলে দেব তোমাকে স্কোরার হওয়ার ট্রেনিং দিতে।"

কলাবতী ব্যগ্র স্বরে বলল, "তা হলে আমাকে লাস্ট পিরিয়ডে ছেড়ে দেবেন?"

"কেন?" মলয়া ভ্রূ কোঁচকাল। "স্কোর লেখা তো বাড়িতে বসেও শেখা

যায়। তুমি ক্রিকেট আইনের বইতেই পাবে স্কোরারদের কী কী কাজ করতে হবে। কার্ডিফে গ্ল্যামোরগান আর ইন্ডিয়ান টিমের খেলা দেখতে যাওয়ার আগে আমি ক্রিকেট আইনের বইটা উলটে-পালটে দেখেছিলুম।''

''স্কোরিং-এর একটা প্র্যাকটিক্যাল দিকও তো আছে। সেটা মাঠে বসে না করলে শেখা যাবে না।'' কলাবতী মরিয়া হয়ে এবার শেষ চেষ্টা করল।

মলয়া খয়েরির পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আলোচনায় শেষ পেরেকটা পুঁতে দিল। ''নেট প্র্যাকটিসে স্কোর লেখার দরকার হয় এমন কথা কখনও তো শুনিনি।''

কলাবতী বুঝে গেল শেষ পিরিয়ডে তার ছুটি পাওয়ার দফা-রফা হয়ে গেছে। তারপরই দেখল অদ্ভুত জিনিস, মঙ্গলা চোখ বুজে মুখটি তুলে আর খয়েরি তার চোয়াল-থুতনি চেটে দিচ্ছে। ভয় ভেঙে গেছে খয়েরির। মলয়া কোল থেকে ওকে মেঝেয় নামিয়ে দিয়ে বলল, ''বিস্কিট দিই খয়েরিকে।''

মলয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মঙ্গলা তার পিছু নিল। খয়েরিও যাচ্ছিল, কলাবতী ধমকে উঠতে থমকে পড়ল। মিনিট দুই পরে মলয়া ফিরল, হাতে দুটি চৌকো আকারের বিস্কুট। একটি মুখের সামনে ধরতেই খয়েরি টেনে নিয়ে খেতে শুরু করল। মঙ্গলা ঘাড় বাঁকিয়ে খাওয়া দেখতে লাগল।

''কালু, মাংসের চপ ভাজছে ঠাকুর, হাতটা ধুয়ে এসো।''

কলাবতী বাইরে দালানের বেসিনে হাত ধুয়ে এল। ''বড়দি, মঙ্গলাকে বিস্কুট দিলেন না?''

''ওর রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। তারপর আর কিছু খেতে দেওয়া হয় না।'' মলয়া সস্নেহে মঙ্গলার মাথায় হাত বুলোল, ''ওর সবকিছুই চলে নিয়ম মেনে। খয়েরি খায় ক'টার সময়?''

কলাবতী ঢোক গিলল। সবার খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর অপুর মা রাত দশটা নাগাদ সবার উচ্ছিষ্ট যা পড়ে থাকে সেগুলোই ফিটনের ঘরে খয়েরির থালায় রেখে আসে। একথা জানাতে কলাবতীর লজ্জা করল। সে শুধু বলল, ''দশটার সময় খায়।''

একটা প্লেটে দুটো বড় আকারের চপ আর স্যালাড নিয়ে এল ঠাকুর। কলাবতী একটা চপ থেকে একটু ভেঙে মঙ্গলার মুখের কাছে ধরল, কতটা নিয়ম মানে সেটা পরীক্ষা করার জন্য।

''ভাজাভুজি কখনও মঙ্গলাকে খাওয়ানো হয়নি। দেখো ও খাবে না।''

সত্যিই তাই হল। চপের টুকরোটা একবার শুঁকেই মঙ্গলা মুখ সরিয়ে নিল।

কলাবতী সেটা খয়েরির মুখের সামনে ধরতেই সে শোঁকাশুঁকি না করেই কপাত করে মুখে পুরে দিল।

"কালু, এসব জিনিস ওকে খাইয়ো না।" মলয়া বিচলিত স্বরে বলল, "পেটের গোলমাল হবে, লোম ঝরে যাবে।"

"কিচ্ছু হবে না খয়েরির। ও তো ভুখা পার্টি থেকে এসেছে, যা খাবে হজম করে ফেলবে।" কলাবতী নিশ্চিন্ত গলায় বলল।

ওরা ফিরে আসার জন্য যখন গাড়িতে উঠছে মঙ্গলা তখন বারান্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে মাথা বার করে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। কলাবতীর মনে হল, খয়েরি চলে যাচ্ছে বলে মঙ্গলর মনখারাপ হয়ে গেছে।

"খয়েরি আবার আসবে।" কলাবতী হাত তুলে মঙ্গলাকে বিদায় জানাল। গাড়ি যখন ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পড়ল তখনও ঘৌ ঘৌ ডাক সে শুনতে পাচ্ছে।

কলাবতী বাবুদাকে জানিয়ে দিল বড়দি খেলার জন্য ছুটি দেবেন না।

"না দিক, তুমি স্কুলের পর বাসে উঠে সোজা চলে এসো। হয়তো একটু দেরি হবে, প্র্যাকটিসের সময় খানিকটা কমে যাবে। তা হোক, যতটুকু হয় সেটাই লাভ। আমাদের স্কুলগুলোর ছুটির সময়টা এমন, ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করবে কখন, শিখবেই বা কখন। আমি বরং মলুকে জানিয়ে দেব তুমি স্কোরার হওয়ার জন্য বাড়িতে প্র্যাকটিস করছ।" তারপর ধুপুকে বলল, "খবরদার স্কুলে একদম মুখ খুলবে না।"

এইভাবে বড়দিকে লুকিয়ে সল্টলেকের নেটে চলল কলাবতীর প্র্যাকটিস। বাড়িতে সে নানাদিকে ঝাঁপিয়ে বল ধরার কসরত চালিয়ে যেতে লাগল দাদুর বা মুরারির ছোড়া বলে। তার দুটো কনুই ও পুরো বাহু ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোল, বেকায়দায় পড়ে গিয়ে ব্যথা হল কিন্তু সে এইসব ঝামেলা গ্রাহ্যে আনল না। তাকে উইকেটকিপার হতেই হবে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠা বছরের সুবর্ণজয়ন্তী, তাই সোমবার স্কুলের ছুটি। দুপুরে সভা, বিকেলে নানা অনুষ্ঠান ও নাটক হবে। নাটকে কলাবতীর ছোট্ট একটা পার্ট আছে ঝগড়ুটে এক বিধবা বুড়ির। সকাল থেকে ঘরে আয়নার সামনে সে একাই মহড়া দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সত্যশেখর কোর্টে বেরোবার মুখে ব্যস্ত

হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, ''কালু, আমার একটা কাজ করে দিবি, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হবে। আজ সন্ধেবেলায় আমাদের কোর্টের এক বেয়ারাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে, কাল ওর ছেলে মুম্বইয়ে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাবে, এদিকে হাতে একটা পয়সাও নেই, ধার করার অনেক চেষ্টা করেও জোগাড় করতে পারেনি। শেষে আমার কাছে চাইল। মানুষটা খুব ভাল, বলেছি সোমবার এসে যেন নিয়ে যায়। তুই টাকাটা তুলে মুরারির কাছে রেখে দিস।''

এই বলে সত্যশেখর চেকটা কলাবতীর হাতে দিল। সে এর আগে ব্যাঙ্ক থেকে কয়েকবার চেক ভাঙিয়েছে। তাদের বাড়ির খুব কাছেই ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের শাখা। ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের অনেকেই তাকে চেনে। সাড়ে দশটায় কলাবতী ব্যাঙ্কের কোলাপসিবল গেটে এল। এক মানুষ গলে যাওয়ার মতো ফাঁক রেখে গেটটা মোটা লোহার শিকল জড়িয়ে সেটায় তালা লাগিয়ে বন্ধ। একনলা বন্দুক হাতে দরোয়ান ভেতরে দাঁড়িয়ে। ভেতরে বেশ ভিড়। কলাবতী বুকসমান উঁচু খোলা কাউন্টারে বসা লোকটিকে চেক দিয়ে পেতলের একটা চাকতি টোকেন নিল। তাতে নম্বর লেখা সতেরো। সে পেমেন্ট লেখা লোহার খাঁচার মতো জাল ঘেরা কাউন্টারের সামনে ছোট ভিড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। খাঁচার মধ্যের লোকটি টোকেন নাম্বার ডাকছে, টোকেন নিচ্ছে, নোট গুনে ফোকরের মধ্য দিয়ে সেগুলো এগিয়ে দিচ্ছে, টাকা পেয়ে নোট গুনে নিচ্ছে। কলাবতী দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছে এবং দেখতে তার ভালই লাগছে। ব্যাঙ্কের লোকেরা কী অদ্ভুত দ্রুত নোট গোনে এবং ভুল করে না। এটা তাকে অবাক করে। সে এর আগে যে ক'বার টাকা তুলেছে কখনও কাউন্টারে দাঁড়িয়ে গুনে মিলিয়ে নেয়নি। বাড়ি এসে গুনে দেখেছে একটা টাকাও বেশি বা কম নেই।

নিবিষ্ট হয়ে সে পিঁপড়ের শুঁড় নাড়ানোর মতো নোট গোনা আঙুলের নড়াচড়া দেখছিল তখনই একটা ভারী গলার চিৎকার করে বলা কথা সে শুনতে পেল: ''কেউ নড়বেন না। যে যেখানে যেমনভাবে আছেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। বাধা না দিলে আপনাদের কোনও ক্ষতি আমরা করব না।'' ব্যাঙ্কের ভেতরে দাঁড়িয়ে কোল'পসিবল গেট টেনে বন্ধ করে দিয়ে লোকটি হাতের রিভলভার দরোয়ানের পেটে ঠেকিয়ে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল।

লোকটির মাথায় সাদা ক্যাপ যেমনটি ক্রিকেটাররা পরে। চোখের

নীচ থেকে গলা পর্যন্ত মুখ একটা সবুজ রুমাল বেঁধে ঢেকে রাখা। পরনে বিবর্ণ জিন্‌স আর গোলগলা নীল গেঞ্জি, স্বাস্থ্যটা মোটেই কলাবতীর পড়া বিশেডাকাত বা রোঘোডাকাতের মতো নয়, খুবই ছিপছিপে পাতলা।

কলাবতীর পাশ থেকে কেউ ফিসফিস করে বলল, "ডাকাত পড়েছে। কেউ যেন না বাধা দেয়। ওরা ব্যাঙ্ক লুট করেই চলে যাবে।"

ব্যাঙ্কের ভেতরে তখন প্রায় তিরিশজন লোক। তার মধ্য থেকে তিনজন দ্রুত মুখে কালো রুমাল বেঁধে নিয়ে ছুটে কাউন্টারের ওধারে হলঘরে ঢুকে পড়ল। তাদের দু'জনের হাতে পাইপগান, অন্যজনের হাতে বড় একটা সাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগ থেকে সে দু'হাত লম্বা একটা মোটা রড বার করে হলঘরের একমাত্র টেলিফোনটাকে পেটাল। ভেঙে ছত্রাকার হয়ে গেল টেলিফোনটা। তারপরই সে হাত বাড়াল সেই টেব্‌লে বসা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের দিকে। তিনি ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লেন। ডাকাতটি তার টেব্‌লের খোলা ড্রয়ারটা টেনে একটা চামড়ার ওয়ালেট বার করে খুশিতে মাথা নাড়ল।

ইতিমধ্যে দুই পাইপগানধারীর একজন ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে পড়েছে। কলাবতী তারপরই টেলিফোন আছড়ে ভাঙার শব্দ পেল। কয়েক সেকেন্ড পর ম্যানেজার পিঠে ঠেকানো পাইপগান-সহ নিরক্ত মুখে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলেন, স্ট্রংরুমের চাবি রাখা ওয়ালেটটি ম্যানেজারের হাতে দিয়ে ব্যাগধারী তাকে কী যেন বলল। পাশেই তালা দেওয়া একটা ভারী দরজার দিকে ম্যানেজার এগোলেন। তাঁকে অনুসরণ করল দু'জন।

"হারি আপ, হারি আপ, ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম।" গেটে দাঁড়ানো নেতা অধৈর্য হয়ে চিৎকার করে উঠল। সারা ব্যাঙ্ক পাথর, বোবা। টেব্‌লে বসা কর্মচারীরা ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে। কিছু করতে গেলেই গুলি খেতে হবে। কলাবতী লক্ষ করছিল নেতাকে। একটা মশা বা কোনও পোকা নেতার বাঁ চোখের পাশে কামড়েছে বোধহয়। মুখে বাঁধা রুমালটা টেনে নামিয়ে সে চুলকোতে শুরু করল। কলাবতী দেখল ওর বাঁ চোখের নীচেই একটা বড় আঁচিল আর বাঁ চোখের ওপর পাতাটা অর্ধেক নেমে, ঘুম পেলে যেমন আধবোজা হয় অনেকটা সেইরকম। নেতার চোখ হঠাৎ পড়ল কলাবতীর ওপর, ভ্রূ তুলে মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে। সে দ্রুত রুমালটা টেনে তুলে দিয়ে অস্বস্তিভরে বারকয়েক কলাবতীর দিকে তাকাল।

"ম্যানেজারের টেব্‌লের নীচে তো অ্যালার্মের বাটন আছে, টিপে দিল না কেন?" ফিসফিস করে একজন বলল।

"টিপুক আর গুলি খাক।" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ফিসফিস হল। "আগে ব্যাঙ্ক না আগে প্রাণ?"

কলাবতীর কানে আরও কিছু কথা এল:

"দেখলেন, সব আগে থেকে ওরা অবজার্ভ করে রেখেছে, চাবির ব্যাগটা কীরকম ভাবে ড্রয়ার থেকে বার করে নিল!"

"আরে মশাই, ভেতরে ওদের লোক আছে খবর দেওয়ার। ঠিক জানে ভল্ট খুলতে দুটো চাবি লাগে আর সে দুটো কার কার কাছে থাকে।"

ডাকাতদুটো মিনিট তিনেকের মধ্যেই ছুটে স্ট্রংরুম থেকে বেরিয়ে এল। তিনজন হলঘরের মধ্য দিয়ে দৌড়ে কাউন্টারের এদিকে এসে গেটের দিকে এগোল। ভিড় বিভক্ত হয়ে ওদের জন্য যাওয়ার পথ করে দিল। গেটটা ফাঁক করে নেতা দাঁড়িয়ে। ক্যাম্বিসের ব্যাগটা রুগ্ণ অবস্থায় স্ট্রংরুমে ঢুকেছিল, বেরোল এমনই নধর হয়ে যে, গেটের ফাঁক দিয়ে তাকে গলাতে গিয়ে পেটটা আটকে গেল। অবশেষে একটা হ্যাঁচকা টানে তাকে বার করা গেল।

সবশেষে বেরোল নেতা। বেরোবার আগে সে কলাবতীর দিকে একঝলক তাকিয়ে নিল। বেরিয়ে গেটটা টেনে বন্ধ করেই সে ছুটে গিয়ে, এঞ্জিন চালিয়ে রেখে অপেক্ষা করা একটা মোটরবাইকে উঠে পড়ল। তাতে চালক ছাড়াও বসে ছিল ব্যাগ কোলে নিয়ে অন্য ডাকাতটি। নেতা ওঠামাত্র তিনজনকে নিয়ে বাইকটা পশ্চিম দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল। বাকি দুই ডাকাতকে নিয়ে আর একটা বাইক আগেই রওনা দিয়েছে পূর্ব দিকে। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল মিনিট সাতেক।

মোটরবাইক দুটো চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "ডাকাত, ডাকাত" রব যথারীতি উঠল। লোকজন বাইরে থেকে ছুটে এল। সবাই জানতে চায় কত টাকা ডাকাতি হয়েছে, কেউ মরেছে কিনা। ম্যানেজার মুহ্যমানের মতো হলঘরে বসে শুধু মাথা নেড়ে যাচ্ছেন। থানায় ও লালবাজারে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ আসছে। আজ আর ব্যাঙ্কের কোনও কাজকর্ম হবে না। টাকা নেওয়াও নয়, দেওয়াও নয়।

টোকেনটা সঙ্গে নিয়ে কলাবতী বাড়ি ফিরে এল। তার মন খুব খারাপ লাগছে কাকার সেই বেয়ারাটির কথা ভেবে, যে আজ সন্ধ্যায় এক হাজার টাকা নিতে আসবে। তার ছেলে কাল মুম্বই যাবে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে, হাতে একটা টাকাও নেই। মুম্বই তো আর রানাঘাট কি বর্ধমানের মতো একদিনেই যাতায়াত করা যায় না, হাজার-বারোশো মাইল দূরে তো হবেই।

অতদূরে যেতে হলে কিছু টাকা তো সঙ্গে রাখা উচিত।

আজই স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব। সন্ধ্যাবেলায় তাকে নাটকে নামতে হবে। তার ইচ্ছে করছে না স্কুলে যেতে। দাদুকে সে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনাটা সবিস্তারে বলল। আর বলল, কেন সত্যশেখর টাকাটা তুলতে তাকে পাঠিয়েছিল।

"সতুর কাছে এক হাজার টাকা নেই! আশ্চর্য! এক হাজার টাকা দেওয়ার জন্য সিংহিবাড়ির ছেলে কিনা চেক কাটল?" রাজশেখর রাগে গরগর করে কথাগুলো বলে শোয়ার ঘরে গিয়ে সিন্দুক থেকে দশটা একশো টাকার নোট বার করে এনে কলাবতীর সামনে ধরে বললেন, "যা, মুরারির কাছে রেখে আয়।"

স্কুলের অনুষ্ঠানের পর রাত্রে বাড়ি ফিরে সদর দরজা পেরোতেই কলাবতী সেরেস্তা থেকে চাপা গলায় কাকার ডাক শুনল, "কালু, একটু দাঁড়া।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এল সত্যশেখর। কলাবতীর মুখে নাটকের মেকআপ, সত্যশেখরের মুখে বিপক্ষ কৌঁসুলির আচমকা তোলা নতুন এক পয়েন্ট। "বাবাকে তুই বলেছিস আমার কাছে টাকা নেই?"

অবাক কলাবতী বলল, "তা তো বলিনি। শুধু বলেছি চেকে টাকা তোলার জন্য আমাকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছ। তোমার লোক টাকা নিতে এসেছিল?"

"এসেছিল, নিয়ে গেছে। নাটক কেমন হল?"

কলাবতী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "দারুণ হয়েছে। সবচেয়ে ভাল হয়েছে বড়দির, উকিলের পার্ট করেছিল। আমি করেছি মিথ্যে সাক্ষী দিতে আসা এক বুড়ির।"

"ব্যাঙ্কের টোকেনটা তোর কাছে রয়েছে, কাল গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসবি।" এই বলে সত্যশেখর ব্যস্ত হয়ে সেরেস্তায় ঢুকে গেল।

রাতে খাওয়ার টেবলে ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং স্কুলের নাটক নিয়ে কথাবার্তা হল। সত্যশেখর জানতে চাইল, "কালু তুই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি তো? এতদিন তো শুধু বইয়ের পাতায় আর সিনেমাতেই ডাকাত দেখেছিস, এবার রক্তমাংসের ডাকাত দেখা হয়ে গেল। কেউ যে রেজিস্ট করতে যায়নি এটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে।"

রাজশেখর গর্জন করে উঠলেন, "বুদ্ধিমান না ছাই। কাপুরুষের মতো কাজ হয়েছে। আটঘরার বাড়িতে একবার ডাকাত পড়েছিল। আমাদের শ্যামা পাইক লাঠি আর সড়কি নিয়ে একা মহড়া দিয়েছিল সেই ডাকাত দলের সঙ্গে,

শেষে পালাবার পথ পায় না। গ্রামের লোক তাড়া করে চারটেকে ধরে ফেলে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেয় তিনদিন। শেষে মাফ চেয়ে নাকখত দিয়ে বলল, জীবনে আর ডাকাতি করবে না। তখন ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়।''

''বাবা, এটা কোন সময়ের ঘটনা?'' সত্যশেখর তেরছা চোখে তাকাল বাবার দিকে।

কলাবতী বলল, ''শুনলে না, লাঠি-সড়কি নিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, নাকখত দিইয়ে চারজনকে ছেড়ে দিয়েছিল। দাদু, এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের ঘটনা, তাই না?''

''এইট্টিন ফিফটি নাইনের। সিপাহি বিদ্রোহের দু'বছর পরে।'' রাজশেখরের গলায় বনেদি আভিজাত্য ঝলসে উঠল। ''তখন বাঙালির সাহস ছিল।''

সত্যশেখর বলল, ''এমন পাইপগান-বোমা আর পিটিয়ে মেরে ফেলার আমল। এখন সাহস দেখায় শুধু ডাকাতরাই। লড়াই করার জন্য এখন কাছে আসতে হয় না। দূর থেকেই গুলি করে দেয়, বোমা ছোড়ে। মানুষ ভয় পায় বলেই ওরা সাহসী।''

এই শুনে রাজশেখরের মুখের উদ্দীপ্ত ভাবটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল। গলা নামিয়ে শুধু বললেন, ''অনেক কিছুই আমাদের হারিয়ে গেছে।''

দাদুর মুখ দেখে কলাবতী দুঃখ পেল। এই সময় তার মনে পড়ে গেল একটা কথা। চোখ বড় করে সে বলে উঠল, ''জানো দাদু, নাটকের পর গ্রিনরুমে বড়দি চুপিচুপি আমাকে কী বলল?...মঙ্গলার বাচ্চা হবে আর তিন মাস পরেই।''

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অপুর মা। সে ঘরে ঢুকল, চোখ চকচক করছে, গলায় চাপা উত্তেজনা, বলল, ''আমাদের খয়েরিরও বাচ্চা হবে কালুদি।''

শোনামাত্রই কলাবতী দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল, রাজশেখরের মুখে হাসি ফুটল আর সত্যশেখর মাথা চুলকোতে শুরু করে দিল।

পরের দিন খবরের কাগজে দশ লাইন বেরোল এই ডাকাতির খবর। খবরের শেষে লেখা: 'ডাকাতির কোনও সূত্র পুলিশ পায়নি, কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ডাকাতি হওয়া ছয় লক্ষ টাকা উদ্ধার করতে পারবে বলে পুলিশ আশা করছে। জোর অনুসন্ধান চলছে।'

সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য পরদিনও স্কুলের ছুটি। কলাবতী ব্যাঙ্কে গিয়ে জানল যারা গতদিন টোকেন নিয়ে টাকা তুলতে পারেনি তারা আজ পাবে। ব্যাঙ্কের ফটকে রাইফেল হাতে দু'জন পুলিশ, যারা ঢুকছে তাদের দিকে

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে। ভেতরে যথারীতি কাজকর্ম চলছে, পরিবেশ থমথমে। কলাবতী গতকালের টোকেনটা কাউন্টারে যাকে দিল তিনি মুখচেনা। নতুন একটা টোকেন তাকে দিয়ে তিনি বললেন, "কাল অত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন, পুলিশ এসে সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করল।"

কলাবতী আলগোছে বলল, "জিজ্ঞেস করলে আমি বলতুমই বা কী? সবাই যা দেখেছে আমিও তাই দেখেছি। কী জিজ্ঞেস করল পুলিশ?"

"কাউকে চেনা মনে হল কি না, দেখলে চিনতে পারবেন কি না, এইসব। আজও তো ওরা এসে জিজ্ঞেস করছে, ঘুরে ঘুরে দেখছে, ওই দ্যাখো না দুটো লোক। ডাকাতরা কি আর কোনও ক্লু রেখে গেছে যে, চাইলেই পেয়ে যাবে।" লোকটি তাচ্ছিল্যভরে তাকাল।

কলাবতী দেখল হাওয়াই শার্ট পরা সাধারণ চেহারার দুটি লোককে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার টেব্‌লের ড্রয়ার টেনে খুলে খুলে দেখাচ্ছেন। এরপর ওই দু'জনের একজন নিজে ড্রয়ার টানাটানি শুরু করল।

ব্যাঙ্কে আজও বেশ ভিড়। কলাবতী সরে গিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল। তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে লোকটির কথাগুলো— কাউকে চেনা মনে হল কি না, দেখলে চিনতে পারবেন কি না। নাহ্, চেনা মনে হওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না। সবাই মুখ ঢেকে রেখেছিল রুমালে, শুধু চোখদুটো দেখা যাচ্ছিল। তাই দিয়ে কাউকে পরে চেনা সম্ভব নয়, কেউ কথা বলেনি শুধু লিডার ছাড়া। গলার আওয়াজটা তার মনে আছে শুনলে হয়তো চিনতে পারবে।

একটু পরেই তার টোকেন নাম্বার ধরে ডাক হল। কলাবতী পেমেন্ট কাউন্টারের দিকে এগোল। তার আগের লোক টাকা পেয়ে তখন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে গুনছে। গুনতে গুনতে লোকটি আঙুল দিয়ে দু'-তিনবার চোখের কোণ ঘষল। তাই দেখে কলাবতীর হঠাৎই ডাকাতদের নেতার কথা মনে পড়ে গেল, সেও চোখের নীচে চুলকোচ্ছিল, একটা আঁচিল, চোখটা আধবোজা...এই তো ক্লু!

টাকা নিয়ে সে কাউন্টার ঘুরে ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকল। কোথায় পুলিশের লোক দু'জন? সে এধার-ওধার তাকিয়ে তাদের দেখতে পেল না। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেন, "ওরা তো এইমাত্র চলে গেল। কেন, কী দরকার?"

"দরকার আছে।" বলেই কলাবতী ছুটল কোলাপসিব্‌ল গেট লক্ষ্য করে। লোক দুটি তখন একটা জিপে উঠতে যাচ্ছে।

"এই যে, এই যে, শুনুন।" হাত তুলে সে দৌড়ে গেল। লোকদুটি ফিরে তাকাল।

হাঁফাতে হাঁফাতে কলাবতী বলল, "আপনাদের আমি একটা ক্লু দিতে পারি। কাল যে ডাকাতিটা হল তার লিডারের বাঁ চোখের নীচেই একটা বড় আঁচিল আছে আর লোকটার বাঁ চোখটা আধবোজা।"

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করার পর একজন বলল, "চলো, ভেতরে চলো।"

লোকদুটি কলাবতীকে নিয়ে ব্যাঙ্কের ভেতরে এসে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল। একজন বিনীতভাবে ম্যানেজারকে বলল, "আপনার কাজে একটু ব্যাঘাত ঘটাব। আমরা এই মেয়েটির সঙ্গে একটু কথা বলব। জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কথা, বাইরে বসে বলতে চাই না।"

ম্যানেজার শশব্যস্ত, বললেন, "বসুন, বসুন। যতক্ষণ ইচ্ছে কথা বলুন।"

লোকদুটির একজন নোটবই বার করল পকেট থেকে। কলাবতীর নাম, বাড়ির ঠিকানা, কে কে আছে বাড়িতে, কোন স্কুলে কোন ক্লাসে পড়ে, কীজন্য কাল ব্যাঙ্কে এসেছিল, চেকটা কার ছিল ইত্যাদি জেনে নিয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি ঠিক দেখেছ বাঁ চোখের নীচে আঁচিল আছে আর চোখটা ডিফেক্টিভ?"

কলাবতী জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক দেখেছি। লোকটা যখন দেখল আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি তখন তাড়াতাড়ি রুমালটা টেনে তুলল আর বারকয়েক আমার দিকে তাকাল। আমি যে আঁচিলটা দেখে ফেলেছি সেটা ও বুঝতে পেরেছে মনে হল।"

লোকটি খসখস করে তার কথাগুলো লিখে নিয়ে বলল, "আমাদের কাছে ডাকাতদের যেসব ছবি আর চেহারার বর্ণনার ফাইল আছে তোমার কথামতো সেখানে আমরা খুঁজব। আমাদের যা বললে সেসব কথা আর কাউকে কি বলেছ?"

"আপনাদেরই প্রথম বললুম।"

অন্য লোকটি বলল, "একদম এই নিয়ে কাউকে একটি কথাও বলবে না। বললে বিপদ হতে পারে। এখন তুমি আসতে পারো, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।"

বাড়ি ফিরে কলাবতী ব্যাঙ্ক থেকে তোলা টাকাগুলো দাদুকে দিয়ে পুলিশ দু'জনকে সে যেসব কথা বলেছে তা বলল। শুনে রাজশেখরের মুখ উদ্বেগে ভরে গেল।

"তুই বলে ভালই করেছিস কিন্তু ওই যে বিপদের কথা বলল সেটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার নয়। তুই যেমন ডাকাতটার মুখ দেখেছিস তেমনই ডাকাতটাও তোর মুখ দেখে রেখেছে। যদি ও জানতে পারে তুই পুলিশকে বলে দিয়েছিস মুখে কী কী চিহ্ন আছে, তা হলে কিন্তু লোকটা তোকে আঘাত করতে পারে।" রাজশেখর থেমে থেমে চিন্তিত স্বরে বললেন।

কলাবতীর বুকের মধ্যে হালকা একটা ভয় মেঘের মতো উড়ে গেল। ফুঁ দিয়ে সেটা সরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে সে বলল, "লোকটা জানবে কী করে পুলিশকে আমি বলেছি। সেখানে তো ছিলেন শুধু ম্যানেজার, তিনি নিশ্চয় ডাকাতটাকে বলতে যাবেন না।"

"পুলিশের মধ্যেও গুন্ডাবদমাশদের লোক আছে, তারা জানিয়ে দেবে।"

তিনদিন পর বিকেলে একটা টেলিফোন এল। রিসিভার তুলে রাজশেখর বললেন, "রাজশেখর বলছি।"

ওধার থেকে একজন পুরুষ শান্ত গলায় বলল, "কলাবতী আপনার কে হয়?"

"নাতনি।"

শীতলকণ্ঠে লোকটি বলল, "ওকে বারণ করে দেবেন যেন ডাকাত চেনাবার জন্য উৎসাহ না দেখায় আর সাবধানে থাকতে বলবেন।"

রেগে উঠে বললেন রাজশেখর, "যদি উৎসাহ দেখায় তা হলে কী করবেন?"

আরও ঠান্ডা গলায় উত্তর এল, "তা হলে চিরকালের মতো উৎসাহ দেখানো বন্ধ করে দেব।"

রাজশেখর জবাব দেওয়ার আগেই ওধারে ফোন রেখে দিল। এই ফোন পাওয়ার কথাটা তিনি কাউকে বললেন না, কলাবতীকেও না। তাঁর মনে হল, ডাকাতরা এখনও জানে না কালু পুলিশকে ঠিক কী বলেছে। ফোনটা করেছে আন্দাজে, আগাম একটা হুমকি দিয়ে, ভয় দেখাতে। তবে কালু কী বলেছে সেটা ওরা ঠিকই জেনে যাবে।

এর দু'দিন পর কলাবতী স্কুল থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছে। আজ বিকেলে তার সল্টলেকে প্র্যাকটিসে যাওয়ার দিন নয়। হাওয়াই শার্ট পরা পাতলা

গড়নের একটা লোক, যে তাকে স্কুলের গেট থেকে পিছু নিয়েছে তা সে জানে না। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে সে আসছিল। বন্ধুরা যে যার বাড়ির পথে চলে যেতে সে একাই সিংহিবাড়ির ফটকে পৌঁছোল। দূর থেকেই সে দেখেছিল ফটকের সামনে রাস্তায় খয়েরি তার জন্য বসে আছে। প্রতিদিনই বসে থাকে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য। সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে কলাবতী স্কুলব্যাগ থেকে টিফিনবক্স বার করবে। খয়েরি তখন দ্বিগুণ বেগে লেজটা নাড়তে নাড়তে সামনের দু' পা কলাবতীর কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে উঠে, "উঁ উঁ" শব্দ করে খাবার চাইবে। না খেয়ে ওর জন্য রেখে দেওয়া টিফিনের খাবার কলাবতী যতক্ষণ না মুখে তুলে দিচ্ছে, খয়েরি নাছোড়বান্দার মতো বারবার দাঁড়িয়ে উঠে খাবার চাইবে। অবশ্য এই সামান্য খাবারে ওর পেট ভরবে না। কিন্তু এটা প্রতি বিকেলে ওর করা চাই-ই। খয়েরি মনে করে রেখে দিয়েছে কলাবতীর সঙ্গে তার প্রথম ভাব হয়েছিল এই টিফিন খাওয়া থেকেই। আজও সে যত অল্পই হোক কলাবতীর হাত থেকে টিফিন খাবেই আর কলাবতীও ওর জন্য টিফিনের ভাগ রেখে দেবেই।

আজও কলাবতী দূর থেকে দেখল ফটকের সামনে খয়েরি উঠে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। সে কাছাকাছি এলে খয়েরি ফটক দিয়ে আগে ঢুকে কয়েক পা গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে তারপর সঙ্গে সঙ্গে যাবে সদর দরজা পর্যন্ত। এটাই রোজ হয়ে থাকে। কলাবতী ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকল। তার পিছু নেওয়া লোকটি ফটক পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল, দু'পাশে ও ভেতরে তাকিয়ে দেখে নিল লোকজন আছে কিনা। রাস্তা দিয়ে দু'-চারজন যাচ্ছে বটে কিন্তু ভেতরের বাগানে একটা কুকুর ছাড়া আর কাউকে সে দেখতে পেল না। লোকটা চট করে ফটক পেরিয়ে ঢুকল।

"অ্যাই অ্যাই, দাঁড়াও তো।"

কর্কশ গলায় ধমকের মতো কথাগুলো শুনে অবাক কলাবতী ঘুরে দাঁড়াল। চকরাবকরা হাওয়াই শার্ট পরা, বেঁটে, কালো বিশ্রী মুখের একটা লোককে সে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল।

"কী বলেছ তুমি পুলিশকে, অ্যাঁ?" লোকটা বাঁ হাতে কলাবতীর ব্লাউজের কলার ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিল। কলাবতীর গলায় ও ঘাড়ে ব্যথা লাগল। তার মধ্যেই সে "গর্‌র্‌র্‌" একটা আওয়াজ শুনতে পেল।

লোকটা কলার ছাড়েনি। আরও দু'-তিনবার ঝাঁকুনি দিয়ে চাপা গলায়

হিংস্র স্বরে বলল, "কী বলেছ, অ্যাঁ কী বলেছ?"

কলাবতী বুঝে গেছে গায়ের জোরে সে এই গুন্ডার সঙ্গে পারবে না। মুখটা নিচু করে সে গুন্ডার হাতটা কামড়ে ধরল সজোরে। দাঁত বসে গেল আঙুলের ওপর দিকে।

"আহ্হ্হ।" চিৎকার করে উঠেই গুন্ডাটা ডান হাতে কলাবতীর গালে ঘুসি মারল। টলে পড়ে গেল কলাবতী। পড়ার সময় তার কানে এল, "খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা" একটা শব্দ।

গুন্ডাটা জামা তুলে প্যান্টে গুঁজে রাখা একটা ছোরা বার করে কলাবতীর গলার কাছে ধরে বলে উঠল, "কী বলেছ পুলিশকে, কী বলেছ? না বললে এই ছোরা গলায় ঢুকিয়ে দেব।"

কলাবতী চোখে অন্ধকার দেখছে। চিৎকার করে কাউকে যে ডাকবে সে জোরও তার গলায় নেই। শুকিয়ে গেছে গলা। ছোরার ঠান্ডা ছুঁচলো আগাটা তার গলায় খোঁচা দিচ্ছে। সে হাঁটু গেড়ে বসা গুন্ডাটার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল। তার মনে হচ্ছে ছোরাটা তার গলায় সত্যিই ঢুকিয়ে দেবে। অজ্ঞান হয়ে পড়ার আগে শুনতে পেল খয়েরির গলায় যা কখনও শোনেনি এমন একটা হাড়কাঁপানো হিংস্র গর্জন—" ঘউউঅউঅউ।"

গুন্ডাটার ডান পায়ের ডিমের কাছটায় খয়েরি কামড়ে ধরে মুখটা ঝাঁকাচ্ছে। প্যান্টের মধ্য দিয়ে তার দাঁত বসে গেছে মাংসে। ছোরা ধরা হাতটা সে ঘুরিয়ে সজোরে চালাল খয়েরির উদ্দেশে। ছোরাটা লাগল খয়েরির সামনের বাঁ পায়ের থাবার ওপরে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে বেরোল। কিন্তু খয়েরি তার কামড় আলগা করল না।

ঠিক এই সময় বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অপুর মা। চোখের সামনে কলাবতীকে শুয়ে থাকতে, একটা লোককে ছোরা হাতে এবং খয়েরি তাকে কামড়ে ধরে আছে দেখে সে তার বিখ্যাত আকাশ ফাটানো গলায় চিৎকার করে উঠল, "ওগো কে কোথায় আছ গো, ডাকাতে কালুদিদিকে মেরে ফেলল গো।" বলতে বলতে অপুর মা ছুটে গেল গুন্ডাটার দিকে। চিৎকার শুনে রাস্তা দিয়ে যাওয়া দুটি লোক ফটকের সামনে থমকে দাঁড়াল, গাড়ি বারান্দায় ছুটে এলেন রাজশেখর। অপুর মা একটা আধলা ইট কুড়িয়ে নিয়ে ছুটল গুন্ডাটার দিকে।

গতিক সুবিধের নয় বুঝে, কুকুরের কামড়ের যন্ত্রণা এবং সেকেলে ডাকাতদের মতো পিলে চমকানো হাঁক দিয়ে আসা রণরঙ্গিণী মূর্তিটিকে দেখে

গুন্ডাটি ফটকের দিকে দৌড় দিল। খয়েরি তাড়া করতে গিয়ে কয়েক পা দৌড়ে লুটিয়ে পড়ল। রাজশেখর তাঁর দোনলা বন্দুকে কার্তুজ ভরে আবার যখন গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তখন অপুর মা'র ছোড়া ইটটা ফটকের লোহার গরাদে লেগে 'ঠং' করে শব্দ তুলেছে আর গুন্ডাটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে তখন রাস্তা দিয়ে দৌড়োচ্ছে এবং একদল লোক তার পেছনে ছুটছে।

কলাবতীর জ্ঞান একটু পরেই ফিরে এল। প্রথমেই সে বলল, "খয়েরি কোথায়?"

মুরারি কলাবতীকে দাঁড় করিয়ে পিঠ থেকে স্কুলব্যাগটা খুলে নিয়ে বলল, "অপুর মা ওকে তুলে ঘরে নিয়ে গেছে, কত্তাবাবু পুলিশ আর ডাক্তারকে ফোন করছেন, তুমি কি পারবে আস্তে আস্তে হেঁটে বৈঠকখানা পর্যন্ত যেতে?"

"আমার হয়েছে কী যে, পারব না?" এই বলে কলাবতী সটান হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। অপুর মা তার নিজের ঘরের মেঝেয় খয়েরিকে শুইয়ে একটা ন্যাকড়া দিয়ে পা-টা বেঁধে রেখেছে। কলাবতী ঘরে ঢুকতেই খয়েরি মুখ তুলে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লেজটা নাড়ল। ওর বাঁ পায়ের থাবাটা কেটে ঝুলে পড়েছে।

রাজশেখর ঘরে ঢুকে বললেন, "ডাক্তার গুপ্ত অর্থোপেডিক সার্জন। তাকে ফোন করে পেলুম না, এখন কী করি?"

কলাবতী বলল, "উনি তো মানুষের ডাক্তার। এখন দরকার ভেটারিনারি সার্জন, তুমি বরং বড়দিকে ফোন করো, মঙ্গলাকে যে ডাক্তার দেখেন তাঁকে কল করো।"

রাজশেখর ফোন করলেন মলয়াদের বাড়িতে। ফোন ধরলেন মলয়ার বাবা হরিশঙ্কর মুখুজ্জে।

"বলছিস কী রে রাজু, একটা নেড়িকুত্তার চিকিচ্ছের জন্য মঙ্গলার ডাক্তারকে চাই! অবাক করলি। বাড়িতে গেলে ডাক্তার পাল তিনশো টাকা নেন। দিবি?"

"হরি, তিনশো বলছিস কী রে, তিন হাজার, তিন লক্ষ দেব। এই নেড়ি কুত্তাটাকে বাঁচাতেই হবে। ও আমার একমাত্র নাতনির প্রাণরক্ষা করেছে। হরি এসব বোঝার মতো ঘিলু তোর মাথায় নেই। মলু কোথায়, ফোনটা ওকে দে।"

আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার পালকে নিয়ে মলয়া হাজির হল সিংহিবাড়িতে।

শেষবার সে এ বাড়িতে এসেছিল মাধ্যমিকে থার্ড স্ট্যান্ড করে রাজশেখরকে যখন প্রণাম করতে আসে। ডাক্তার পাল খয়েরির পা দেখে বললেন, হাড় ভেঙেছে, অপারেশন করে ঠিক করতে হবে।

লোকাল অ্যানাসথেসিয়া করে ডাক্তার পাল ভাঙা হাড় জুড়লেন। সারাক্ষণ অপুর মা'র কোলে মাথা রেখে খয়েরি ঘরের লোকেদের মুখগুলো শুধু দেখে গেল। তার মুখ দেখে মনে হল সে যেন বুঝতে চাইছে—আমাকে নিয়ে আবার এত বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে কেন!

অপুর মা বলল, "ডাক্তারবাবু খয়েরি মা হবে, ওর পেটের বাচ্চাদের কোনও ক্ষেতি হবেনি তো?"

খয়েরির পায়ে প্লাস্টার করতে করতে ডাক্তার বললেন, "কোনও ক্ষতি হবে না। তবে বোধহয় খোঁড়া হয়ে যাবে। অসম্ভব শান্ত আমাদের দিশি কুকুররা। পৃথিবীর যে-কোনও দেশের কুকুরদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। আপনি কিছু ভাববেন না।" ডাক্তার পাল খয়েরির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন।

সেই গুন্ডাটি পালাতে গিয়ে সিংহিবাড়ির কাছেই জনতার হাতে ধরা পড়ে এবং গণপ্রহারে মারা যায়। পুলিশ একজনও ডাকাত ধরতে বা ছ'লাখ টাকা উদ্ধার করতে এখনও পারেনি।

পায়ে প্লাস্টার করা খয়েরি আশ্রয় পেল সিংহিবাড়ির ভেতরে একতলায় সিঁড়ির নীচে। আগে ওই জায়গায় সত্যশেখরের প্রিয় জার্মান শেফার্ড কুকুর হিটলার থাকত। জায়গাটাকে সে বলত, 'হিটলারের বাঙ্কার'। পঁচিশ বছর পর বাঙ্কারে এল আদ্যন্ত বাঙালি খয়েরি, তবে দেড়মাসের জন্য। পায়ের প্লাস্টার কাটার পর ক্ষতস্থান শুকোতেই সে আবার ফিরে যায় নিজের আস্তানা ফিটনের ঘরে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে বাগানে ঘুরে বেড়ায় আর ফটক পর্যন্ত গিয়ে কলাবতীর জন্য বিকেলে অপেক্ষা করে।

সকালে খাওয়ার টেবলে একবাক্স দানাদার দেখে সবাই অবাক! মুরারি মাথা চুলকে বলল, "অপুর মা'র কাণ্ড। বলল মুরারিদা এমন একটা শুভদিনে সবাইকে মিষ্টিমুখ না করালে কি চলে?. ও দশটা টাকা দিল, আমিও দশটা টাকা দিলুম।"

রাজশেখর অবাক হয়ে বললেন, "কীসের শুভদিন?"

সত্যশেখর আর কলাবতী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল মুরারির দিকে। একবার দরজার দিকে তাকিয়ে মুরারি বলল, "কত্তাবাবু, আপনার আটঘরার মেয়েই বলুক। আয় রে খবরটা তুই দে।"

অপুর মা ঘরে ঢুকে কোনও ভণিতা না করে যথাসম্ভব তার বিখ্যাত গলাটা চেপে বলল, "খয়েরি আজ ভোরে মা হয়েছে, পাঁচটা বাচ্চা।"

কলাবতীর আগেই রাজশেখর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সত্যশেখর বাক্স থেকে দানাদার তুলে মুখে ঢোকাতে গিয়ে থমকে বলল, "পাঁচ-পাঁচটা?"

"সতু, তোমার কাছে তো নগদ টাকা থাকে না কিন্তু এখন কি তোমার পকেটে কয়েকটা টাকা আছে চন্দ্রপুলি কেনার মতো?" রাজশেখর গম্ভীর সিরিয়াস গলায় বললেন।

সত্যশেখর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা নোট বার করে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "বাবা শ' তিনেক হবে।"

"মুরারি, ফেলু ঘোষের দোকানে এক্ষুনি যা। চন্দ্রপুলি বাসি হলেও নিয়ে নিবি, না থাকলে কড়াপাক। ফেরার সময় অর্ধেকটা মলয়াকে দিয়ে খবরটা দিবি।"

এরপর সারা সিংহিবাড়ি ফিটনের ঘরে গিয়ে হাজির হল। একটা চটের ওপর খয়েরি হাত-পা ছড়িয়ে পাশ ফিরে শুয়ে। কালো খয়েরি সাদা লোমের, ধাড়ি ইঁদুরের সাইজের পাঁচটা চোখ-না-ফোটা বাচ্চা তার বুকের কাছে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। কলাবতী একটা বাচ্চা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই অপুর মা ধমকে উঠল, "হাত দিউনি, গায়ে নোনা লাগবে। আর একটু বড় হোক।"

সত্যশেখর বলল, "একটা বেবি কটে বাচ্চাগুলোকে রাখলে কেমন হয়, কালু কী বলিস?"

"অপুর মাকে জিজ্ঞেস করো।"

কথাটা বুঝে নিয়ে অপুর মা বলল, "কটমট আবার কী, মায়ের পাশে না থাকলে ওরা দুধ খাবে কী করে?"

সন্ধ্যায় ফোন এল কলাবতীর কাছে, করেছে মলয়া। তার গলায় দুশ্চিন্তা, "কালু, কাল রাত থেকে মঙ্গলার লেবার পেন উঠেছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ডাক্তার পাল দুপুরে এসেছিলেন, বললেন আরও চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করে দেখতে, না হলে সিজারিয়ান করবেন।"

"বড়দি শুনেছেন তো খয়েরির বাচ্চা হয়েছে, পাঁচটা।" উচ্ছ্বাস চেপে কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে কলাবতী বলল। মঙ্গলার কষ্টের কথা শোনার পর আনন্দ প্রকাশ করা যায় না।

"বাচ্চা হওয়ার খবর তো সকালেই মুরারি দিয়ে গেছে, সেইসঙ্গে সন্দেশও। কেমন আছে খয়েরি; বাচ্চারা দেখতে কেমন হয়েছে?"

"মায়ের মতো অত সুন্দর কেউ নয়।"

"আমার মন খুব খারাপ। কাল স্কুলে যাব না। মঙ্গলার কাছেই সারাক্ষণ রয়েছি, বেচারা খালি কাঁদছে। কী যে হবে জানি না।" মলয়া ভিজে গলায় কথাগুলো বলে ফোন রেখে দিল।

পরদিন সকালে কলাবতী মলয়াকে ফোন করে জানল, মঙ্গলার কষ্ট আরও বেড়েছে। ডাক্তার বলেছেন আর দেরি নয়, বাড়িতেই সিজারিয়ান অপারেশন করবেন। একতলায় একটা ফাঁকা ঘর আছে, সেখানে একটা বড় টেব্‌ল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ডাক্তারের সঙ্গে থাকবেন দু'জন সহকারী। মঙ্গলার হার্টের অবস্থা খুব ভাল নয়।

কলাবতী ভাবল স্কুল ছুটির পর মঙ্গলাকে দেখে আসবে। ছুটির পর মলয়াদের বাড়ির দিকে কিছুটা হেঁটে হঠাৎ কী এক অজানা ভয় তার মনে ধরল। সে আর না এগিয়ে বাড়ি ফিরে এল। ফটকে আজ খয়েরি তার অপেক্ষায় ছিল না। সে ফিটনের ঘরে গিয়ে দেখল পাঁচটা বাচ্চা জড়ামড়ি করে একের ঘাড়ে অন্যজন ওঠার চেষ্টা করছে। দুটো বাচ্চা খুবই রুগ্‌ণ, বোধহয় বাঁচবে না। খয়েরি জিভ দিয়ে ওদের গা চেটে চলেছে। কলাবতীকে দেখে শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল। খয়েরির ভাতের থালাটা পরিষ্কার একটা কণাও পড়ে নেই। সে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে টিফিনবক্স বার করল। খয়েরির লেজ নড়ে উঠল।

সন্ধ্যায় ক্ষুদিরামবাবুর কাছে কলাবতী যখন পড়ছে তখন মলয়াদের বাড়ি থেকে ফোন এল, ধরলেন রাজশেখর। অপর প্রান্তে মলয়ার গলায় তিনি শুনলেন শুধু একটি বাক্য, "জ্যাঠামশাই মঙ্গলা আর নেই।" এরপর হাউহাউ করে কান্নার শব্দ এবং ফোন রেখে দেওয়া।

রাজশেখর খবরটা বাড়ির কাউকে তখন দিলেন না। কলাবতীর পড়া শেষ হওয়ার পর তিনি তাকে ডেকে বললেন, "সতুকে গাড়ি বার করতে বল কালু, হরির বাড়িতে যাব। মঙ্গলা মারা গেছে।"

শোনামাত্র কলাবতীর মুখ থেকে আর্তনাদের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে

এল। সে ছুটে গেল কাকার সেরেস্তায়। একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে সত্যশেখর দোতলায় উঠে এল। "বাবা এ কী শুনছি?"

"মলয়া ফোন করে আমায় জানিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।" ধীর স্তিমিত গলা রাজশেখরের।

দশ মিনিটের মধ্যে ওঁরা তিনজন মলয়াদের বাড়ি পৌঁছোলেন। রাজশেখর তিরিশ বছর আগে হরিশঙ্কর মুখুজ্জের মায়ের শ্রাদ্ধে শেষবার এই বাড়িতে এসেছিলেন তারপর আজ এলেন। বাড়ির বাইরের আলোগুলো নেভানো। ভেতরেও টিমটিম করছে একটি-দুটি। সাড়াশব্দ নেই কোথাও।

"আয়।" হরিশঙ্কর ডাকলেন রাজশেখরকে, নিয়ে বসালেন বৈঠকখানায়।

"মলয়া কোথায়?" রাজশেখর নিচুগলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"পাশের ঘরে।"

সত্যশেখর আর কলাবতী পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, মঙ্গলাকে টেব্‌লেই শুইয়ে রাখা হয়েছে গলা পর্যন্ত একটা সাদা চাদরে ঢেকে। তার পাশে দাঁড়িয়ে মলয়া হাত বুলিয়ে যাচ্ছে মৃত মঙ্গলার মাথায়।

ঘরের একধারে একটা বড় প্লাস্টিকের গামলায় মঙ্গলার বাচ্চারা স্তূপ হয়ে রয়েছে। পলতে পাকানো ন্যাকড়া গোরুর দুধে ডুবিয়ে চাকর চেষ্টা করছে ওদের খাওয়াতে। কয়েক ঘণ্টা বয়সি বাচ্চারা পারছে না পলতে চুষে দুধ খেতে।

কলাবতী ফিসফিস করে চাকরটিকে জিজ্ঞেস করল, "ক'টা বাচ্চা হয়েছে?"

"সাতটা। তার মধ্যে দুটো মরা।"

"এভাবে কি ওরা খেতে পারে? ড্রপারে করে খাওয়াতে হবে।" কলাবতী পরামর্শ দিল।

"চেষ্টা করেছি, মুখ থেকে ফেলে দিল।" চাকরটির অসহায়ত্ব গলায় ফুটল।

সত্যশেখর বলল, "ফিডিংবটলে করে খাইয়ে দেখা যেতে পারে। তুমি দৌড়ে স্টেশনারি দোকান থেকে একটা কিনে আনো।"

মানিব্যাগ থেকে সে টাকা বার করে দিল। রাজশেখর ঘরে এলেন, সঙ্গে হরিশঙ্কর। মলয়ার মাথায় হাত রেখে রাজশেখর বললেন, "মঙ্গলা যাদের রেখে গেল এবার তাদের তো দেখতে হবে। ওদের মধ্য দিয়েই মঙ্গলা বেঁচে থাকবে।"

মুখ ফিরিয়ে মলয়া গামলাটার দিকে তাকাল। তার চোখ দিয়ে টপটপ জল ঝরে পড়ল। চাকরটি একটি দুধ খাওয়াবার ফিডিং বটল আনল। তাতে দুধ ভরে সে নিপ্‌লটা একটা বাচ্চার মুখে ঢোকাল। কিন্তু অত বড় আর মোটা নিপ্‌ল মানুষের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার জন্য। অতটুকু সদ্যোজাত কুকুরের বাচ্চা চুষে দুধ বার করতে পারল না।

"তা হলে কী হবে?" হরিশঙ্কর দুশ্চিন্তায় পড়লেন। "এরা তো না খেয়ে মারা যাবে।"

গামলার মধ্যে পাঁচটা দৃষ্টিহীন বাচ্চা নড়াচড়া করছে, কলাবতীর মনে হয় ওরা খিদেয় ছটফটাচ্ছে। কিন্তু কীই-বা তারা এখন করতে পারে! বাচ্চাগুলো না খেতে পেয়ে হয়তো একে-একে মরে যাবে। এ-কথা ভেবে তার চোখে জল এসে গেল। সে আর এখানে থাকতে চাইল না, রাজশেখরকে কানে কানে বলল, "দাদু বাড়ি চলো।"

ওরা বাড়ি ফিরে আসতেই অপুর মা ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল, মঙ্গলা মারা গেল কেন? কলাবতী তাকে কারণটা বলল, হার্টফেল। তারপর অপুর মা জিজ্ঞেস করল, "বাচ্চাক'টার কী হবে?"

মনের কষ্ট চেপে কলাবতী উদাসীন ভাবে বলল, "কী আবার হবে, মায়ের দুধ না পেয়ে একসময় মরে যাবে।"

অপুর মা অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "সে কী। মরে যাবে কেন? এই তো আমি দিব্যি বেঁচে আছি। আমাকে জন্মো দিয়েই তো মা মরে গেল। সেই সময় মাসির ছেলে হয়েছে। মাসিই তো আমাকে আর নিজের ছেলেকে একসঙ্গে বুকের দুধ খাওয়াত।"

"তুমি বলতে চাও কী?" কলাবতীর খটকা লাগল কথাগুলো শুনে। নিশ্চয় কিছু একটা ভেবে অপুর মা কথাটা বলল।

"বলতে চাই খয়েরিকে মঙ্গলার বাচ্চাদের কাছে নিয়ে যাও।" দু'হাত শূন্যে তুলে কলাবতী চেঁচিয়ে উঠল, "দি আইডিয়া।" সে ছুটে গেল সত্যশেখরের ঘরে। "কাকা, প্রবলেম সলভ্‌ড। এখনই খয়েরিকে নিয়ে যেতে হবে বড়দির বাড়ি, মঙ্গলার বাচ্চাদের ও দুধ খাওয়াবে। এটা অপুর মা'র সাজেশন। আবার তুমি গাড়ি বার করো।"

ফিটনের ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে হাজির হল অপুর মা আর কলাবতী। খয়েরি কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। বাচ্চারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমোচ্ছে। খয়েরি উঠে দাঁড়াল ওদের দেখে।

অপুর মা ডাকল, "খয়েরি, আয় আমার সঙ্গে।" কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে আবার ডাকল। "আয়, আয়।"

খয়েরি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অপুর মা'র পিছু নিল। কলাবতী তাকে পাঁজাকোলা করে মোটরে তুলল। ইতিমধ্যে রাজশেখর টেলিফোনে হরিশঙ্করকে জানিয়ে দিয়েছেন খয়েরিকে নিয়ে কালু আর অপুর মা যাচ্ছে। ওরা পৌঁছেই দেখল দরজার ব্যগ্র মুখে হরিশঙ্কর দাঁড়িয়ে তাদের জন্য।

গাড়ি থেকে নেমেই খয়েরি মুখ তুলে "ঘৌ উ উ উ উ" ডাক দিল। কলাবতীর মনে হল ও মঙ্গলাকে যেন বলছে আমি এসেছি। গামলাভরা বাচ্চাগুলিকে বৈঠকখানায় এনে রাখা হয়েছে। খয়েরি এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে প্রথমে শুঁকল, তারপর কলাবতী আর অপুর মা'র দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল। অপুর মা ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে চাপ দিয়ে কাত করে শুইয়ে দিল। তারপর সে গামলা থেকে একটি একটি করে বাচ্চা তুলে খয়েরির বুকের কাছে রেখে দিল। ক্ষুধার্ত বাচ্চাগুলো আঁকুপাঁকু করে হামলে পড়ল খয়েরির ওপর। মাথা ঘুরিয়ে খয়েরি ওদের গা চাটতে শুরু করল।

হরিশঙ্কর পাশের ঘর থেকে মলয়াকে ডেকে আনলেন দেখার জন্য। বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে দেখে মলয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সত্যশেখর বলল, "এখনকার মতো তো সমস্যা মিটল, কিন্তু এর পর?"

অপুর মা বলল, "ওর নিজের তো বাচ্চা রয়েছে, তাদেরও তো দুধ খাওয়াতে হবে। অত বাচ্চাকে পারবে কি?"

হরিশঙ্কর বললেন, "খয়েরি আজ রাত্তিরটা এখানেই থাকুক, কাল সকালে ওকে দিয়ে আসব।"

তার কথামতো খয়েরি রয়ে গেল। খয়েরির বাচ্চারা সারারাত একা-একা কাটাল। খিদের জ্বালায় মাকে খোঁজার উদ্দেশ্যে ওরা ফিটনের ঘর থেকে রাত্রে বেরিয়ে আসে দরজার বাইরে। সকাল ন'টা বেজে গেল তবুও খয়েরিকে ওরা পাঠাচ্ছে না দেখে কলাবতী ফোন করল। ওধার থেকে হরিশঙ্কর বললেন, "এই পাঠাচ্ছি। খয়েরি এখন বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছে।"

ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে কলাবতী গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল। খয়েরিকে এখনও ওরা পাঠায়নি। সে অধৈর্য বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল, রাতে ওকে না রেখে এলেই হত। ওর নিজের বাচ্চাদেরও তো

খাওয়া দরকার। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল ফিটনের ঘরের দিকে। গোটা কুড়ি কাক ঘরের মাথায়, পাঁচিলের ওপর আর গাছের ডালে বসে তারস্বরে চিৎকার আর ওড়াউড়ি করে চলেছে। রেলিং-এ ঝুঁকে সে ফিটনের ঘরের দরজাটা দেখার চেষ্টা করল। যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেল। দুটো চিল ঠুকরে ঠুকরে ছিঁড়ে কী যেন খাচ্ছে।

চিৎকার করে, "দাদু, অপুর মা, মুরারিদা" বলে উঠে কলাবতী সিঁড়ির দিকে ছুটল। ছ'-সাতটা লাফে একতলায় পৌঁছে, "মেরে ফেলল, মেরে ফেলল" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিটনের ঘরের দিকে পাগলের মতো ছুটে গেল। তার পেছনে ছুটল অপুর মা, মুরারি আর এক ঠিকে ঝি।

পাঁচটা বাচ্চা নিথর হয়ে পড়ে আছে। চিল দুটো দুটো বাচ্চার পেট ঠোঁট দিয়ে চিরে নাড়িভুঁড়ি বার করে খাচ্ছে। কয়েকটা কাক চিল দুটোর তিন-চার হাত দূরে কা-কা করে ওড়াউড়ি করছে। কলাবতী এধার-ওধার তাকিয়ে একটা বাঁশের টুকরো দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে, "ভাগ ভাগ" বলে এগিয়ে গেল চিলদুটোর দিকে।

"হায় হায় হায়, এ কী সব্বোনাশ হল গো।" অপুর মা এই বলে ঝুঁকে পড়ল বাচ্চাগুলোর ওপর। "এখন আমি খয়েরির কাছে মুখ দেখাব কী করে কালুদি। ওকে তো আমিই বাচ্চাদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ও-বাড়িতে দিয়ে এনু। রেতে যদি ওকে আনতুম তাইলে এই সব্বোনাশটা হতনি গো।" অপুর মা কপাল চাপড়াতে লাগল।

মুরারি বলল, "দ্যাখ তো এখনও একটা যেন বেঁচে আছে মনে হচ্ছে।" পেটের কাছটা সাদা তা ছাড়া আগাগোড়া খয়েরি লোমের বাচ্চাটার মাথা নড়ছে, মুরারি আঙুল দিয়ে দেখাল। সন্তর্পণে আলগোছে অপুর মা বাচ্চাটাকে তুলে নিল। "দেখি বাঁচাতে পারি কি না।"

কলাবতীর তাড়া খেয়ে কাক-চিলেরা উড়ে গিয়ে ছাদের ওপর বসল। গাড়িবারান্দা থেকে রাজশেখর বললেন, "মুরারি ওখানেই মাটি খুঁড়ে ওদের কবর দিয়ে দে, খয়েরি এসে বাচ্চাদের মরামুখ যেন না দেখে।"

মৃতপ্রায় বাচ্চাটিকে অপুর মা বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল, মুরারি একটা কোদাল এনে জমি খুঁড়তে শুরু করল। কলাবতী একদৃষ্টে মরা বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে। চারটে বাচ্চাকে গর্তে শুইয়ে মুরারি মাটিচাপা দিল।

তার মিনিটখানেক পরেই মলয়ার মোটর সিংহিবাড়িতে ঢুকল। গাড়ি

থেকে নামল মলয়া আর খয়েরি। নেমেই খয়েরি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে গেল ফিটন ঘরের দিকে, ঘরের ভেতর ঢুকে বাচ্চাদের দেখতে না পেয়ে ঘরের এধার-ওধার ঘুরে ঘুরে মেঝেয় কিছুক্ষণ শোঁকাশুঁকি করে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বাচ্চাদের ডাকল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কলাবতী। মলয়া তার কাছে এসে কৈফিয়ত দেওয়ার স্বরে বলল, "বাচ্চাগুলোকে সকালে পেটভরে খাইয়ে দিয়ে ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব, এই ভেবেই খয়েরিকে রেখে দিয়েছিলুম। একটু দেরি হয়ে গেল, এবার ও নিজের বাচ্চাদের খাওয়াক।"

কলাবতী শান্ত স্বরে বলল, "তার আর দরকার হবে না বড়দি। খয়েরি তার বাচ্চাদের আর দুধ খাওয়াতে পারবে না, ওরা মরে গেছে, ওই দেখুন কবর।"

কলাবতী আঙুল তুলে যেখানটা দেখাল তার ধারেই দাঁড়িয়ে খয়েরি মুখটা আকাশের দিকে তুলে করুণ সুরে দু'বার ডাকল— "ও ঔ ঔ ঔ, অউ অউ অউ"। তারপর সে কলাবতীর কাছে এগিয়ে এল। কলাবতীর মনে হল খয়েরি যেন জিজ্ঞেস করছে—আমার বাচ্চারা কোথায়! তুমি জানো কি?

হতভম্ব মলয়াকে দাঁড় করিয়ে রেখে কলাবতী ছুটতে ছুটতে বাড়ির মধ্যে ফিরে এল। রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে সে সদর দরজার দিকে তাকাল, খয়েরি তার পিছু নিয়ে আসছে কি?

খয়েরি নয়, এল মলয়া।

"কালু, আমি মঙ্গলার বাচ্চাদের কথাই শুধু স্বার্থপরের মতো ভেবেছি, খয়েরির বাচ্চাদের কথা ভাবিনি।" অনুতপ্ত স্বরে সে বলল।

রাজশেখর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মলয়ার কথাগুলি শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, "খয়েরির মুশকিল কী জানো, ও অবোলা, মানুষের মতো কথা বলতে পারে না, পারলে অনেক কিছু বলত।"

সদর দরজার কাছ থেকে শোনা গেল, "ভুক ভুক্ ভ উ উ উ।"

রাজশেখর বললেন, "কী বলল বল তো?"

সবাই চুপ করে রইল।

"কালু ওকে ডেকে আনো, না ডাকলে তো বাড়ির মধ্যে ঢুকবে না।"

কলাবতী সদরে গিয়ে খয়েরিকে সঙ্গে করে ফিরে এল। এত চেনা মানুষকে একসঙ্গে দেখে সে লেজ নাড়তে লাগল। অপুর মা ওকে বকলশ ধরে সিঁড়ির নীচে টেনে নিয়ে গেল, "এই নে তোর বাচ্চা, ওকে বাঁচিয়ে তোল।"

রাজশেখর বললেন, "অপরাধ যা হওয়ার তা তো হয়েছেই, আর সংশোধন করতে পারে বলেই মানুষকে মানুষ বলা হয়। মলু তোমার বাড়ির বাচ্চাগুলোকে এবার বাঁচাতে হবে, ওরা যেন না মরে যায়। এই বাড়িতে ওর পা গেল, বাচ্চাদের হারাল, আর নয়—এবার খয়েরিকে তুমি নিয়ে যাও।"

অপুর মা জুড়ে দিল, "সঙ্গে ওর বাচ্চাটাকেও নিয়ে যেয়ো।"

মলয়া তাই নিয়েই বাড়িতে ফিরল।

ছ'মাস পর পূর্ব কলকাতা ক্রিকেট ক্লাব লখনউ, কানপুর, দিল্লি দু'সপ্তাহের জন্য সফরে যাচ্ছে আটটি ম্যাচ খেলতে। কলাবতীকে হাওড়া স্টেশনে মোটরে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে সত্যশেখর, সঙ্গে ধুপুও চলেছে। সিংহিবাড়ি থেকে গাড়ি বেরোতেই কলাবতী বলল, "কাকা একবার বড়দির বাড়ি হয়ে যাবে, এখনও তো ট্রেনের জন্য হাতে অনেক সময় রয়েছে।"

সত্যশেখর বলল, "বড়দির বাড়িতে আবার কেন!"

কলাবতী বলল, "খয়েরিকে একবার দেখব।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সত্যশেখর বলল, "যাবি তো, তারপর বড়দি যদি তোর খেলতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়? দেড়শো গ্রাম ওজনের লোহার মতো শক্ত বল ঘণ্টায় তিরিশ-চল্লিশ মাইল স্পিডে আসবে, সেই বল ধরতে তোকে বারণ করেছিল না?" গাড়িটা মলয়াদের বাড়ির পথে ঘুরিয়ে সত্যশেখর বলল।

"সেই বড়দি এখন আর নেই, একদম বদলে গেছে। আমি প্র্যাকটিসে ঠিকমতো যাচ্ছি কিনা বড়দার কাছে প্রায়ই খোঁজ নেন।"

মলয়াদের বাড়ির ফটক দিয়ে গাড়িটা ঢুকে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল। গাড়ির শব্দে দোতলার বারান্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে তিনটি অ্যালসেশিয়ান ও একটি দেশি কুকুরের মুখ বেরিয়ে এল। মোটর থেকে নামল শুধু কলাবতী। তাকে দেখেই ওরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। কলাবতী কলিং বেল বাজাতে কাজের লোক এসে দরজা খুলল।

"বড়দি, কী করছে?"

"বেরিয়েছেন।"

"খয়েরি কোথায়?"

"ঘুমোচ্ছে।"

ভৃত্যটির কথা শেষ হওয়ামাত্র কলাবতীর কানে এল ভেতরের ঘর থেকে

"ভুক ভুক ঘৌ উ উ উ" একটা চাপা ডাক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল খয়েরি। কলাবতীকে দেখেই সে ছুটে এসে সামনের দু' পা তুলে দিল ওর কোমরে। কলাবতী মুখ নামাল, খয়েরি ওর গাল চেটে কুঁই কুঁই শব্দ করে লেজ নাড়তে লাগল, কান দুটো ঘাড়ে মিশিয়ে দিয়ে। কলাবতী আড়চোখে দেখল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে পাঁশুটে ও কালো রঙের একটু বড়সড় চেহারার পাঁচটি আর তাদের মাঝে ছোটখাটো চেহারার খয়েরি কিন্তু পেটের কাছে সাদা রঙের একটি কুকুর। এখন আর ওদের বাচ্চা বলা যায় না। ওরা নেমে এসে খয়েরির পেছনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে।

বাইরে থেকে গাড়ির হর্নের শব্দ এল।

"এখন কেমন আছিস?" কলাবতী জানতে চাইল খয়েরির গলা জড়িয়ে ধরে।

"উ।"

"এবার আমি যাই। আবার আসব।"

"ঘেউ ঘেউ।"

দরজা থেকে বেরিয়ে কলাবতী পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, ছ'টি সন্তান নিয়ে খয়েরি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

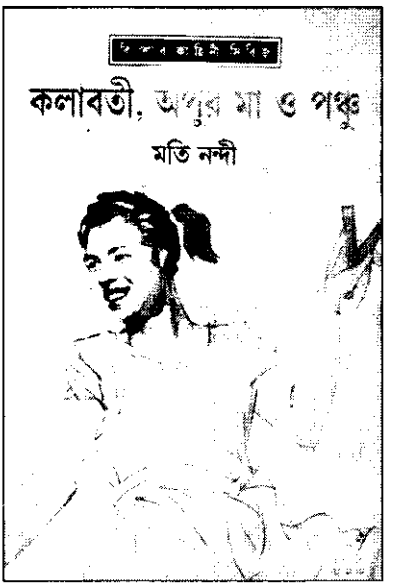

কলাবতী, অপুর মা ও পঞ্চু

সিংহিবাড়িতে গুলতির প্রবেশে বড়ির ভূমিকা

স্কুল থেকে ফিরে কলাবতী স্কুলের ব্যাগটা—যেটাকে দাদু রাজশেখর মাঝে মাঝে বলেন 'গন্ধমাদন' এবং কলাবতীকে 'হনুমান'— টেবলে নামিয়ে রেখে চেয়ারে ধপ করে বসে মুখ তুলে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, "উফফ্ কী গরম রে বাবা!...পাখাটা একটু বাড়িয়ে দেবে পিসি?"

অপুর মা রেগুলেটর বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "একটু জিরিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, ততক্ষণে পেঁপেটা কেটে আনি।"

"পেঁপে!" কলাবতী সিধে হয়ে বসল। এই ফলটি তার খেতে একদমই ভাল লাগে না।

"আটঘরা থেকে দিয়ে গেছে। পেঁপে, সজনে ডাঁটা, চালতা, কচু, মত্তোমান কলা, পটল, আরও কত কী।"

"এত জিনিস খাবে কে?"

অপুর মা ঠোঁট মুচড়ে বলল, "খাওয়ার লোকের অভাব? একা মুরারিদাই তোমার কাকার সঙ্গে তিনদিনে শেষ করে দেবে।"

"আমার খিদে নেই।" গম্ভীর মুখে কলাবতী বলল।

"খিদে নেই? রোজ এই এক কথা। কী খেয়েছ টিপিনে? হজমি, চাটনি আচার, আলুকাবলি, ঝালমুড়ি?"

"একটাও না। ধুপুকে আজ ওর মা সঙ্গে দিয়েছিল খিচুড়ি। কাদা কাদা নয়, শক্ত শক্ত বেশ ঝরঝরে অনেকটা পোলাওয়ের মতো, বলল ভুনি খিচুড়ি। হটপট থেকে চামচে তুলে তুলে খাচ্ছে—"

"আর তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলে।" অপুর মা'র চোখে দপদপ করল ধিক্কার। সেটা অগ্রাহ্য করে কলাবতী বলল, "দেখছিলুমই তো। দেখব না? কী জিনিস।"

"কেন তুমি কি কখনও খাওনি? এই তো ক'দিন আগে ভাদ্দর মাসে ছোটবাবু বললেন বিষ্টি হচ্ছে আজ খিচুড়ি খাব। করে দিলুম, বেগুনিও করলুম।"

"সে তো গত বছর অগাস্ট মাসে। সেটা ছিল বেঙ্গলি খিচুড়ি কিন্তু এই ভূনি খিচুড়ি? ধুপু যখন এক চামচ মুখে ঢোকাচ্ছে আর একটা করে বড়িভাজা মুখে নিয়ে মড়মড় করে চিবোচ্ছে, কী বলব পিসি ওর চোয়ালদুটো কী বিউটিফুলি নড়াচড়া করছিল আর মড়মড় সাউন্ডটা!" কলাবতী বড়ি চিবোনোর শব্দ চোখ বন্ধ করে শুনে বলল, "আমি আর থাকতে পারলুম না।"

"তুমি অমনি চেয়ে বসলে।"

"চাইবই তো। আমার প্রাণ যে চাইছিল। কাকা তো আমাকে বলেই দিয়েছে, 'কালু আত্মাকে কখনও কষ্ট দিবি না, দিলে ভগবানও তোকে কষ্ট দেবেন। ফুচকা, চিকেনরোল খেতে তোর আত্মা যখনই চাইবে তখুনি খাবি। চকোলেট, আইসক্রিমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এসব খাওয়ার অপকারিতা নিয়ে যদি মাথা ঘামাতে চাস তা হলে বুড়ো বয়সে ঘামাবি, এখন যা পারিস সাঁটিয়ে যা।' পিসি আমি কিন্তু ধুপুর কাছে চাইনি। ও আমার মুখ দেখে নিজেই বলল, কালু একটু খেয়ে দেখবি? তখন যেসব কথা ভদ্রতা করে বলতে হয়, বললুম। ধুপু আমার থেকেও এককাঠি, দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করে বলল, ঠিক আছে, খেতে হবে না। পড়লুম বিপদে। তাড়াতাড়ি বললুম, মাসিমার হাতের তৈরি বড়ির কি অমর্যাদা করা যায়? বলব কী পিসি, সে কী বড়িভাজা! মোহন্তর পকৌড়িও সেই বড়ির ধারেকাছে আসে না।" কথাগুলো বলার সঙ্গে কলাবতী জিভ দিয়ে টাকরায় চকাত চকাত শব্দ তৈরি করল।

শুনতে শুনতে কালো হয়ে এল অপুর মা'র মুখ। গম্ভীর থমথমে মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল, "পেঁপেটা নিশ্চয় মুখে রুচবে, ওটা আমার রান্না করা নয়।"

কলাবতী বুঝে গেল পিসি দারুণ চটেছে, কারও রান্নার প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। ও চায় সবাই ওর রান্নারই গুণগান করুক। আর সত্যি সত্যিই অপুর মা'র রান্নার হাতটা ভাল, বিশেষ করে নিরামিষ রান্নার। সেজন্য রাজশেখরের চাপা একটা গর্বও আছে। হাজার হোক অপুর মা তাঁরই গ্রামের মেয়ে।

আটঘরায় সিংহদের জমিদারি সেরেস্তায় অপুর মা'র ঠাকুরদা কানাই মোদক ছিল লেঠেলদের সর্দার। বকদিঘির মুখুজ্জেদের সঙ্গে জমি দখল নিয়ে একবার লাঠালাঠি করতে গিয়ে হাঁটু ভেঙে খোঁড়া হয়ে যায়। তখন তাকে করা হয় রাজশেখরের বাবার খাস ভৃত্য।

অপুর মা'র বাবা সাতকড়ি তখন এগারো বছরের। সমবয়সি সাতকড়ির কাছেই রাজশেখর গুপিসায়রে সাঁতার শেখেন। তাঁর সাইকেল চালানোর শিক্ষাতেও সাতকড়ির হাত ছিল। একদিন কামরাঙা পাড়তে গাছে ওঠেন। ডালে জড়িয়ে ছিল একটা গোখরো সাপ। ফণা তুলে স্থির হয়ে তিন হাত দূর থেকে রাজশেখরকে লক্ষ করতে থাকে। সেই সময় ধাক্কা দিয়ে সাতকড়ি ফেলে না দিলে কী যে হত, তাই ভেবে এখনও তিনি শিউরে ওঠেন। গাছে চড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল, তাই ব্যাপারটা দু'জনেই চেপে যায়। সাতকড়ি যুবক হয়ে উঠতেই কানাই তাকে তারকেশ্বরে ডাল-মাছ-ভাতের একটা ছোট্ট পাইস হোটেল করে দেয়। অপূর্ব রান্নার হাত ছিল সাতকড়ির। একবার যে ধোঁকার ডালনা কি চালতা দিয়ে টকের ডাল খেয়েছে তাকে আবার করুণাময়ী হোটেলে খেতে আসতে হবেই। এই করুণাময়ীই অপুর মা।

সাতকড়ি নিজের হাতে মেয়েকে রান্না শেখায়, বিয়ে দেয় তিন ক্রোশ দূরের এক পাঠশালার শিক্ষকের সঙ্গে, কিছু জমিজমা যৌতুক দিয়ে। তারকেশ্বরের হোটেলটি মৃত্যুর আগে সাতকড়ি দিয়ে যায় তিন ছেলেকে। দু'বছরের মধ্যেই রান্নার সুনাম হারিয়ে হোটেলের লোকসান শুরু হয়, তৃতীয় বছরেই ছেলেরা হোটেল বিক্রি করে নিজেদের মধ্যে টাকা ভাগ করে নিয়ে তারকেশ্বর বাজারে মাছ আর আলু বেচতে বসে যায়, তৃতীয়জন চায়ের দোকান দেয় বাজারেই।

ইতিমধ্যে করুণাময়ী বিধবা হয়ে আটঘরায় ফিরে এসেছে। তিন ভাইয়ের ভিন্ন সংসার। বোনকে তারা একটা ঘর ছেড়ে দিল থাকার জন্য, কিন্তু খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিল না। যেটুকু নিজস্ব জমিজমা করুণাময়ীর ছিল তাই দিয়ে সারা বছরের খরচ চালিয়ে অপুকে স্কুলে পড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না, তখন সে খুঁজতে শুরু করে ভদ্রগোছের কোনও কাজ।

রাজশেখর বছরে একবার আটঘরায় আসেন জমি পুকুর বাগানের বিলি বন্দোবস্তের জন্য। আগের মতো বিশাল জমিদারি আর নেই তাই নেই নায়েব, পাইক, গোমস্তাদের বাহিনী। এখন শচীন হালদার নামে একজন কর্মচারী সম্পত্তির তদারক আর দু'জন ভৃত্য আর মালি বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ

করে। বছরে একবার দু'বার আনাজ সবজি মাছ ফল ইত্যাদি তারা কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসে।

চারদিনের জন্য রাজশেখর আটঘরায় আসবেন খবর পাঠিয়েছেন। সিংহিবাড়িতে ধুম পড়ে গেল ঝাড়পোঁছের, বাগানের ঝোপজঙ্গল সাফ হল। কিন্তু রাজশেখরকে রান্না করে খাওয়াবে কে? গত বছর অস্থায়ী রাঁধুনির কাজ করেছিল মিষ্টির দোকানের যতীন। এখন সে মিষ্টি বানানোর চাকরি নিয়ে শ্রীরামপুর চলে গেছে। শচীন হালদার দু'দিন হন্যে হয়ে খুঁজে না পেয়ে খোঁজার দায়িত্বটা দিলেন স্ত্রীকে। তিনি আধঘণ্টার মধ্যে হাজির করলেন করুণাময়ীকে।

আটঘরা পৌঁছোনোর পর দুপুরে দোতলার দালানে ভাত খেতে বসে রাজশেখর চোখ কপালে তুললেন। মুহূর্তে মনে পড়ে যায় তাঁর ছোটবেলার কথা। এই বগি থালায় ঠিক এই জায়গায় মায়ের হাতে তৈরি পশমের রঙিন ফুল-তোলা আসনে বসে তার বাবা ভাত খেতেন। থালার মাঝখানে স্তূপ করে থাকত জুঁইফুলের মতো ভাত, ভাতের পাশে দু'-তিনরকমের ভাজা, থালা ঘিরে চার-পাঁচটা বাটি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন শচীন। রাজশেখর জিজ্ঞেস করলেন, "এই আসনটা পেলে কোথায় আর থালাবাটিগুলো?"

শচীনও জানতেন না আসন আর থালাবাটিগুলো এল কোথা থেকে। মাথা চুলকে আন্দাজেই বললেন, "ভাঁড়ারের কাঠের সিন্দুকে তোলা ছিল, বার করে মাজালুম।" কথাটা বলে আড়চোখে তিনি পাশে তাকালেন। দরজার আড়ালে সাদা থান কাপড় পরা বিশাল এক ঘোমটায় মুখ ঢাকা দশাসই এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে। ফিসফিস করে সেই মূর্তি তখন বলল, "ভাঁড়ার ঘরে নয়, রান্নাঘরের ওপরের তাকে ছিল থালাটা আর আসনটা ছিল শোয়ার খাটে গদির নীচে।"

ফিসফিসিয়ে বললেও অপুর মা'র কণ্ঠস্বর দশ-বারো হাত বৃত্তের মধ্যে পরিষ্কার শোনা যায়। সুতরাং রাজশেখর শুনতে পেলেন।

মধ্যাহ্নভোজনের মাঝপথে রাজশেখর শচীনকে বললেন, "থোড় ছেঁচকিটা আর একটু দিতে বলো তো।"

আড়াল থেকে বাটি হাতে বেরিয়ে এল অপুর মা। সিংহিবাড়িতে খাওয়ার সময় দ্বিতীয় পরিবেশন হাতায় করে পাতে দেওয়া হয় না। বাটিটা মেঝেয় রেখে মুখের সামনে কাপড় টেনে অপুর মা বলল, "আর একটু কচুবাটা আর পোস্তর বড়া কি আনব?"

রাজশেখরের মুখে হাসি খেলে গেল। বুঝলেন খাওয়ার সময় তাঁর মুখের ভাব এই রাঁধুনিটি বেশ ভালভাবেই লক্ষ করেছে। বললেন, "নিয়ে এসো।"

খাওয়া শেষ করে রাজশেখর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ইজিচেয়ারে। রুপোর রেকাবিতে (এটাও রাজশেখর প্রায় চল্লিশ বছর পর দেখলেন) ছোট্ট ছোট্ট খিলির চারটি পান নিয়ে অপুর মা এল। খিলিগুলো আঁটা লবঙ্গ দিয়ে।

"বাড়ি কোথায় তোমার?" রাজশেখর হালকা চালে প্রশ্ন করলেন।

"ময়রাপাড়ায়।"

ভ্রূ কুঁচকে উঠল রাজশেখরের। ময়রাপাড়া এবং সেখানকার লোকেদের তিনি চেনেন। "তোমার নাম কী? বাবার কী নাম?"

"বাবার নাম সাতকড়ি মোদক। আমার নাম করুণাময়ী।"

রাজশেখর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে গেলেন, "তুমি সাতুর মেয়ে!... কানাই মোদকের নাতনি!...তাই বলো। সিংহিবাড়ির আদবকায়দা কোথা থেকে জানলে, এবার আমি বুঝতে পারছি।"

"ঠাকুরদাকে আমার মনে নেই। এ বাড়িতে ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে অনেকবার এসেছি।"

"তোমার ঠাকুরদাকে আমার মনে আছে। তোমাকে দেখে এখন আরও মনে পড়ছে।" রাজশেখর কৌতুকের ছলে বললেন। শুনে করুণাময়ী তার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল চেহারাটাকে কুঁকড়ে যতটা সম্ভব ছোট করে নেওয়ার চেষ্টা করল, এরপর রাজশেখর খুঁটিয়ে জেনে নিলেন করুণাময়ীর বর্তমান অবস্থা, শেষে বললেন, "কলকাতায় যাবে আমার সঙ্গে?" করুণাময়ী একটুও না ভেবে বলল, "যাব।"

চারদিন পর রাজশেখর মোটরে কলকাতা রওনা হলেন। পেছনের সিটে একটা পুঁটলি কোলে নিয়ে বসে অপুর মা। গাড়ি তারকেশ্বরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে তারকনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছে। রাজশেখর তখন সামনের সিট থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, "তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। অপুর সব ভার আজ থেকে আমার। শচীনকে বলে এসেছি, ওর খাওয়াপরা, বইপত্তর, জামাজুতোর জন্য যা টাকা লাগবে সব দিয়ে আসবে।"

কলাবতী যেদিন বলল, "বলব কী পিসি সে কী বড়িভাজা!" পরের শনিবারই অপুর মা নিজে থলি হাতে পাড়ার মুদির দোকানে গিয়ে দু'-

তিনরকমের ডাল, কালোজিরে, পোস্ত আর হিং কিনে আনল। ডাল ভিজিয়ে রাখল গামলায়। পরদিন সকালে রান্নাঘরের কাজের বউ শকুন্তলাকে বলল, "আজ আর তোকে অন্য কাজ করতে হবে না, ডালগুলো বাট।" শীর্ণ, দুর্বল চেহারার শকুন্তলা ডাল বাটছে রান্নাঘরের এক কোণে, আর অপুর মা গ্যাসের উনুনে বসানো কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে। একসময় সে বলল, "ও কী বাটনা হচ্ছে, নোড়াটা ভাল করে চেপে ধরে বাট। গতরে কি জোর নেই? ক্ষীরের মতো মিহি না হলে কি বড়ি হয়?"

তারপর গজগজ করতে করতে বলল, "ধুপুর মা'র ভাজাবড়ি খেয়ে কালুদিদি মুচ্ছো গেছে! অমন বড়ি নাকি পিথিবিতে আর কেউ তৈরি করতে পারে না।...অ্যাই, তখন থেকে তুই চন্দন কাঠ বুলোবার মতো শিলে নোড়া ঘষছিস। ওঠ, ওঠ।" শকুন্তলাকে তুলে দিয়ে অপুর মা বসল ডাল বাটতে। পনেরো মিনিটের মধ্যে তিন কেজি মটর, বিউলি আর মুসুর ডাল কাদার মতো করে দিয়ে শকুন্তলাকে বলল, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী, গামলাটা নিয়ে আয়, ফ্যাটাতে হবে।"

তিনতলার ছাদে শুরু হল বড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠান। বড় একটা শীতলপাটির ওপর রাজশেখরের পুরনো একটা লঙ্গিতে কাচানো ধুতি বিছিয়ে রাখা। সারি দেওয়া থালায় স্তূপ করে রাখা নানান রকমের বাটা ডাল। তার কোনওটা ভাজা বড়ির জন্য, কোনওটা মশলা বড়ির, কোনওটা পলতা বড়ির, কোনওটা লাউ দিয়ে বাটা, কোনওটা শুধুই পোস্তর। এক-একটা স্তূপের এক-এক রং। অপুর মা স্নান করে পাটভাঙা থান পরে একটা রেকাবিতে ধান, দূর্বা আর সিঁদুর নিয়ে বসল। পাশে উবু হয়ে বসে কলাবতী, তার পাশে দাঁড়িয়ে শাঁখ হাতে শকুন্তলা, একটু দূরে সিঁড়িঘরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রাজশেখর তাঁর পাশে মুরারি।

অপুর মা হিং দেওয়া মশলা বড়ির জন্য বাটা ডালের স্তূপ থেকে খানিকটা তুলে বিছানো কাপড়ের মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে মন্দিরের চূড়ার মতো করল, সাইজটা হল একটা বড় জামরুলের মতো।

"এটা হল বুড়ো।" অপুর মা ফিসফিস করে কলাবতীকে জানিয়ে দিল, "এবার ওর পাশে বসবে বুড়ি।"

অপুর মা বুড়োর পাশে আর একদলা ডালবাটা বসাল। তারপর বুড়োবুড়ির মাথায় ধান-দূর্বা চড়াবার সময় শকুন্তলার দিকে তাকাল। শকুন্তলা তাড়াতাড়ি শাঁখে ফুঁ দিল। বুড়োবুড়ির ওপর সিঁদুরের টিপ পরিয়ে অপুর মা জোড়হাতে প্রণাম জানাল।

"কালুদি প্রণাম করো।" একটু জোরে ফিসফিস করল অপুর মা এবং সবাই শুনতে পেল।

কলাবতী তাড়াতাড়ি দু'হাত কপালে তুলল, শকুন্তলাও। তাই দেখে রাজশেখর এবং তাঁকে দেখে মুরারি হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

"পিসি, বুড়োবুড়ি দুটো খাওয়া যাবে?"

"যাবে।"

"কে খাবে?"

"বাড়ির কত্তা আর গিন্নি। তোমার দাদু আর তুমি খাবে।"

"এত ডালবাটা! সব বড়ি আজকেই দেবে?" কলাবতী অবাক হয়ে বলল।

অপুর মা বড়ি দেওয়া শুরু করেছে। মাথা নেড়ে বলল, "একদিনে এত দেওয়া যায় নাকি। আজ যতটা পারি দোব, বাকিটা কাল।" তারপর শকুন্তলাকে বলল, "এই ডালবাটা থালাগুলো সব রান্নাঘরে বড় ফিজে ঢুকিয়ে দে।"

অপুর মা আর কলাবতী বাদে ছাদ থেকে সবাই নেমে যাওয়ার পর দু'জনে সিঁড়িঘরের দেওয়ালের ছায়ায় বসে রইল বড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য। তখন কথায় কথায় অপুর মা বলল, "এই এক ঝকমারির কাজ, বসে থাকো বড়ি আগলে। কাজকম্মো শিকেয় তুলে বসে থাকার লোক তখন পাওয়া যেত, সব সংসারে একটা করে বুড়ি থাকত। এখন না আছে ডালবাটার লোক, না আছে বড়ি দেওয়ার ছাদ, বড়ি পাহারা দেওয়ার বুড়িরাই বা কোথায়! আমার ছিল জেঠিমা, বাড়ির উঠোনে বড়ি দিয়ে ঘরের দাওয়ায় সারা দুপুর বসে থাকত একটা গুলতি আর ছোট ছোট পোড়া মাটির গুলি নিয়ে, কাকপক্ষী বড়ির কাছে এলেই গুলতি দিয়ে পটাং করে গুলি ছুড়ত, আর ধারেকাছে কেউ আসত না।"

"পিসি, তুমি গুলতি ছুড়তে পারো?"

অপুর মা ভ্রূ তুলে কলাবতীর মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "পারি মানে? জেঠিমার গুলতি দিয়ে মাঠের ইঁদুর মেরেছি, সাপ মেরেছি, কোলা ব্যাং মেরেছি, ডাকাতও তাড়িয়েছি!"

"ডাকাত! কী করে?" বিস্ময়ে কলাবতীর চোখ কপালে উঠল।

"কী করে আবার, অন্ধকার রাতে চুপিচুপি গুলতি মেরে।"

"কোথায় ডাকাত পড়েছিল? তোমাদের বাড়িতে?"

"পাশের ভুলুকাকাদের বাড়িতে। বেশ পয়সাওলা। কলকাতায় মিষ্টির

দোকান, এখন আরও একটা করেছে চন্দননগরে, ডাকাত পড়ল রাত এগারোটা নাগাদ। এখনকার মতো ইলেকট্রিক আলো তো ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকার, ডাকাতদের সঙ্গে কেরোসিনের মশাল আর চার ব্যাটারির টর্চ। পাড়ার সবাই দরজা জানলা এঁটে ঠকঠক করে ঘরের মধ্যে কাঁপছে। জেঠিমা বলল, কোরু, গুলতিটা আর গুলি নে কোঁচড় ভরে। চল আমার সঙ্গে, দেখি মুখপোড়াদের মুরোদ কত। গুলতি তো নিলুম। গুলি দেখি দুটোমাত্তর রয়েছে। জেঠিমা বলল, ঠিক আছে। আমার তক্তপোশের নীচে কৌটোয় খোলা ছাড়ানো আস্ত সুপুরি আছে, তাই নিয়ে আয়। এক-একটা সুপুরি গুলির সাইজের, কৌটোটাই হাতে তুলে নিলুম। জেঠিমা আর আমি বেরিয়ে অন্ধকারে আদাড়ের কচুবনের বড় বড় পাতার আড়াল দিয়ে,'' অপুর মা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে এমনভাবে বলল, এই ভরদুপুরে কলাবতীর গা ছমছম করে উঠল। ঢোক গিলে সে বলল, ''তারপর পিসি?''

''তারপর আমরা কাদা মাড়িয়ে ফণিমনসা গাছ ঠেলে পৌঁছোলুম ভুলুকাকাদের কলাবাগানে। তখন দরজা ভাঙার আওয়াজ, ঘরের মধ্যে চিৎকার কান্না 'ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, কে আছ বাঁচাও গো' চলছে আর ডাকাতদের দাবড়ানি শুনতে পাচ্ছি 'দরজা খোল, দা দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে রেখে যাব।' দেখলুম হাত তিরিশেক দূরে উঠোনে মশাল হাতে খালি গায়ে পেল্লায় চেহারার একটা ডাকাত দাঁড়িয়ে রয়েছে।''

কলাবতী তাড়াতাড়ি বলল, ''মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা?''

অপুর মা থমকে গেল, ''তুমি জানলে কী করে?''

''পড়েছি। বিশে ডাকাত কপালে লাল ফেট্টি বাঁধত।''

''বিশে ডাকাত কে?'' অপুর মা বিভ্রান্ত মুখে জানতে চাইল।

''সে একজন ছিল দেড়শো-দুশো বছর আগে। রনপায়ে চড়ে এক ঘণ্টায় দশ ক্রোশ চলে গিয়ে ডাকাতি করে রাত থাকতে থাকতেই ফিরে আসত। যাক গে সে-কথা, তোমরা তারপর কী করলে?''

''তারপর আবার কী করব। জেঠিমা আমাকে বলল, 'কলাগাছের গা ঘেঁষে থির হয়ে কলাগাছের মতো দাঁড়া, একদম নড়বি না, গুলতিটা হাতে নে, সুপুরি লাগা, তারপর টিপ করে ডাকাতটার কপালে মার।' দুটো কলাগাছের মধ্যিখানে দাঁড়ালুম গুলতিতে সুপুরি লাগিয়ে, রবাটটা এই নাক পর্যন্ত টেনে এক চোখ বন্ধ করে টিপ করে রবাটটা ছাড়তে যাব আর তখুনি ডাকাতটা মাথা নিচু করে পা চুলকোতে লাগল। চুলকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে আমি আর

দেরি করলুম না। দিলুম রবাটের ছিলেটা ছেড়ে, কী বলব কালুদি, একেবারে বন্দুকের গুলির মতো সুপুরিটা ওর রগে গিয়ে খটাস করে লাগল। 'বাবা গো' বলে ডাকাতটা কপালে হাত চেপে উবু হয়ে বসে পড়ল। দেখি কপাল ফেটে রক্ত বেরোল। 'কী হল কী হল' বলে ছুটে এল দুটো ডাকাত।

"জেঠিমা আমার হাতে আর একটা সুপুরি দিয়ে বলল, 'আবার মার।' যেটা রোগা ঢ্যাঙা সেটার মাথা তাক করে ছুড়লুম। এটাও 'উরিব্বাস' বলে মাথায় হাঁত দিয়ে এধার-ওধার তাকাতে লাগল। জেঠিমা আর একটা সুপুরি হাতে দিল। এবার মশাল হাতে করা লম্বা নেকো ডাকাতটার নাক লক্ষ্য করে ছুড়লুম, লাগল গিয়ে নাকের এক আঙুল পাশে, ব্যস, ধপাস, মশাল পড়ে গেল হাত থেকে। একজনের টর্চের আলো এধার-ওধার করে খুঁজতে শুরু করল। আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। মাথার ওপর দিয়ে আলো ঘুরে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে ডাকাতটার কান লক্ষ্য করে আর একটা ছুড়লুম, কান চেপে ধরে সে লাফিয়ে উঠে টর্চ ফেলে ভয়ে দৌড় লাগাল। ডাকাতরা ততক্ষণে বুঝে গেছে—আড়াল থেকে কেউ তাদের মারছে। ওরা তখন ভাবল, গ্রামের লোক বোধহয় ওদের ঘিরে ফেলেছে। বাড়ির মধ্যে যারা দরজা ভাঙছিল, শিস দিয়ে তাদের ডেকে নিয়ে চম্পট দিল।"

"তোমরা তারপর কী করলে?"

"যেভাবে এসেছিলুম ঠিক সেইভাবে চুপিসারে বাড়িতে চলে এলুম। জেঠিমা কানে কানে বলল, 'খবরদার, কোরু কাউকে গপ্পো করবি না। পাঁচকান হতে হতে ঠিক ডাকাতদের কানে পৌঁছে যাবে। ওদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি আমরা, এর শোধ ওরা নেবেই। জানতে পারলে কেটে কুচি কুচি করে রেখে দেবে।' শুনেই তো ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল, কাঠের গুলতিটা পুড়িয়ে ফেললুম। চল্লিশ বছর পর আজ এই প্রথম তোমার কাছে মুখ খুললুম। তুমি কিন্তু কাউকে কিছু বোলো না।"

অপুর মা'র মুখ দেখে কলাবতী আর হাসি চাপতে পারল না। খুক খুক করে হেসে উঠল। "চল্লিশ বছর পরও তোমার ভয় গেল না পিসি। ওসব ডাকাতরা তো এতদিনে মরে ভূত হয়ে গেছে।"

"ভয় তো ওই ভূতকে নিয়েই। ওদের মধ্যে দু'জন, রাম বাগদি আর ভজা দুলে আর এক জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে গ্রামের লোকের হাতে ধরা পড়ে। তখন তো ডাকাত ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলার চল ছিল না। পুলিশের হাতে তুলে দিত। ওদেরও পুলিশে দেয়। কোর্টে বিচার হয়, দশ বছর জেল

খাটে। রাম মরে গেছে, ভজা বেঁচে আছে। ওটাকেই ভয়।...তার থেকেও এখন ভয় ওই ওটাকে।'' এই বলে অপুর মা ছাদের পাঁচিলের দিকে আঙুল তুলল। একটা কাক বসে রয়েছে।

''এই হতচ্ছাড়ারা আমার বড়ি নষ্ট করতে এসেছে। যাও তো কালুদি দৌড়ে দাদুর লাঠিটা নিয়ে এসো।''

কলাবতী দোতলা থেকে রাজশেখরের তিনটে ছড়ির মধ্য থেকে একটা নিয়ে এল, অপুর মা ছড়িটা শূন্যে সপাৎ সপাৎ আছড়ে ছাদের মেঝেয় ঠকঠক শব্দ করতেই কাকটা শুধু পাঁচিলের একধারে হাতদুয়েক সরে মাথা ঘুরিয়ে অপুর মা'র দিকে তাকিয়ে রইল।

''গুলতি থাকলে বাছাধনের এই অগ্রাহ্যি করা ঘুচিয়ে দিতুম।'' গজগজ করল অপুর মা।

''একটা গুলতি তৈরি করো না পিসি।'' আবদারের সুরে বলল কলাবতী।

''বললেই কি তৈরি করা যায়।'' অপুর মা দুটো আঙুল ইংরাজি 'ভি' অক্ষরের মতো দেখিয়ে বলল, ''এইরকম দেখতে পেয়ারা গাছের শুকনো ডাল চাই আর চাই নরম রবাট। তুমি জোগাড় করে দাও, আমি তৈরি করে দোব।''

কাকটা আবার সরে এল পাঁচিলে আগের জায়গায়। উড়ে এল আরও দুটো কাক। অপুর মা ছড়ি ঘুরিয়ে মৃদু ''হুসস'' করল। তিনটে কাকই একটু নড়াচড়া করে বড়ির দিকে তাকিয়ে বারদুয়েক 'কা কা কা' ডেকে অপুর মা'র আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাল। সিঁড়িঘরের মাথা থেকে শালিকের কর্কশ ডাক উঠল। অপুর মা বিরক্ত হয়ে ওপরদিকে মুখ তুলে ''জ্বালিয়ে মারলে'' মন্তব্য করে বড়িসমেত শীতলপাটিটা সিঁড়িঘরের মধ্যে টেনে আনল।

''কাজকম্মো ফেলে এখন বড়ি পাহারা দেওয়া পোষাবে না। কালুদি পাটিটার একটা দিক ধরো, একতলার রকে নিয়ে যাই, ওখানে রোদ আছে।''

দু'জনে পাটিটা নামিয়ে এনে উঠোনের ধারের রকের ওপর পাতল। ঘণ্টাখানেক অন্তত রোদ পাবে এখানে। মিনিট তিনেক পর কলাবতী চেঁচিয়ে উঠল, ''পিসি, ওই দ্যাখো আবার এসেছে।''

কলাবতী আঙুল দিয়ে দোতলার কার্নিশে বসা কাকটাকে দেখাল। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে থমথমে হয়ে গেল অপুর মা'র মুখ। কাকটা উড়ে এসে বসল ঠিক বড়ির ওপরের কার্নিশে। দু'-তিনবার ভেংচি কাটার মতো ডাকল।

এবার অপুর মা রান্নাঘর থেকে টুল এনে বসল পাটির ধারে হাতে ছড়িটা নিয়ে। মুরারিকে ডেকে বলে দিল, "আজ আর আমি ভাত বেড়ে দিতে পারব না কাউকে, মুরারিদা, তুমি ম্যানেজ করে দোতলায় খেতে দাও, আমি হতচ্ছাড়া কাকটার আস্পদ্দার শেষ দেখে ছাড়ব। বড়ি দিতে অনেক কষ্ট করতে হয়।"

যতক্ষণ না রোদ সরে যায় ততক্ষণ অপুর মা ছড়ি হাতে বসে থাকবে। কাকটা এবং তার সঙ্গে আরও দু'-তিনটি অতঃপর অপুর মা'র সঙ্গে ধৈর্যের পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা না করে মিনিট পাঁচেক পরেই উড়ে গেল। কাকের স্বভাব সম্পর্কে অপুর মা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সে জানে এমন মশলা দেওয়া সুগন্ধি ডালবাটা কাকরা ভীষণ পছন্দ করে। ওরা তার ওপর ঠিক নজর রাখবে। যেই টুল থেকে উঠে যাবে অমনই উড়োজাহাজের মতো নেমে এসে—ভাবতেই সে শিউরে ওঠে। সব বড়ি এঁটো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট করবে।

মুরারি ভাত আর অন্যান্য ব্যঞ্জন নিয়ে রান্নাঘর থেকে দু'বার দোতলায় উঠল। অপুর মা আড়চোখে দেখল সব রান্না মুরারি ঠিকঠাক নিয়ে গেল কি না। তারপরই চোখ পড়ল রান্নাঘরের দরজার দিকে। ধূসর রঙের একটা হুলো বেড়াল ধীরেসুস্থে রান্নাঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার সামনে উবু হয়ে বসে তৃপ্তিভরে ঠোঁট চাটল। হুলোটা রোজ একবার বাইরে থেকে এসে সিংহিবাড়িতে টহল দিয়ে যায়।

"সর্বনাশ করেছে।" অপুর মা আঁতকে উঠল "রাতে কালিয়া করব বলে ভেটকি মাছ ভেজে রেখেছিলুম—" কথা শেষ না করেই ছড়ি হাতে অপুর মা তেড়ে গেল হুলো বেড়ালটার দিকে। হুলো হকচকিয়ে প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে গেল, পিছু পিছু অপুর মা-ও। সেখানে সে অপুর মা'র হাতের ছড়ির এক ঘা খেয়ে রান্নাঘরের লাগোয়া কয়লার ঘরে ঢুকে গেল।

কলকাতায় সিলিন্ডারে ভরা রান্নার গ্যাস বাড়ি বাড়ি চালু হওয়ার আগে রান্না হত কয়লার উনুনে। সেইসময় সিংহিবাড়িতে কয়লা আসত ঠেলাগাড়িতে একসঙ্গে পাঁচ বস্তা। সদর দরজা দিয়ে নোংরা কয়লার বস্তার ঢোকা বারণ ছিল। তাই রান্নাঘরের সঙ্গে জুড়ে উত্তরে বাগানের দিকে একটা ছোট ঘর বানানো হয় কয়লা রাখার জন্য। তাতে থাকত ঘুঁটে এবং লকড়িও। কয়লার ঘরটায় একটা ছোট দরজা করা হয় যেটা দিয়ে বাইরে থেকে বস্তা নিয়ে ঢুকে কুলিরা কয়লা ঢেলে দিয়ে যেত। কয়লার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই ঘরে অন্তত তিরিশ বছর কারও ঢোকার দরকার হয়নি। বাইরে যাওয়ার দরজাটার খিলও তাই দেওয়া থাকে।

বেড়ালকে তাড়া করে অপুর মা কয়লার ঘরে ঢুকে দেখল বাগানে বেরোবার পুরনো দরজাটার তলার কাঠ পচে ছোট্ট একটা গর্ত হয়ে রয়েছে। হুলোটা সেই গর্ত দিয়ে প্রাণভয়ে কোনওক্রমে গলে বাইরে চলে গেল। রান্নাঘরে এসে অপুর মা দেখল মুরারি মিটসেফ খুলে রেখে গেছে এবং ভাজা ভেটকি মাছের বড় চারটে টুকরো কম, পড়ে আছে মাত্র দুটি টুকরো। কপালে হাতের চাপড় দিয়ে অপুর মা চিৎকার করে উঠল, "মুরারিদা, শিগগিরি এসে দেখে যাও কী কাণ্ড তুমি করেছ!"

দোতলায় খাবার টেব্‌ল থেকে রাজশেখর, সত্যশেখর ও কলাবতী ছুটে বারান্দায় এসে রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল।

"কী হল অপুর মা, অমন করে চেঁচালে কেন?" রাজশেখর উদ্‌বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলেন।

"উফ্‌ফ, কী গলা রে বাবা, ডাকাতদেরও পিলে চমকে যাবে।" সত্যশেখর এঁটো হাত চাটতে চাটতে বলল।

" কী হয়েছে, কী হয়েছে" বলতে বলতে মুরারি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রকের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল, "কাণ্ড যে এদিকে হয়ে গেল অপুর মা, শিগগিরি এসে দেখে যাও।"

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে অপুর মা তার বড়ির দিকে তাকিয়েই থ হয়ে রইল। বড়িগুলো ছত্রখান। দুটো কাক বড়িগুলো মাড়িয়ে কাপড়ের ওপর হেঁটে হেঁটে কপাকপ করে বড়ি গিলছে। এই দৃশ্য দেখে অপুর মা'র মুখ দিয়ে আর স্বর বেরোল না, মুহ্যমানের মতো থপ করে টুলে বসে পড়ে অস্ফুটে শুধু বলল, "খা খা, সব খেয়ে নে।"

মুরারিই বরং হইহই করে কাক তাড়িয়ে পাটিটা টেনে সরিয়ে এনে বলল, "কেমন পাহারা দিচ্ছিলে? এবার বড়িগুলো তুমিই খেয়ো। হুঁশ রাখোনি কাক শালিকে উড়ে বেড়াচ্ছে।"

গম্ভীর শান্ত গলায় অপুর মা দাঁত চেপে বলল, "খাব, আমিই খাব। আর মাছের যে দুটো টুকরো পড়ে আছে সে দুটো তুমি খেয়ো।"

"দুটো পড়ে আছে? ছ'টা ছিল তো!"

"ছিল। যদি হুঁশ রাখতে বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা হলে মিটসেফটা হাট করে খুলে রেখে যেতে না।"

মুরারি চমকে উঠে রান্নাঘরে দৌড়োল এবং ফিরে এসে মাথার চুল টেনে বলল, "মানিকতলা বাজারে ওই একটাই এতবড় ভেটকি আজ এসেছিল,

তিন কিলোর। কাটিয়ে পেটি থেকে আধ কিলো আনলুম ছোটবাবুর কথা ভেবে।'' এর পরই সে হুংকার দিয়ে উঠল, ''কোথায় গেল সেই মা ষষ্ঠীর বাহন, আজ ওর পিন্ডি চটকে ছাড়ব।''

''আজ কেন, পনেরোদিন ওর ন্যাজের ডগাটিও দেখতে পাবে না।'' অপুর মা এরপর মনোযোগ দিল বড়ির দিকে, ''কত সাধ করে বড়ি দিলুম কালুদিদিকে খাওয়াব বলে। ঠিক আছে এখনও তো ডালবাটা অনেকটা ফিজে তোলা আছে, কাল আবার আমি বড়ি দোব, এবার দেখি বাছাধন আমাকে ফাঁকি দিয়ে খেয়ে পালাতে পারে কিনা। থাকত যদি এখন আমার সেই গুলতিটা তা হলে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতুম।'' চল্লিশ বছর আগের গুলতিটার কথা মনে পড়তেই অপুর মা'র মাথায় রক্ত ছুটে গেল। বিড়বিড় করল দাঁতে দাঁত চেপে, ''ডাকাত তাড়িয়েছি আর কাক তাড়াতে পারব না।''

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপুর মা'র কথা শুনে রাজশেখর হাসছিলেন। পাশে দাঁড়ানো সত্যশেখরকে বললেন, ''ভীষণ রেগে গেছে। দ্যাখ, ঠিক এবার একটা গুলতি বানিয়ে কাক মারবে, কানাই মোদকের নাতনি তো।''

''জানো দাদু, পিসি ছেলেবেলায় গুলতিতে সুপুরি লাগিয়ে ডাকাতদের মেরে তাড়িয়েছিল। হ্যাঁ, সত্যি বলছি, পিসি আজই আমায় বলল।''

''গুল মেরেছে।'' গম্ভীর স্বরে কথাটা বলে সত্যশেখর খাবার টেব্‌লে ফিরে গেল। তার পিছু পিছু কলাবতীও এসে খাবার টেব্‌লে বসল।

''কাকা, তুমি ও-কথা বললে কেন?''

''বললুম এজন্য যে, গুলতি মেরে ডাকাত তাড়ানো যায় না, ছিঁচকে চোর হয়তো তাড়ানো যায়। ডাকাতদের সঙ্গে কীসব অস্ত্র থাকে জানিস?''

''জানি। লাঠি, বন্দুক, রামদা, তির-ধনুক, তরোয়াল।'' কলাবতী নামতা পড়ার মতো বলে গেল।

''ওসব ছিল বাজপাখি, রোঘো, বিশে আর কালোপাঞ্জার আমলের অস্ত্র। এখন ওদের সঙ্গে থাকে বোমা, পিস্তল, পাইপগান, রিভলভার, ভোজালি। তখন ছিল রনপা, এখন মোটরবাইক। অপুর মা একবার এদের সামনে পড়ুক, বোমা মেরে গুলি করে গুলতির দফা রফা করে দেবে... কালু দ্যাখ তো ওটায় ফুলকপির মতো কী যেন একটা রয়েছে।'' সত্যশেখর আঙুল দিয়ে টেব্‌ল রাখা চিনেমাটির বৌলটা আঙুল দিয়ে দেখাল।

কলাবতী মাথা কাত করে তাকিয়ে দেখে বলল, ''কড়াইশুঁটি, টম্যাটো,

ফুলকপি আর ভেটকি মাছ দিয়ে কী যেন একটা রান্না। ঘি-গরমমশলার দারুণ একটা গন্ধ পাচ্ছি।''

শুনেই সত্যশেখরের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

''বাবা টেব্‌ল থেকে উঠলে আর বসেন না, সেকেলে বুর্জোয়া জমিদারি কেতা। তুই তো ভেটকি মাছ একদমই পছন্দ করিস না, নিশ্চয় এটা খাবি না। তা হলে বৌলটা আমার দিকে ঠেলে দে।''

তাজ্জব বিভ্রান্ত কলাবতী প্রতিবাদ করে উঠল, ''কাকা, আমি ভেটকি মাছ ভীষণ ভালবাসি।''

সত্যশেখর হতাশ স্বরে বলল, ''অ্যা ভালবাসিস। আমি তো জানতাম তুই শুধু গলদা চিংড়ি ভালবাসিস।''

''শুধু গলদা কেন, ভেটকি, ইলিশ, ট্যাংরা, গুলে, আড়, পারশে সব ভালবাসি। তুমি একাই পুরোটা খাবে তা কিন্তু হবে না। মনে রেখো এটা তিনজনের জন্য পিসি রেঁধেছে।''

''ঠিক আছে, তা হলে দু'জনেই শেয়ার করে খাব। রাতে তো মাছ পাব না, বেড়ালে খেয়ে গেছে। কালু, এই বেড়াল আর কাকদের শায়েস্তা করা দরকার। পাকা ভেটকি মাছের পেটি একটা রেয়ার জিনিস, কত কষ্ট করে মুরারি কিনে আনল, আর সেটার অর্ধেকটা কিনা একটা জানোয়ারের পেটে চলে গেল। এসব এদেশেই সম্ভব।''

''কাকা, তুমি কথায় কথায় এদেশ নিয়ে খোঁটা দিয়ে বিলেত টেনে আনো। কই বড়দি তো একবারের জন্য বিলেতের নামও উচ্চারণ করে না। অথচ তোমরা দু'জনে একই সঙ্গে ইংল্যান্ডে থেকেছ, তুমি ব্যারিস্টার হয়েছ, বড়দি এডুকেশনে ডক্টরেট করেছে।''

কলাবতীর মৃদু ভর্ৎসনা শুনে সত্যশেখর মুখ নামিয়ে বলল, ''হয়েছে, হয়েছে, বড়দির গুণ আর গাইতে হবে না, বৌলটা এদিকে ঠেলে দে।''

বৌলটা কাকার দিকে সরিয়ে দিয়ে কলাবতী বলল, ''পিসি কাল হুলুস্থুলু কাণ্ড বাধাবে।''

সত্যশেখর জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলল, ''কীরকম?''

''আবার বড়ি দিতে বসবে, আবার কাক আসবে, পিসি আবার দাদুর ছড়িটা নিয়ে ডাকাতে গলায় হুংকার দিয়ে কাক তাড়াবে।''

''কালু, তোর শেয়ারটা তুলে নে, নইলে ভুল করে পুরোটাই খেয়ে ফেলব। দারুণ রেঁধেছে। হ্যাঁরে, হঠাৎ বড়ি দেওয়ার শখ হল কেন অপুর মা'র?''

বৌল থেকে চামচ দিয়ে মাছ কপি আলু ইত্যাদি নিজের প্লেটে তুলে নিতে নিতে কলাবতী বলল, "পিসিকে বলার মধ্যে শুধু বলেছিলুম, টিফিনে ধুপু খিচুড়ি খাচ্ছিল বড়িভাজা দিয়ে। ওর মা বাড়িতে বড়ি দিয়েছিলেন। আমি খানিকটা খিচুড়ি আর গোটাচারেক ভাজাবড়ি খেলুম মানে ধুপুর অফারটা আর ফেরালুম না।"

"খুব ভাল করেছিস, দুপুরে যা খিদে পায় স্কুলে! একটা টিনের তোরঙ্গয় গরম মাংসের প্যাটিস নিয়ে রহমান বসত টিফিনের সময় স্কুল গেটে। গোটাচারেক খেয়ে মনে হত কিছুই খাওয়া হল না। গোটা তোরঙ্গটাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করত কিন্তু পকেটে তো আর পয়সা নেই।"

তিরিশ বছর আগে খাওয়া রহমানের প্যাটিসের স্বাদটা আবার জিভে অনুভব করার চেষ্টা করে সত্যশেখর বলল, "যেমন মুড়মুড়ে তেমনই টেস্টি, কত তো দোকান পার্ক স্ট্রিটে, দূর দূর, একটাও কেউ রহমানের তোরঙ্গের কাছে লাগে না।" এই বলে সে চামচের দিকে হাত বাড়াল।

"আমিও তো ঠিক এই কথাই বলেছিলুম পিসিকে, কী দারুণ বড়িভাজা, মোহন্তর পকৌড়িকেও হার মানিয়ে দেবে। ব্যাস্‌স্‌, পিসির আঁতে ঘা পড়ল। অন্যের রান্নার প্রশংসা একদম সহ্য করতে পারে না সেটা তো তুমি জানো।"

"জানি বলেই তো সেদিন অপুর মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললুম, কী দারুণ ধোঁকার ডালনা খেলুম হাইকোর্ট পাড়ার ফুটপাথের হোটেলে। মনে আছে তোর?"

"খুব মনে আছে, পরের দিন রাতেই তো...কাকা ও মাছটা কিন্তু আমার শেয়ারের।" কলাবতী হাত তুলে কাকাকে থামিয়ে দিল। অপ্রতিভ সত্যশেখর তাড়াতাড়ি চামচে তোলা ভেটকির টুকরোটা বৌলে নামিয়ে রেখে বলল, "বলেছিলুম তো আমার ভুলো মন। ধোঁকাটা অপুর মা রেঁধেছিল কেমন বল তো?"

"তুলনাহীন অতুলনীয়।"

"কারেক্ট। ম্যাচলেশ, ভোজনবিলাসীর সুখানন্দ। কালু, বাংলাভাষাটা আমিও জানি রে। পারিস তো ওর কাছ থেকে রান্না শিখে নে।"

"ওরে বাবা রান্নাঘরের ধারেকাছে আমায় ঘেঁষতে দেয় না। বলে রং কালো হয়ে যাবে। গরম তেলের ছিটে লেগে ফোসকা পড়ে দাগ হবে। আচ্ছা কাকা, আমার এই গায়ের রং আরও কি কালো হওয়া সম্ভব?"

"কালু, পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, তুই যত কালো হবি ততই তোকে সুন্দর দেখাবে। পিসিকে পটিয়েপাটিয়ে ওর অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যা। কী জিনিস যে বাবা আটঘরা থেকে তুলে এনেছেন! শুধু ওর গলার ডেসিবেলটা যদি আদ্দেক কমানো যেত!" সত্যশেখর মাথা নাড়ল আফশোসে।

"দাদু তো পিসিকে এনেছে কানাই মোদকের নাতনি আর ছোটবেলার বন্ধু সাতকড়ির মেয়ে বলে। কানাই মোদক ছিল আটঘরার লেঠেলসর্দার। তার মানে ডাকাতের ওপরেও আর এক কাঠি। দাদু বলেছিল ওর চেহারা আর গলার আওয়াজ শুনেই আমার মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় দেখা কানাই মোদককে। তারপর যখন শুনলাম সাতকড়ির মেয়ে, আর দ্বিতীয় চিন্তা করতে হয়নি।"

"কিন্তু এখন তো অপুর মাকে তৃতীয় চিন্তা করতে হবে বড়ি নিয়ে।"

"তৃতীয় কেন?"

"দ্বিতীয় চিন্তা তো আবার বড়ি দেওয়া, তৃতীয় চিন্তা বড়ি রক্ষার জন্য গুলতি তৈরি করা।"

কথা বলতে বলতে দু'জনে খাওয়া শেষ করল। বড়ি নষ্ট বা বেড়ালের মাছ খেয়ে যাওয়াটাকে দু'জনেই কোনও গুরুত্ব দিল না বরং হাসাহাসি করল গুলতি মেরে অপুর মা'র ডাকাত তাড়ানোর গল্প নিয়ে।

গুলতির জন্য শ্যামার কামারশালে

অপুর মা'র জেদ আর গোঁয়ারতুমি যে শুধু মুখের কথা নয় সেটা বিকেলেই কলাবতী বুঝে গেল।

"কালুদিদি, আমার সঙ্গে চলো তো পেছনের মালোপাড়া বস্তিতে, মুরারিদা বলল এখানে একটা কামারশাল আছে।" অপুর মা'র স্বরে তাড়া কথার ভঙ্গিতে ব্যস্ততা। ধবধবে দামি থানের ওপর গায়ে মুগার চাদর জড়ানো, পায়ে চামড়ার চটি। বাড়ির বাইরে বিশেষ কাজে যেতে হলে অপুর মাকে এই সাজে যেতে হয় রাজশেখরের নির্দেশে।

কলাবতী অবাক হয়ে বলল, "কামারশাল সে আবার কী? সেখানে যাবে কেন?"

আরও অবাক হয়ে অপুর মা বলল, "সে কী কামারশাল কী জানো না! সাঁড়াশি, খুন্তি, হাতা, সাঞ্চা, চাটু, গজাল, লাঙলের ফলা, আংটা এইসব কামারেরা যেখানে তৈরি করে তাকেই কামারশাল বলে। আমাদের আটঘরায় ছিল সুয্যিকামার, ওর বাড়িতেই ছিল কামারশাল। একহাত দিয়ে সে মাঝে মাঝে হাপর টেনে হাওয়া চালিয়ে কয়লার আগুন উসকে গনগনে করত, আর অন্য হাতে সেই কয়লার মধ্যে ঢোকানো লোহাটাকে সাঁড়াশিতে ধরে উলটেপালটে দিত। লোহা লাল টকটকে হলে তখন লম্বা সাঁড়াশি দিয়ে ধরে নেহাইয়ের ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চ্যাপটা করত কি বাঁকিয়ে গোল করত।

"ডাকাতে ভুলুকাকার ঘরের দরজার লোহার হুড়কো ভেঙে দিয়েছিল। সুয্যিকামার পরের দিনই নতুন একটা বানিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে মোটা একটা শিকলও। তোমাকে মুখে বলে কামারশাল বোঝাতে পারব না, এখন চলো তো আমার সঙ্গে, মুরারিদাকে বললুম আমাকে কামারশালটা একবার দেখিয়ে দাও, তাইতে বলল বুড়ো বয়সে ওসব ছেলেমানুষি খেলনা তৈরি করে দিতে বললে কামারটা তো হেসে গড়াগড়ি খাবেই আর মালোপাড়ার বাচ্চারা আমাকে দেখলেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে 'বুড়োখোকা গুলতি ছোড়ে, বুড়োখোকা গুলতি ছোড়ে।' মুরারিদা তাই বলল, যেতে হয় তুমি একাই যাও—আমি গুলতির মধ্যে নেই।"

এবার কলাবতী বুঝতে পারল পিসি কেন মালোপাড়ায় কামারশালে যেতে চাইছে। লোহার গুলতি বানিয়ে কাকেদের ভয় দেখিয়ে বড়ি রক্ষার জন্য পিসি যে এমন জেদ ধরবে সেটা শতচেষ্টা করেও সে কল্পনায় আনতে পারবে না। তার খুব মজা লাগল অপুর মা'র গম্ভীর উৎকণ্ঠিত মুখ দেখে।

"মুরারিদার এমন কথা বলা খুব অন্যায় হয়েছে। গুলতি সব বয়সের মানুষই ছুড়তে পারে। পিসি, এক মিনিট দাঁড়াও আমি চটিটা পরে আসি, তোমার সঙ্গে যাব।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দু'জনে বেরিয়ে পড়ল মালোপাড়ার উদ্দেশে। সিংহিবাড়ির পশ্চিমে আট ফুট উঁচু পাঁচিল। পাঁচিল ঘেঁষে মাটি আর খোয়ার সরু গলি চলে গেছে একটা পানাপুকুরের ধার দিয়ে দক্ষিণে, এটাকে বলা হয় পগার গলি। সেই পুকুরে গোটা মালোপাড়া কাপড় কাচে, বাসন মাজে এবং স্নান করে। বাড়ির ছাদ থেকে কলাবতী দেখেছে গরমের দিনে ছোট ছেলেমেয়েরা দুপুরে সাঁতারও কাটে। পুকুরটার ধারে একখণ্ড জমি, সেখানে

ছেলেরা ফুটবল খেলে বাঁশের পোস্ট পুঁতে, রবারের বল দিয়ে ক্রিকেটও খেলে। মাঠের ধারেই মালোপাড়া। পগার গলি দিয়ে ক্বচিৎ যাতায়াত করে লোকজন। পাঁচিলের একটা ছোট্ট একপাল্লার লোহার দরজা দিয়ে পগার গলিতে যাওয়া যায়। লোহার খিল দিয়ে দরজাটা বন্ধ থাকে। আজ সেই দরজা দিয়ে বেরোল কলাবতী আর অপুর মা।

পগার গলি দিয়ে তারা পুকুরধারের মাঠে এল। মাঠ পেরিয়ে তারা ঢুকল মালোপাড়া বস্তির মধ্যে। কলাবতী আগে কখনও বস্তি দেখেনি। চার হাত চওড়া মাটির রাস্তায় মুখোমুখি বাড়ি বা ঘরের সারি। রাস্তার ধারে খোলা নর্দমায় জমে রয়েছে থকথকে পাঁক। ইটের পাতলা দেওয়ালের ধারে ছোট ছোট জানলা, ঘরের ছাদ টিনের বা খোলার বা টালির। ঘরগুলো একটার সঙ্গে অন্যটা লেগে রয়েছে। অদ্ভুত একধরনের গন্ধ সে পেল, আগে যা কখনও তার নাকে লাগেনি। গন্ধে তার গা গুলিয়ে উঠল। চাপা গলায় সে বলল, "পিসি কোথায় কামারশাল? একটু তাড়াতাড়ি চলো।"

দু'জনে পা চালিয়ে দ্রুত এগোল। একটি ছোট মেয়ে দুটি বাচ্চা সমেত একটা ছাগল নিয়ে আসছে। তাকে দাঁড় করিয়ে অপুর মা জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে মেয়ে, এখানে কামারশালটা কোথায় জানিস?"

মেয়েটি চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, "জানি না।"

সেইসময় দরজা খুলে বেরোল বয়স্কা এক স্ত্রীলোক, হাতে প্লাস্টিকের বালতি। কৌতূহলে সে অপুর মাকে জিজ্ঞেস করল, "কাকে খুঁজছেন?"

"শুনেছি এখানে একটা কামারশাল আছে।"

"আছে। কী করবেন সেখানে?"

'গুলতি করাব' বলতে গিয়ে থেমে ঢোক গিলে অপুর মা বলল, "সাঁড়াশি করাব।"

"ভেঙে গেছে বুঝি। আজকালকার সাঁড়াশির যা দশা, আমারটা দু'-দু'বার ঢলঢলে হয়ে খুলে গেল। ওই শ্যামা কামারকে দিয়ে নতুন একটা তৈরি করালুম, তা আজ ছ'মাস হয়ে গেল এখনও বেশ টাইট আছে। ওর হাতের কাজ খুব ভাল, তবে গাঁজা না খেলে ও মন দিয়ে একদম কাজ করতে পারে না। আমি তো আট আনার গাঁজা কিনে দিয়ে একবেলার মধ্যে সাঁড়াশিটা করালুম। আসুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তবে একটা কথা বলে রাখি, কামারশালটাল বলা ও কিন্তু পছন্দ করে না, বলতে হবে শ্যামাচরণের কারখানা। না বললে আপনার কাজ নাও নিতে পারে।"

স্ত্রীলোকটি এই বলে হাঁটতে শুরু করল। ওরা দু'জন পিছু নিল। প্রথম বাঁকটা ঘুরতেই পড়ল একটা বেলগাছ, তার নীচে টিউবওয়েল এবং প্লাস্টিকের জারিকেন, বালতি, মাটির কলসি, পেট্রলের টিন ইত্যাদির দীর্ঘ লাইন টিউবওয়েল থেকে থার্ড ব্র্যাকেটের মতো হয়ে রাস্তায় এসেছে, স্ত্রীলোকটা হাতের বালতি লাইনের শেষে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বউকে বলল, "ফুলি, বালতিটা দেখিস। আমি এদের শ্যামার কারখানায় পৌঁছে দিয়েই আসছি।" এই বলে সে ব্যস্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করে দিল।

শ্যামার কামারশাল বা কারখানা বস্তির আর একপ্রান্তে এবং বড় রাস্তার ধারে।

কলাবতী বলল, "পিসি, আমরা তো মানিকতলা মেন রোড দিয়েই আসতে পারতুম, মিছিমিছি বস্তির মধ্য দিয়ে আসতে হল। এই রাস্তা দিয়েই তো বড়দিদের বাড়ি যাওয়া যায়।"

"এরপর যখন আসব বড় রাস্তা দিয়েই আসব।"

একটা টালির চালের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, "এইটেই শ্যামার কারখানা, ও ভেতরে রয়েছে। যান কথা বলুন।" তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, "আমি চারটে টাকা আর গাঁজা দিয়ে সাঁড়াশি করিয়েছি। আপনি কিন্তু এর বেশি দিয়ে রেট খারাপ করে দেবেন না। ও যদি চায় দশ টাকা, আপনি তখন বলবেন তিন টাকা। তারপর দরকষাকষি করে রাজি হবেন চার টাকায়। মনে রাখবেন, তাড়াতাড়ি পেতে চান যদি, তা হলে ওই গাঁজাটা দিতে হবে। চললুম, খাবার জল নিয়ে ঘরে যেতে হবে।"

স্ত্রীলোকটি ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। অপুর মা বলল, "দেখলে কালুদিদি, মানুষটা কত ভাল। কী উপকারটাই না করল উপযাচক হয়ে। গরিব লোকেরাই এটা করে।"

পরিহাসের স্বরে কলাবতী বলল, "উপকার তো নিশ্চয়ই করল, কামারশাল না বলে কারখানা বলতে হবে, নয়তো অর্ডার নেবে না। আর আর্জেন্ট পেতে হলে আটআনার গাঁজা ঘুষ দিতে হবে, এই পরামর্শ দিয়ে উনি তো উপকারই করলেন।"

অবাক হয়ে অপুর মা বলল, "এটা উপকার করা নয়?" আমার একটা লোহার গুলতি এখুনি চাই, বাগানে আজ দুপুরে দু'-দুটো পেয়ারা গাছে কাটার মতো একটা ডালও পেলুম না, যা দিয়ে গুলতি বানানো যায়। কাঁচা কাঠের

গুলতি তো মট করে ভেঙে যাবে, কাঠ শুকিয়ে শক্ত হতে হতে আমার বড়ি তদ্দিনে কাক শালিকের গব্বায় চলে যাবে।''

শ্যামা বনাম অপুর মা

কামারশাল বা কারখানার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপুর মা এবং কলাবতী কথা বলছিল, তখন ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ চোখে তাদের লক্ষ করছিল শ্যামাচরণ। কথা শুনতে পাচ্ছিল না কিন্তু দু'জনের কথা বলার ভঙ্গি থেকে সে আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করছিল। দশাসই অপুর মা'র পরনের ধবধবে থান ও গায়ে জড়ানো মুগার চাদর দেখে তার মনে হল এ নিশ্চয় বড়ঘরের গিন্নি আর সাধারণ সালোয়ার কামিজ, চটি পরা প্রসাধনহীন শ্যামলারঙের কলাবতীকে দেখে সে নিশ্চিত হল, এটা গিন্নির কাজের মেয়ে।

অপুর মা কামারশালের ভেতরে উঁকি দিল। ময়লা একটা ধুতি মালকোঁচা করে পরা, সেটায় জড়ানো কালিমাখা গামছা। ঊর্ধ্বাঙ্গে বগলকাটা কালো গেঞ্জি। গালে এক সপ্তাহের কাঁচাপাকা দাড়ি। মুখ শরীরের মতোই শীর্ণ এবং লম্বাটে। চুলে কখনও চিরুনি পড়েছে বলে মনে হয় না। চোখ দুটি ঘন ভুরুর নীচে ড্যাবড্যাবে এবং ঈষৎ লাল। শ্যামা উবু হয়ে বসে ছিল, অপুর মাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

''কী চাই আপনার?''

''লোহার একটা গুলতি করে দিতে হবে।''

শ্যামার চোখ আরও গোলাকার হয়ে স্থির হয়ে রইল পাঁচ সেকেন্ড। অবশেষে বলল, ''গুলতি! কার জন্য?''

''আমার জন্য।''

অপুর মা'র গম্ভীর মুখ ও কণ্ঠস্বর শ্যামাকে বুঝিয়ে দিল, ব্যাপারটা হালকা করে দেখা ঠিক হবে না।

''আমি তো জীবনে গুলতি তৈরি করিনি, ওসব আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়।''

''কেন সম্ভব নয়? গুলতি আপনি কি কখনও চোখে দেখেননি?''

''দেখেছি, ছেলেবেলায় আমার নিজেরই একটা ছিল, কাঠের। চড়কের মেলায় কিনেছিলুম। গুলতি দিয়ে পাথর ছুড়ে রাস্তার একটা কুকুরকে মারতেই

সে আমাকে কামড়ে দেয়। ভাগ্যিস কুকুরটা পাগলা ছিল না। পরদিনই মা গুলতিটা দিয়ে উনুন ধরায়।''

অপুর মা বুঝে গেল শ্যামাচরণ কামার কথা বলতে ভালবাসে। কিন্তু এখন আজেবাজে কথা বলার সময় নয়। সে কাজের কথা পাড়ল। ''আপনার কাজের এত নাম কত লোকের কাছে শুনেছি বলেই তো খুঁজতে খুঁজতে আপনার কারখানায় এলুম।''

কথাগুলো শুনে শ্যামার চোখ ভাললাগার আমেজে ছোট হয়ে কোটরে প্রায় ঢুকে গেল। কলাবতী এতক্ষণ ঘরটার চারধারে চোখ বোলাচ্ছিল। ছোট ছোট নানান আকারের লোহার টুকরো কোনওটা গোল কোনওটা চ্যাপটা, কোনওটা 'দ' বা ইংরিজি 'জেড'-এর মতো, লোহার সরু ও মোটা পাত এক কোনায়, আর এক কোনায় কয়লা। মাটির মেঝেয় গর্ত করে কয়লার চুল্লি, চামড়ায় তৈরি হাপর থেকে একটা নল মাটির তলা দিয়ে গেছে চুল্লিটার নীচে। হাপরটাকে হাতল ধরে ওঠানামা করালে বাতাস যায় নল দিয়ে চুল্লিটার তলায়, গনগন করে ওঠে কয়লার আগুনের আঁচ।

শ্যামাচরণ ছোট্ট একটা নিচু টুলে বসে হাপরের হাতল ধরে ওঠানামা করাতে শুরু করল। ঝিমিয়ে থাকা চুল্লি থেকে দু'-চারটে ফুলকি ছিটকে উঠল।

''লোহা দিয়ে গুলতি বানানো সোজা কাজ নয়। আপনি কাঠ দিয়ে করে নিন, ছুতোর মিস্তিরির কাছে যান। আমার দুটো ঘর পরেই অনিল মিস্তিরির কারখানা, ওকে গিয়ে বলুন।'' শ্যামাচরণ সহজ স্বরে পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

''অ। তা হলে আপনি পারবেন না। তা হলে আপনার সম্পর্কে যা শুনেছিলুম তা সবই ভুল।'' অপুর মা চিবিয়ে চিবিয়ে এমনভাবে কথাগুলি বলল যা শোনামাত্র শ্যামার মাথা চিড়বিড়িয়ে উঠল।

''কী শুনেছেন আমার সম্পর্কে?'' চড়া গলায় বলল শ্যামা।

অপুর মা তার গলা এক ডেসিবেল নামিয়ে বলল, ''আপনি যে কাজ করেন তা খুব নিখুঁত আর টেকসই হয়, অবশ্য গাঁজার জন্য যদি আপনাকে আলাদা পয়সা দেওয়া হয়।''

শ্যামাচরণ প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভীষণ চটে গেছে সে অপুর মা'র কথায়। বলল, ''গাঁজা খাই তো বেশ করি। এইরকম আগুনের পাশে বসে দশ ঘণ্টা লোহা পিটোতে হলে আপনিও খেতেন।''

শুনে অপ্রতিভ হয়ে গেল অপুর মা। কিছুক্ষণ রান্নাঘরে থাকলেই তার মাথা ধরে আসে, তখন ইচ্ছে করে বাইরে বেরিয়ে আসতে, ঠান্ডা হাওয়া লাগাতে, আর এ তো গনগনে আঁচের ধারে এমন বদ্ধ ঘরে দশ ঘণ্টা কাটানো। অপুর মা'র মন ভরে উঠল সহানুভূতিতে। সে বলল, "আমি আপনাকে দু'টাকা দোব গাঁজার জন্য, বলুন আমার কাজটা করে দেবেন কিনা।"

ইতিমধ্যে কলাবতী ঘরের কোণে পড়ে থাকা নানা আকারের চল্লিশ-পঞ্চাশটা লোহার টুকরো ঝুঁকে দেখছিল। টুকরোগুলো বাঁকানো, তার কোনওটা ৪৫ ডিগ্রিতে, কোনওটা একেবারেই গোল, কোনওটা সমকোণের। দেখেই বোঝা যায় এ-সবই শ্যামার হাতের কাজ। তৈরি করেছে কারও অর্ডার পেয়ে। কলাবতীর মনে পড়ল এই ধরনের লোহা সে দেখেছে পাড়ার হার্ডওয়্যারের দোকানে, কাকার সঙ্গে ছোট একটা হাতুড়ি কিনতে গিয়ে।

হঠাৎ সে দুটো এক ফুট লম্বা লোহা তুলে নিল, দুটোই ৪৫ ডিগ্রিতে বাঁকানো। সে দুটোকে একসঙ্গে জোড়া দিয়ে মুঠোয় ধরতেই আকার নিল ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরের মতো। দু'হাত তুলে কলাবতী চেঁচিয়ে উঠল, "পেয়ে গেছি, গুলতি পেয়ে গেছি।"

শ্যামাচরণ আর অপুর মা অবাক হয়ে কলাবতীর দিকে তাকাল।

"অ্যাই, অ্যাই মেয়েটা, রেখে দে, রেখে দে"— ধমকে উঠল শ্যামা, "একদম ওতে হাত দিবি না, দু'ডজন কালকের মধ্যে পৌঁছে না দিলে আমার পিন্ডি চটকে দেবে ননীবাবু।"

শ্যামাচরণের ধমকানি কলাবতীর কানে ঢুকল না। সে উত্তেজিত হয়ে অপুর মা'র কাছে এসে জোড়া দেওয়া লোহা চোখের সামনে ধরল।

"ওম্মা তাই তো! এ তো ঠিক গুলতির মতোই!" কলাবতীর হাত থেকে লোহাদুটো প্রায় কেড়ে নিয়ে অপুর মা ছেলেমানুষের মতো গলায় শ্যামাকে বলল, "এ দুটো আপনি জুড়ে দিন, আপনি বরং পরে আর দুটো তৈরি করে নেবেন।"

শ্যামার চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আবার ড্যাবড্যাবে হয়ে উঠল। খিঁচিয়ে উঠে বলল, "তার মানে? জুড়ে দিন, তৈরি করে নেবেন, এ কি বেগুনভাজা না চাটনি করা? অ্যাই মেয়েটা, ও দুটো যেখানে ছিল সেখানে রেখে আয়। ওসব পরের জিনিস, আমার নয়।"

অপুর মা প্রমাদ গুনল, হাতের মুঠোয় এসে পাখি উড়ে পালাবে? মরিয়া হয়ে সে বলল, "কত টাকা নেবেন ও দুটোর জন্য? এ তো এক মিনিটের

কাজ। গাঁজার জন্য পাঁচ টাকা দোব আর কালুদিদিকে তুই-তোকারি করবেন না, ও জমিদারবাড়ির মেয়ে।''

শ্যামাচরণ ভ্রূকুটি করল। অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে বলল, ''কোথাকার জমিদার?''

''আটঘরার জমিদার, এই বস্তির পেছনেই ওদের বিরাট বাড়ি।'' অপুর মা'র গলা গর্ব মিশিয়ে একটু চড়ল।

''সিংহিবাড়ি?''

''হ্যাঁ। জানেন দেখছি।''

''জানব না কেন, ও বাড়ির মুরারি তো দুখ্যু পেলে, মনখারাপ হলে মাঝেমধ্যে আমার এখানে এসে দু'-চারটে টান দিয়ে যায়। লোকটা খুব সরল, দুটো টান দিয়েই বলে চাকরি ছেড়ে দোব, আর সহ্য করতে পারি না।''

কলাবতী অবাক হয়ে বলল, ''মুরারিদা এখানে মাঝেমধ্যে আসে গাঁজায় টান দিতে, পিসি এটা তো জানতুম না!''

''আমিও তো এই প্রথম শুনছি, তা চাকরি ছাড়বে কেন?''

শ্যামাচরণ টুলে বসে হাপরের হাতলটা ধরল। দু'বার ওঠানামা করিয়ে আঁচ উসকে দিয়ে বলল, ''মুরারি খুব ভয়ে ভয়ে থাকে, জমিদারবাবু দেশ থেকে একজন মেয়েছেলেকে এনেছে, তার গলার আওয়াজ মিটিং-এ বক্তিতার সময় মাইকের তিনটে চোঙা দিয়ে যে শব্দ বেরোয় তা এক করলে যা দাঁড়াবে ততটা আওয়াজ একসঙ্গে তার গলা দিয়ে বেরোয়। মুরারির হার্ট ভাল নয়, ও বলে, শ্যামা, শুনলে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, মনে হয় এবার মরে যাব। একবার যদি দেখা হয় তা হলে দেখতুম তার গলার জোর কতটা, ঠান্ডা করে দিতুম, আপনি কি জানেন সে মেয়েছেলেটাকে?''

শ্যামা তাকাল অপুর মা'র দিকে। মুখ থমথমে হয়ে গেছে রাগ চাপতে চাপতে। ''হ্যাঁ জানি সেই মেয়েছেলেটাকে।'' শান্তভাবে নিচু গলায় অপুর মা বলল, ''কিন্তু কথাগুলো বেটপকা বলে ফেলে মুরারিদার যে কী সব্বোনাশ আপনি করলেন তা হয়তো জানেন না।''

শ্যামা অবাক হয়ে বলল, ''কী সব্বোনাশ করলুম মুরারির?''

''মুরারিদা যে মেয়েছেলের কথা বলেছে, আমিই সেই। এবার আমায় কী ঠান্ডা করবি কর।'' অপুর মা লোহাদুটো মুঠোয় ধরে এক পা এগিয়ে যেতেই শ্যামা টুল থেকে লাফিয়ে উঠল।

অপুর মা এবার ছাড়ল তার ডাকাতে গলাটাকে, ''মেরে মাথা ফাটিয়ে

দোব হতচ্ছাড়া। এক্ষুনি আমায় এ দুটো দিয়ে গুলতিটা তৈরি করে দে বলছি, নয়তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন। সিংহিবাড়ির মেয়েকে তুই-তোকারি করা?''

কামারশালের দরজায় তিন-চারজন লোক হাজির হয়ে গেছে। তারা ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, এই ভেবে ইতস্তত করছে। একজন বলল, ''শ্যামাদা হয়েছে কী? আবার খদ্দেরের সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়েছ।''

শ্যামা জবাব দেওয়ার আগেই অপুর মা বলল, ''হবে আবার কী, ছোটমুখে বড় কথা! কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে না, গাঁজা খেয়ে খেয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। করে দাও বলছি।''

দরজা থেকে একজন বলল, ''ও শ্যামাদা, ঝামেলা বাড়াচ্ছ কেন, করে দাও না, মাসিমা যা চাইছে।''

আর একজন বলল, ''কী না কী হল রে বাবা, ভাবলুম ডাকাত পড়ল বুঝি, আজকাল তো মেয়ে-ডাকাতও হয়।''

আর একজন বলল, ''দম মারাটা এবার একটু কমাও শ্যামাদা।''

গজগজ করে শ্যামা বলল, ''সারাদিনে একটা টানও দিইনি আর বলছিস কিনা দমমারা কমাতে? ভাগ, ভাগ এখান থেকে।''

দরজা থেকে লোকগুলো সরে যেতেই শ্যামা বলল অপুর মাকে, ''মুরারি ঠিকই বলেছে। তিনটে চোঙার আওয়াজ আপনার গলায়। দেখি ও দুটো।'' হাত বাড়িয়ে লোহাদুটো নিয়ে চুল্লিতে ঢোকাল। জোরে জোরে হাপর টেনে গনগনে করে তুলল চুল্লিটা। যখন তেতে লোহাদুটোয় কমলা রং ধরেছে তখন একটা একটা করে তুলে নেহাইয়ের ওপর রেখে সরু মুখ ছেনি দিয়ে লোহার ঠিক মাঝখানে দুটো করে গর্ত করল দুই ইঞ্চির ব্যবধানে। এরপর জলভরা একটা লোহার বালতির মধ্যে গরম লোহাদুটো ফেলে দিতেই ছ্যাঁক করে উঠে সাদা ধোঁয়া উড়ল।

''এ কী, জোড়া হল কই?'' কলাবতী উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল।

''আমার এখানে লোহা জোড়া লাগাবার জিনিস থাকে না, ওসব থাকে মোটর সারাইয়ের গ্যারেজে, যাকে বলে ওয়েল্ডিং।'' এই যে গর্ত করে দিলুম এবার লোহা দুটোকে একসঙ্গে ধরে ওর মধ্যে দিয়ে বল্টু আর নাট ঢুকিয়ে টাইট করে দিলেই জোড়ার কাজ হয়ে যাবে। এখান থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে দশ পা গেলেই হার্ডওয়ারের দোকান, দুটো বল্টু আর দুটো নাট কিনে লাগিয়ে নেবেন।''

আঁচলের গিঁট খুলে অপুর মা দোমড়ানো একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বলল, "এতে হবে?"

জবাব না দিয়ে শ্যামাচরণ নোটটা টুক করে টেনে নিয়ে বলল, "পাঁচটা টাকা আর দিতে হবে না। যা ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেছে।"

কলাবতী বলল, "কী ক্ষতি হল আপনার?"

"মুরারির সব্বোনাশ করে ফেললুম। বেচারা হার্টের রুগি, এখন তো উঠতে বসতে ওর কানের কাছে যে চোঙাগলার বক্তিতা বাজবে, বেচারা এবার মরেই যাবে।" শ্যামাচরণ টপ করে টুলে বসে হাপরের হাতল ধরল।

ওরা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে নাট-বল্টু কিনল, দোকানদারই সেগুলো টাইট করে লাগিয়ে দিতেই 'ওয়াই' হয়ে গেল লোহাজোড়া। কলাবতী বাঁ হাতে ওয়াইয়ের গোড়াটা মুঠোয় ধরে মুখের সামনে তুলে এক চোখ বন্ধ করে টিপ করল। তারপর ডান হাতে কাল্পনিক রাবারের ছিলে দু'আঙুলে চেপে ধরে টান দিয়ে ছেড়েই নিজের মনে বলে, "ঠকাস ... ডাকাতটার কপালে ... পড়ে গেল।" বলেই সে হেসে উঠল।

অপুর মা বলল, "একেই বলে গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল, কলকাতা কি আটঘরা যে, এখানে বাড়িতে ডাকাত পড়বে? তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো, মুরারিদার সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

কলাবতী চলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, "না পিসি না, মুরারিদাকে তুমি কিছু বলতে পারবে না। দাদুর কাছে শুনেছি সত্যি সত্যিই ওর হার্টের অসুখ আছে, মানুষটা খুব ভাল, সবাইকে ভালবাসে, তোমাকেও মেয়ের মতো ভালবাসে, ওকে তুমি কিছু বোলো না, প্লিজ পিসি।" অপুর মা'র হাত চেপে ধরল কলাবতী।

কিছুক্ষণ কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অপুর মা'র ঠোঁট পাতলা হাসিতে মুচড়ে গেল, বলল, "আচ্ছা, বলব না। তবে তোমাকেও কথা দিতে হবে এমন কাজের মেয়ের মতো সাজে কখনও বাড়ির বাইরে যাবে না।"

"তুমি কথা রাখলে আমিও রাখব।" কলাবতী পালটা শর্ত রাখল।

অপুর মা তাড়া দিয়ে বলল, "হয়েছে হয়েছে, পা চালিয়ে বাড়ি চলো। কতক্ষণ বেরিয়েছি বলো তো! তবে কি জানো কালুদি, এই গলার ওপর আমার তো কোনও হাত নেই, জন্মো থেকেই পেয়েছি। শুনেছি আমার ঠাকুদ্দার নাকি এমন গলা ছিল।"

হাঁটতে হাঁটতে অপুর মা বলে চলল, "ঠাকুদ্দা একটা হাঁক দিলে নাকি

ছেলের কান্না বন্ধ হয়ে হেঁচকি উঠত, মাঠের গোরু উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাত, ডাব পাড়তে ওঠা মানুষ গাছ থেকে পড়ে যেত।''

''আচ্ছা পিসি, তুমি কখনও ঠাকুরদার মতো হাঁক দিয়েছ?'' কৌতূহলে কলাবতী জিজ্ঞেস করল।

''ঠাকুদ্দার মতো কি না জানি না। তবে অপুর বাবা তো পাঠশালার মাস্টার ছিল। আমাদের বাড়ির পাশে মস্ত ধানখেত, তার লাগোয়া বিরাট একটা বিল, তারপর একটা গ্রাম, নাম বায়সা, পাঠশালাটা ছিল ওই বায়সায়, তা প্রায় আধ মাইল তো হবেই, তার বেশিও হতে পারে। অপুর বাবা তো ভাত না খেয়েই পড়াতে চলে যেত। দুপুরে উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আমি ধানখেতের ধারে গিয়ে বায়সার দিকে মুখ করে গলাটা একটু উঁচুতে তুলে তখন বলতুম...'' অপুর মা এবার মুখের দু'পাশে দু'হাতের চেটো চোঙার মতো করে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভাআত বেএড়েছিই' আর তখনই পাঠশালে টিপিন হয়ে যেত। গ্রামের পাঠশালে তো আর ঘড়ি থাকে না।''

কলাবতী মজা করে বলল, ''পিসি, এখন তুমি অমন গলায় 'ভাত বেড়েছি' বলতে পারবে?''

''পাগল হয়েছ!'' সিংহিবাড়ির লোহার ফটকের আগল খুলে অপুর মা ভেতরে পা দিয়ে বলল, ''এটা কলকাতা শহর, এখানে কি গলা ছাড়া যায়! তখন বয়স কম ছিল, জোর ছিল কাজেতে, আর সেটা ছিল গ্রাম। তবু মাঝেমধ্যে রেগে গিয়ে গলাটা তখন আর বশে থাকে না, তুলে ফেলি। শুনলে না কামারটার কাছে, মুরারিদা গাঁজায় দুটো টান দিয়েই কী বলেছে।'' অপুর মা'র স্বরে অভিমান আর ক্ষোভ ঝরে পড়ল।

গুলতি তৈরি হয়ে গেল

বাড়িতে পা দিয়েই কলাবতী দোতলায় ছুটে গেল লোহার 'ওয়াই'টা দাদুকে দেখাবার জন্য। রাজশেখর তখন বসার ঘরে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে টিভিতে রোমা আর এভার্টনের মধ্যে দু'দিন আগে খেলা ফুটবল ম্যাচটা ই এস পি এন চ্যানেলে দেখছিলেন। পাশেই মেঝেয় বসে মুরারিও দেখছিল খেলা। কলাবতী তার হাতের জিনিসটা তুলে ধরে বলল, ''বলো তো দাদু, এটা কী?''

রাজশেখর ভ্রূ কুঁচকে দেখে বললেন, "তক্তা রাখার ব্র্যাকেট।"

"মোটেই না, এটা দিয়ে তৈরি হবে গুলতি।" কলাবতী ওয়াইটা বাঁ হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ডান হাতে কাল্পনিক তির ছোড়ার মতো ভঙ্গিতে ছিলে টেনে ধরল। "মালোপাড়ার বস্তির মধ্যে শ্যামা কামারের কামারশাল থেকে তৈরি করালুম। পিসি এবার কাক চিল বেড়াল কুকুর দেখলেই শিক্ষা দিয়ে দেবে। উফফ্ অমন সাধের বড়ির কী দশাটা করল।"

রাজশেখর হাসি চেপে বললেন, "দিদি, এবার যে দুটো এক বিঘত লম্বা রবার লাগবে আর রবারদুটোর মাঝে একটুকরো চামড়া লাগবে, তা না হলে তো গুলতি হবে না।"

"রবার!" কলাবতী চিন্তায় পড়ে গেল, "পিসি অবশ্য রবাটের কথা বলেছিল। কোথায় পাই বলো তো দাদু?"

দাদু-নাতনি খুবই সমস্যায় পড়ে গেল। রাজশেখর বললেন, "আমরা ছেলেবেলায় যেসব গুলতি বিক্রি হতে দেখেছি তার ছিলেগুলো মোটরের চাকার টিউব কেটে বানাত।"

"টিউব পাব কোথায়! যেসব দোকান টায়ার সারায় সেখানে খোঁজ করব। স্কুল যাওয়ার পথে অমন একটা দোকান পড়ে, কাল তা হলে খোঁজ নোব।"

এতক্ষণে মুরারি কথা বলল, "মোটরের টায়ারের মধ্যে গোলপানা যে রবারটা থাকে; যার মধ্যে হাওয়া ভরে, সেটার কথা কি বলছেন কত্তাবাবু?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে টিউব বলে।" রাজশেখর উৎসুক চোখে তাকালেন।

"ছোটবাবু তো অমন একটা গোল রবারের টিউব নিয়ে সাঁতার কাটতে যেত কেলাবে, আপনার মনে আছে কত্তাবাবু?"

"খুব মনে আছে। সাঁতার শেখার জন্য ক্লাবে ভরতি হয়ে টিউবে চড়ে সারাক্ষণ জলে ভেসে বেড়াত। সাঁতারটা আর শেখা হল না।" রাজশেখর হতাশ এবং বিরক্ত স্বরে বললেন।

"সেই টিউবটা তো একতলায় বাতিল জিনিসের ঘরে এখনও পড়ে রয়েছে, ওটা থেকেই তো গুলতির ছিলে তৈরি করা যায়।"

তিন মিনিটের মধ্যেই মুরারি চুপসে থাকা বড় একটা লাল রঙের টিউব কলাবতীর হাতে তুলে দিয়ে বলল, "এটা অপুর মাকে দাও, ও কাঁচি দিয়ে কেটে ছিলে বানিয়ে নেবে।" তারপর নিচু গলায় বলল, "কালুদিদি, শ্যামা আমার সম্পর্কে কি কিছু বলল?"

কলাবতী আকাশ থেকে পড়ার মতো চোখ এবং গলার স্বর নিয়ে বলল, ''সে কী মুরারিদা, লোকটা তোমার চেনে নাকি? কই, কিছু তো বলল না!''

আশ্বস্ত হয়ে মুরারি বলল, ''শ্যামা আমার পাশের গ্রামের ছেলে, মানুষটা খুব ভাল।''

সেই সন্ধ্যাতেই রান্নাঘরে ঢোকার আগে অপুর মা তার তিনটে কাঁচির মধ্যে যেটা বড়, সেটা দিয়ে টিউবটা কেটে দুটো রবারের ছিলে বার করল। ওয়াইয়ের দুটো ঊর্ধ্ববাহুর সঙ্গে বাঁধার জন্য শক্ত টোন সুতো চাই। কলাবতীর ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘর অপুর মা'র। সেখানে আছে পুরনো একটা কাঠের দেরাজ আর আলনা। আর আছে একটা স্টিলের তোরঙ্গ, কলাবতী তার নাম দিয়েছে 'আজব বাক্স'। সেই বাক্সে আছে বাতিল চিরুনি, টুথব্রাশ, ভাঙা ছিটকিনি, নানার মাপের স্ক্রু ও পেরেক, স্ক্রু ড্রাইভার, ঘুড়ির সুতো, উড পেনসিলের টুকরো, ইরেজার, শাড়ির পাড়, কলাবতীর হোমটাস্কের খাতা যার অর্ধেক পাতা সাদা রয়ে গেছে, নাইলনের দড়ি, বোরিক তুলো, অর্ধেক খাওয়া ওষুধের শিশি, নানান মাপের ও রঙের বোতাম, ব্লেড, হাতলভাঙা হাতুড়ি, ফলকাটা ভোঁতা ছুরি এবং আরও বহুবিধ দ্রব্য। মজার কথা, এইসবের কোনও-না-কোনওটা কখনও-না-কখনও ঠিক দরকার পড়ে যায়, আর তখনই বাক্স থেকে অপুর মা সেটি বার করে দেয়।

গুলতিতে রবারের ছিলে বাঁধার জন্য দরকার শক্ত টোন সুতো, সেটিও বেরোল পিসির আজব বাক্স থেকে। করে যেন সুতোয় বাঁধা বই দিল্লি থেকে ডাকে এসেছিল সত্যশেখরের জন্য। অপুর মা তখনই সুতোটা তুলে রেখেছিল। তবে পাওয়া গেল না নরম চামড়ার টুকরো।

''দরকার নেই কালুদিদি চামড়ার, গ্রামে আমরা শাড়ির মোটা পাড় দিয়েই চালিয়ে দিয়েছি।''

সুতরাং সমস্যা মিটে গেল।

রাত্রে অপুর মা শোয় কলাবতীর খাটের পাশে মেঝেয় বিছানা পেতে। এই শোয়ার স্থানটি সে নিজেই নির্বাচন করেছে, কারণ 'অতটুকু মেয়ে রাতে একা একা ঘুমোলে খারাপ স্বপন দেখে ভয় পেতে পারে।' স্বপন দেখে ভয় পেয়ে কিনা কে জানে, তবে প্রায়ই ভোরবেলা দেখা যায় কলাবতী মেঝেয় পিসিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে।

কলাবতী ঘুমিয়ে পড়ার পর অপুর মা তার বিছানায় ছুঁচ সুতো কাঁচি নিয়ে বসে গুলতি তৈরি শেষ করল যখন, বসার ঘরে প্রায় একমানুষ উঁচু

গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে তখন রাত বারোটা বাজল। ঘড়িটি রাজশেখর কেনেন চৌরঙ্গি এক্সচেঞ্জ নামে তাঁর চেনা এক নিলামঘর থেকে। ফ্রান্সে তৈরি দেড়শো বছরের পুরনো ঘড়িটা তাঁর কথায় 'জলের দামে মাত্র তিরিশ হাজার টাকায় পেয়েছি।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে কলাবতী দেখল তার বালিশের পাশে রয়েছে লোহার গুলতিটা, তাতে রবারের ছিলে বাঁধা। সেটা হাতে নিয়ে দুই আঙুলে দুটো ছিলের মাঝে জোড় দেওয়া কাপড়ের পাড়টা টিপে ধরে রবারটা টেনে ছেড়ে দিল, শব্দ হল 'ছপাং'। দু'-তিনবার ছপাং শব্দটা শুনে খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে বারান্দায় এসে "পিসি, পিসি" বলে চেঁচাতে শুরু করে দিল। অপুর মা তখন একতলায় ঘর মোছামুছির ঠিকে ঝি কান্তির মা'র দালান মোছার দিকে নজর রাখতে রাখতে তার রান্নাঘরের সহকারী শকুন্তলাকে নির্দেশ দিচ্ছিল, "ফিজ থেকে ডালবাটাগুলো বার করে ভাল করে ফ্যাটা, আজ আবার বড়ি দোব। দেখব আজ কাকের একদিন কি আমার একদিন।"

কলাবতী একতলায় নেমে এসে বলল, "পিসি কখন বানালে গুলতিটা, রাতে? এটা নিয়ে আমি কিন্তু আজ স্কুলে সবাইকে দেখাব।"

"একদম নয়।" অপুর মা কড়া গলায় কলাবতীকে দমিয়ে দিয়ে বলল, "আজ বড়ি দোব, ওটা আমার দরকার।"

"কাক শালিক মারবে? কিন্তু কী দিয়ে ছুড়বে গুলতি, সেজন্য তো সুপুরির মতো ইট কি পাথর চাই!"

"তুমি কি ভেবেছ, সে ব্যবস্থা আমি করিনি? কাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় দেখলুম একটা বাড়ির জন্য ভিত খোঁড়া হয়েছে, আর ইট বালি পাথরকুচি গাদা করে রাখা ফুটপাতের ধারে। মাটি তো নয়, যেন নলেন পাটালি। ওই মাটি পুড়িয়ে খুব শক্ত গুলি হবে। তাই আজ ভোরবেলায় যখন রাস্তার লোকজন প্রায় নেই তখন বালতি নিয়ে আর মোটা পেলাসটিকের একটা বড় থলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।"

"বাড়ির জন্য ভিত খোঁড়া হচ্ছে তো অনেক দূরে, প্রায় পাঁচশো গজ এখান থেকে! তুমি এত দূর থেকে বয়ে আনতে পারলে?"

"কেন পারব না!" অপুর মা অবাক হয়ে বলল, "ভত্তি এক বালতি মাটির ওজন কত? পনেরো-কুড়ি কেজি, আর পেলাসটিকে পাথরকুচির ওজন বড়জোর পাঁচ-সাত কেজি। দু'হাতে এ দুটো বইতে পারব না!" অপুর

মা যেভাবে তাকিয়ে রইল তাতে কলাবতীর নিজেকে মনে হল সে গোপাল ভাঁড়ের মতো হাসির কথা বলছে।

কলাবতী কথা বাড়াবার সাহস আজ পেল না। দোতলা থেকে নেমে এল সত্যশেখর, সেরেস্তায় মক্কেল আসার সময় হয়ে গেছে। কলাবতীর হাতে গুলতিটা দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কালু, তোর হাতে ওটা কী?"

"গুলতি।"

"একটা যাচ্ছেতাই বাজে জিনিস, পেলি কোথা থেকে? জানিস কী বিপজ্জনক ওটা? তোর বড়দি তখন তোর বয়সি, খেলাচ্ছলে ধাঁ করে গুলতিতে ইট লাগিয়ে মেরে আমার কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিল। ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস ওয়েপন। মলয়াকে আমি এক মাস ক্ষমা করিনি। আসলে বকদিঘির মেয়ে তো, ওর বাপের মতোই আটঘরাকে সহ্য করতে পারে না।"

"বড়দিকে তা হলে তো জিজ্ঞেস করতে হয় কেন তোমার কপাল ফাটিয়েছিলেন।"

"খবরদার। বড়দির কাছ থেকে আমার সম্পর্কে কোনও ইনফর্মেশন নেওয়ার চেষ্টা করবি না, টপ টু বটম বাজে খবর দেবে।" বলেই সত্যশেখর লম্বা পায়ে সেরেস্তার দিকে হাঁটা দিল।

স্কুলে যাওয়ার সময় কলাবতী দেখল শকুন্তলা পাটি, কাপড় আর ডালবাটা ভরতি গামলা আর অপুর মা হাতে গুলতি আর পলিথিনের একটা থলি নিয়ে তিনতলায় উঠছে। স্কুল থেকে ফেরার সময় ফটক দিয়ে ঢুকেই তার চোখ গেল ছাদের পাঁচিলে। অন্তত পঞ্চাশটা কাক সার দিয়ে বসে চিৎকার করে চলেছে। এমন দৃশ্য তাদের বাড়িতে সে আগে কখনও দেখেনি।

সদর দরজা পেরিয়ে ঢুকতেই দেখা হল মুরারির সঙ্গে। অবাক কলাবতী বলল, "মুরারিদা, ছাদে কী হয়েছে, অত কাক বসে চেঁচাচ্ছে?"

"কাকেরা হরিসংকীর্তন করছে। অপুর মা ওদের দু'জনকে স্বগ্নে পাঠিয়েছে কিনা।"

"গুলতি দিয়ে?"

"তবে না তো কী!"

শুনেই উত্তেজিত কলাবতী ছুটল দোতলায়। অপুর মা তখন রাজশেখরকে চা দিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। "পিসি, তুমি দু'-দুটো কাক মেরেছ গুলতি দিয়ে!"

"হুঁ।" গম্ভীর মুখে কলাবতীর পাশ কাটিয়ে অপুর মা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

"আমি কাক মারা দেখব পিসি, চলো, ছাদে চলো, গন্ডা গন্ডা কাক বসে আছে। গুলতিটা কোথায়?"

অপুর মা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলল, "কলকাতার কাক যে এমন বিটকেল হয় তা যদি আগে জানতুম তা হলে কি মারতুম, বাড়ি যেন মাথায় তুলেছে। কত্তাবাবু পর্যন্ত বকলেন আমায়। এখন উনি বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছেন, সন্ধের আগে ফিরবেন না। আর বাবা আমি ওই গুলতি ধরছি না!"

"কাক দুটোকে কী করলে?"

"পায়ে দড়ি বেঁধে তারে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। অন্যেরা দেখুক বড়ি নষ্ট করলে কেমন শাস্তি পেতে হবে। ওম্মা, তারপরই ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে পাঁচিলে বসে গেল। তবে ছাদে কেউ নামেনি, বড়ির ধারেকাছেও কেউ আসেনি, যাই শকুন্তলাকে বলি, ও দুটোকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে।"

"পিসি, তুমি ক'বার ছুড়লে?"

"দুটো পাথর।" অপুর মা দুটো আঙুল তুলে দেখাল।

"আর তাতেই দুটো কুপোকাত! তোমার হাতে এত টিপ! তাও কত বছর প্র্যাকটিস নেই!"

ভ্রূ কুঁচকে অপুর মা বলল, "কী নেই?"

"প্র্যাকটিস, মানে অনুশীলন।"

অপুর মা কী বুঝল কে জানে, শুধু বলল, "অ। এখন হাতমুখ ধুয়ে এসো, আজ খিদেটিদে আছে তো, নাকি কেউ টিপিনের ভাগ দিয়েছে?"

"ভীষণ খিদে পাবে পিসি যদি গুলতিটা আমাকে দিয়ে দাও।"

কলাবতীর সঙ্গে পঞ্চুর সাক্ষাৎ

সেইদিনই অপুর মা গুলতিটা তুলে দিল কলাবতীর হাতে। পরের দিন একটি কাককেও দেখা গেল না ছাদের আশপাশে। বোধহয় অপুর মা'র শাস্তি দেওয়ার ধরন দেখে তারা বুঝতে পেরেছে বড়ি খাওয়ার সুখ থেকে প্রাণরক্ষা করাটা বেশি জরুরি। এরপর বড়ি দেওয়া, শুকোনোর পর প্লাস্টিকের কৌটোয় তুলে রাখার কাজ সাত দিনের মধ্যেই অপুর মা সমাপ্ত করে ফেলল। তারপর বড়ির

গুণগত উৎকর্ষ পরীক্ষা করার জন্য পোস্ত বড়িভাজা, পলতার শুক্তোবড়ি, হিং দিয়ে ঝালের বড়ি এবং টকের বড়ি রান্না হল এক রবিবারের দুপুরে।

খাওয়ার পর রাজশেখরের মন্তব্য, ''শুক্তোটা আর একদিন খাইয়ো, বহু বছর পর আসল বড়ি খেলুম।''

সত্যশেখর অবশ্য খুঁত ধরল, ''কালু, পোস্তর বড়িটা তোর কেমন লাগল? একটু ঝাল ঝাল হলে মোহন্তর পকৌড়ি আর মুখে দেওয়া যাবে না।''

কলাবতী বলল, ''তেঁতুলের টকে যে বড়ি খেলুম সেটা ধুপুকে খাওয়াতেই হবে পিসি, তুমি একদিন রেঁধে দাও, আমি ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসব।''

এইসব কথা শুনে আত্মপ্রসাদ চেপে নম্রস্বরে অপুর মা বলে, ''শুধু টকের বড়ি কেন, অন্য বড়ির রান্নাও টিপিন কেরিতে করে দোব, নিয়ে গিয়ে ধুপুর মাকে খাইয়ে আসবে আর বলে দেবে এসব আটঘরার বড়ি।''

রাজশেখর বললেন, ''শুধু ধুপুর মাকে কেন, হরির বাড়িতেও পাঠাব, খেয়ে দেখুক আটঘরার বড়ি কী জিনিস।''

তিনদিন পর স্কুল থেকে ফিরে কলাবতী শোয়ার ঘরে ঢুকেই দেখল তিন বাটির টিফিন ক্যারিয়ারটা টেব্‌লের ওপর রাখা। দেখেই সে বুঝে গেল এটাকে নিয়ে তাকে ধুপুদের বাড়ি যেতে হবে। যাওয়ার সম্ভাবনায় সে খুশিই হল। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির বাইরে অনেক কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, হঠাৎ দেখা হয়ে যায় স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে। তা ছাড়া পিসি যাকে বলে 'অখাদ্য কুখাদ্য', সেইসব জিনিস কিনে খাওয়া যায়।

আধঘণ্টা পর টিফিন ক্যারিয়ার হাতে ঝুলিয়ে কলাবতী যখন বেরোচ্ছে, অপুর মা তখন হুঁশিয়ারি দিল, ''রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটবে, নাচতে নাচতে যেন যেয়ো না, টিপিন কেরিটা নাড়ানাড়ি কোরো না। আর বোলো গরম করে নিয়ে যেন খায়। ফেরত দেওয়ার সময় যেন ভাল করে ধুয়ে দেয়।''

ধুপুদের ফ্ল্যাট প্রায় দশ-বারো মিনিটের পথ। বাসরাস্তা পার হয়ে কিছুটা ভেতরে একটা মাঝারি চওড়া রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা গেলে পড়বে একটা পার্ক। সেটার তিনদিকে চার-পাঁচতলার সাত-আটটা ফ্ল্যাটবাড়ি, ফুটপাথে ও পার্কে বড় বড় গাছ। এলাকাটায় নতুন বসত হয়েছে, তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পার্কের যেদিকে বাড়ি নেই সেই দিকে রেললাইন এবং সার দিয়ে টালির ঘর।

কলাবতী যেতে যেতে দেখল পার্কের ছোট গেটের ধারে ডালমুট, চানাভাজা, সিদ্ধ ছোলা নিয়ে বসে একটি লোক। তার পাশে তোলা উনুনে বালিভরা কড়াইয়ে চিনেবাদাম ভাজছে এক স্ত্রীলোক। গরম বাদাম খাওয়ার লোভ সামলাতে না পেরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। টিফিন ক্যারিয়ারটা ফুটপাথে রেখে কিনল একশো গ্রাম সদ্য ভাজা বাদাম। ঠোঙাটাকে হাতে নিয়ে একটা বাদাম দু'আঙুলে টিপে দানা বার করে মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে বলল, "নুন দাও।"

লোকটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের পুরিয়ার মতো কাগজের একটা পুরিয়া তাকে দিল। সেটা খুলে আঙুলের ডগায় নুন লাগিয়ে জিভে দিল। তখন তার চোখে পড়ল গজখানেক দূরে আইসক্রিমওলার পাশে রয়েছে ঝালমুড়িওলা।

কলাবতী বাদামের ঠোঙা হাতে এগোল ঝালমুড়ি কিনতে। "দু'টাকার দাও, কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ বেশি করে।"

বাঁ হাতে বাদামের ঠোঙা ডান হাতে ঝালমুড়ির। কলাবতী ঠিক করল, আগে ঝালমুড়িটাকে শেষ করে একটা হাত টিফিন ক্যারিয়ারের জন্য রাখবে। এর পরই সে চমকে উঠে তাকাল, যেখানে টিফিন ক্যারিয়ার ফুটপাতে রেখে বাদাম কিনছিল সেই জায়গাটার দিকে, দেখল একটা বানর টিফিন ক্যারিয়ার তুলে নিয়ে রেলিং-এর ওপর দিয়ে উঠে পার্কের ভেতর নামল। তারপর ছুটে দূরে গিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের মাথার খিলটা সরিয়ে ঢাকনা তুলল। বানরটা বছর দেড়েকের বাচ্চা ছেলের মতো, ল্যাজটা হাতখানেক লম্বা, গায়ের লোমের রং পাট-এর মতো।

বাদামওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল, "ধরো, ধরো, খুকি দাঁড়িয়ে আছ কেন, দৌড়োও ওর পিছে।"

কলাবতী ধড়মড়িয়ে ছুটে গেল গেটের দিকে। পার্কের মধ্যে ঢুকে "হেই হেই" বলে চিৎকার করতে করতে ছুটল বাঁদরটার দিকে। ওপরের বাটিতে রাখা ছিল আলু ও বেগুন দিয়ে বড়ির ঝাল। বানরটা কপকপ করে সেগুলো তুলে মুখে পুরছে। কলাবতীকে ছুটে আসতে দেখে বানরটা টিফিন ক্যারিয়ার ফেলে পাশেই রাধাচূড়া গাছটায় উঠে মুহূর্তে মগডালে পৌঁছে গেল।

কলাবতী ফ্যালফ্যাল করে মুখ তুলে বানরটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটায় ঢাকনা পরাবার আগে প্রথম বাটিতে পড়ে থাকা ঝোলটুকু ফেলে দিল। তবু ভাল, বাকি দুটি বাটি অক্ষত রয়ে গেছে। পার্কে যারা ঘটনাটা দেখেছে তাদের বেশির ভাগই হাসল, দু'-তিনজন সহানুভূতি

জানাল। লজ্জায় গরম হয়ে গেল কলাবতীর দুটো কান। একটা বাঁদরের কাছে এমন হেনস্থা হতে হল! মজা পেয়ে লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ভাবছে, মেয়েটা কী নির্বোধ!

কলাবতী পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতেই বাদামওলা তাকে বলল, "বাঁদরটা আমার ছোলা, চানা চুরি করে খেত। কেন চুরি করত সেটা আমি বুঝি। মানুষের মতো জানোয়ারেরও খিদে পায়। মানুষ ভিক্ষে করেও পেট চালাতে পারে, কিন্তু জানোয়ার তো ভিক্ষে করতে পারে না, তাই চুরি করে খায়। একদিন আমি ওকে পাকড়াও করে আচ্ছাসে পিটুনি দিয়ে বললুম, চুরি করবি না, এখানে এসে দাঁড়াবি, আমি তোকে চানা দোব। ও এসে দাঁড়াত, আমি একমুঠো চানা দিতাম। কিন্তু ওইটুকু খাবারে কি পেট ভরে? তাই ও চুরি করে খায়। খুকি তুমি কিছু মনে কোরো না, ওকে মাফ করে দাও।"

পার্কের ধারেই চারতলা একটা বাড়ির দোতলায় ধুপুদের ফ্ল্যাট। তাকে দেখে ধুপু অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে বলল, "তুই! কী ব্যাপার, হাতে ওটা কী?"

"বড়ি।"

এরপর কলাবতী তার আগমনের কারণ জানিয়ে দিতে ধুপু বলল, "মা তো বড়মাসির বাড়ি গেছে, সন্ধের পর আসবে। যাই হোক, ওগুলো আমি রেখে দিচ্ছি, রাতে সবাই খাব।" ধুপু টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনাটা তুলে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "এটা যে একদম খালি!"

কলাবতী অপ্রতিভ হেসে বলল, "আর বলিস কেন, ওটায় ছিল বড়ির ঝাল, একটা বাঁদর খেয়ে নিল।"

তারপর সে ধুপুকে বলল ফুটপাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ার তুলে নিয়ে বাঁদরের পালানো এবং পার্কের মধ্যে বসে তার বড়ি খাওয়ার ঘটনাটা। শুনেই ধুপু হো হো করে হেসে উঠে বলল, "পঞ্চু তোকেও তা হলে ঘোল খাইয়েছে!"

"এটা ঘোল খাওয়ানো নয়, চুরি।"

"এখানে খুব কম বাড়িই আছে যেখানে পঞ্চু রান্নাঘরে ঢোকেনি বা চুরি করে খায়নি, তবে জিনিসপত্তর ভাঙে না, কাপড়চোপড় ছেঁড়ে না। রেললাইনের ধারে থাকত উসমান বাঁদরওয়ালা, তার ছিল তিনটে বাঁদর, তাদের দিয়ে রাস্তায় খেলা দেখিয়ে সে পেট চালাত। অদ্ভুত ট্রেনিং দিয়েছিল বাঁদরগুলোকে।

একেবারে মানুষের মতো আচরণ করত! পঞ্চু ছিল তিনটের একটা, মানেকা গাঁধি কী যেন আইন করলেন, কেউ খাঁচায় পশুপাখি আটকে রেখে তাদের কষ্ট দিতে পারবে না, তাদের দিয়ে খেলা দেখাতে পারবে না। ব্যস, একদিন উসমানকে বাঁদর সমেত পুলিশে থানায় ধরে নিয়ে গেল, পঞ্চুটা থানা থেকে পালাল। উসমানকে অবশ্য পুলিশ ছেড়ে দেয়। বাকি বাঁদরদুটোকে পুলিশ সল্টলেকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বলে শুনেছি। উসমান তারপর দিনমজুরের কাজ নিল। এদিকে পঞ্চু ঠিক ফিরে এসেছে। রাতে উসমানের কাছেই থাকে, খায়ও ওর সঙ্গে, দিনের বেলা থাকে পার্কের গাছে। তার মধ্যেই কখনও লোকের বাড়িতে ঢুকে রেন ওয়াটারপাইপ বেয়ে তিন কি চার তলায় উঠে সেখান থেকে লাফিয়ে বারান্দায় নেমে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কোন বাড়িতে ঢুকেছে সেটা জানতে পারি যখন 'ধর ধর, তাড়া ওটাকে তাড়া' বলে একটা চেঁচামেচি শুরু হয়।'' বলতে বলতে ধুপুর হাসি দেখে কলাবতী বুঝল, পঞ্চু নামক বজ্জাতটি ওর খুবই স্নেহের পাত্র।

''উসমান কি ওকে খেতে দেয় না?''

শুনেই ম্লান হয়ে গেল ধুপুর মুখ। বলল, ''উসমান মরে গেছে। ইট ভরতি লরির ওপর বসে দমদম যাচ্ছিল, লরিটা এক গর্তে পড়ে উলটে যায় আর উসমান ইটের নীচে চাপা পড়ে, হাসপাতালে দু'দিন বেঁচে ছিল। তারপর থেকে পঞ্চু অনাথ। আমাদের পেছনের পাড়ার এক হাউজিং-এর দরোয়ান ওকে পোষার চেষ্টা করেছিল। গলায় বকলশ পরিয়ে চেন দিয়ে বাড়ির গেটে বেঁধে রেখে দিত কিন্তু পঞ্চু দু'বেলা খাওয়া পাওয়ার জন্য বাঁধা থাকতে চায়নি। পাঁচদিনের দিনই চেন খুলে পালিয়ে যায়।''

''পঞ্চু নামটা কার দেওয়া, উসমানের?''

''আরে না, না, নামটা ওই শিবনাথ বাদামওয়ালার দেওয়া। পুরো নাম পঞ্চানন। তার মানে শিব, মহাদেব।''

''মহাদেবই বটে! তোর পঞ্চুকে বাগে পেলে গুলতি মেরে ওর মাথা ফাটাব।''

''খবরদার কালু, ওই কাজটি করতে যাস না। পঞ্চু অসম্ভব ভাল নকল করতে পারে। যা একবার দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে কপি করে নেবে, তারপর করে দেখাবে। মাথা হয়তো তুই ওর ফাটাবি কিন্তু একদিন তোরই মাথা ফাটাবে ওই গুলতি দিয়েই। মা একদিন হাতা দিয়ে রান্নাঘরে ওর মাথায় ঠকাস করে মেরেছিল, দু'দিন পর সকালে মা ওমলেট করছে তখন কে যেন মাথায়

খুট করে মারল। চমকে মা ফিরে দেখে পঞ্চু রান্নাঘরের টুলের ওপর। হাতে সেই হাতাটা আর কিচকিচ, কিচকিচ করে হাসছে। এখনও আমরা ওটা নিয়ে হাসাহাসি করি। এক মিনিট বোস, টিফিন ক্যারিয়ারটা খালি করে দিচ্ছি। তোর পিসি হঠাৎ বড়ির রান্না করে পাঠালেন যে?''

''সেদিন টিফিনে তুই বড়ি খাওয়ালি, এটা তার রিটার্ন। কাল স্কুলে অবশ্যই বলবি খেয়ে কেমন লাগল।''

ধুপুর কাছ থেকে ফেরার সময় কলাবতী দেখল, ঝালমুড়িওয়ালা তখনও রয়েছে। পঞ্চুকে তাড়া করতে গিয়ে হাতের বাদাম ও ঝালমুড়ির ঠোঙা প্রথমেই বিসর্জন দিতে হয়েছিল। আবার সে দাঁড়িয়ে বিসর্জিত ঠোঙাটা উদ্ধারের চেষ্টায় রিপিট করল, ''দু'টাকার দাও, কাঁচালঙ্কা পেঁয়াজ বেশি করে।''

ঠোঙা হাতে নিয়েই কলাবতী দেখল ঝালমুড়িওয়ালার পেছনে পার্কের রেলিং-এর ওপর বসে পঞ্চু। কোথা থেকে কখন যে এল কে জানে! ওকে দেখে মায়া হল কলাবতীর। পঞ্চুকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবার চেষ্টা করে সে কষ্ট পেল।

একগাল মুড়ি মুখে দিয়ে ঠোঙাটা সামনে বাড়িয়ে সে বলল, ''আয় পঞ্চু।''

শোনামাত্র পঞ্চু রেলিং থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে ঠোঙাটা কলাবতীর হাত থেকে তুলে নিয়ে যেভাবে সে মুখে মুড়ি ঢেলেছিল হুবহু সেইভাবে মুখে ঢেলে ঠোঙাটা শেষ করে দিল। কলাবতী বুঝল ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। আইসক্রিমওয়ালা চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল পঞ্চুর মুড়ি খাওয়া দেখতে। কলাবতী তার কাছ থেকে একটা কাপ কিনল। কাঠের চামচ দিয়ে খানিকটা আইসক্রিম মুখে তুলে সে-কাপটা পঞ্চুর দিকে বাড়িয়ে দিল। তার নকল করে চামচ দিয়ে তুলে তুলে কেমন করে খায় সেটা দেখবে। চামচ নয় জিভ দিয়ে তিন-চারবার চেটেই সে কাপটা পরিষ্কার করে ফেলল। কলাবতী হেসে টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে তুলে নিয়ে এগোতেই তার জিনসের হিপ পকেটে টান পড়ল। এবার তার আরও অবাক হওয়ার পালা। তার টাকা রাখার ব্যাগটা পঞ্চুর হাতে!

বাদামওয়ালা শিবনাথকে হাসতে দেখে কলাবতী আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ''ব্যাপার কী?''

''পঞ্চু ছোলা খাওয়াতে বলছে। ও জানে ছোলা কেনার পয়সা ব্যাগে থাকে, তাই ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলছে কিনে দাও।'' শিবনাথ একটা ঠোঙায়

দু'মুঠো সিদ্ধ ছোলা ভরে কলাবতীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ''পঁচাশ পয়সা।''

পঞ্চুর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে কলাবতী বলল, ''ছোলা বিক্রি করিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে কমিশন দিয়ো।''

ঠোঙাটা পঞ্চুর হাতে দিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে কলাবতী হাঁটা শুরু করল। একটু গিয়েই রাস্তা পার হওয়ার জন্য সে দু'দিকে তাকাল। দেখল পঞ্চু চার হাত-পায়ে ছুটে আসছে লেজটা 'ৎ'-এর মতো বাঁকানো, তার পাশে এসে পঞ্চু মাড়ি বার করে দাঁতগুলো দেখিয়ে 'কিচকিচ' শব্দ করে দু-তিনবার কিছু একটা বলতে চাইল। ওর ভাষা বোঝার সাধ্য নেই কলাবতীর, তবু কিছু একটা ধরে নিয়ে বলল, ''রাস্তা পার হবি? আঙুল ধর।'' সে বাঁ হাতের তর্জনীটা বাড়িয়ে ধরল, একটা বাচ্চা ছেলের মতো পঞ্চু আঙুলটা আঁকড়ে ধরে দুলতে দুলতে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে ফুটপাতে উঠে দু'পা এগোতে না এগোতেই কিচকিচ করে ডেকে ভয়ে কলাবতীর হাঁটু জড়িয়ে ধরল। সামনে দিয়ে আসছেন এক প্রৌঢ়, তাঁর হাতে ধরা চেনে বাঁধা এক ডোবারমান।

কলাবতী এর আগে কুকুরের সঙ্গে বাঁদরের বা ছাগলের সঙ্গে বাঁদরের খেলা রাস্তায় দেখেছে। কুকুরে-বাঁদরে ভাব হয় বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু এই ডোবারমানটার সঙ্গে পঞ্চুর যে ভাব হয়নি সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। কুকুরটা কামড়ে দিতে পারে এই আশঙ্কায় চটপট সে পঞ্চুকে বগল ধরে কোলে তুলে নিল, যেভাবে ছোট ভাইকে কাঁখে নেয় দিদিরা, সেইভাবে।

প্রৌঢ় লোকটি কৌতুকভরে কোলে ওঠা বাঁদরটির এবং কলাবতীর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। খুবই শিক্ষিত ডোবারমান তাই পঞ্চুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু চাপা 'গর্‌র্‌র্‌র' ছাড়া একটা 'ঘেউ' পর্যন্ত করল না। পঞ্চু কলাবতীকে জড়িয়ে মুখ পেছন দিকে ফিরিয়ে যতক্ষণ দেখা যায়, সাক্ষাৎ যম দেখার মতো চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

পঞ্চুর নতুন আশ্রয়

পঞ্চুকে কোলে করে কলাবতী বাড়িতে ঢুকল। একতলায় কেউ নেই, দোতলায় এসে দেখল রাজশেখর টেলিফোনে কথা বলছেন। কলাবতীকে দেখে অবাক হয়ে রিসিভারে দুটো কথা বলে সেটা নামিয়ে রাখলেন।

"একে কোথায় পেলি?" রাজশেখরের এটাই প্রথম প্রতিক্রিয়া।

"বলছি।" পঞ্চুকে কোল থেকে মেঝেয় নামিয়ে দিতেই সে কলাবতীর পা আঁকড়ে ভীত চোখে এধার-ওধার তাকাতে লাগল। ওকে পাশে নিয়ে কলাবতী সোফায় বসল।

"এর নাম পঞ্চু, পঞ্চানন। এর কেউ নেই, পার্কের একটা গাছে থাকে আর বাড়ি বাড়ি ঢুকে চুরি করে খায়। আমার টিফিন ক্যারিয়ারটা চুরি করে দৌড় লাগায়। আমি ওকে ধরার আগেই প্রথম বাটির আলু বড়ি বেগুনের ঝালটা ওর গব্বায় চলে যায়। তারপর ধুপুর কাছে শুনলুম পঞ্চু ছিল বানর-খেলানো উসমান নামে একজনের কাছে। ও কিন্তু খুব ট্রেইন্ড।"

রাজশেখর বললেন; "ট্রেইন্ড যে, সেটা তো দেখেই বুঝতে পারছি, কীরকম চুপচাপ ভদ্দরলোকের মতো বসে রয়েছে! তা একে বাড়ি আনলি কেন?"

কলাবতী বলল, "দ্যাখো দাদু, চুরির জন্য পঞ্চুর তো আমার হাতে মার খাওয়ার কথা। কিন্তু, যেই ওকে মুড়ি খেতে ডাকলুম অমনই কাছে চলে এল, আসলে খাবার দেখে ও ভয় ভুলে গেল। তারপর আইসক্রিম খাওয়ালুম, তারপর ছোলাও। আমি চলে আসছি, ও আমার পিছু নিল। একটা ডোবারমান দেখে পালাবার পথ না পেয়ে ও আমাকে আঁকড়ে ধরল, আমিও ওকে কোলে তুলে নিলুম।

"দাদু, তুমিই তো বলেছিলে, একটা মানুষ ভাল না খারাপ সেটা বোঝা যায় পশুপাখিরা মানুষটাকে কীভাবে গ্রহণ করছে, তাই দেখে। পঞ্চু আমাকে নিশ্চিন্তে গ্রহণ করেছে। আমি যে সত্যি সত্যিই ভাল, এর থেকে বড় প্রমাণ আমার কাছে আর কী হতে পারে।"

রাজশেখরের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, "এখন তোর নিজেকে কেমন লাগছে?"

কলাবতী পঞ্চুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "দারুণ লাগছে। এত ভাল আগে কখনও লাগেনি। পঞ্চু কিন্তু আমাদের বাড়িতে থাকবে।" আবদারে কলাবতীর স্বর নাকি হয়ে গেল।

"তা নয় রইল, কিন্তু বাড়ির অন্যরা, তোর কাকা, পিসি, মুরারিদা, তারা পঞ্চুকে মেনে নেবে তো?"

তখনই বসার ঘরে ঢুকল অপুর মা, কলাবতী যে সোফায় বসে ছিল তার পেছন দিকের দরজা দিয়ে।

"দিয়ে এলে কালুদিদি?"

কলাবতী মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, বলল, "দিয়ে এসেছি, তবে ওরা খাবে রাত্তিরে। কাল স্কুলে ধুপু আমাকে জানাবে কেমন লাগল।"

"মনে করে কিন্তু জেনে আসবে।" অপুর মা তারপর রাজশেখরের দিকে তাকিয়ে বলল, "সকালে বললেন গা গরম গরম লাগছে। থারমিটারটা এনেছি, দেখুন একবার জ্বরটর হল কিনা।"

অপুর মা সোফার পেছন থেকে এগিয়ে গেল থার্মোমিটার হাতে, আর তখনই সোফায় গুটিসুটি হয়ে বসা পঞ্চুকে দেখতে পেয়ে তার চোখদুটো গোল হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। এক পা পিছিয়ে গিয়ে সে বলল, "ওম্মা, এ আবার কে?"

জবাব দিলেন রাজশেখল, "পঞ্চু। আজ থেকে আমাদের বাড়িতে থাকবে। তোমার তাতে অসুবিধে হবে না তো?"

অপুর মা কিছু বলার আগেই কলাবতী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, পিসির অসুবিধে হবে কেন, পিসি তো পশুপাখি খুব ভালবাসে, তাই না? তুমি তো দেশের বাড়িতে কুকুর পুষেছিলে, তোমাদের হাঁস ছিল, গোরু ছিল, ছাগলও ছিল।"

অপুর মা বুঝে গেল দাদু-নাতনি জোট এই বাঁদরটার দিকে, দু'জনের বিরুদ্ধে সে একা। তার আপত্তি টিকবে না। থমথমে মুখে সে বলল, "অসুবিধে হবে কেন, একটা বাঁদরের বদলে নয় দুটোকে এবার থেকে দেখতে হবে।" বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজশেখর বললেন, "কালু, ভীষণ চটে গেছে পিসি, তোকে বাঁদর বলে গেল।"

"পিসিকে ঠিক করতে হয় কী করে, আমি জানি। কাল ওকে ধুপুর মায়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এমন শুনিয়ে দেব আর বলব তোমার বড়ির ঝাল পঞ্চু চেটেপুটে খেয়েছে। কী রে পঞ্চু, দারুণ নয়?"

কলাবতী পঞ্চুর মাথা ধরে নাড়িয়ে দিল। পঞ্চু 'চিঁইই, চিঁই' শব্দ করে সম্ভবত বুঝিয়ে দিল কলাবতী ঠিকই বলেছে।

রাজশেখর বললেন, "কালু রাতে ও থাকবে কোথায়? শুনলুম তো রাতে পার্কের গাছে থাকত। আমাদের বাগানে তো বড় গাছ বলতে দেবদারু, চাঁপা, নিমগাছ, তার একটাতেই ও থাকুক।"

"না, না দাদু, গাছেটাছে নয়, বাড়ির মধ্যে থাকবে।" কলাবতী আপত্তি জানাল, "আমার ঘরেই থাকবে।"

"তোর ঘরে?" রাজশেখর সন্ত্রস্ত হলেন, "অপুর মা তা হলে বাক্স বিছানা নিয়ে সোজা আটঘরায় ফিরে যাবে। পঞ্চুকে বরং তিনতলার সিঁড়িঘরে চট পেতে বিছানা করে দে। রাতে ওখানে থাকবে আর দিনের বেলা বাগানে।"

মুরারি এতক্ষণ বাড়ি ছিল না। রাজশেখর তাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কলেজ সহপাঠী এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর লেখা একটি ইংরেজি বই আনার জন্য। মুরারি বই হাতে ফটক দিয়ে ঢুকে দেখল বাগানে কলাবতী চারতলা সমান চাঁপাগাছটার দিকে মুখ তুলে চেঁচাচ্ছে, "ওঠ, ওঠ, আরও ওপরে ওঠ।" ওর হাতে গুলতি।

বিকেলে সে গুলতি নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেছে বাগানে। অপুর মা কয়লার উনুনে মাটি পুড়িয়ে সুপুরির মাপের গুলি বানিয়ে দিয়েছে, বাগানের পাঁচিলে ইট ঘষে লাল টার্গেট করে সে গুলতি দিয়ে গুলি ছোড়ে বিকেলে। মুরারি গাছের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাকে বলছ কালুদি?"

"পঞ্চুকে।" মুরারির বিভ্রান্ত চোখ দেখে সে ব্যাপারটা খোলসা করে দিল, "একটা বাঁদর, আমার সঙ্গে এসেছে, এ বাড়িতেই থাকবে।"

তখনই পঞ্চু লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল। মুরারি বাঁদর পছন্দ করে। সে হাত বাড়িয়ে ডাকল, "আয়, আয়।" ডাক শুনে পঞ্চু পিছিয়ে কলাবতীর পাশে দাঁড়িয়ে পিটপিট করে মুরারিকে দেখতে লাগল। ভাবখানা, এই লোকটার কাছে যাওয়া ঠিক হবে কি? কলাবতী পঞ্চুকে কোলে তুলে মুরারির কাছে এসে বলল, "এ হচ্ছে মুরারিদা, ভয় করবি না, খুব ভাল লোক।" পঞ্চুকে সে মুরারির কোলে তুলে দিল। কোলে উঠেই সে মুরারির ঝোপের মতো সাদা চুল আঙুল দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে উকুন খুঁজতে শুরু করল। বিব্রত কলাবতী বলল, "আরে আরে করছে কী!"

"ও কিছু না কালুদি, এটা বাঁদরের স্বভাব। তবে উকুন একটাও পাবে না।"

"না পাক, কালই তুমি চুল ছোট ছোট করে কেটে আসবে।"

তারপর মুরারির হাতে বই দেখে কলাবতী বলল, "ওটা তো দাদুকে

দেবে? আমায় দাও।''

বইটা নিয়ে সে পঞ্চুকে মুরারির কোল থেকে নামিয়ে তার হাতে দিয়ে বলল, ''যা, দাদুকে দিয়ে আয়।'' পঞ্চু পিটপিট করে তাকিয়ে রইল। কলাবতীর মনে হল, ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

''ঠিক আছে চল, দাদুকে চিনিয়ে দিচ্ছি। মুরারিদা, পঞ্চু ট্রেনিং পাওয়া বাঁদর। ওর মালিক ওকে হুকুম বলো আর নির্দেশই বলো তামিল করার শিক্ষাটা দিয়েছে, নয়তো রাস্তায় অত লোকের সামনে খেলা দেখাতে পারত না।'' এক হাতের বগলে বই, অন্য হাতে কলাবতীর আঙুল ধরে পঞ্চু হাঁটছে।

মুরারি বলল, ''পঞ্চু কি তা হলে বাঁদর-খেলানোওলার বাঁদর ছিল? তুমি পেলে কী করে?''

''পরে সব বলব। এখন থেকে ওকে নতুন করে ট্রেনিং দোব, অন্যরকমের।''

পঞ্চুকে হাত ধরে কলাবতী দোতলায় নিয়ে এল। রাজশেখর তখন লাইব্রেরি ঘরের টেব্‌লে একটা ম্যাপের বই খুলে চশমা চোখে ঝুঁকে দেখছিলেন।

কলাবতী দরজায় দাঁড়িয়ে পঞ্চুর কানে ফিসফিস করে বলল, ''ওই হচ্ছে দাদু, বইটা দিয়ে আয়।'' এই বলে সে পঞ্চুর ঘাড়ে একটা ঠেলা দিল। পঞ্চু চোখ তুলে তাকিয়ে বারকয়েক পিটপিট করে ঢুকল ঘরের মধ্যে, দুলে দুলে রাজশেখরের পাশে পৌঁছোল নিঃশব্দে, তারপর 'চিঁ চিঁ' আওয়াজ করল মুখে। চমকে রাজশেখর তাকালেন এবং তাজ্জব বনে গেলেন।

''আরে, আরে, এ কী কাণ্ড!'' বইটা হাতে নিয়ে তিনি নাতনিকে বললেন, ''তুই শিখিয়েছিস নাকি?''

''তবে না তো কে শেখাবে? আস্তে আস্তে ওকে আরও শেখাব।''

জলখাবার উধাও

সত্যশেখর হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে, সেখানেই কয়েকশো উকিল অ্যাটর্নি বসেন এমন একটা বাড়িতে তার ছোট্ট চেম্বারে মক্কেলদের সঙ্গে কথাটথা বলে বাড়িতে ফিরল সন্ধের পর। স্নান করে জলযোগ সেরে এবার সে মক্কেলদের নিয়ে বসবে বাড়ির চেম্বারে, যাকে সে পুরনো ঢঙে বলে সেরেস্তা।

ক্ষুদিরামবাবু পড়াতে এসেছেন। পড়ার ঘরে আসবার আগে কলাবতী

পঞ্চুকে তিনতলার সিঁড়িঘরে রেখে দোতলায় সিঁড়ির কোলাপসিবল গেট বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে একতলা-দোতলা ঘুরে বেড়াতে না পারে। সত্যশেখর সেরেস্তায় বসেই মুরারির এনে দেওয়া জলখাবার খায়। এখন মক্কেল কেউ এলে বাইরে রাখা চেয়ারে অপেক্ষা করে।

চারখানা গরম পরোটা, আলু ছেঁচকি ও দুটি ল্যাংচা মুরারি রেখে দিল টেব্‌লে। সত্যশেখর তখন মামলার একটা ব্রিফ পড়ছিল। মুখ তুলে প্লেটের দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "একটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে যাও, বাইরে কি কেউ এসেছে?"

"আসেনি।" বলে মুরারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই লঙ্কা নিয়ে এসে বলল, "ওপরে ফোন এসেছে।"

টেব্‌লে রাখা ফোনটার দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে সত্যশেখর বলল, "সাতদিন হয়ে গেল এখনও লাইন ঠিক হল না। কোথা থেকে ফোন এসেছে?"

"কত্তাবাবু বললেন শিলিগুড়ি থেকে।"

"ওহ্‌হ," সত্যশেখর ব্যস্ত হয়ে দোতলায় ফোন ধরতে গেল। মুরারিও ঘর থেকে বেরোল।

মিনিটপাঁচেক পর সত্যশেখর ফিরে এসে খাবারের প্লেটটা টেনে এনে তাকাতেই চক্ষুস্থির, তারপরই চিৎকার, "মুরারি, মুরারি। দুটোমাত্র পরোটা আর ল্যাংচাদুটো গেল কোথায়?"

ত্রস্ত মুরারি ছুটে এসে প্লেট দেখে বলল, "আমি তো চারটেই দিয়েছি আর দুটো ল্যাংচাও।"

হুংকার দিয়ে সত্যশেখর বলল, "তা হলে গেল কোথায়। কেউ একজন নিশ্চয় নিয়ে গেছে। কে সে? ভূত নিশ্চয় নয়!"

অঙ্ক কষতে কষতে কলাবতীর কানে গেছে কাকার কণ্ঠস্বর, সে ক্ষুদিরামবাবুকে "আমি আসছি সার, এক মিনিট" বলেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে দোতলায় সিঁড়ির কোলাপসিবল গেট খুলে তিনতলায় সিঁড়িঘরে পৌঁছে দেখল পঞ্চু নেই এবং ছাদের দরজা খোলা। মনে মনে সে বলল, "যা ভেবেছিলুম, নিশ্চয় পঞ্চুর কাজ।"

আলো জ্বেলে সে ছাদের এধার-ওধার দেখতে শুরু করল। হঠাৎ দেবদারু গাছে সরসর শব্দ হতেই সে পাঁচিলের ধারে এসে নিচু গলায় ডাকল, "পঞ্চু, পঞ্চু, অ্যাই পঞ্চু।" গাছ থেকে চিঁ চিঁ মতো একটা আওয়াজ হল।

দেবদারু গাছটা বাড়ির গা ঘেঁষে। তার ডালপালা ছাদ থেকে হাতদশেক দূরে। কলাবতী আবার ডাকল, "আয়, আয়।" গাছ থেকে লাফ দিয়ে ঝপাত করে ছাদের পাঁচিলে নামল পঞ্চু। কলাবতী ওর হাতের চেটোয় হাত দিয়ে পেল চটচটে রস। বুঝে গেল কাকার প্লেটের ল্যাংচার ও পরোটার অন্তর্ধান রহস্যটা। এখন কাকা যদি জানতে পারে বাড়িতে একটা বাঁদর পোষা হয়েছে, আর সেই বাঁদর তার খাবার চুরি করেছে, তা হলে যা কাণ্ড ঘটবে, সেটা ভেবে সে মনে মনে শিউরে উঠল।

ছাদের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে আবার সিঁড়িঘরে পঞ্চুকে রেখে কলাবতী দোতলার কোলাপসিবল গেট টেনে দিয়ে নীচে নেমে এল পড়ার ঘরে। শুনতে পেল কাকা গজগজ করে চলেছে, "দু'-দুটো পরোটা আর ল্যাংচা আমার টেব্‌ল থেকে...মুরারি ব্যাপার কী? তোমার তো চুরি করে খাওয়ার অভ্যেস নেই, তা হলে কি কালু? কিন্তু কালু তো খুব একটা মিষ্টির ভক্ত নয়, তা হলে? বাইরের লোক তো কেউ আসেনি, তা হলে? এখন কি আমায় ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করতে হবে?"

সারা বাড়িতে ফিসফাস, ছমছমে ভাব। অপুর মা জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে বারবার বলল, "বাবা তারকনাথ, তুমি তো ভূতনাথও, আমাদের দেখো।" মুরারি বলল, "ছি ছি, ছোটকত্তা শেষে আমাকেও বললেন 'তোমার তো চুরি করে খাওয়ার ওব্যেস নেই', তার মানে ওনার মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল, নইলে কথাটা বলবেন কেন?" রাজশেখর বললেন, "হয়তো অপুর মা দুটো পরোটাই দিয়েছিল আর ল্যাংচা দিতে ভুলে গেছল। মুরারি তো দেওয়ার সময় অতটা নজর করেনি।" প্রতিবাদ করে সত্যশেখর বলল, "না বাবা, আমি ঠিক নজর করেছি, চারটে আর দুটো ছিল।" তিনি আর কথা বাড়াননি, কেননা খাবারদাবারের দিকে ছেলের নজরে যে ভুল হবে না সেটা ভাল করেই জানেন।

রাত্রে খাওয়ার পর দোতলার ছাদে রাজশেখর পায়চারি করছিলেন, তখন কলাবতী তাঁকে বলল, "দাদু, আমি কিন্তু জানি কে খেয়েছে।"

রাজশেখর থমকে দাঁড়ালেন, "কে?"

"কাউকে বলবে না, বলো।"

"বলব না।"

"ওটা পঞ্চুর কীর্তি।"

"কী করে খেল। ও তো সিঁড়িঘরে ছিল!"

"ছিল, সেখান থেকে ছাদ, তারপর লাফিয়ে দেবদারু গাছ, তারপর মাটিতে নেমে সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই কাকার ফাঁকা সেরেস্তায় পরোটা-ল্যাংচা দেখে আর লোভ সামলাতে পারেনি। ভেবেছিলুম ওকে পেটাব কিন্তু তা হলে তো বাড়ির সবাই জেনে যাবে, পঞ্চুকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে কাকা।"

চিন্তিত স্বরে রাজশেখর বললেন, "এখন থেকে ওকে সামলে রাখতে হবে।"

সামলে রাখার জন্য পরদিন থেকেই সত্যশেখর কোর্টে বেরোনোর আগে পর্যন্ত সে পঞ্চুকে নিজের ঘরে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে আটকে রেখে নীচে পড়তে যেত। তার স্কুলের নমিতাদি সকালে একঘণ্টা সপ্তাহে তিনদিন ইংরেজি আর বাংলা, বাকি তিনদিন অন্য এক স্কুলের শিক্ষক তাকে বিজ্ঞান পড়ান। সত্যশেখরের গাড়ি ফটক থেকে বেরোলেই কলাবতী পঞ্চুকে বাগানে রেখে সদর দরজা বন্ধ করে দেয়। বাড়িতে ঢোকার এই একটিই দরজা। ঢুকতে হলে এবার পঞ্চুকে গাছ বেয়ে উঠে লাফিয়ে ছাদে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। ছাদের দরজাটাও এখন সারাক্ষণ বন্ধ রাখা হচ্ছে। কেউ বাড়ির বাইরে গেলে সদর দরজায় সঙ্গে সঙ্গে খিল পড়ে যায়। পঞ্চু সারা দুপুর বাধ্য হয়েই বাগানে কাটায়। একবার সে পাইপ বেয়ে দোতলার ছাদে উঠেছিল। অপুর মা দেখতে পেরে ছড়ি নিয়ে তেড়ে যেতেই দ্রুত নেমে যায়।

পঞ্চুর আনন্দ উথলে ওঠে যখন কলাবতী স্কুল থেকে ফেরে। ও ঠিক জানে কখন কলাবতী ফটক দিয়ে ঢুকেই "পনচুউ" বলে ডাকবে। ডাক শুনে ছুটে এলেই কলাবতী তাকে কোলে তুলে নেবে। বইয়ের বস্তাটা ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে বলবে "যা, রেখে আয়।" পঞ্চু দোতলায় রেখে আসবে কলাবতীর টেব্‌লে, আর সঙ্গে করে আনবে গুলতিটা, গুলি রাখা থলিটাও। সবকিছু যেন ওর মুখস্থ। এরপর সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের আর আলাদা দেখা যাবে না। বাগানে গুলতি নিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করার সময় দেওয়ালে লাগা পোড়া মাটির গুলি ছিটকে যায়, পঞ্চু সেগুলো কুড়িয়ে এনে হাতে তুলে দেয়।

একদিন দুপুরে দমকা হাওয়ায় ছাদ থেকে রাজশেখরের গেঞ্জি উড়ে গিয়ে পড়ে নিমগাছের উঁচু ডালে। স্কুল থেকে ফিরে কলাবতী দেখে মুরারি একটা বাঁশ দিয়ে গেঞ্জিটা পাড়ার চেষ্টা করছে। বাঁশটা ছোট তাই পৌঁছোচ্ছে না। কলাবতী কিছুক্ষণ দেখে বলল, "থাক মুরারিদা, আমি ব্যবস্থা করছি। পঞ্চু আয় তো।" এরপর সে আঙুল দিয়ে গাছের ডালে আটকে থাকা গেঞ্জিটা

দেখিয়ে বলল, "ওটা পেড়ে আন", চটপট দু'মিনিটের মধ্যে গেঞ্জিটা কলাবতীর হাতে পৌঁছে গেল। হাততালির শব্দে সে ঘুরে তাকাল দোতলার ছাদের দিকে। দাদু হাততালি দিচ্ছেন, পাশে দাঁড়িয়ে পিসি।

রাজশেখর চেঁচিয়ে বললেন, "কালু, ওকে তো পুরস্কার দেওয়া উচিত। চকোলেট কিনে দে, মুরারিকে বল।"

কলাবতীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে মুরারি প্রায় ছুটে গিয়ে 'ক্যাডবেরি' কিনে আনল, কলাবতী মোড়ক ছিঁড়ে চকোলেট পঞ্চুর মুখের সামনে ধরল। জীবনে সে এমন বস্তু মুখে দেয়নি। দু'-তিনবার শুঁকেই চকোলেটটা ছিনিয়ে নিয়ে সে মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলল। তারপরই সে ছেঁড়া মোড়কটা তুলে নিয়ে কলাবতীর দিকে তাকিয়ে "চিঁ চিঁ" করে বায়না শুরু করল, তার আরও চাই। কলাবতী ধমক দিল, "আর খায় না, অনেক দাম।"

আটঘরার বড়ি বকদিঘির আচার

খাওয়ার টেবলে রাজশেখর বললেন, "হরি তো গত বছর বকদিঘির আচার পাঠিয়েছিল, আমরা তো এবার আটঘরার বড়ি পাঠাতে পারি, কী বলিস কালু?"

শুনেই কলাবতী লাফিয়ে উঠল, "ঠিক বলেছ দাদু, অনেকদিন বড়দির বাড়ি যাওয়া হয়নি। আমি তা হলে বড়ি নিয়ে যাব।"

সত্যশেখর বিরক্ত মুখে বলল, "আবার ওদের বড়ি দেওয়া কেন, ওই থার্ড ক্লাস আচার খেয়ে আমি এক হপ্তা অন্য কোনও খাবারের টেস্টই ফিল করিনি।"

"কী বলছ কাকা, আদা আর করমচা দিয়ে আচারটা? কী দারুণ খেতে, গোটা শিশি তো আমি আর দাদু সাতদিনে শেষ করলুম। বড়দি যা সুন্দর বানায়!"

"নিজে বানিয়েছে না ছাই, দেখগে মানিকতলায় পল্লি শিল্পাশ্রম থেকে কিনে এনে নিজের হাতে করা বলে চালিয়েছে।"

"ঠিক আছে, আমি বড়দিকে জিজ্ঞেস করব?"

সন্ত্রস্ত হয়ে সত্যশেখর বলল, "কী জিজ্ঞেস করবি, নিজের হাতে বানিয়েছে কিনা? ও কি বলবে শিল্পাশ্রমের আচার?"

"বড়দি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না।" কলাবতী তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল। সত্যশেখর বাবার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তিনি নাতনির কথা অনুমোদন করে মাথা নোয়ালেন।

১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে যে ব্যবস্থা বাংলায় ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে চালু করেন তাতে জমিদাররা জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি পান। সেই সময়ই আটঘরায় সিংহ এবং বকদিঘিতে মুখুজ্যে পরিবার জমিদার হয়ে বসেন আর তখন থেকেই এই দুই পরিবারের মধ্যে জমির দখল ও প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার নিয়ে লাঠালাঠি থেকে বন্দুকের লড়াই পর্যন্ত হয়ে গেছে।

এদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি ও লড়াই ক্রমশ থিতিয়ে আসতে থাকে, যখন দুই পরিবারই কলকাতায় বাড়ি তৈরি করে গ্রাম থেকে এসে বাস করতে থাকে। সেই বছরই অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজের নতুন নামকরণ হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ। সিংহি আর মুখুজ্জে বাড়ির দুই ছেলে প্রেসিডেন্সিতে ভরতি হয় এবং বলা যায় তখন থেকেই পরিবারদুটিতে অন্য ধরনের হাওয়া বইতে শুরু করে, পরস্পরের মধ্যে ধীরে ধীরে সখ্য তৈরি হয়। দুই বাড়িতে শুরু হয় যাতায়াত। তবু সম্প্রীতি সত্ত্বেও দুশো বছরের ঝগড়ার রেশ মাঝেমধ্যে ফুটে বেরোয় হুল ফুটিয়ে কথা বলার মধ্যে।

চারটে ছোট ছোট পলিপ্যাক হাতে কলাবতীকে দেখে মলয়া অবাক হয়ে বলল, " কী ব্যাপার কালু, হাতে ওগুলো কী?"

"বড়ি। দাদু পাঠিয়ে দিলেন, আটঘরার বড়ি।"

মলয়ার বাবা হরিশঙ্কর তখন বেরোচ্ছিলেন, কলাবতীর কথা কানে যেতেই বসার ঘরে ঢুকে বললেন, "দেখি, কেমন বড়ি।"

চারটে পলিপ্যাক খুলে দেখলেন, গন্ধও শুঁকলেন, তারপর বললেন, "আটঘরার বড়ি? কী আশ্চর্য, মলু ঠিক এইরকম বড়ি আমি পল্লি শিল্পাশ্রম দোকানে দেখেছি, ঠিক এই গন্ধ।"

কলাবতী একটুও না দমে বলল, "জানেন বড়দি, কাকাও ঠিক একই কথা বলেছে আপনার পাঠানো আচার খেয়ে।"

মলয়া বিব্রত হয়ে বলল, "সতুর কথায় আমি কিছু মনে করি না।"

হরিশঙ্করের মুখ থমথমে হয়ে উঠল। মেয়েকে বললেন, "জ্যাম-জেলি বানাবি বলছিলিস। যখন বানাবি সতুকে সামনে বসিয়ে বানাবি, নয়তো

বলবে শেয়ালদার বাজার থেকে কিনে পাঠিয়েছে।'' বলেই গটগট করে হরিশঙ্কর বেরিয়ে গেলেন।

কলাবতী নম্র গলায় বলল, ''দাদু কিন্তু কাকার এসব কথায় বিন্দুমাত্র কান দেন না। বলে দিয়েছেন, মলুকে বলিস তেঁতুলের ঝাল আচারটা আর একবার যদি খাওয়ায়।''

''জ্যাঠামশাইকে বোলো আমি অবশ্যই পাঠাব, ভাল তেঁতুল আগে পাই। এই বড়ি কে তৈরি করল?''

''পিসি করেছে আর পিসি যা তৈরি করে দাদু তাতেই আটঘরার স্ট্যাম্প মেরে দেয়। আটঘরার শুক্তো, আটঘরার অম্বল, আটঘরার বড়ি। আর এই বড়ি তৈরি করতে গিয়ে পিসি দুটো কাক পর্যন্ত মারল গুলতি দিয়ে।''

''গুলতি।'' মলয়ার ভ্রূ আধ ইঞ্চি উঠে গেল। ''অপুর মা পেল কোথায়? ওটাও কি আটঘরার?''

''না, না, ওটা এখানকার মালোপাড়ার শ্যামা কামারের তৈরি। বড়দি, শুনলুম আপনিও ছেলেবেলায় গুলতি ছুড়ে কাকার কপাল ফাটিয়েছিলেন, সত্যি?''

''ফাটাইনি, তবে এখন গুলতি পেলে সত্যি সত্যি ওর মাথাটা ফাটাব। বুড়ো হচ্ছে অথচ কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে। কী করে যে ব্যারিস্টারি করে, ভেবে পাই না।''

''কাকাও ঠিক এই কথা বলে, 'মলু যে কী করে হেডমিস্ট্রেসি করে, বুঝতে পারি না।' বড়দি আপনি সত্যি সত্যি তা হলে কাকার কপাল ফাটাননি?''

''আমাদের বকদিঘির বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোয় তোমাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। আটঘরা থেকে নেমন্তন্ন রাখতে এসেছিল সতু। তখন ও ক্লাস নাইনে, আমি সিক্সে। আমাদের পুকুরধারে আছে একটা বিলিতি আমড়ার গাছ, এই বড় বড় যেমন তেমনই মিষ্টি। দেখেই সতুর খাওয়ার ইচ্ছে হল, আমাকে বলল, খাওয়াও। বললুম, কাজের বাড়িতে আমড়া পাড়ার লোক এখন পাব না, তুমি নিজে গাছে উঠে পেড়ে খাও। বাহাদুরি দেখাবার জন্য গাছে উঠল, তারপরই 'ওরে বাবা রে, মরে গেলুম রে' বলতে বলতে ঝপ করে লাফিয়ে নামল। লাল কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়েছে। কালু, এই পিঁপড়ের কামড়ে যে জ্বলুনি তা প্রায় বিছে কামড়াবার মতো। সতুর ধারণা পিঁপড়ের কামড় খাওয়াবার জন্য ইচ্ছে করে ওকে গাছে তুলিয়েছি। খেপে গিয়ে ও একটা মাটির ঢেলা তুলে আমার দিকে ছুড়ল, বলা বাহুল্য, লক্ষ্যভ্রষ্ট

হল। তখন আবার একটা ঢেলা তুলল, আমার হাতে ছিল গুলতি আমিও একটা মাটির ঢেলা গুলতি দিয়ে ছুড়লুম। ওর মাথায় লেগে সেটা ভেঙে যায়। এখন সেটাকেই বলছে ওর কপাল ফাটিয়েছি, অকল্পনীয়! কালু একটা জিনিস জেনে রেখো, গুলতি খুব নিরীহ অস্ত্র নয়। ছোট্ট ডেভিড গুলতি দিয়েই দৈত্য গোলিয়াথকে মেরেছিল।''

এরপর মলয়া খোঁজ নিল নমিতা কেমন পড়াচ্ছে? বলল, ''খুব ভাল টিচার, বাংলা আর সংস্কৃতে অসম্ভব ভাল। খুব মন দিয়ে ওর কাছ থেকে বাংলাটা শেখো। আমরা তো বাংলা ভাষাটা শেখার জিনিস বলেই মনে করি না। সেদিন নমিতা এগারো ক্লাসের দুটি মেয়ের খাতা দেখাল। একজন লিখেছে, শেয়ালটা আঙুরের কাঁদি দেখে লোভ সামলাতে পারল না। আর একজন লিখেছে ইংরেজরা বিপ্লবীদের ধরে হাড়িকাঠে ঝোলাত। দেখে কী যে লজ্জা করল কী বলব! কালু তুমি যেন 'কাঁদি' 'হাড়িকাঠ'-এর মতো বাংলা শিখো না।''

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে কলাবতী উঠল বাড়ি ফেরার জন্য। মলয়া তাকে আবার মনে করিয়ে দিল, ''গুলতি নিয়ে বেশি ছোড়াছুড়ি কোরো না। দেখতে নিরীহ কিন্তু মারাত্মক হতে পারে।''

রাতে খাবার টেব্‌লে কলাবতী জানাল, হরিদাদু বড়ি দেখে কী বলেছেন। ''আমিও বললুম আচার দেখে কাকাও ওই কথা বলেছে।''

সত্যশেখর বাঁ হাতে টেব্‌লে চাপড় মেরে বলল, ''এই তো সিংহিবাড়ির মেয়ের মতো কথা। কালু যখনই পাবি বকদিঘিকে ডাউন করে দিবি। তোর কথা শুনে বড়দি কী বলল?''

''কী আবার বলবেন, বললেন তোমার কথায় উনি কিছু মনে করেন না।''

''তার মানে আমাকে অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য করল।'' বলেই সত্যশেখর ছোলার ডালের বাটিটা তুলে মুখে ঢেলে দিয়ে বলল, ''মনে করবে কী করে, আমার প্রত্যেকটা কথাই তো সত্যি।''

''তবে কাকা, বড়দি বললেন তোমায় গুলতি দিয়ে মেরেছিলেন সেটা একটা মাটির ঢেলা, মাথায় লেগে ভেঙে গেছল আর তাতে তোমার কপাল ফাটেনি।''

''এই কথা বলল!'' সত্যশেখর বজ্রাহতের মতো নিজেকে দেখাবার চেষ্টা করল।

গম্ভীর মুখ করে কলাবতী বলল, "আরও বললেন, এখন গুলতি পেলে সত্যি সত্যিই তোমার মাথা ফাটাবেন।"

"এই হল রিয়্যাল বকদিঘি। সামনে আচার, আড়ালে অনাচার। এমন একটা মিথ্যা কথা তোকে বলতে পারল?" সত্যশেখরের স্বর হতাশায় ভেঙে পড়ল।

এতক্ষণ রাজশেখর চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন, এবার বললেন, "কালু বলেছিস মলুকে তেঁতুলের আচারটা আর একবার—।"

"বলেছি। ভাল তেঁতুল পেলেই করে পাঠিয়ে দেবেন।"

সত্যশেখর একটুও দেরি না করে বলল, "তার মানে আবার পল্লি শিল্পশ্রীতে ওকে যেতে হবে।"

ছেলের কথায় কান না দিয়ে রাজশেখর বললেন, "ঝালটা যেন আগের মতোই দেয়, এটা ওকে বলে দিতে হবে।" কথাটা তিনি বললেন এটাই বোঝাতে সত্যশেখরের 'শিল্পশ্রী' গল্পটার এতটুকুও তিনি বিশ্বাস করেননি এবং সত্যশেখর সেটা হৃদয়ঙ্গম করে চুপচাপ খাওয়া শেষ করল।

ব্যাগাটেলির গুলি অন্য কাজে

বছর দুয়েক আগে রাজশেখর নিলাম থেকে একটা ব্যাগাটেলি কিনেছিলেন। রাসেল স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে ওটা ছিল, খদ্দেররা অবসরে খুশিমতো খেলত। রেস্টুরেন্ট উঠে যাওয়ায় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ব্যাগাটেলিটাও নিলামে আসে। একটা চার ফুট উঁচু টেব্‌লে স্ক্রু দিয়ে আটকানো, সাড়ে তিন ফুট লম্বা এতবড় ব্যাগাটেলি বোর্ড অর্ডার দিয়ে তৈরি করাতে হয়। নাতনির কথা ভেবে রাজশেখর সেটা কিনে নেন।

ছোট বোর্ডের ব্যাগাটেলিতে ঝকঝকে সাদা কাবলিমটরের মাপের লোহার গুলি কাঠের স্টিক দিয়ে ঠেলে দিতে হয়। এই বোর্ডে সেটা করা হয় একটা স্প্রিং টেনে ছেড়ে দিয়ে। গুলি আছে দশটা। স্প্রিং ধাক্কা দেয় বড় আঙুরের সাইজের ভারী ওজনের লোহার গুলিতে। গুলি দু'পাশ চাপা একটা গলি দিয়ে জোরে বেরিয়ে এসে প্রথমে ধাক্কা দেয় একটা পিনে, তারপর এখানে-ওখানে ধাক্কা খেতে খেতে পিন দিয়ে বেড়ায় মতো তৈরি গোল গোল ঘরগুলোর একটায় ঢুকে যায়, না ঢুকতে পারলে বোর্ডের নীচে পড়ে

যায়। ঘরগুলোয় নম্বর দেওয়া আছে। যে ক'টা গুলি ঘরে ঢুকবে, যোগ করে তত নম্বর সে পাবে।

দোতলায় লম্বা করিডরের মতো চওড়া দালানে ব্যাগাটেলি বোর্ডটা রাখা হয়। প্রথম প্রথম কলাবতী প্রবল উৎসাহে দু'বেলা খেলত। মাঝেমধ্যে যোগ দিতেন রাজশেখর এবং সত্যশেখর। মাস দুয়েকের মধ্যেই সবার উৎসাহই থিতিয়ে আসে, অবশেষে ব্যাগাটেলিটার ওপর ধুলো জমতে শুরু করে। মুরারি মাঝেমধ্যে ঝাড়ন দিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গজগজ করে, "অহেতুক জিনিসটা কেনা হল। খেলবে না যদি তা হলে নীচের মালঘরে পাঠিয়ে দাও।"

পঞ্চু আসার পর কলাবতী ওকে শেখাবার জন্য আবার ব্যগাটেলি নিয়ে কয়েকদিন খেলতে শুরু করে। একটা টুলে বসে পঞ্চু মন দিয়ে দেখতে দেখতে বোর্ড থেকে একটা গুলি খপ করে তুলে নিল। মাথায় চাঁটি মেরে কলাবতী বলল, "রাখ, যেখানে ছিল রাখ।" পঞ্চু রেখে দিল। এক মিনিট পরেই আবার একটা গুলি তুলে নিল। এবার তার মাথায় চাঁটিটা একটু জোরেই পড়ল। কিছু না বলে কলাবতী কটমট করে তাকিয়ে শুধু আঙুল দিয়ে বোর্ডটা দেখাল। পঞ্চু বোর্ডের ওপর গুলিটা রেখে দিল।

এরপর কলাবতী ব্যাগাটেলি খেলা শেখাতে গেল পঞ্চুকে। ওর হাতটা স্প্রিং-এর নব-এর ওপর রেখে বলল, "টান, আঁকড়ে ধরে টান।"

কলাবতীর মুখের দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে নবটা জোরে টেনেই ছেড়ে দিল। গুলিটা ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে বোর্ডের কিনারে ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে উঠে ছিটকে মেঝেয় পড়ল। লাফাতে লাফাতে লোহার গুলি চলে যাচ্ছে, পঞ্চু তড়াক করে নেমে গুলিটা ধরে ফেলে কলাবতীর হাতে ফিরিয়ে দিল।

"আবার টান।" পঞ্চুকে টুলে বসিয়ে কলাবতী বলল।

আবার সেই একই ব্যাপার ঘটল। কলাবতী বুঝল মানুষের মতো হাতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ওর নেই। গুলিটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে এনে দিতেই সে বলল, "তোর দ্বারা ব্যাগাটেলিটা হবে না।" তারপর দুটো আঙুল 'ভি' করে সে বলল, "যা, এটা নিয়ে আয়।" সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চু কলাবতীর ঘরে ঢুকল এবং গুলতিটা দু'হাতে ধরে দুলে দুলে হেঁটে এনে দিল। এরপর বোর্ডে আবার ধুলো জমতে শুরু করে।

স্কুলে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে কলাবতী। বইপত্তর গুছিয়ে নিয়েছে, এবার অপুর মা টিফিন বক্স আর ওয়াটারবট্‌ল দিয়ে গেলেই বেরিয়ে

পড়বে। মোজা পরে জুতোয় পা গলাতে যাবে তখনই একটা বাচ্চার ভয়ার্ত চিৎকার আর কুকুরের খেঁকানি এবং কিছু মানুষের হইচই শুনে সে ছুটে পেছনের জানলায় গেল, জানলার নীচে সরু পগার গলি। দেখল গলিতে পাঁচ-ছ' বছরের গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরা একটি রুগ্ণ ছেলে ভয়ে সিঁটিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, তার কিছু দূরে একটা কালো রঙের রাস্তার কুকুর ওপরের ঠোঁটটা টেনে মাড়ি আর সামনের দাঁতগুলো হিংস্রভাবে বার করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে 'গর্‌র্ গর্‌র্' করছে। ওদিকে মালোপাড়া থেকে ছ'-সাতজন পুরুষ ও নারী ছুটে এসে চিৎকার করছে আর কুকুরটার দিকে ইট ছুড়ছে।

একটা ইট গায়ে লাগতেই কুকুরটা লোকগুলোর দিকে তেড়ে গেল। তারা ভয়ে পেছনদিকে ছুট লাগাল. "পাগলা কুকুর, কামড়ে দেবে, কামড়ে দেবে," বলতে বলতে। কুকুরটা ঘুরে আসছে, ছেলেটা ডুকরে কেঁদে উঠল।

'কিছু একটা এখুনি করতে হবে' কলাবতীর মাথায় দমকলের ঘণ্টার মতো কথাটা বেজে উঠল। সে ছুটে টেব্‌লের ওপর থেকে গুলতিটা তুলে নিয়ে পোড়ামাটির গুলি রাখা পলিপ্যাকটার জন্য এধার-ওধার তাকাল। মনে পড়ল পরশু ওটা অপুর মা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলেছিল, "রাতদিন শুধু গুলতি আর গুলতি, কী কুক্ষণেই যে জিনিসটা বাড়িতে নিয়ে এলুম। এটা এবার আমি ছুড়ে ফেলে দোব।" বলেই প্লাস্টিকের থলিটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যায়। রান্নাঘরটা অপুর মা'র দুর্গ, সেখানে কলাবতী ইতিপূর্বে যতবার অভিযান চালিয়েছে ততবারই ব্যর্থ হয়েছে। কলাবতী জানে থলিটা সে একসময় ফিরে পাবে, তবে একটু সময় লাগবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে এক সেকেন্ড সময়ও হাতে নেই। এখনই তার গুলি চাই। ছুটে সে ঘর থেকে বেরোতেই চোখে পড়ল ব্যাগাটেলি বোর্ড আর বোর্ডের ওপর পড়ে থাকা লোহার গুলির ওপর। দুটো গুলি সে মুঠোয় তুলে ঘরে ছুটে গেল। ওয়াটারবট্‌ল আর টিফিন বক্স নিয়ে তখন অপুর মা সবে দোতলায় উঠেছে। দেখল কলাবতী ব্যাগাটেলি বোর্ড থেকে গুলি তুলেই ঘরে ছুটে গেল। কৌতূহলে অপুর মা দ্রুত তার পিছু নিল।

জানলার গরাদের বাইরে গুলতিটা বার করে কলাবতী রবারের ছিলেতে লোহার গুলি লাগিয়ে এক চোখ বন্ধ করে টানল। তার হাত কাঁপছে। কুকুরটা খ্যাক খ্যাক করে ছেলেটার প্রায় গোড়ালির কাছে মাথা নামিয়ে এগিয়ে এসেছে কামড়াবার জন্য। কলাবতী ছিলেটা ছেড়ে দিল।

'কেঁউ' শব্দ করে কুকুরটা ঘুরে পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার সামনে তাকাল। গুলিটা তার উরুতে লেগেছে। সেই সময় অপুর মা তার হাতের জিনিসদুটো মেঝেয় রেখে বলল, "কাকে মারলে?"

"একটা পাগলা কুকুর, ছেলেটাকে কামড়াতে যাচ্ছে।"

চোখদুটো ছোট হয়ে গেল অপুর মা'র। কপালে ভাঁজ পড়ল। কলাবতীর হাত থেকে গুলতিটা ছিনিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, "দাও।"

কলাবতী ঝটিতি তার হাতে দ্বিতীয় গুলিটা তুলে দিল। বিশাল চেহারার অপুর মা গুলতির ছিলেতে গুলি লাগিয়ে জানলার কাছে পৌঁছেই ছিলে টেনে দুই গরাদের মাঝ দিয়ে গুলি পাঠাল।

হতভম্ব কলাবতী ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে রইল অপুর মা'র দিকে। বাইরে পগার গলি থেকে কুকুরের খ্যাক খ্যাক, ছেলেটার কান্না আর শোনা যাচ্ছে না। অপুর মা ওয়াটারবট্‌ল আর টিফিন বক্স মেঝে থেকে তুলে বলল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ইস্কুল যেতে হবে না?"

শুনে কলাবতীর সংবিৎ ফিরল। জানলার কাছে গিয়ে উঁকি দিল। কুকুরটা মাটিতে শুয়ে, মাথা দিয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরোচ্ছে আর ছেলেটা প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে মালোপাড়ার দিকে, সেখানে কিছু লোক দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে বোধহয় ছেলেটির মা।

"দিব্যি করেছিলুম গুলতি আর ছোঁব না।" চাপাস্বরে গজগজ করে উঠল অপুর মা, "নাও এখন রওনা দাও, ইস্কুলে লেট হয়ে যাবে।"

সত্যি সত্যিই ডাকাত পড়ল

সেদিন রাত্রে ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। দোতলায় নিজের ছোট্ট ঘরে দু'হাত তুলে অপুর মা উঁচু তাক থেকে নামাচ্ছিল একটা পুরনো তামার থালা। থালার ওপরে ছিল একটা ছোট ভারী কাঠের বাক্স। থালা ধরে টান দিতেই বাক্সটা পড়ে গেল আর পড়ল অপুর মা'র পায়ের পাতার ওপর। 'উহ্‌হ্‌' বলে সে পা চেপে বসে পড়ে। রাজশেখর টিভি-তে তখন খবর শুনছিলেন, পাশে মেঝেয় বসে মুরারিকে বললেন, "দ্যাখ তো মুরারি, কে যেন উহুহু করল!"

মুরারি লম্বা দালানের সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাবল পঞ্চু বোধহয় শব্দটা করেছে। সে দু'বার "পঞ্চু, পঞ্চু" বলে ডাকল। সাড়া

পেল না। একতলায় পড়ার ঘরে ক্ষুদিরামবাবু চলে যাওয়ার পরও কলাবতী পড়ে। সত্যশেখর এখনও তার চেম্বারে।

মুরারি ফিরে আসছে তখন কানে এল মৃদু একটা কাতরানি। তাড়াতাড়ি অপুর মা'র ঘরে ঢুকে দেখল, এক হাত দিয়ে দেওয়াল ধরে ডান পা মেঝে থেকে সামান্য তুলে অপুর মা দাঁড়িয়ে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে, মেঝেয় কাঠের বাক্সটা।

"কী হল? অমনভাবে দাঁড়িয়ে কেন?"

অপুর মা বাক্সটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওটা পায়ের ওপর পড়ল। যন্তোন্না হচ্ছে মুরারিদা।"

মুরারি দেখল রক্তটক্ত বেরোয়নি শুধু একটু ছড়ে যাওয়ার দাগ আর পাতাটা লালচে। সে বলল, "বোধহয় থেঁতলে গেছে, তুমি আমায় ধরে আস্তে আস্তে পা ফেলে কালুদির ঘরে এসে খাটে বোসো। আমি কত্তাবাবুকে খবর দিচ্ছি।"

কথাটা শুনেই রাজশেখর ব্যস্ত হয়ে বললেন, "মুরারি, শিগগিরি ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রে-টা নিয়ে আয়।" তারপর পায়ের অবস্থা দেখে বললেন "এখুনি ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে হবে, হাড় ভেঙেছে কি না কে জানে।"

তখনই সত্যশেখর গাড়ি নিয়ে বেরোল পারিবারিক ডাক্তারকে নিয়ে আসতে। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে ব্যান্ডেজ বেঁধে, দুটো ট্যাবলেট খাওয়ার জন্য ব্যাগ থেকে বার করে অপুর মা'র হাতে দিয়ে বললেন, "ব্যথা বাড়লে খাবে আর কাল সকালেই এক্স-রে করিয়ে আনুন, বোধহয় হাড় ভেঙেছে।"

সকাল আটটার আগে বাজারের কাছাকাছি ডায়াগোনেস্টিক সেন্টারের এক্স-রে ইউনিট চালু হয় না। কলাবতীর কাঁধ ধরে অপুর মা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দোতলা থেকে নেমে সদর দরজার সামনে এনে রাখা মোটরে কলাবতীকে নিয়ে পেছনে উঠল, সামনে সত্যশেখরের পাশে থলি হাতে মুরারি, সে যাবে বাজারে এবং বাজার করা সেরে হেঁটেই ফিরে আসবে।

আধঘণ্টা বসে থাকার পর অপুর মা'র পায়ের এক্স-রে হল, নেগেটিভ ও রিপোর্ট পাওয়া যাবে সন্ধ্যায়। সত্যশেখর বলল, "কোর্ট থেকে ফেরার সময় আমি নিয়ে নোব।"

তিনজনে ফিরছে, বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল রাস্তায় গাড়ি জমে উঠেছে। জ্যাম শুরু হয়েছে। সত্যশেখর জানলা দিয়ে মুখ বার করে জ্যামের কারণটা বোঝার চেষ্টা করে কলাবতীকে বলল, "কালু নেমে দ্যাখ তো

ব্যাপার কী? বাড়ির এত কাছে এসে শেষে কিনা ফেঁসে গেলুম।''

গাড়ি থেকে নেমে কলাবতী দু'পা হেঁটেই পেল আশা ভ্যারাইটি স্টোর্স। এর মালিক বিশ্বনাথ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো একটা জটলাকে উত্তেজিত স্বরে বিবরণ দিচ্ছে। কলাবতী দাঁড়িয়ে শুনল, ''ঝড়ের মতো মারুতি ভ্যানটা যাচ্ছে আর তার পেছনে 'ডাকাত, ডাকাত' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে মোটরবাইকে তাড়া করে চলেছে একটা লোক। দোকান থেকে আমি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম ভ্যানটা একটা অ্যাম্বাসাডারকে ওভারটেক করে আবার একটা অটো রিকশাকে ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি পড়ল সামনে থেকে আসা লরির। শিয়োর অ্যাকসিডেন্ট বাঁচাতে ওই স্পিডের ওপরই ভ্যানটা ডানদিকের ফুটপাতে উঠে গিয়ে ধাক্কা মারল সিংহিদের বাউন্ডারি ওয়ালে। তারপর দেখলুম, চারদিকের লোকজন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আর গাড়িটা থেকে তিনটে লোক বেরিয়ে এল। একজনের হাতে পিস্তল। তিনজন এধার-ওধার তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজল। শেষকালে সিংহিদের উত্তর দিকের পাঁচিলের গা দিয়ে যে সরু মাটির রাস্তাটা পগার গলিতে গেছে সেটা দিয়ে ওরা ছুটে পালাল। মনে হচ্ছে ডাকাতি করতে বেরিয়েছে।''

শুনতে শুনতে কলাবতীর গা ছমছম করে উঠল। তাদেরই বাগানের দেওয়ালে ডাকাতদের মারুতির ধাক্কা আর পাঁচিলের পাশের রাস্তা দিয়েই তিনটে ডাকাত পালিয়েছে, কী ভয়ংকর ব্যাপার! তাদের একজনের হাতে আবার পিস্তল। একজনের হাতে থাকলে বাকি দু'জনের সঙ্গেও পিস্তল বা রিভলভার বা ভোজালি টোজালিও নিশ্চয় আছে। এ তো গল্পের বা সিনেমার নয়, সত্যিকারের ডাকাত! কলাবতীর গায়ে কাঁটা দিল।

ধাক্কা দেওয়া মারুতিটা ঘন নীল রঙের, দূর থেকেই কলাবতী দেখতে পেল তাদের পাঁচিলে লেগে রয়েছে মোটরটার মাথা, পেছনের স্লাইডিং দরজাটা হাট করে খোলা। হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাটার প্রাথমিক বিমূঢ়তা কাটিয়ে লোকজন এগিয়ে এসেছে। জিন্‌স আর টি-শার্ট পরা যে যুবকটি মোটরবাইকে তাড়া করেছিল সে তখন ভিড়ের নায়ক। কলাবতী এগিয়ে গেল তার কথা শুনতে।

''দেখছেন তো ওই লোকটাকে ফেলে পালিয়ে গেল।'' যুবকটি আঙুল দিয়ে কাছেই দাঁড়ানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কাঁচাপাকা চুলের এক প্রৌঢ়কে দেখাল। বিভ্রান্তি আর আতঙ্ক প্রৌঢ়ের চোখে-মুখে ছড়িয়ে।

''বাড়ি থেকে উনি বেরিয়েছেন গাড়িতে উঠবেন বলে। তার আগেই

মারুতিটা ওঁর গাড়ির সামনে দাঁড় করানো ছিল। নিজের গাড়ির দিকে উনি যাচ্ছেন, আমি তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলুম। দেখলুম দুটো লোক মারুতি থেকে বেরিয়ে এসে ওঁকে ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে তুলে দিল। আধ মিনিটও লাগল না। দেখেই আমি মোটরবাইকে স্টার্ট দিলুম।''

একজন জিজ্ঞেস করল, ''লোকটাকে ধরে গাড়িতে তুলল কেন?''

বিরক্ত স্বরে যুবকটি বলল, ''কেন তুলল তা আমি কেমন করে জানব? হতে পারে কিডন্যাপ করার জন্য। ভদ্রলোক শেয়ার মার্কেটের একজন বড় দালাল, একই পাড়ায় আমরা থাকি, বিশাল বড়লোক, ওঁর কাছ থেকে পনেরো-কুড়ি লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করবে বলে হয়তো এটা করেছে কিংবা অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। মুক্তিপণ আদায় করাটাও তো এখন বেশ ভাল ব্যাবসা।''

একটা পুলিশের জিপ এসে থামল। সাদা পোশাকের এক খুদে অফিসার আর এক খাকি কনস্টেবল নামলেন।

''কী করে হল অ্যাকসিডেন্ট? কারা কারা দেখেছেন? কেউ মারা গেছে কি? ডেডবডি তো দেখছি না, গাড়ির লোকেরা কোথায়?'' ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পুলিশ অফিসার সবার উদ্দেশে প্রশ্নগুলো ছুড়ে ছুড়ে দিলেন। মারুতির ভেতরে উঁকি দিলেন। কনস্টেবলকে বললেন, ''তাড়াতাড়ি রাস্তা ক্লিয়ার করো।''

''গাড়ি থেকে তিনটে ডাকাত নেমে এই গলিটা দিয়ে সার পালিয়েছে।''

''অ্যাঁ, ডাকাত!''

''হ্যাঁ সার, হাতে পিস্তল ছিল।''

অফিসার দ্রুত জিপে ফিরে গেলেন। কলাবতীও ফিরে এল মোটরে।

''কালু, ব্যাপার কী?'' সত্যশেখর মোটরে স্টার্ট দিল। রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

''একটা মারুতি ভ্যানে তিনটে ডাকাত পালাচ্ছিল একটা লোককে তুলে নিয়ে। মারুতিটা আমাদের পাঁচিলে ধাক্কা মেরেছে। ডাকাতগুলো তারপর নেমে পালিয়েছে পগার গলির দিকে।'' কলাবতী উত্তেজিত গলায় ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল দ্রুত।

ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে সদর দরজার সামনে এসে সত্যশেখর নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলল, ''ডাকাত যে তার প্রমাণ কী?''

"একজনের হাতে পিস্তল ছিল।"

"অ। তা হলে ডাকাত নয়, তোলাবাজ।" সত্যশেখর সদর দিয়ে ভেতরে ঢুকে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল কলাবতী আর অপুর মাকে আগে যেতে দিয়ে। "আস্তে আস্তে পা ফেলে উঠবে, কালুকে ভাল করে ধরো, নয়তো—।" ঠিক সেই সময় তার কানের কাছে চাপা স্বরে কে যেন বলল, "একটি কথাও নয়, চুপ করে থাকুন।"

সিংহের গুহায় সিংহ

সত্যশেখর চমকে উঠেই কাঠ হয়ে গেল। পিঠে একটা শক্ত কিছুর খোঁচা। সে দু'পা এগিয়ে যেতেই আরও দুটো লোক চটপট ভেতরে ঢুকে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। পেছনের লোকটিকে সত্যশেখর মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই পিঠে একটু জোরে খোঁচা লাগল।

"বাড়িতে আর আছে কে কে? বাড়ি থেকে বেরোবার আর দরজা আছে?"

"ওই দু'জনের একজন আমার ভাইঝি, অন্যজন অপুর মা। আর আছেন বাবা, দু'জন কাজের বউ আর মুরারি। সে গেছে বাজারে, এখুনি আসবে। বাড়িতে ঢোকা-বেরোনোর একটাই দরজা।"

"ভেবো, দ্যাখ তো কাজের মেয়েমানুষদুটো আছে কোথায়, বাড়ি থেকে ওদের বার করে দে।"

ভেবো ছিপছিপে, লম্বা, বয়স কুড়ির বেশি নয়। মাথায় কদমছাঁট চুল, পরনে কালো ট্রাউজার্স আর বুশশার্ট, গলায় সরু সোনার চেন। ডান হাতে ঘড়ি। ভেবোর চোখদুটো সামান্য ট্যারা, চোখের নীচে হনুর হাড়দুটি উঁচু। হাতদুটো সরু ও দীর্ঘ। হুকুম পেয়ে ভেবো পিঠের দিকে ট্রাউজার্সে গোঁজা একটা ছুরি বার করে স্প্রিং টিপল। লাফিয়ে বেরোল একটা ছয় ইঞ্চি ঝকঝকে ফলা। ছুরিটা হাতে নিয়ে যখন সে সিঁড়ির পাশ দিয়ে রকের দিকে এগোল তখন কলাবতী ও অপুর মা দোতলার সিঁড়ির পঞ্চম ধাপে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে ভেবোকে দেখছে।

"পিসি, এরা তো সত্যি ডাকাত, কী হবে এখন?" কলাবতীর গলা থেকে প্রায় চিঁ চিঁ করে শব্দ বেরোল।

অপুর মা তীক্ষ্ণ চোখে ডাকাতদের লক্ষ করে যাচ্ছিল। এবার কলাবতীর হাতে একটা টিপুনি দিয়ে চাপা স্বরে বলল, "ভয় পেয়ো না, মাথা ঠান্ডা রাখো।" তারপর সে সত্যশেখরকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলল, "ছোটকত্তা, আমি ওপরে যাচ্ছি, কত্তাবাবুকে মিছরির শরবত এখনও দেওয়া হয়নি।"

"রাধু।"

বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা, মিশকালো, বছর ত্রিশের তৃতীয় ডাকাতটি ডাক শুনেই বলল, "বলো গুরু।"

গুরু চোখের ইশারায় রাধুকে ওপরে যেতে বলল, রাধু সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে কাঠবেড়ালির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে অপুর মা'র পাশ দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

যাকে গুরু বলে সম্বোধন করল রাধু সেই যে দলনেতা, সেটা তিনজনেই বুঝে গেল। সত্যশেখর এবার ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। গুরুর হাতে ধরা অস্ত্রটি দেখেই সে চিনে ফেলল ওটি ওয়েবলি স্কট রিভলভার। তার মুখের ভীত ভাব এবং হৃষ্টপুষ্ট চেহারাটি দেখে গুরু জিন্‌সের ডান হিপপকেটে রিভলভারটি ঢুকিয়ে রাখল। বাঁ দিকের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে মোবাইল ফোন।

"আপনার নাম কী?" গুরু জানতে চাইল।

"সত্যশেখর সিংহ।"

"সত্যবাবু, আমরা ডাকাতি করার জন্য এ-বাড়িতে ঢুকিনি। নেহাত বিপদে পড়েই আশ্রয় নিতে ঢুকে পড়েছি। নিরাপদে আমরা চলে যেতে চাই কিন্তু যাওয়ার আগে পর্যন্ত আপনাদের আমরা আটকে রাখব। আর আশা করব ততক্ষণ অন্য কিছু করার চেষ্টা আপনারা করবেন না।"

বছর ত্রিশ বয়স, পরিষ্কার শিক্ষিত উচ্চারণ। কথা বলার ভঙ্গি মার্জিত। চেহারাটা একদমই ডাকাতের মতো নয়। চওড়া কাঁধ, গায়ে সেঁটে থাকা লাল গেঞ্জির মধ্যে থেকে বুকের ও বাহুর পেশিগুলো ফুলে রয়েছে, পায়ে স্নিকার। চোখদুটি টানা এবং শান্ত।

সত্যশেখর এবার ভরসা করে প্রশ্ন করল, "আপনার নাম কী?"

"রঞ্জন সিংহ।" বলেই হেসে ফেলল রঞ্জন, "আমরা দু'জনেই সিংহ। আশা করি সিংহের গুহায় আমরা অশান্তি ঘটাব না। তবে আমার শাগরেদ দু'জন সম্পর্কে কোনও গ্যারান্টি দিতে পারছি না। ওই যে ভেবো ছেলেটা, ওর মানসিক ভারসাম্যটা সামান্য কম, অত্যন্ত অপরিণত, বেড়ালের মতো চলাফেরা আর ছোরাটা খুব ভাল ব্যবহার করে এবং সামান্য কারণেই সেটা

করে থাকে। অন্তত আটজনের শরীরে ও ছোরা ঢুকিয়েছে এই বয়সেই। আর যাকে রাধু বলে ডাকলুম—কোথাও একটু বসা যাক এবার।''

ভেবোর কথা শুনতে শুনতে সত্যশেখরের ভেতরটা হিম হয়ে যাচ্ছিল। রঞ্জনের প্রস্তাব শুনে তাড়াতাড়ি বলল, ''নিশ্চয় নিশ্চয়, আমার চেম্বারে আসুন। বসে কথাবার্তা বলবেন।''

তখনই দেখা গেল শকুন্তলা আর কান্তির মা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে সদর দরজার দিকে পায়ে পায়ে চলেছে, তাদের পেছনে ছোরা হাতে একগাল হাসি নিয়ে ভেবো। দরজার একটা পাল্লা খুলে ছোরাটা নেড়ে ভেবো ওদের বেরিয়ে যাওয়ার ইশারা করামাত্র সৌরভ গাঙ্গুলির একস্ট্রা কভার ড্রাইভ মারা বলের মতো শকুন্তলা ও কান্তির মা বেরিয়ে গেল। দরজার ভারী খিল আর তিনটে ছিটকিনি আটকে দিয়ে ভেবো তাকাল রঞ্জনের দিকে।

রঞ্জন বলল, ''একতলা দোতলা ছাদ ভাল করে দেখে নে, বাইরে থেকে বাড়িতে ঢোকার কোনও রাস্তা আর আছে কিনা, আর দেখে নে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। কোনও জিনিসে হাত দিবি না, রাধুকে বলে দিস।''

সত্যশেখরের চেম্বারে ঢুকেই রঞ্জনের চোখ পড়ল সার দেওয়া মোটা মোটা আইনের বইয়ের দিকে। বইয়ের তাকগুলো প্রায় দু'মানুষ উঁচু। স্টিলের একটা ঘড়াঞ্চিতে উঠে বই পাড়তে হয়।

''মনে হচ্ছে আপনি একজন উকিল।''

সত্যশেখর ছোট্ট জবাব দিল, ''হ্যাঁ।''

''আমিও হতে পারতুম, এক বছর ল কলেজে পড়েছি।''

রঞ্জন এইটুকু বলেই কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, ''হ্যাঁ, রাধুর কথা বলছিলুম, ওর নামে এগারোটা ডাকাতির, চারটে খুনের মামলা রয়েছে, জেল ভেঙে পালিয়ে আমার কাছে আসে তিন মাস আগে। ওর বাড়ি ক্যানিং-এ। টাকার আর সোনার দিকে অসম্ভব লোভ।''

সদরে কলিং-বেল বাজল। রঞ্জন লাফ দিয়ে জানলায় গিয়ে হিপ পকেটে হাত রেখে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সদর দরজার দিকে তাকাল। বাজারের দুটি থলি দু'হাতে ঝুলিয়ে এক বুড়োমানুষকে দেখে তার চোখে স্বস্তি ফুটে উঠল।

''বোধহয় মুরারি, ভেবেছিলুম পুলিশ।''

রঞ্জন গিয়ে দরজা খুলল। অপরিচিত লোক দরজা খুলে দিল দেখে মুরারি অবাক! চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছে সত্যশেখর। তাকে দেখে মুরারি বলল, ''ছোটবাবু, বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছে! গেটের বাইরে বিস্তর লোক জড়ো

হয়েছে, শকুন্তলা চেঁচাচ্ছে, পুলিশের গাড়ি থেকে দেখলুম পাঁচ-ছ'জন নামল বন্দুক নিয়ে।'' কথাগুলো বলার সময় মুরারির চোখে ভয়ের থেকেও বেশি ছিল অবাক হওয়া।

''সত্যবাবু, আপনাকে এখন একটা কাজ করতে হবে।'' রঞ্জনের স্বর প্রখর হয়ে উঠল। তার শরীরের ভঙ্গিতে এসেছে কাঠিন্য। ''বাইরে গিয়ে পুলিশকে বলুন, তারা যেন এই বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা একদমই না করে। করলে যা ঘটবে সেটা খুবই দুঃখের হবে এই বাড়ির লোকদের কাছে। ছোরা আর রিভলভার তা হলে কাজ করবে আপনাদের ওপর। পুলিশকে বলুন হঠকারী না হতে। আপনার বাবা বা ভাইঝি কিংবা আপনি মারা গেলে সেজন্য দায়ী হবে কিন্তু পুলিশ। আর বলবেন দায়িত্ববান হাই র‍্যাঙ্কিং কোনও অফিসার ফোনে আমার সঙ্গে যেন কথা বলেন। আপনার চেম্বারের ফোনের নম্বরটা দিয়ে দেবেন। আপনি ল ইয়ার, গুছিয়ে অল্প কথায় বুঝিয়ে দেবেন আপনারা এখন হোস্টেজ হয়ে পড়েছেন, পুলিশ অ্যাকশান নিলেই আপনারা হবেন মৃত।''

রঞ্জন সদর দরজার একটা পাল্লা খুলে বলল, ''স্বাভাবিকভাবে যাবেন, সেইভাবেই ফিরে আসবেন।'' সত্যশেখর ঢোক গিলে মাথা নেড়ে বেরোল। রঞ্জন পাল্লাটা অল্প ফাঁক করে তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ চোখে। দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে সত্যশেখরের তুঁতে রঙের মারুতি হাজার।

রাধু দোতলায় উঠেই লম্বা দালানটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চোখ ফেলল। সেখানেই রাজশেখরের শোয়ার ঘর। ঘরটা খোলা। রাজশেখর তখন বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ছিলেন। রাধু প্রথমে দালানের ডান দিকের ঘরগুলোর পরদা সরিয়ে সরিয়ে দেখল কেউ আছে কি না। প্রথম ঘরটি সত্যশেখরের, তার পরেরটি কলাবতীর। সেই ঘরের মধ্য দিয়ে পাশের ঘরে যাওয়া যায়, সেটা অপুর মা'র, তারপর লাইব্রেরি ঘর, এখানেও রাধু কাউকে পেল না। রাজশেখরের ঘরে না ঢুকে দালানের বাঁ দিকে দুটো বাথরুম এবং খাওয়ার ঘরে ঢুকে দেখল। বসার বিরাট ঘরটার একদিকে দুটো বড় দরজা, খুললেই রেলিং-ঘেরা ছাদ। ছাদের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বাড়ির গেটের কাছে ভিড় এবং রাইফেল হাতে পুলিশ দেখে পিছিয়ে এল।

এবার রাধু নিঃসাড়ে ঢুকল রাজশেখরের ঘরে। চোখের সামনে তুলে ধরা খবরের কাগজের জন্য তিনি দেখতে পাননি রাধুকে।

"দাদু, পেপার পড়ছেন? পড়ুন, পড়ুন।"

ঘরে অপরিচিত স্বর হঠাৎ কাছের থেকে শুনে রাজশেখর চমকে কাগজ নামিয়ে বললেন, "কে? কী চাই তোমার?"

ততক্ষণে অপুর মা ও কলাবতী হাজির হয়ে গেছে।

অপুর মা বলল, "কত্তাবাবু ও হল একজন ডাকাত, নীচে আরও দু'জন আছে ছোরা আর ছোট বন্দুক নিয়ে। ছোটকত্তাকে নীচে ধরে রেখেছে।"

রাজশেখর ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, "এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দিনেদুপুরে বাড়িতে এভাবে ঢুকে ডাকাতি করে যাবে, তাও কখনও হয়!"

তিনি তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে দেওয়ালে কাঠের ব্র্যাকেটে আড়াআড়ি রাখা দোনলা বন্দুকটার দিকে এগিয়ে যেতেই রাধু পেছন থেকে রাজশেখরের ঘাড়ে জোরে ধাক্কা দিল। তিনি ছিটকে পড়লেন, খাটের বাজুতে ঠুকে কপাল লাল হয়ে উঠল।

"দাদু!" কলাবতী আর্তনাদ করে রাজশেখরকে জড়িয়ে ধরল।

"কত্তাবাবুর গায়ে এভাবে হাত তুললে!" স্তম্ভিত অপুর মা। "অ্যাতোবড় আস্পদ্দা।" রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে।

রাধু ততক্ষণে বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে প্রথমেই দেখে নিল নলের মধ্যে কার্তুজ ভরা আছে কি না। নেই দেখে হাত বাড়াল রাজশেখরের দিকে, রুক্ষ গলায় হুকুমের স্বরে বলল, "টোটাগুলো কোথায়? এখনই আমায় দিন।"

"নআআআ।" রাজশেখরের চিৎকারে রাধু মুখ বিকৃত করল। কড়া গলায় সে বলল, "সোজা আঙুলে দেখছি ঘি উঠবে না।"

বন্দুকটা তুলে কুঁদো দিয়ে সে রাজশেখরের পিঠে আঘাত করল।

"দাদুকে মারবে না, মারবে না" বলে কলাবতী দু'হাত ছড়িয়ে রাজশেখরকে আড়াল করে দাঁড়াল।

এক হাতে বন্দুক ধরে অন্য হাতে রাধু "সর সামনে থেকে" বলে কলাবতীকে ঝটকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপুর মা বন্দুকটা রাধুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েই কুঁদোটা তার ডান কাঁধে কোপ মারার মতো বসিয়ে দিল।

"আহহ্" বলে রাধু কাঁধে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। সেইসময় ঘরে ঢুকল রঞ্জন আর সত্যশেখর।

"কাকা এই দ্যাখো দাদুর কপাল, ওই লোকটা মেরেছে।" কলাবতী ছুটে গেল কাকার কাছে। "বন্দুকটা দিয়ে পিঠেও মেরেছে।"

রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সত্যশেখর বলল, "একজন নিরীহ বৃদ্ধ মানুষকে

এভাবে যে আপনার লোক মারবে, আমি ভাবতেও পারি না। এখন থেকে আপনাদের শত্রু বলে গণ্য করব।''

থমথমে হয়ে গেল রঞ্জনের মুখ। গম্ভীর গলায় সে রাধুকে বলল, ''নীচে যাও, একদম ওপরে উঠবে না।''

এখন থেকে শত্রুতা

বাঁ হাত দিয়ে কাঁধটা চেপে ধরে রাধু অনিচ্ছুকের মতো ঘর থেকে বেরোবার আগে তীব্র দৃষ্টিতে অপুর মাকে দেখে নিল। অপুর মা-ও দৃষ্টিটা ফিরিয়ে দিল কড়া চোখে তাকিয়ে। রঞ্জন সেটা লক্ষ করল। বন্দুক তখনও অপুর মা'র হাতে ধরা। রঞ্জন হাত বাড়িয়ে বলল, ''ওটা দাও।''

''না।'' অপুর মা বন্দুকটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরল।

ঘরের সবাইকে স্তম্ভিত করে রঞ্জন প্রচণ্ড জোরে অপুর মাকে চড় মারল। অপুর মা'র বিশাল শরীর সেই বিরাশি সিক্কা চড়ের ধাক্কায় ঘুরে খাটের ওপরে পড়ে গেল। রঞ্জন বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে সত্যশেখরকে বলল, ''শত্রুতাটা তা হলে এখন থেকেই শুরু হল।'' তার দু'চোখ দেখে সত্যশেখর অবাক! কোথায় সেই চাহনির শান্ততা, হিংস্র জানোয়ারের মতো জ্বলছে চোখদুটো! লোকটা মুহূর্তে বদলে গেছে।

বন্দুক হাতে রঞ্জন ঘর থেকে বেরোবার আগে রিভলভারটা হিপপকেট থেকে বার করে কলাবতীর রগে ঠেকিয়ে বলল, ''নীচে চলো। তুমিই হবে হোস্টেজ।'' এই বলে সে কলাবতীর কপালে নলের ঠোক্কর দিল।

''ওকে নয়, আমাকে হোস্টেজ করুন।'' সত্যশেখর হাতজোড় করে কাতর স্বরে বলল।

''না, না, এই মেয়েটিই হবে। পুলিশ যদি কোনও চালাকি খেলতে যায় তা হলে সঙ্গে সঙ্গে একে গুলি করব, তারপর একে একে—।'' ইস্পাতের মতো ঠান্ডা কঠিন গলা রঞ্জনের।

মাথা ঘুরছে কলাবতীর, চোখে ঝাপসা দেখছে, কানে শব্দ ঢুকছে না। মাথার মধ্যে তখন পিসির একটা কথা ভিমরুলের মতো বোঁ বোঁ করে চলেছে—'ভয় পেয়ো না, মাথা ঠান্ডা রাখো'। দালান দিয়ে হেঁটে নীচের সিঁড়ির দিকে যাওয়ার সময় সে দেখল ছাদের সিঁড়ির খোলা কোলাপসিব্‌ল গেট দিয়ে পঞ্চু দ্রুত উঠে গেল।

কলাবতী, রঞ্জন এবং তাদের পেছনে সত্যশেখর একতলায় এল। চেয়ারে বসে সত্যশেখরের টেব্‌লে পা তুলে ভেবো ছোরা দিয়ে শশার খোসা ছাড়াচ্ছিল, চারটে টোম্যাটো, দুটো পেয়ারা, আধডজন মর্তমান কলা টেব্‌লে সাজিয়ে রাখা। ঘরের এককোণে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মুরারি, পায়ের কাছে বাজারের থলি, ফলগুলো স্যালাডের জন্য সে বাজার থেকে এনেছে। অন্য একটা চেয়ারে বসে রাধু। বাঁ হাত ডান কাঁধে, মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। ডান হাতের কনুইটা সে রেখেছে চেয়ারের হাতলে, রঞ্জন ইশারায় কলাবতীকে একটা খালি চেয়ার দেখাল।

"এই বুড়ো খানিকটা নুন আন তো! নুন ছাড়া শশা পেয়ারা খাওয়া যায় না। জলদি।" ভেবোর হুকুম শুনেই মুরারি ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

"বড্ড যন্তন্না হচ্ছে গুরু।" রাধু বলল রঞ্জনকে। "একটা ব্যান্ডেজ-ফ্যান্ডেজ করলে ভাল হত। হাড়টা ভাঙল কি না বুঝতে পারছি না। মেয়েমানুষ দেখে এতটা আর সাবধান হইনি। জব্বর হাঁকিয়েছে, গায়ে যে অত জোর আছে বুঝতে পারিনি।" আক্ষেপে কাতরে উঠল রাধু।

রঞ্জনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। জানলার কাছে গিয়ে বাইরে ফটক পর্যন্ত দেখে সে সত্যশেখরকে বলল, "আপনি ও সি-কে ঠিকভাবে বলেছেন তো? ফোন নম্বরটা দিয়েছেন?"

"আমার কার্ড ওর হাতে দিয়ে বলেছি ফোনে তাড়াতাড়ি যেন কমিশনার কথা বলেন।"

রাধু আবার কাতরে উঠল। রঞ্জন ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে ঝাঁকালো গলায় বলল, "কী হয়েছে কী? বাচ্চা ছেলের মতো প্যানপ্যান করছিস কেন? ভেবো, ওপরে গিয়ে দ্যাখ তো ব্যান্ডেজ করার মতো ফালি কাপড়টাপড় পাওয়া যায় কিনা।"

একমুঠো নুন প্লেটে করে নিয়ে এল মুরারি। শসায় নুন মাখিয়ে কামড় দিয়ে ভেবো বলল, "এটা খেয়ে নিয়ে যাচ্ছি, ভীষণ খিদে পেয়েছে, রাধুদা খাবে নাকি?"

"রাখ তোর খাওয়া।" বিরক্ত হয়ে বলল রাধু তারপর কলাবতীকে জিজ্ঞেস করল, "খুকি, বাড়িতে ব্যান্ডেজ আছে?"

"আছে।" কলাবতী শান্তস্বরে বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

রাধু উৎসুক চোখে তাকাল রঞ্জনের মুখের দিকে। রঞ্জন বলল, "ভেবো, ওর সঙ্গে যা।"

ছোরাটা টেব্‌লে রেখে ভেবো উঠল। কলাবতীর পেছন পেছন কয়েক পা যেতেই রঞ্জন তাকে ডেকে ছোরাটা দেখাল, ভেবো ফিরে এসে সেটা তুলে নিল। দোতলায় উঠেই দালানের দেওয়াল ঘেঁষে জুতো রাখার র‍্যাক। ভেবো সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "তুমি ব্যান্ডেজ নিয়ে এসো, আমি বরং জুতো দেখি। বাব্বা, এত জুতো কার?"

"সবার জুতো আছে, তবে বেশিরভাগই কাকার।"

ভেবো জুতোগুলো তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "চামড়ার কী চেকনাই! কী জেল্লা! খুব দামি, তাই না?"

"ওটার দাম বারোশো টাকা।" বলেই কলাবতী দেখল ভেবোর চোখে লোভ জ্বলজ্বল করে উঠল।

"আর এটা?" ভেবো একজোড়া জগিং শু তুলে ধরল।

"আড়াই হাজার টাকা।"

কলাবতী লাইব্রেরি ঘরের দেওয়াল আলমারি খুলে ফার্স্ট এইড বক্স বার করে দালানে এসে দেখল মেঝেয় বসে ভেবো কাকার জগিং শু-টা পরছে, পাশে পড়ে রয়েছে তার ময়লা পুরনো জুতো আর ছোরাটা। কলাবতীকে দেখে সে লাজুক হেসে বলল, "এটা আমি নিলুম। একটু ঢলঢল করছে, ন্যাকড়া গুঁজে নোবখন।"

কৌতূহল মেশানো স্বরে কলাবতী এবার জিজ্ঞেস করল, "তোমরা ঢুকলে কী করে আমাদের বাগানে?"

ভেবো তাজ্জব বনে গিয়ে বলল, "এ আর এমন কী, রাধুদা তুলে ধরল আমাকে, পাঁচিল ডিঙিয়ে নেমে খিড়কি দরজাটা খুলে দিলুম।"

সেই সময় ছাদের সিঁড়িতে উঁকি দিল পঞ্চু। তাকে দেখেই কলাবতী দ্রুত হাত নেড়ে ইশারা করল সরে যাওয়ার জন্য। সেটা দেখতে পেয়েই ভেবো চট করে মুখ ফিরিয়ে ছোরাটা হাতে নিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকাল কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে সন্দেহাকুল স্বরে বলল, "কাকে দেখে হাত নাড়লে?"

"একটা বাঁদর।"

"বাঁদর! বাড়িতে বাঁদর কেন? খুব খারাপ জানোয়ার, ছেলেবেলায় একটা হনুমান আমাকে কামড়ে দিয়েছিল, পেটে চোদ্দোবার ছুঁচ ফুটিয়েছিল সদর

হাসপাতালের ডাক্তার, সে যে কী ব্যথা, বলে বোঝাতে পারব না। পাগলা কুকুরে কামড়ালেও চোদ্দোটা।''

''বাঁদর আর হনুমান এক জানোয়ার নয়।'' কলাবতী সংশোধন করে দিল।

পঞ্চু আবার উঁকি দিল এবং ভেবো তাকে দেখে ফেলল। ছোরাটা তুলে ধরে সে পঞ্চুর দিকে ছুড়ে মারার ভঙ্গি করে বলল, ''এইসব জানোয়ার দেখলে আমার ভয় করে। চলো, চলো, নীচে চলো।''

নীচে এসে কলাবতী দেখল রঞ্জন কার সঙ্গে টেলিফোনে রুক্ষভাবে কথা বলছে। ব্যান্ডেজটা রাধুকে দেখিয়ে কলাবতী বলল, ''স্কুলে সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের ট্রেনিং নেওয়া আছে আমার। ব্যান্ডেজ করে দোব?''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই করে দাও খুকি।'' রাধুর স্বর নরম, চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। কলাবতীর মাথার মধ্যে তখন 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, মাথা ঠান্ডা রাখো, মাথা ঠান্ডা রাখো' গুনগুন করে যাচ্ছে।

''জামা না খুললে ব্যান্ডেজ করব কী করে?''

রাধু জামা খোলার জন্য হাত তুলতে গিয়ে ''উহহ'' বলে কাতরে উঠল।

''দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।'' ভেবো এগিয়ে এল। রাধুর বুকের কাছ থেকে ছোরা দিয়ে সে ফরফর করে জামাটার তলা পর্যন্ত টেনে ফাঁক করে দিল। এরপর জামাটা দেহ থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, ''ওপরে অনেক হাওয়াই শার্ট দেখেছি, একটা পরে নিয়ো।''

রাধুর ডান হাতটা বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে কলাবতী কাঁধ বুক ও বাহু বেষ্টন করে শক্তভাবে জড়িয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল। রাধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, ''ওরে ভেবো, আমি যে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা পড়লুম। ডান হাত যে নাড়াতে পারছি না।''

ভেবো একটা টোম্যাটো তুলে কামড় দিয়ে চেয়ারে বসে চিবোতে চিবোতে বলল, ''এখন ওইভাবেই থাকো, পরে ডাক্তার দেখিয়ে যা করার করবে। কেন মিছিমিছি ওই মেয়েটাকে রাগাতে গেলে বলো তো? চেহারা দেখে বুঝতে পারোনি গায়ে জোর কত?''

''চুপ মার ভেবো।'' রাধু রাগে ধমকে উঠল, ''গায়ের জোর আমারও আছে। নেহাত হুঁশ করিনি ততটা, তাই মারটা খেলুম। একবার পাই হাতের মুঠোয়, ওই বন্দুক দিয়ে মাথা ফাঁক করে দোব।''

দাঁত কিড়মিড় করে রাধু বন্দুকটা বাঁ হাতে টেনে নিল। রঞ্জন ফোন রেখে

রাধু আর ভেবোর দিকে তাকিয়ে বলল, "পুলিশ রাজি হয়েছে।"

দু'জনে অবাক হয়ে তাকাল। ভেবো বলল, "কীসের রাজি?"

"এখান থেকে আমাদের নির্বিঘ্নে যেতে দেবে।"

রাধু বলল, "অমনি অমনি চলে যেতে দেবে?"

রঞ্জন চেয়ারে বসে বলল, "এমনি কি আর যেতে দেয়, দাবার চাল চালতে হয়েছে। তুমি আমার গজ খেলে আমি তোমার ঘোড়া খাব। তুমি আমায় গুলি মারলে আমি এই মেয়েটার মাথায় গুলি মারব। তুমি পুলিশ, নাগরিকদের প্রাণরক্ষা করা তোমার কাজ, এবার তাই করো।" রঞ্জন মুচকি মুচকি হাসল।

যে টানটান ভাবটা তার মুখে ছিল, এখন সেটা আলগা দেখাচ্ছে। টেব্‌ল থেকে পেয়ারা তুলে ছোরা দিয়ে সেটা দু'টুকরো করে রঞ্জন নুন মাখাতে মাখাতে রাধুকে বলল, "খালি গায়ে এইরকম ব্যান্ডেজ জড়িয়ে তুমি যাবে নাকি? একটা জামা চড়িয়ে নাও। ভেবো, একটা জামা এনে দে তো।"

শোনামাত্র ভেবো উঠে দাঁড়াল। ছোরা দিয়ে রঞ্জন আধখানা পেয়ারাটা আবার টুকরো করছে মন দিয়ে। ভেবো ছোরাটা চাইতে গিয়েও আর চাইল না। তাকে চলে যেতে দেখে রঞ্জন ছোরাটা বাড়িয়ে ধরে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। বরং রাধু বলল, "অস্তর সবসময় কাছে রাখা উচিত। এটা ভেবোর খেয়াল থাকে না। কখন দরকার পড়বে কে জানে।"

রঞ্জন বলল, "সত্যবাবু, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনার মোটরে আমাদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোবেন। অবশ্য সঙ্গে থাকবে আপনার এই ভাইঝি। পুলিশের যে কাণ্ডজ্ঞান আছে সেটা এবার বুঝলুম, ওরা একঘণ্টার মধ্যে জানাবে নির্বিঘ্নে আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দেবে কি না; আর দেবে নাই-বা কেন?" ডাকাতি করিনি, প্রাণহানিও করিনি, শুধুমাত্র শেলটার নিয়েছি। এতে অপরাধ কোথায়?"

সত্যশেখর বলল "কিডন্যাপিং-এর উদ্দেশ্যে একজনকে গাড়িতে তুলেছিলেন সেটা গুরুতর অপরাধ। তা ছাড়া এই বাড়িতে দু'জনকে আপনারা আঘাত করেছেন, তারা মারাও যেতে পারত, এটাও গুরুতর অপরাধ। ভয় দেখিয়ে মানসিক আঘাত দিয়েছেন, সেটাও অপরাধ বলে গণ্য হবে।"

রঞ্জন পেয়ারা শেষ করার পর মর্তমানের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, "হুম্‌ম।"

ওদিকে ভেবো দোতলায় উঠে জুতোর র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোভাতুর চোখে জুতোগুলো দেখছে, তখন রাজশেখরের ঘর থেকে আইস ব্যাগ হাতে এক পা টেনে টেনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসে অপুর মা যাচ্ছিল ফ্রিজের দিকে। এতক্ষণ সে কর্তাবাবুর কপালে বরফ দিচ্ছিল। ভেবোকে দেখতে পেয়ে সে বলল, ''কী কচ্ছিস রে মুখপোড়া ওখানে?''

ভেবো একগাল হেসে বলল, ''খুব জব্বর কষিয়েছ মাসি। রাধুদার ডানাটা খসে গেছে, একেবারে নুলো। ওকে একটা পরার শার্ট দিতে হবে।'' বলেই সে সত্যশেখরের ঘরে ঢুকে ওয়ার্ডরোবটা খুলল। হ্যাঙারে ঝোলানো জামাপ্যান্টগুলো সরিয়ে সরিয়ে পছন্দ করছে। তখন বাইরে শুনল অপুর মা'র গলা, ''পঞ্চু দ্যাখ তো ছোঁড়াটা ঘরে কী করছে?''

ভেবো চমকে গেল। সে তো সারা বাড়িই ঘুরে দেখেছে পাঁচটা লোক ছাড়া আর কেউ নেই, আর ওদের কারও নাম যতদূর সে জানে পঞ্চু নয়। তা হলে এই পঞ্চু লোকটা কোথা থেকে এল? ভেবো খুবই হুঁশিয়ার। সে চট করে খোলা পাল্লার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ছোরাটা সঙ্গে নেই বলে মনে মনে আপশোস করল।

দরজায় পঞ্চু। আড়চোখে তাকে দেখেই ভেবো ''ভাগ, ভাগ'' বলে চেঁচিয়ে উঠল। মুহূর্তে পঞ্চু খাটে উঠেই লাফ দিয়ে ওয়ার্ডরোবের মাথায় চড়ে ঠোঁট তুলে মাড়ি বার করে ''চিঁ চিঁ কিচ কিচ কিচ'' শব্দ করল। ভেবো দরজার দিকে পা বাড়াতেই পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কামড় বসাল বাঁ কানে। কানটার প্রায় আধখানা ঝুলে পড়ল, রক্ত বেরোচ্ছে ফিনকি দিয়ে।

ভেবো চিৎকারে বাড়ি মাথায় তুলে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

''ওরে বাবা রে, মরে গেলুম, আমার কান গেল। বাঁচাও রাধুদা, বাঁচাও।''

চমকে উঠে রিভলভার হাতে রঞ্জন পড়িমরি ছুটে বেরোল ঘর থেকে। তার পেছনে পেছনে রাধু ছাড়া আর সবাই।

দোতলায় তখন অপুর মা'র কোলে পঞ্চু। ওর গালটা নিজের গালে চেপে অপুর মা বলে চলেছে, ''বাবা আমার, সোনা আমার।''

রঞ্জন হতভম্ব হয়ে গেল ভেবোকে দেখে। তারপর বলল, ''কী করে এমন হল?''

"বাঁদর কামড়ে দিল।"

রাগে কালো হয়ে উঠল রঞ্জনের চাহনি। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "এইসব মাথামোটা ইডিয়টদের নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয়। একটার হাত গেল, অন্যটার কান।" কলাবতীর দিকে তাকিয়ে সে বলল "বাঁদর এল কোথা থেকে?"

"আমাদের পোষা বাঁদর।"

রঞ্জন তাকে বলল, "পারবে ওর কানে ব্যান্ডেজ করে দিতে?" কলাবতী বলল, "পারব।"

ভেবো চিৎকার করে উঠল, "না, না, না, ও ব্যান্ডেজ করবে না। দেখছ না রাধুদাকে কী করে দিয়েছে। আমায় বরং তুলো দাও, আমি কানে চেপে ধরে থাকব। আমাকে আবার সেই চোদ্দোটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে।"

কলাবতী অস্ফুটে বলল, "চোদ্দোটা নয়, এখন চারটে নিলেই হয়।"

কথাটা ভেবো শুনতে পেল এবং তেলেবেগুনে জ্বলে খিঁচিয়ে উঠল, "চোদ্দোটা নয়, চারটে!" তারপর কলাবতীর চুল মুঠোয় ধরে মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "এমন বাঁদর পোষো কেন, যে মানুষের কান কামড়ে দেয়?"

সত্যশেখর এতক্ষণ চুপ করে দেখছিল, এইবার আর সে নিজেকে সামলাতে পারল না। "খবরদার" বলে গর্জে উঠেই ভেবোর জামার কলার পেছন থেকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েই থাপ্পড় কষাল। ভেবো ছিটকে মেঝেয় পড়ে গেল। রঞ্জন রিভলভারের বাঁট দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সত্যশেখরের মাথার পেছনে মারল। সে টলে পড়ে যাচ্ছিল, কলাবতী তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে ঘরের ভেতরে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

"শত্রুতাটা তা হলে ভালভাবেই চালাতে চান।" সত্যশেখর বলল।

"আমার দুটো লোককে আপনারা জখম করে আপসেট করে দিয়েছেন। আর একবার যদি কারও গায়ে হাত দেন, ভেবোর ছোরা আপনাকে রেয়াত করবে না।"

রাধু বলল, "গুরু, হাতে তো ঘোড়া রয়েছে, লোকটাকে একটা দানা খাইয়ে দাও। বড্ড বাড় বেড়েছে। যদি একটা টোটাও থাকত তা হলে—" বন্দুকটা বাঁ হাতে তুলে ধরে সে বুঝিয়ে দিল, তা হলে সে কী করত।

ফার্স্ট এইড বক্স থেকে খানিকটা তুলো বার করে কলাবতী ভেবোর দিকে বাড়িয়ে ধরল। তুলো হাতে নিয়ে ভেবো একচোখ বন্ধ করে কলাবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বলছ চারটেতেই হবে?"

"কালু, একদম কোনও হেল্প করবি না।" সত্যশেখর আর সহ্য করতে পারল না কলাবতীর এই দয়ার মনোভাবকে। ক্ষিপ্ত স্বরে বলল, "ব্যান্ডেজ তুলো কিচ্ছু দিবি না আর। এদের যা প্রাপ্য ভগবান তাই দিয়েছেন।" এই বলে সে আগুনঝরা দৃষ্টি নিয়ে রঞ্জনের দিকে তাকাল।

রঞ্জন ঠোঁট মুচড়ে হেসে বলল, "ভগবান ভীষণ কিপটে, আমার প্রাপ্যটা এখনও আমায় দিলেন না। অবশ্য দেওয়ার সুযোগও আর পাবেন না।"

এইসময় ফোন বেজে উঠল। অভ্যাসবশে সত্যশেখর ফোনের দিকে হাত বাড়াতেই ওয়েবলি স্কটের নল তার হাতে খোঁচা দিল। হাতঘড়ি দেখে নিয়ে রঞ্জন রিসিভার তুলল। ঘরের সবাই উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে।

"হ্যাঁ বলুন।" ভ্রূ কুঁচকে রঞ্জন শুনে গেল ওধারের কথা। তারপর বলল, "দু'ঘণ্টা নয়, তিনঘণ্টা পরই ওদের ছেড়ে দোব। সবথেকে জরুরি কথাটা নিশ্চয় মনে আছে, আমাদের ফলো করবেন না, বা মাঝপথে আটকাবার চেষ্টা করবেন না। তা হলে কয়েকটা ডেডবডি পাবেন শুধু। আমরা কিন্তু ওয়েল আর্মড, তিনটে রিভলভার আর বোমা সঙ্গে আছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমার বেরোব, উৎসাহের বশে আপনার লোকেরা যাতে কিছু করে না বসে সেজন্য ওদের যা যা জানবার জানিয়ে দিন।"

রঞ্জন আবার কিছুক্ষণ শুনে বলল, "না, না, এদের গাড়ি নিয়েই যাব। আমরা নেমে গেলে, সত্যবাবু গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবেন নিরাপদে, অবশ্য পুলিশ কথার খেলাপ যদি না করে।.....দেখা যাক।" রিসিভার রেখে সে রাধুকে বলল, "একটা জামা পরে নাও, ব্যান্ডেজ যেন পুলিশের চোখে না পড়ে।"

রাধু দাঁত বার করে হেসে বলল, "গুরু দিলে ভাল, তিনটে রিভলভার! বোমা! আরে বোমার থলিটা তো গাড়িতেই রয়ে গেছে, তাড়াহুড়োয় আর— ভেবো, কোন ঘরটায় জামা আছে রে?"

"সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকের প্রথম ঘর। দেখবে কাঠের আলমারিতে সারি সারি জামা ঝুলছে।"

রাধু উঠে দাঁড়াতেই ভেবো মনে করিয়ে দিল, "বন্দুকটা সঙ্গে নাও। বাঁদরটাকে দেখলেই মোক্ষম এক ঘা কষিয়ে মাথা ভেঙে দিয়ো।"

রঞ্জন ঘড়ি দেখে বলল, "তিন মিনিটের মধ্যে নেমে আসবে। আমাদের এখুনি রওনা হতে হবে।"

সত্যশেখর বলল, "আমরা কোথায় যাব?"

"গাড়িতে আগে উঠুন তারপর যেদিকে চালাতে বলব চালাবেন, তেল কত আছে?" রঞ্জন গম্ভীর গলায় বলল।

"কাল রাতে বারো লিটার ভরেছি।"

মনে মনে হিসেব করে রঞ্জন বলল, "হুম্‌ম্‌, বর্ডার পর্যন্ত হয়ে যাবে।"

এরপর সে মোবাইল ফোনটা বার করে নম্বরের বোতাম টিপতে টিপতে ঘরের বাইরে গেল কারও সঙ্গে কথা বলতে। ঘরের এককোণে মুরারি তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে একটি কথাও না বলে। এইবার সে মুখ খুলল, "ছোটবাবু, তোমাকে আর কালুদিকে কি মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাবে?"

হালকা সুরে সত্যশেখর বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

শুনেই ডুকরে উঠে মুরারি দোতলার সিঁড়ির দিকে ছুটল।

"ওরে অপুর মা রে, সব্বোনাশ হয়ে গেছে রে।" চিৎকার করতে করতে সে দোতলায় উঠল। রাজশেখরের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে গিয়ে, "উহহ" বলে কাতরে উঠে অপুর মা এক পা তুলে দাঁড়িয়ে গেল। " হয়েছে কী মুরারিদা?"

"আর হয়েছে! কালুদি আর ছোটবাবুকে খুন করার জন্য গাড়িতে করে ওরা এবার নিয়ে যাবে।" মুরারির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। "আমি গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ব, চালাক আমার বুকের ওপর দিয়ে। আমার আর বেঁচে থাকার দরকার নেই।" বলতে বলতে মুরারি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সত্যশেখরের ঘরে তখন রাধু বিস্ফারিত চোখে জামাগুলো দেখছে। একটা সিল্কের হাওয়াই শার্ট বেছে গায়ে পরার জন্য বন্দুকটা খাটের ওপর রেখে বাঁ হাতে জামার হাতা গলাল, তারপর আর গায়ে ওঠাতে পারল না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। নীচের থেকে ভেবোর চিৎকার শুনতে পেল, "রাধুদা, হল তোমার? এখুনি বেরোতে হবে।"

"যাচ্ছি রে।" বলে রাধু আরও দুটো শার্ট বার করে বাঁ কাঁধে ফেলে বাঁ হাতে বন্দুকটা নিয়ে ঘর থেকে বেরোল। ডাইনে তাকিয়ে দেখতে পেল সিঁড়ির মাথায় বসে একটা বাঁদর, তাকে দেখেই অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ব্যাগাটেলির টেব্‌লটায় হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দশাসই চেহারার সেই মেয়েমানুষটা।

অপুর মাকে দেখেই রাধুর চোখ দপদপ করে উঠল। বন্দুকের মুঠো শক্ত হল। পায়ে পায়ে সে এগোল। অপুর মা'র কাছে এসে এক হাতে বন্দুকটা খাঁড়ার কোপ দেওয়ার মতো করে তুলল। চোখ বন্ধ করে অপুর মা কুঁদোটা

মাথার ওপর পড়ার অপেক্ষায় রইল। কয়েক সেকেন্ড পর চোখ খুলে দেখল ডাকাতটা তার গলার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে। বাবার দেওয়া, বিয়ের দু'ভরির সোনার হারটা সে আজ পর্যন্ত কখনও গলা থেকে খোলেনি। রাধু হারটাকেই দেখছে। অপুর মা গলায় হাত দিয়ে পিছিয়ে যেতে গিয়ে ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেল মেঝেয়।। রাধুর চোখ পড়ল তার ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ে।

বীভৎস হাসিতে ভরে গেল রাধুর মুখ।

অপুর মা অন্য রূপে

"এইবার আমি বদলা নোব। আমার কাঁধ নিয়েছিস, এবার আমি তোর পা নোব।" বলেই রাধু বন্দুকটা বাঁ হাতে তুলে অপুর মা'র ডান পায়ের পাতার ওপর জোরে আঘাত করল। কাটা ছাগলের মতো অপুর মা ছটফটিয়ে আছড়ে পড়ল, একটা চাপা "আহ্হ" ছাড়া মুখ দিয়ে আর কোনও শব্দ বেরোল না। রাধু বন্দুকটা মেঝেয় রেখে নিচু হয়ে বাঁ হাতের মুঠোয় হারটা ধরে সবেমাত্র টান দিয়েছে তখনই সাপের ছোবলের মতো অপুর মা'র দুটো হাত রাধুর চুল মুঠোয় ধরে মাথাটা টেনে নামিয়ে এনে কপাল দিয়ে রাধুর নাকে হাতুড়ির মতো আঘাত করল; মুহূর্তে রাধুকে চিত করে পেড়ে ফেলে তার বুকের ওপর হাঁটু রেখে উন্মাদের মতো মাথাটা সে মেঝেয় ঠুকতে ঠুকতে বলে যেতে লাগল, "ছোটবাবুকে মারবি? কালুদিকে মারবি? ছোটবাবুকে মারবি? কালুদিকে মারবি?...।"

সেইসময় ভেবো "রাধুদা, রাধুদা, আর এক মিনিটও দেরি করলে কিন্তু—" বলতে বলতে দোতলায় উঠে এল এবং নেতিয়ে পড়ে থাকা রাধুকে দেখে থমকে গিয়ে "মেরে ফেলেছে, রাধুদাকে মেরে ফেলেছে" বলে চিৎকার করে নেমে গেল।

"মেরে ফেলেছে" শব্দদুটো অপুর মা'র অন্ধকার হয়ে যাওয়া চেতনায় বিদ্যুতের চমক দিল। সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "মরবে না, মরবে না।" উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সে পড়ে গেল। এবার ব্যাগাটেলি বোর্ডের টেব্‌লের পায়া ধরে নিজেকে টেনে তুলছে।

"চি চি চি"।"

অপুর মা মুখ তুলে দেখল পঞ্চু সিঁড়িতে। তার মনে পড়ল কলাবতী দুটো আঙুল তুলে ফাঁক করে দেখালেই পঞ্চু গুলতিটা এনে দিত। অপুর মা দুই আঙুল তুলে 'ভি' দেখাল, "নিয়ে আয় বাবা।"

পঞ্চু তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে কলাবতীর ঘরে ঢুকল আর গুলতিটা নিয়ে বেরিয়ে এসে অপুর মা'র হাতে দিল। গুলি কোথায়, গুলির ব্যাগাটেলি বোর্ড থেকে একটা লোহার গুলি তুলে নিল অপুর মা।

পা ফেলে হাঁটার ক্ষমতা নেই। সে হামাগুড়ি দিয়ে দোতলার ছাদের দিকে নিজেকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছে, মনে মনে নিজেকে বলে যাচ্ছে, "কোরু, আর একটু সহ্য কর, আর একটু আর একটু।"

ঢালাই লোহার নকশাদার রেলিং ঘেরা ছাদ। অপুর মা রেলিং আঁকড়ে উঠে দাঁড়াল। ছাদের নীচেই ছোটবাবুর গাড়িটা দাঁড়িয়ে। গেটের বাইরে যেমন হেলমেট পরা বন্দুক হাতে পুলিশের, তেমনই কৌতূহলী লোকের ভিড়। সবার নজর গাড়িটার দিকে। কেউ লক্ষ করল না রেলিং ধরে দাঁড়ানো, থানকাপড় পরা ঘোমটাখসা আলুথালু চুল মধ্যবয়সি স্ত্রীলোকটিকে।

মুরারি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। সে গাড়িকে এগোতে দেবে না। বুড়ো লোকটিকে হাত ধরে টেনে রঞ্জন সরিয়ে দিল। মুরারি আবার গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"তুমি যদি যেতে না দাও তা হলে এখানেই ওদের গুলি করে মারব। তিন পর্যন্ত গুনব, তার মধ্যে যদি পথ ছাড়ো তো ভাল, নইলে—।" রঞ্জন রিভলভার হাতে গাড়ির পেছনের জানলার কাছে দাঁড়াল। পেছনের সিটে বসে আছে কলাবতী।

"এক— দুই—।" তিন বলার আগেই চোখ মুছতে মুছতে মুরারি সরে গেল।

ড্রাইভারের দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে সত্যশেখর, গাড়িতে এবার সে উঠবে। ভেবো আগেই উঠে বসেছে সামনের সিটে, হাতে ছোরা নিয়ে। সত্যশেখরকে সোজা করে রাখার দায়িত্বটা তার। পেছনের দরজা খুলে মাথা নামিয়ে রঞ্জন উঠতে যাচ্ছে, হাতে রিভলভার।

অপুর মা লোহার গুলিটা ছিলেয় লাগিয়ে গুলতি তুলে ধরল। শরীরে এখন সে যন্ত্রণা বোধ করছে না। হাত কাঁপছে না। তার কাছে একটাই গুলি। রবারের ছিলে নাক পর্যন্ত এক হাত টেনে এনে একচোখ বন্ধ করল।

সত্যশেখরই প্রথম রিভলভারটা হাত থেকে পড়ে যেতে দেখল, তারপর দেখল রঞ্জনের কোমর থেকে ঊর্ধ্বাংশ গাড়ির মধ্যে, নীচের দিক গাড়ির বাইরে পড়ে রয়েছে। একটুও শব্দ না করে ব্যাপারটা ঘটে গেল। জীবনে এই প্রথম সত্যশেখর একটা কাজ করল যাতে জানা গেল তার উপস্থিত বুদ্ধি যথেষ্টই ভাল। সে চট করে রিভলভারটা তুলে নিয়ে ভেবোর দিকে তাক করে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, "নেমে আয় শুয়োর।"

গেটের বাইরে থেকে পুলিশ লক্ষ করে যাচ্ছিল ওদের গতিবিধি। তারা চমকে গেল সত্যশেখরের হাতে রিভলভার দেখে এবং ছুটে এল সিংহিবাড়ির মধ্যে। সবাই ধাঁধায় পড়ে গেল রঞ্জনের খুলি ভেঙে রক্ত বেরোচ্ছে কেন? কলাবতী গাড়ির মধ্যেই গুলিটা কুড়িয়ে পেয়ে প্রথমেই তাকাল দোতলার ছাদের দিকে। যাকে দেখবে ভেবেছিল তাকেই দেখল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়িতে ঢুকে পঙ্গুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় উঠে ছাদে গিয়েই "পিসিইই" বলে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল অপুর মা'র বুকে।

"ছাড়ো কালুদি, ছাড়ো, রান্নাবান্না হয়নি এখনও। কারুর খাওয়া হয়নি, মুরারিদাকে বলো শকুন্তলাকে ডেকে আনতে, ক'টাদিন আমি এখন তো রান্নাঘরে যেতে পারব না।"

"যেতে হবে না, আমি রান্না করব।"

"খবদ্দার, রান্নাঘরে ঢুকবে না, রং কালো হয়ে যাবে।"

অ্যাম্বুলেন্স এসে রাধু ও রঞ্জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ওদের অবস্থা সংকটাপন্ন। ভেবোকে নিয়ে গেল পুলিশ। সিংহিবাড়ি কয়েক ঘণ্টার জন্য রাহুর গ্রাসে পড়েছিল, এখন তা থেকে মুক্তি পেল। বাড়ির সবার এজাহার নেওয়ার পর অপুর মাকে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেটা এইরকম :

"আপনি একাই ডাকাত দু'জনকে মারলেন?"

ঘোমটা চোখ পর্যন্ত টেনে জবাব হল, "ওম্মা, আমি একা পারব কেন, কালুদি, ছোটকত্তা, মুরারিদা, কত্তাবাবা আর পঞ্চু সবাই মিলে চেষ্টা করে তবেই না সাহস পেয়েছি।"

"পঞ্চু? সে কে?"

"আমার ছেলে।"

"কই, তাকে তো দেখছি না! ডাকুন তাকে।"

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তাই তো, গেল কোথায় পঞ্চু? পুলিশ

কী বস্তু, থানা থেকে পালানো। পঞ্চু তা জানে এবং জানে বলেই এখন সে দেবদারু গাছের মগডালে।

রাতে কলাবতী ফোন করে মলয়াকে সবিস্তারে সারাদিনের ঘটনা বলার পর শেষে যোগ করল, "বিশ্বাস করবেন না বড়দি, রিভলভারটা হাতে নিয়ে কাকার সে কী অগ্নিমূর্তি! আমি তো ভাবলুম এই বুঝি ভেবোর ইহলীলা খতম হবে।"

"তুমি ভাবতে পারো কিন্তু আমি ভাবছি না, যতদূর জানি সতু জীবনে কখনও রিভলভার হাতে ধরেনি। যদি গুলি ছুড়ত তা হলে ভেবো নয়, হয়তো তোমারই ইহলীলা সাঙ্গ হত। তবে ও যে একটা অস্ত্র হাতে ধরেছে, ওই অসমসাহসী কাজের জন্য ওকে আমি ফুলহাতা একটা সোয়েটার নিজে হাতে বুনে দেব। কথাটা তুমি ওকে বলে দেখো, শুনেই বলবে নিউ মার্কেট থেকে কিনে নিজের হাতে বোনা বলে চালাচ্ছে।" মলয়া হেসে উঠল কথার শেষে।

রাতে খাবার টেব্‌লে কলাবতী বলল, "কাকা, তোমাকে বড়দি একটা ফুলহাতা সোয়েটার দেবে নিজের হাতে বুনে।"

ভ্রূ কুঁচকে সত্যশেখর তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই বিশ্বাস করলি? ময়দানে ভুটিয়াদের কাছ থেকে কিনে নিজের হাতে বোনা বলে চালাবে সেটা কি জানিস? ও বকদিঘির মেয়ে, এটা মনে রাখিস। আর মনে রাখিস, আটঘরার মেয়ে হল অপুর মা।"

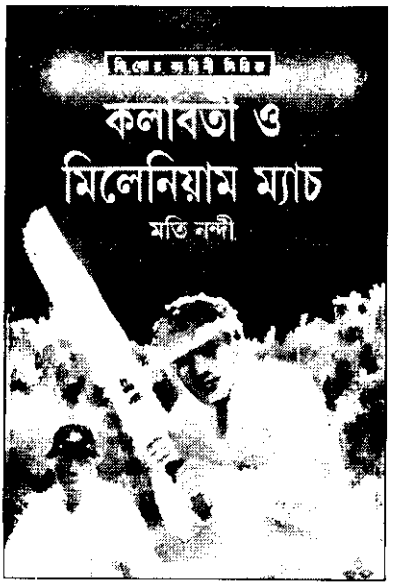

কলাবতী ও মিলেনিয়াম ম্যাচ

বকদিঘিকে চ্যালেঞ্জ দিলেন রাজশেখর

চারদিন আগে আটঘরা থেকে রাত্রে টেলিফোনে খবর এসেছিল অপু ফুটবল খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ের গোছ ভেঙেছে। পরদিন সকালে সত্যশেখর মোটরে করে অপুর মাকে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে গিয়ে তারকেশ্বর লোকালে তুলে দিয়ে আসে। যাওয়ার সময় রাজশেখর বলে দেন, "যদি বোঝো ব্যাপারটা গুরুতর, তা হলে অপুকে মোটরে কলকাতায় নিয়ে আসবে। খরচের জন্য চিন্তা করবে না।"

অপুর মা'র চিন্তা একটাই, তিনমাস পর তার ছেলের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ততদিনে ভাঙা পা সারিয়ে পরীক্ষায় বসতে পারবে কি না বাবা তারকনাথই জানেন। রাজশেখরকে সে তার দুশ্চিন্তার কথা জানিয়ে বলেছিল, "তারকেশ্বরে নেমেই বাবার পুজো দিয়ে চন্নমেত্ত নিয়ে গিয়ে অপুকে খাওয়াব। বাবার ইচ্ছে থাকলে অপু সাতদিনেই হাঁটতে পারবে।"

শোনামাত্র সত্যশেখর বলে, "অপুর মা, বাবার চরণামৃত খেয়ে অপু হয়তো সাতদিনে হাঁটতে পারবে, তারপর ওকে আবার বিছানা নিতে হবে জন্ডিস কিংবা হেপাটাইটিসে।"

"ডিসটিস কী বলছ ছোটকত্তা?" অপুর মা হতভম্বের মতো তাকিয়ে থেকে ছিল।

কলাবতী বলেছিল, "দুটো খুব খারাপ অসুখ পিসি, এতে মানুষ মারাও যেতে পারে, দূষিত জল থেকে এইসব রোগ হয়।"

অপুর মা নিরুপায় চোখে রাজশেখরের দিকে তাকায়। "হ্যাঁ কত্তাবাবা, কালুদি যা বলল সত্যি?"

"একশো ভাগ সত্যি।" রাজশেখর খবরটা কঠিন করে জানিয়ে দেন। "তারকনাথের পুজো দাও, ঠিক আছে। পুজোর ফুলপাতা অপুর মাথায় ঠেকাও, ঠিক আছে। মুখে প্রসাদ দাও, ঠিক আছে কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর কিছু ওর পেটে যেন না যায়।"

অপুর মা মাথা কাত করে রাজশেখরের নির্দেশ মেনে নিয়েছিল।

অপুর মা'র অবর্তমানে রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে তার রান্নাঘরের সহকারী শকুন্তলা। অপ্রত্যাশিত এই প্রোমোশনে শকুন্তলার কথাবার্তা, চলাফেরা বদলে গেছে। মুরারি তাকে জানিয়েছে, "ভাল করে রাঁধ, ছোটকত্তার জিভে রুচলে তোর মাইনে দুশো টাকা বাড়িয়ে দিতে বলব।" তাই শুনে শকুন্তলা বলে, "মাইনে বাড়লে কী হবে, পারমেন্ট তো করবে না। দেশ থেকে দিদি ফিরলেই তো আবার বাটনা বাটতে হবে।"

"তা তো হবেই।" মুরারি নিশ্চিত স্বরে বলেছিল, "তুই কি ভেবেছিস অপুর মা বাটনা বাটবে আর তুই রাঁধবি আর কত্তাবাবু তাই দেখবে? আমি বরং কত্তাবাবুকে বলে যতদিন না অপুর মা ফিরে আসে বাটনা বাটার কাজটা কান্তির মাকে করতে বলব।"

"ওকে বলে দিয়ো যেভাবে বাটতে বলব ঠিক সেইভাবে যেন বাটে। দিদি আমাকে দিয়ে দু'বার করে কতদিন যে বাটিয়েছে। বড্ড মুখ করে কান্তির মা। আর ওকে বলে দিয়ো এটা টেম্পোরি কাজ, পারমেন্ট নয়।"

শকুন্তলার রান্না প্রথমদিন কয়েক গ্রাস খেয়েই সত্যশেখর বলেছিল, "হ্যাঁরে কালু, অপুর মা কবে আসবে বলে গেছে?"

রাজশেখর ভ্রূ তুলে বলেন, "কেন? শকুন্তলার রান্না কী এমন খারাপ, বেশ তো খেতে লাগছে।"

সত্যশেখর কথা না বাড়িয়ে মুখ নামিয়ে বিড়বিড় করে, "বিশ্বনাথের ব্যাটিং-এর পর বিষাণ বেদির ব্যাটিং।"

কাকার রসনা অপুর মা'র হাতের রান্নার অভাবে বিষণ্ণবোধ করলেও ভাইঝির রসনাকে তেল ও লঙ্কায় মাখামাখি তেঁতুলের বা কাঁচা আমের আচারে, যা স্কুল গেটের বাইরে বিক্রি হয়, পুলকিত করে তোলার সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। অপুর মা বরাবর সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে, স্কুল থেকে ফিরে কলাবতীর 'খিদে নেই' ঘোষণার একমাত্র কারণ 'টিপিনের সময় হজমি চাটনি আচার আলুকাবলি, ঝালমুড়ি ইত্যাদি অখাদ্য' গিলে আসা।

অপুর মা এখন আটঘরায়, তাই সেদিন স্কুল ছুটির পর নির্ভয়ে কিনে আনা

জলপাইয়ের আচার কলাবতী মুখে রেখে চুষছিল গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে। জিভ ও টাকরায় টক আর ঝালের ছোঁয়া লাগিয়ে চোখমুখ কুঁচকে সে, মাঘ মাসে পুকুরে নামার মুহূর্তে যেমন হিহি কাঁপুনি দেয় সেইরকম একটা কম্পন উপভোগ করতে করতে সে আচার খেয়ে যাচ্ছিল।

গাড়িবারান্দাটা একটা উঠোনের মতো। তিনদিকে কোমরসমান উঁচু ঢালাই লোহার নকশাকাটা রেলিং। বারান্দা থেকে প্রায় চল্লিশ মিটার দূরে দেড়শো বছরের পুরনো লোহার গেট, যাকে সবাই বলে ফটক। বাড়ির সদরে দশ ফুট উঁচু ছ'ফুট চওড়া কাঠের দরজা। পাঁচিল ঘেরা বাড়িতে দুটো টেনিস কোর্ট হওয়ার মতো জমি। দেবদারু, পাম, কাঁঠালি চাঁপা, পেয়ারা, বকুল, বাতাবি ও পাতিলেবুর গাছ পাঁচিল ঘেঁষে। সদর দরজা থেকে মোরামের রাস্তা গেছে ফটক পর্যন্ত। কলাবতী জলপাইয়ের আচার খেতে খেতে দেখল সাদা হাফশার্ট ধুতি পরা, পায়ে পাম্পশু, লম্বা, রোগা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, পাতাকাটা চুল একটি লোক ফটক দিয়ে ঢুকল। পকেট থেকে চিরুনি বার করে চুল ঠিক করল, সবুজ রুমাল দিয়ে মুখটা রগড়ে মুছল।

কলাবতীর মনে হল লোকটিকে সে দেখেছে। কোথায়? এই বাড়িতে, না অন্য কোথাও? সে ভেবে চলেছে ততক্ষণে লোকটি সদর দরজায় পৌঁছে কলিংবেল বাজিয়েছে। তখনই মনে পড়ে গেল তার। সে ছুটে লাইব্রেরি ঘরে গিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল, "দাদু, দাদু, আটঘরার সেই পটল প্রধান এসেছে। নীচে বেল বাজাল, বোধহয় মুরারিদা সদর দরজা খুলেছে।".

রাজশেখর চিঠি লিখছিলেন, একটু অবাক হয়ে বললেন, "পটল প্রধান?... ওহো গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পটল হালদার, তাই বলো। মুরারিকে বলো ওকে এখানে পাঠিয়ে দিতে, লোকটা খুব সরল আর সৎ, শুধু বুদ্ধিটা—" রাজশেখর থেমে গিয়ে হাসলেন, তারপর বললেন, "দিদি, তুমি আর আঙুল চেটো না, এবার সাবান দিয়ে ধুয়ে নাও। অপুর মা ফিরে এসেই তোমার আঙুলের গন্ধ শুঁকবে, তারপর কী কাণ্ড যে হবে।" বলেই তিনি শিউরে ওঠার ভাব দেখালেন।

মুরারি এসে দাঁড়াল। কলাবতী বলল, "কে এসেছে আমরা জানি মুরারিদা, তুমি ওকে এখানে নিয়ে এসো।" বলেই সে হাত ধুতে বেসিনের দিকে চলে গেল।

পটল হালদার এসেই রাজশেখরের পদধূলি নিয়ে (যা তাঁর পায়ে কখনও থাকে না) মাথায় ঠেকাল।

খটাস করে রাজশেখর রিসিভার রেখে পটলের দিকে তাকালেন, রাগে থমথমে চাহনি। অবাক গলায় পটল বলল, "আপনি বলে দিলেন, দেখব কী করে তোরা জিতিস? এটা তো চ্যালেঞ্জ!"

"হ্যাঁ, সিংহিবাড়ির চ্যালেঞ্জ, আটঘরার চ্যালেঞ্জ।"

ঘরে ঢুকল মুরারি, হাতে ট্রে। উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল পটল হালদারের চোখ। তবে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার উদ্দীপনায়, না ট্রে-তে রাখা প্লেটের সন্দেশ ও শিঙাড়া দেখে, সেটা বোঝা গেল না।

"আবার এসব কেন।"

"হরির বাড়িতে কী খেয়ে এসেছ?" রাজশেখর গম্ভীর স্বরে জানতে চাইলেন। পটল ইতস্তত করে বলল, "একটা ভেজিটেবল চপ, দুটো দরবেশ আর চা।"

রাজশেখর ঠোঁট মোচড়ালেন। "প্লেটটা শেষ করো। মুরারি, ডাব আছে?"

"আছে।"

রাজশেখরকে আর কিছু বলতে হল না, মুরারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"দু'বছর আগের হারের জ্বলুনিটায় এখনও জ্বলছে। সত্যি বলতে কী, আমি পর্যন্ত জানতুম না কালু ওইভাবে গোপী ঘোষের ছেলের জায়গায় ব্যাট হাতে নামবে।"

"আপনি জানবেন কী করে," শিঙাড়ার অর্ধেকটা মুখের মধ্যে, দু'বার দাঁতে পিষে গলার স্বর বার করার জায়গা তৈরি করে নিয়ে পটল বলল, "তখন তো আপনি ব্যাট করছেন মাঠে। কাকপক্ষীতে জানতে পারেনি, এমনকী আমিও না। উফ্‌ফ্‌, তলে তলে কী ফন্দিটাই না এঁটেছিল আপনার নাতনি! একটা বাচ্চা মেয়ে যে এত ভাল ব্যাট করে কে জানত বলুন তো?"

"আমি জানতুম, সতুও জানত। তোমার অবশ্য জানার কথা নয়। কালু বাংলার মেয়ে টিমে খেলেছে।" মুরারিকে কাচের গ্লাসে ডাবের জল নিয়ে ঢুকতে দেখে তিনি থামলেন।

দ্বিতীয় শিঙাড়াটা তুলে নিয়ে পটল বলল, "আপনি, সতুবাবু আর কলাবতী তিনজনে একই ম্যাচে খেললেন। আচ্ছা, তিন পুরুষের একই ম্যাচে খেলাটা বিশ্বরেকর্ড কি না সেটা কি খোঁজ করে দেখেছেন? হলে আমি বিশ্বরেকর্ড স্তম্ভ গড়ব আটঘরা বাজারে, ভোটের আগেই।"

"হ্যাঁ, দেখেছি। অসমের এক চা-বাগানের মালিক, তার ছেলে আর নাতি

মিলে একটা ম্যাচ খেলেছিল নাইনটিন থার্টিফোরে। মালিক ছিল ইংলিশম্যান। খেলাটা হয়েছিল শিলং-এ, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের টিমের সঙ্গে।''

আধখাওয়া শিঙাড়া হাতে পটল লাফিয়ে উঠল। ''কী বললেন, নাতি? নাতনি তো নয়। আরে, এটাই তো বিশ্বরেকর্ড! কী আশ্চর্য, আগে কেউ আমায় জানায়নি, তা হলে তো দু'বছর আগেই স্তম্ভ গড়ে ফেলতুম। সেই ম্যাচে সতুবাবু একটা সেঞ্চুরি করেছিলেন যা এই বাৎসরিক খেলার ইতিহাসে এখনও কেউ করতে পারেনি...।''

রাজশেখর গম্ভীর মুখে বললেন, ''পটল শিঙাড়াটা শেষ করে কথা বলো, তারপর সন্দেশগুলোর গতি করো।''

''নিশ্চয়ই করতে হবে। পতু মুখুজ্যে তো এখন থেকেই ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছে আমার এগেনস্টে। এবার তো আমাকেও শুরু করতে হবে। আচ্ছা, যদি দুটো স্তম্ভ গড়ে ফেলি তা হলে কেমন হয়, একটা আটঘরার বাজারে, অন্যটা বাসস্টপে, অনেক লোকের চোখে পড়বে।'' পটল সন্দেশ তোলার জন্য বাড়ানো হাতটা থামিয়ে সমর্থন পাওয়ার আশায় তাকাল।

রাজশেখর বললেন, ''দুটো কীসের কীসের?''

পটল সন্দেশ তুলে নিয়ে বলল, ''সতুবাবু যে তেরোটা ছক্কা হাঁকড়ে একশো চার করেছিলেন, আটঘরার হিস্ট্রিতে এটাই প্রথম সেঞ্চুরি। এখনও লোকে বলে, বাব্বা, এক-একটা ছক্কা তালগাছের মাথায় চড়ে যাচ্ছিল। পরের বছর ইস্কুলের কত ছেলে ওঁর অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিল কিন্তু উনি তো আর গেলেন না।'' পটল ক্ষুব্ধ মুখের মধ্যে সন্দেশ পুরে দিল।

''আর দ্বিতীয় স্তম্ভটা?''

পটল সন্দেশটার গতি করার জন্য একটু সময় নিল। এক ঢোঁক ডাবের জল খেয়ে বলল, ''দ্বিতীয়টা তিনপুরুষ স্তম্ভ। স্তম্ভে পাথর লাগানো থাকবে, তাতে থাকবে তিনজনের নাম আর তাদের কীর্তির কথা। আমাদের বাংলার টিচারকে দিয়ে লেখাব, বড় ভাল বাংলা লেখে।''

রাজশেখর গম্ভীর হয়ে গেলেন শুনতে শুনতে। ধীরস্বরে বললেন, ''পটল, চালের দাম পড়ে গেছে। মানুষ অসন্তুষ্ট। এখন এসব করলে তুমি একটাও ভোট পাবে না।''

গলা নামিয়ে চুপিসারে পটল বলল, ''এই সময়েই তো এসব করতে হয় বড়বাবু। দেখেননি দেশের অবস্থা খারাপ হলে রায়ট কিংবা যুদ্ধ লাগিয়ে দেশবাসীর নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। আমিও ক্রিকেটের হুজুগ

তুলে... কী বলব আপনাকে, ওয়ান ডে ক্রিকেট টিভিতে দেখানো শুরু হলেই আটঘরা একেবারে সুনসান হয়ে যায়, বাজারে বেচাকেনা লাটে ওঠে, ইস্কুলে মাস্টারমশাইরাও কামাই করেন, ফুটবল মাঠে ছেলেরা সারা বছর এখন ক্রিকেট খেলছে। বড়দের মুখে শুধু ক্রিকেটের কথা। চালের দামটাম সব ভুলিয়ে দেওয়া যাবে স্তম্ভ গড়ার জন্য শোরগোল তুলে দিয়ে।''

রাজশেখর আর কথা বললেন না। পটলের সন্দেশ খাওয়া দেখতে লাগলেন। ডাবের জলটা খেয়ে পটল গ্লাস রেখে বলল, ''বকদিঘিকে যে চ্যালেঞ্জটা দিলেন, সেটাকেই মূলধন করে কাল থেকেই আটঘরাকে তাতাবার কাজ শুরু করব। বাইরের লোক এনে খেলানো তো ভ্রষ্টাচার, বাৎসরিক ম্যাচটাকে তো অপবিত্র করে দেওয়া। এর মূলে পতু মুখুজ্যের বুদ্ধি কাজ করছে। উদ্দেশ্য একটাই। আটঘরাকে নয় আমাকে হারানো।''

রাজশেখর চিন্তিত স্বরে বললেন, ''সেবারের ম্যাচ দেখে তো মনে হয়েছিল দুই আম্পায়ারের মধ্যেই যেন খেলাটা হচ্ছিল। আমাদের আম্পায়ার—কী যেন নাম?''

''বুদ্ধুস্যার, বুদ্ধদেব ঘোষ অঙ্কের টিচার; ওদের আম্পায়ার হরিশ কর্মকার, বকদিঘি ড্রামাটিক পার্টির প্রম্পটার।''

''বুদ্ধদেব প্রথম দু'ওভারেই তিনটে রান আউট আর দুটো স্টাম্পড দেন। ওদের হরিশ কর্মকারও প্রথম ওভারেই চারটে এল বি ডবলু দিয়েছিল। দেখো পটল, এভাবে খেলা হয় না। নিজেদের গ্রামের লোককে আম্পায়ার রাখলে পুকুরচুরি হবেই। এবার থেকে নিউট্রাল আম্পায়ার রাখার ব্যবস্থা করো। পারলে কলকাতা থেকে নিয়ে যাও।''

''আবার কলকাতা! বকদিঘি কলকাতা থেকে প্লেয়ার আনাচ্ছে বলে আপনি আপত্তি তুলছেন, আর—।''

''দুটো এক ব্যাপার নয় পটল। আম্পায়াররা তো আর ব্যাট-বল নিয়ে খেলবে না। ওরা শুধু খেলাটা পরিচালনা করবে। খেলার আইনে বলেছে, ইনিংসের জন্য টস করার আগে আইনের প্রয়োজন অনুযায়ী চরম নিরপেক্ষতা সহকারে খেলাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রতি প্রান্তে একজন করে, দু'জন আম্পায়ার নিয়োগ করতে হবে। এবার তুমিই বলো, ওইসব রানআউট, স্টাম্পড আর এল বি ডবলুগুলো কি চরম নিরপেক্ষতার নমুনা? ও তো রেষারেষি করে আউট দেওয়া, দিনে ডাকাতি। ব্যাপারটা তা হলে তো স্রেফ

ভাঁড়ামিতে দাঁড়াল। তুমি ওদের বলো, কলকাতা থেকে আম্পায়ার আনতে। আমরাও নিয়ে যাব আম্পায়ার।''

''বড়বাবু, আম্পায়ারকেও ম্যানেজ করা যায়।''

''করা গেলে আর কী করা যাবে। তবু তো ম্যাচটাকে ডিগনিফায়েড করা যাবে।''

''কিন্তু বড়বাবু, হায়ার করে প্লেয়ার আনার ব্যাপারটার কী হবে? আমরাও তা হলে কালীঘাট কি এরিয়ান থেকে তিন-চারজনকে আনব?''

''একদম নয়। ভুবনডাক্তার কি তার কম্পাউন্ডার চণ্ডী, বকু বোস আর দারোগাবাবু, ওরা এখন কীরকম ফর্মে আছে?''

''পুরনো বড়বাবু বদলি হয়ে গেছেন, নতুন বড়বাবু সবে এসেছেন, ক্রিকেট পছন্দ করেন না। তবে শুনেছি মেজবাবু ভাল খেলেন। ভুবনডাক্তার খেলবেন। দু'মাস আগে লক্ষ্মীপুজোর দিন যে ম্যাচটা হয়েছিল তাতে তিনি পাঁচটা ছক্কা হাঁকিয়েছেন আর বকু বোস তিনটে স্ট্যাম্প আউট করেছে। শুধু চণ্ডী কম্পাউন্ডারই রানআউট হয়ে গেছে নয়তো সবাই বেশ ভাল ফর্মেই আছে। এবার সতুবাবু আর আপনার নাতনি যদি খেলে তা হলে আটঘরা টিমটা খুব স্ট্রং হবে।''

পটল হালদার আর বেশিক্ষণ বসল না। ছ'টা চল্লিশের তারকেশ্বর লোকাল ধরতে হবে তাই উঠে দাঁড়াল। ''আমি আবার আসব সবকিছু ফাইনাল করে। পরমেশ আর নন্তু বলেছিল আপনার সঙ্গে দেখা করবে।''

পঞ্চায়েত প্রধান চলে যাওয়ার পর রাজশেখর গাড়িবারান্দায় এসে বসলেন একটা বেতের ডেকচেয়ারে। এখন তিনি একাকী বসে ভাবতে চান এই ঐতিহ্যপূর্ণ ম্যাচটার ভবিষ্যৎ নিয়ে। হরি মুখুজ্যে তাঁকে বিপদে ফেলে দিয়েছে!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে প্রতিবছরই চলে আসছে এই ম্যাচটা। প্রথমদিকে ছিল ক্রিকেট নামক ব্যাটবল খেলার প্রতি শুধুই গ্রামবাসীদের কৌতূহল, খেলাও হত নিজস্ব নিয়মে। ধীরে ধীরে আগ্রহের সঞ্চার হতে থাকে রেডিয়োয় বাংলা রিলে আর খবরের কাগজের ছবি এবং টেস্ট ক্রিকেটের রিপোর্টিং-এর সুবাদে। নতুন এক ক্রিকেটপ্রেমী শ্রেণি গড়ে ওঠে আটঘরায়। বাৎসরিক ম্যাচটা ঘিরে নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনাটা দুটি গ্রামেরই লোকেদের নেশা ধরাতে শুরু করে, যেমন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে সারা বিশ্বের বাঙালি এই দুই দলের ম্যাচের দিন দু'ভাগ হয়ে যায়,

তেমনিই আটঘরা-বকদিঘি এই ক্রিকেট ম্যাচের দিন দুটি গ্রামের মানুষ একদিনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

ম্যাচটি এখন এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এখন আর একে উপেক্ষা করতে পারছে না। তারা সমীক্ষা করে দেখেছে এই ম্যাচের ফলাফলে তাদের আধিপত্য বাড়ে এবং কমে এবং এও তারা দলীয় লোক মারফত জেনেছে সারা মহকুমাই নাকি এই ম্যাচের খবর জানার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে।

রাজশেখর এসব খবর সবই পান আটঘরার দুটি যুবক পরমেশ ও নন্তুর কাছ থেকে। এই দু'জন রাজনীতির ধারেকাছে নেই, বাস্তববোধ ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, শিক্ষিত। দু'জনে টেলিফোনে আটঘরা থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলে থাকে।

ডেকচেয়ারে বসে রাজশেখর সামনে ফটকের দিকে তাকিয়ে। রাস্তা দিয়ে মানুষের আনাগোনা, গাড়ির যাতায়াত অন্যমনস্কের মতো দেখে যাচ্ছেন। আসলে তিনি স্মৃতিমন্থন করছেন। দু'বছর আগের সেই ম্যাচটাকে তিনি মনের মধ্যে আবার ফিরে পেতে চাইছেন। ওটাই তাঁর জীবনে শেষবার ব্যাট হাতে খেলতে নামা। মলয়ার অর্থাৎ হরিশঙ্করের মেয়ে, কলাবতীর স্কুলের বড়দির তাঁকে লেখা কৌতুকপূর্ণ কিন্তু চিমটি-কাটা একটা চিঠি পড়ে রাজশেখর তেতে ওঠেন। মলয়ার চিঠিটা ছিল বিদ্বেষহীন রসিকতায় মাখা। পনেরো বছর আগে মলয়া ও সত্যশেখর লেখাপড়ার জন্য ইংল্যান্ড যায়। সেখানে সত্যশেখর ছোটবেলার অভ্যেস মতো তার বাল্যবান্ধবী মলয়াকে কয়েকবার জিভ দেখায় বা ভ্যাংচায়। সেই কথাটাই মলয়া লিখেছিল। এরপর রাজশেখর তাঁর পুত্রকে তুলোধোনা করেন, কারণ চিঠির শেষে মলয়া লেখে, 'ওই লাঙ্গুলহীন সিংহসন্তানকে চিড়িয়াখানায় পাঠানো উচিত।' এরপর খেপে উঠে তিনি বলেন, ''এবার আমি ক্রিকেট ম্যাচে খেলব, মুখুজ্যেদের মুখ পুড়িয়ে ছাড়ব।'' কলাবতী অবশ্য তাঁকে নিরস্ত করার জন্য মনে করিয়ে দিয়েছিল, 'বয়স সত্তর হয়ে গেছে। এই বয়সে খেলবে?'

রাজশেখর শ্বাস টেনে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, ''কেন খেলব না? গ্রেস, হব্‌স, রোড্‌স, সি কে, দেওধর ওরা যদি পঞ্চাশের পরও ফার্স্টক্লাস ম্যাচ খেলতে পারে... আরে সত্তর তো পাঁজির হিসেবে কিন্তু মনের বয়সের হিসেব আমি পঁচিশের একদিনও বেশি নই।''

ডেকচেয়ারে বসে কথাগুলো মনে পড়ায় রাজশেখর মনে মনে খুব একচোট

হাসলেন। এধার-ওধার তাকিয়ে দেখলেন তাঁকে কেউ হাসতে দেখল কি না। তখনই চোখে পড়ল রেলিং-এর থামের উপর একটা কাগজের মোড়ক। কৌতূহলে চেয়ার থেকে উঠলেন। মোড়কের দুটো পাট খুলতেই বেরিয়ে পড়ল জলপাইয়ের আচার। কলাবতী ভুলে ফেলে রেখে গেছে। চকচক করে উঠল রাজশেখরের চোখ, সপসপ করে উঠল জিভ। আঙুল দিয়ে খানিকটা তুলে মুখের মধ্যে পাঠিয়ে চোখ বুজে চুষতে লাগলেন। মিনিট তিনেকেই মোড়কটা শেষ করে আবার চেয়ারে বসে ভাবলেন, কালু ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে সল্টলেকে গেছে, ফিরে এসে নিশ্চয় ফেলে যাওয়া আচারের খোঁজ করবে।

আচারটা খেয়ে তেমন তৃপ্তি পেলেন না। সবকিছুই যেন কম কম। তেল ঝাল টক কেনা আচারে কমই থাকে, বাড়ির তৈরি আচারে বেশি বেশি জিনিস পড়ে তাই টেস্টফুল হয়। একবার মলয়া আচার তৈরি করে পাঠিয়েছিল। রাজশেখর চেটে চেটে শিশি খইয়ে দিয়েছিলেন। অসাধারণ আচার করতে পারে মুখুজ্যেবাড়ির মেয়েটা। মায়ের কাছ থেকে শিখেছিল।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে রাজশেখর লাইব্রেরিতে এসে ফোনের রিসিভার তুললেন। ওধার থেকে নারীকণ্ঠে "হ্যালো।"

রাজশেখর বুঝে গেলেন যার সঙ্গে কথা বলতে চান রিসিভার সে-ই তুলেছে। "মলু, আমি রাজুজেঠু বলছি। কালু স্কুল থেকে বেরিয়ে, বোধহয় তোমাদের গেটের সামনে আচার টাচার বিক্রি হয়, খানিকটা কিনে এনেছিল, আমি তার কিছুটা খেয়ে দেখলাম।"

রাজশেখর আর কথা বলার সুযোগ পেলেন না। ওদিক থেকে হেডমিস্ট্রেসের মেশিনগান ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল, "কতবার কতদিন আমি মেয়েদের পইপই বলেছি বাইরের কিচ্ছু কিনে খাবে না, না প্যাটিস না আচার না ফুচকা, না হজমি; কী আনহাইজেনিক নোংরাভাবে ওগুলো তৈরি হয় তা তো ওরা জানে না; ওসব খেলে অবধারিত জন্ডিস, হেপাটাইটিস, এনকেফেলাইটিস, টিবি, কালাজ্বর, কলেরা, হেন রোগ নেই যা না হবে। তবু কালু ওই জিনিস কিনে নিয়ে আপনাকে খাওয়াচ্ছে। আপনি প্রবীণ, বিবেচনাবোধ আছে। আপনিও ওকে দিয়ে কিনে আনিয়ে খাচ্ছেন?" মলয়া থামল।

রাজশেখর বুঝলেন, ওর ম্যাগাজিনের গুলি ফুরিয়ে গেছে। এবার তিনি শুরু করলেন, "মলু, তোমার একটা ভুল প্রথমেই ভেঙে দিতে চাই। কালুকে দিয়ে কিনে আনিয়ে আমি মোটেই জলপাইয়ের আচার খাইনি। ওটা কালু

ভুলে ফেলে গেছিল তাই হঠাৎ পেয়ে গিয়ে খেলুম আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল তোমার পাঠানো ঝাল তেঁতুলের আচারটার কথা, এখনও জিভে তার স্বাদ লেগে আছে। তোমার হাতের যখন, নিশ্চয় হাইজিন মেনে তৈরি করেছ। তুমি কি এখনও তৈরি করো?''

মলয়া বুদ্ধিমতী, কথা না বাড়িয়ে সোজা আসল প্রসঙ্গে এসে গেল। ''জ্যাঠামশাই, এখনও তিনটে শিশিতে তেঁতুল, আম আর লেবুর আচার রয়েছে। আপনি গেটের কাছে এসে দাঁড়ান, দশ মিনিটের মধ্যেই তিনটে শিশি দিয়ে আসছি কিন্তু একটা শর্তে। কালুকে এর থেকে ভাগ দিতে পারেন। কিন্তু আর কাউকে নয়।''

রাজশেখর বুঝলেন, আর কাউকেটা হল সতু।

রাজশেখর নেমে এসে গেটে দাঁড়ালেন। সন্ধে হয়ে এসেছে, রাস্তার আলো জ্বলছে। হাইকোর্ট ফেরত সত্যশেখরের ফিয়াট সিয়েনা গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

''বাবা, তুমি এখন এখানে?'' গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার করে সত্যশেখর বলল।

থতমত রাজশেখর কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এখুনি তো মলয়া আচারের শিশি নিয়ে হাজির হবে। সতুকে দেখলে হয়তো গাড়ি না থামিয়েই চলে যাবে কিংবা গাড়ি থেকে নেমে গটগটিয়ে এসে আচারের শিশিগুলো হাতে দিয়ে বলবে, 'জেঠু, এগুলো আপনার জন্য, শুধুই আপনার জন্য।' তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসবে।

রাজশেখর যা ভাবছিলেন তেমনটি অবশ্য হল না। মলয়া এসে পৌঁছোয়নি।

পরিস্থিতি সামলাতে সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে তিনি বললেন, ''আটঘরা থেকে পটল হালদার এসেছিল। কথা বলতে বলতে ওকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম। তুই ভেতরে গিয়ে পোশাকআশাক বদলা, আমি আসছি। ক্রিকেট ম্যাচটা নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলব।''

সত্যশেখর গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে যাওয়ামাত্র মলয়ার অ্যাম্বাসাডর এসে গেটের সামনে থামল।

মলয়া গাড়ি থেকে নেমে রাজশেখরকে প্রণাম করে বলল, ''লেবুর আচারটা নষ্ট হয়ে গেছে, তবে তেঁতুলের আর আমেরটা মনে হয় আপনার পছন্দ হবে।''

সে দুটো শিশি রাজশেখরের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কালু কোথায়, পড়তে বসেছে কি?"

কলাবতী সেই যে স্কুল থেকে ফিরে সল্টলেকে গেছে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে, এখনও ফেরেনি। এ-কথা মলয়াকে বললেই তো আগুনে ঘি পড়বে। সন্ধে হয়ে গেছে এখনও পড়তে বসেনি? আজ বাদে কাল মাধ্যমিক পরীক্ষা! তারপর বলবে, জেঠু এ-সবই আপনার প্রশ্রয়ে হচ্ছে। আপনারাই আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খাচ্ছেন।

রাজশেখর মনের মধ্যে মলয়ার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং পরিষ্কার মিথ্যে কথাটা বললেন, "কালু তো ক্ষুদিরামবাবুর কাছে বসে অঙ্ক করছে, আমি তো দেখে এলুম।"

মলয়ার মুখে স্বস্তি ফুটল। গাড়ি গ্যারাজে রেখে চাবি হাতে সত্যশেখর বাড়ির দরজার দিকে যেতে যেতে গেটের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল।

"বাবা কার সঙ্গে কথা বলছ?" চেঁচিয়ে সে বলল।

"জেঠু, আমি আসছি। আচারগুলো শুধু আপনার জন্য, আর কাউকে দেবেন না।"

"কালুকে?"

"হ্যাঁ, শুধু কালুকে।"

মলয়া গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল। আর রাজশেখর শিউরে উঠে দেখলেন কলাবতী গেটের কাছে দাঁড়িয়ে, কাঁধে কিটব্যাগ। মলয়ার সবুজ গাড়িটা সে ভালভাবেই চেনে। বিরাট জিভ কেটে কলাবতী পিছন ফিরেই দৌড় লাগাল। হাঁফ ছাড়লেন রাজশেখর। মলয়া দেখতে পায়নি কলাবতীকে। তার গাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে ডান দিকে ঘুরতেই বাঁ দিকে ফুটপাথের রাধাচূড়া গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কলাবতী।

"খুব বাঁচান বেঁচে গেছি দাদু। বড়দি যদি দেখতেন আমি এখনও পড়তে বসিনি, তা হলে আর আস্ত রাখতেন না। তোমার হাতে ও দুটো কী?"

সত্যশেখর তখন কৌতূহলী হয়ে গেটের দিকে এগিয়ে আসছে। রাজশেখর তাড়াতাড়ি শিশিধরা দুটো হাত কোমরের পিছনে নিয়ে গেলেন আর কলাবতী দাদুর হাত থেকে চট করে শিশি দুটো তুলে নিল।

"মুখুজ্যেদের গাড়ি দেখলুম, হরিকাকা এসেছিলেন নাকি?"

সত্যশেখরের নিরাসক্ত কণ্ঠস্বর রাজশেখরকে বুঝিয়ে দিল, সতু ঠিকই দেখেছে মলয়াকে।

"হরি নয়, মলয়া এসেছিল। এখান দিয়ে যাচ্ছিল। গেটে আমাকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে নামল।"

"কেন?"

"কালু পড়তে বসেছে কি না জানতে চাইল।"

"এটা তো টেলিফোন করেই জানা যেত, সেজন্য বাড়ি বয়ে জানতে আসার দরকার ছিল না। আসলে মুখুজ্যেদের বুদ্ধিটা মোটা।"

গেট দিয়ে ক্ষুদিরামবাবু ঢুকছেন দেখে কলাবতী ছুটল বাড়ির দিকে। এরপর বাবা ও ছেলে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

"ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে কী যেন বলবে বলছিলে?"

"হরি এবার কলকাতা থেকে প্লেয়ার ভাড়া করে এনে খেলাবে, পটল বলে গেল।"

"আনাবে তো আনাক না, আমরাও ভাড়া করে আনব।"

"তুই এ-কথা বলছিস?"

"হ্যাঁ, বলছি।" তুমি ঐতিহ্যের কথা বলবে, মোহনবাগানও তাই বলত। বিদেশিকে খেলালে ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর তো চিমাকে খেলাল। বাবা, এখন জেতাটাই আসল ব্যাপার। জিতলে তখন আর কেউ ঐতিহ্য নিয়ে টানাটানি করবে না।"

রাতে খাওয়ার টেব্‌লে পটল হালদার আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। রাজশেখর বললেন, "সামনেই পঞ্চায়েত ইলেকশন, বেচারা খুব দমে গেছে। ধানের দাম পড়ে যাওয়ায় ভোটাররা অসন্তুষ্ট, ওর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিয়েছে পতু মুখুজ্যে।"

কলাবতী ঠাট্টার সুরে বলল, "ধানের দাম কমল কেন, পটল হালদার জবাব দাও, জবাব দাও—এই বলে?"

রাজশেখর বললেন, "না, না, এভাবে নয়, পতু বলেছে এবার আটঘরাকে ক্রিকেট ম্যাচে গোহারান হারিয়ে সতুর সেঞ্চুরি আর কালুর শেষ উইকেটে নেমে উইনিং স্ট্রোক দেওয়ার বদলা নিয়ে পটলের মাতব্বরি ঘোচাবে।" ওদের দু'জনকে তাতিয়ে দেওয়ার জন্য রাজশেখর রং চড়িয়ে বাড়িয়ে বললেন।

শুনেই সত্যশেখর তেতে উঠে বলল, "বাবা, তোমার মনে আছে প্রথম ওভারেই চারজনকে এল বি ডবলু আউট করেছিল ওদের আম্পায়ার? তাইতেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল, ঠ্যাঙাতে শুরু করলাম। সেঞ্চুরিটা কখন যে হয়ে গেল, টেরই পেলুম না।"

কলাবতী বলল, ''আমি গোপী ঘোষের ছেলেকে ভয় দেখালুম, ছেলেটা ভীষণ ভিতু, কখনও ক্রিকেট খেলেনি। বাবা এম এল এ, তাই ওকে টিমে রাখা হয়েছিল। আমায় বলল, ভীষণ নার্ভাস লাগছে। আমি বললুম, তা হলে তো তুমি আজ সহজ ক্যাচও ফেলবে, পায়ের ফাঁক দিয়ে বল গলাবে। আটঘরা হেরে গেলে গ্রামের লোক তোমাকেই দায়ী করবে। তারপর ভয় পাওয়াতে বললুম, গত বছর সিলি মিড অন লোপ্পাই ক্যাচ ফেলে দেওয়ায় আটঘরা জেতা ম্যাচ হেরেছিল। খেলা শেষ হতেই গ্রামের ছেলেরা সিলি মিডঅনের চুল খাবলা খাবলা করে কেটে সাইকেল রিকশায় চাপিয়ে সারা আটঘরা ঘুরিয়েছিল। ওহ্‌হ্ দাদু, তখন যদি তুমি ওর মুখটা দেখতে, ভয়ে সাদা হয়ে গেল।

''তখন ওকে বললুম, তুমি আর খেলো না। হঠাৎই ম্যালেরিয়া ধরেছে বলে ড্রেসিং ঘরের বেঞ্চটায় শুয়ে কাঁপতে থাকো, মুখে কোঁ কোঁ শব্দ করে যাও। তোমার বদলে টুয়েলফ্‌থ্ ম্যান মাঠে নামবে। ছেলেটা আমার কথামতো সত্যি সত্যিই ম্যালেরিয়া রুগি সেজে বেঞ্চে শুয়ে পড়ল। আমিও তখন আমাদের ড্রেসিং ঘরের পিছনে রাখা গাড়িতে বসে বুট, প্যাড, ফুলহাতা সোয়েটারটা, পানামা টুপিটা কপাল পর্যন্ত নামিয়ে মাফলার দিয়ে ঘাড় গলা ঢেকে নিলুম। তোমরা কিন্তু এসবের কিচ্ছুটি তখন জানতে পারোনি।''

উৎসাহভরে রাজশেখর বলে উঠলেন, ''আরে, তখন তো আমিই ক্রিজে ছিলুম। গোপী ঘোষের ছেলের ব্যাট করতে নামার কথা। ম্যালেরিয়ার অ্যাটাকে বেঞ্চে শুয়ে হিহি করে কাঁপছিল আর মুখে কোঁ কোঁ শব্দ করছিল। ছেলেটাকে নামতে দেখে তো আমি অবাক! একদম বুঝতে পারিনি ওটা কালু। একটা শর্ট পিচ্‌ড বল হুক করার সময় মাথা থেকে টুপিটা পড়ে যেতেই তখন চিনতে পারলুম ওকে।''

''আর ঠিক তখনই বড়দির ক্যামেরা ক্লিক করল, আমিও ধরা পড়ে গেলুম।''

''আর সেই ছবি নিয়ে জলঘোলা করল বকদিঘি।'' রাজশেখর গম্ভীর হয়ে গেলেন। ''হরির উসকানিতেই পতু মুখুজ্যে আটঘরার বদনাম রটাতে শুরু করে বলতে থাকে, শেষকালে কিনা একটা মেয়েকে খেলিয়ে আটঘরা জিতল, ছ্যা ছ্যা ছ্যা।''

টেব্‌লে একটা ঘুসি বসিয়ে সত্যশেখর জ্বলন্ত চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, ''বেশ করেছে কালু ব্যাট করে জিতিয়েছে, একটা মেয়ে ব্যাট করে

হারিয়ে দিল। এতে তো ওদেরই লজ্জা পাওয়ার কথা। এবারও কালু খেলবে, দেখি তোর বড়দি কত ছবি তুলতে পারে। কলকাতা থেকে প্লেয়ার ভাড়া করে আনবে? আনুক, তেন্ডুলকরকে আনুক, সৌরভকে আনুক, পন্টিং, বেভান, ব্রায়ান লারাকে আনুক তাতে সিংঘিরা ভয় পায় না। এটা ওদের এবার বুঝিয়ে দিতে হবে।" সত্যশেখর তার গর্জন শেষ করল এই বলে, "এবার আমিও খেলব।"

রাজশেখর মনে মনে খুশি হলেও সেটা চেপে রেখে বললেন, "হরিকে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছি তোরা এই ম্যাচের ট্র্যাডিশন ভাঙতে চাস তো ভাঙ কিন্তু আমি ভাড়া করা প্লেয়ার দিয়ে ম্যাচ খেলে আটঘরার মনের আনন্দ সুখ নষ্ট করব না। দেখি তোরা কেমন করে জিতিস।"

"এই তো সিংহের মতো কথা!" কলাবতীও কাকার মতো টেব্‌লে ঘুসি বসাল।

সত্যশেখরের ফিটনেস প্রস্তুতি

শুধু রবিবারই সকালে সল্টলেকে এ কে ব্লকের পার্কে মেয়েদের ক্রিকেট প্র্যাকটিস হয় নেট খাটিয়ে। সপ্তাহে তিনদিন হয় দু'বেলা। কলাবতী রবিবার প্র্যাকটিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আমের আচারের শিশিটা হাতে নিয়ে সত্যশেখরের ঘরের পরদা সরিয়ে বলল, "কাকা, আসব?"

খালি গায়ে খাটে পা ঝুলিয়ে মাথা নামিয়ে বসে সত্যশেখর। ধীরে ধীরে মুখ তুলল, চোখে বিষণ্ণ চাহনি। ভাইঝির হাতে শিশিটা দেখেই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"ছুটির দিন সকালে এমন মনমরা হয়ে বসে আছ যে?"

"বলছি, তোর হাতে ওটা কীসের শিশি, মনে হচ্ছে আচার টাচার?"

"আমের। বড়দি দিয়েছেন দাদুকে। দেওয়ার সময় বলে গেছেন শুধু আপনার আর কালুর জন্য, আর কাউকে দেবেন না।"

"ঠিক আছে, দে।" সত্যশেখর হাত বাড়াল।

কলাবতী বলল, "দাদুও বারণ করেছেন তোমাকে দিতে, মারাত্মক ঝাল!"

"কেন, ঝাল তো আমি খাই।" বলেই সত্যশেখর শিশিটা কলাবতীর

হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঢাকনা খুলে প্রথমে গন্ধ শুঁকে চোখ বুজে তারিফ জানিয়ে একটা আঙুল ঢুকিয়ে মশলা-মাখানো আমের টুকরো তুলে মুখে পুরে চুষতে শুরু করল।

"দারুণ!" তারপরই শিশিটা ভাইঝির হাতে ফিরিয়ে দিল। কলাবতী দেখল, কাকার চোখ গোল হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কপালে বিনবিনে ঘাম ফুটছে। জিভ বার করে ফেলেছে। ছুটে ঘরের বাইরে গিয়ে বেসিনে কুলকুচি করে ফিরে এল।

"ঝাল কোথায়, এ তো বিষ! উফ্‌ফ আমার যে মাথায় রক্ত চড়ে গেল! পাখাটা ফুলস্পিড করে দে।" বলতে বলতে সত্যশেখর চিত হয়ে খাটে শুয়ে পড়ল।

"কাকা, চিনি এনে দোব?" নিরীহ স্বরে কলাবতী বলল।

"চিনি দিয়ে কী হবে বরফ আন মাথায় আগুন জ্বলছে। এমন জিনিস তুই খেয়েছিস? বাবা খেয়েছে?"

"হ্যাঁ। আমাদের তো ঝালটাল তেমন লাগল না। বড়দি তেঁতুলের আচারও দিয়েছেন, ওটা একটু চেখে দেখবে?"

"না, না না।" সত্যশেখর আঁতকে উঠে খাট থেকে নেমে পড়ল। "ফ্রিজ থেকে বরফ আন।"

কলাবতী প্লেটে বরফের দুটো কিউব এনে দিল। সত্যশেখর মুখে একটা কিউব পুরে চুষতে শুরু করল। কলাবতী বলল, "তুমি অমন মনমরা হয়ে বসে ছিলে কেন?"

"কেন? ঘুম থেকে উঠে মনে এল আমি আনফিট মানে ক্রিকেট খেলার জন্য যে ফিটনেস থাকা দরকার সেটা আমার নেই। এদিকে তো বলে ফেলেছি আমি খেলব।" সত্যশেখর অসহায় চোখে ভাইঝির দিকে তাকিয়ে থেকে যোগ করল, "বকদিঘির বোলিংকে ঠেঙিয়ে বিষ ঝাড়ার জন্য কী করে ফিট হওয়া যায় বল তো?"

চিন্তিত স্বরে কলাবতী বলল, "ব্যাট হাতে শুধু ঠ্যাঙালেই তো হবে না, ফিল্ডিংও করতে হবে, মানে দৌড়োদৌড়ি আর ক্যাচধরার ব্যাপারগুলোও রয়েছে।"

"তা হলে? কী হ্যাপা বল তো। ব্যাটিং, ফিল্ডিং, ক্যাচ ধরা এতসব কাজ একটা লোকের দ্বারা করা কি সম্ভব?" জানি জানি তুই বলবি টুয়েলফ্‌থম্যানকে নামিয়ে দিলেই হবে, কিন্তু সেটা কি সিংঘিদের পক্ষে লজ্জার কারণ হবে না?

টিভিতে ক্রিকেট দেখে দেখে গ্রামের লোকেরাও এখন অনেক কিছু বোঝে, টুয়েলফ্‌থম্যানকে দেখলেই হাসাহাসি শুরু করবে আর সব থেকে আগে সব থেকে বড় করে হাসবে তোর বড়দির বাবা হরিশঙ্কর মুখুজ্যে। উফ্‌ফ্‌ সহ্য করা যাবে না।''

কলাবতী বলল, ''কাকা, তা হলে তুমি ফিটনেস ট্রেনিং শুরু করে দাও আর শুরুটা হোক আজ থেকেই। চলো আমার সঙ্গে, ওখানে আমাদের কোচ বাবুদা আছেন তোমার কলেজের বন্ধু, আর—।''

''আর মলয়ার পিসতুতো দাদা।'' সত্যশেখর হতাশ স্বরে বলল। প্লেটের দ্বিতীয় কিউবটা গলে অর্ধেক হয়ে গেছে। সেটা মুখে পুরে সে বলল, 'চল।''

মোটরে যেতে যেতে কলাবতী জিজ্ঞেস করল, ''মাথাটা ঠান্ডা হয়েছে?''

''না। ভেতরটা দপদপ করছে, ভীষণ রেগে গেলে যেমনটা হয়। তবে জিভটা ঠান্ডা হয়ে গেছে।''

''বাঁচা গেল।'' কলাবতী স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

''তার মানে?''

''মানে জিভ ঠান্ডা হলে পেটও ঠান্ডা থাকে। ফিট হওয়ার জন্য প্রথম কাজ ওজন কমানো, তার মানে খাওয়া কমানো।''

সত্যশেখর আর কথা বলল না, শুধু মুখে ফুটে উঠল বিব্রত ভাব।

ওরা যখন পৌঁছোল তখন দশ-বারোটি মেয়ে পার্কের কিনারা ঘিরে ছুটছে। মাঠের মাঝে বাবু অর্থাৎ সুবীর ব্যানার্জি দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে।

''সাবিনা হাঁটু আর একটু তুলে দৌড়োও... হাসি এটা অলিম্পিক নয় আর একটু স্পিডটা কমাও, মনে রেখো পাঁচ পাক দৌড়োতে হবে... ধুপু, খোঁড়াচ্ছ কেন, পায়ে কী হয়েছে? আর দৌড়োতে হবে না... কালু দাঁড়িয়ে আছ কেন, ওদের সঙ্গে জয়েন করো, এত দেরি এলে সাত পাক দিতে হবে।''

এবার বাবুর চোখে পড়ল সাদা শর্টস আর সবুজ স্পোর্টস শার্ট পরা সত্যশেখরের উপর।

''আরে সতু কতদিন পর আবার দেখা। সেই কবে যেন যেদিন কালু প্রথম এখানে এল সেদিন তুইও ওর সঙ্গে এসেছিলি তারপর আজ, কী মনে করে?''

''কী আবার মনে করে, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাটেখা তো হয় না, আজ ছুটির দিন ভাবলুম যাই বাবু কীরকম কোচিং করায় একটু দেখে আসি।

একসময় আমিও তো ক্রিকেটটা খেলেছি।''

বাবু অবাক হয়ে বলল, ''তুই আবার কবে ক্রিকেট খেললি?''

''কবে খেললি মানে? আমাদের পাড়ার টিম বালক সঙ্ঘের হয়ে রীতিমতো ওপেন করতুম। এখনও বাগমারি পার্কে ছক্কা মারার রেকর্ডটা আমার নামেই রয়ে গেছে।'' সত্যশেখরকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ দেখাল এই তথ্যটি বাবুর না জানা থাকার জন্য। ''এগারোটা ম্যাচ একশো তেত্রিশটা সিক্সার!''

বাবু বলল, ''তুই তো সি কে নাইডুর থেকেও বড় ব্যাটসম্যান! কী বলে খেলতিস, রবারের, না ক্যাম্বিসের বলে?''

''ক্যাম্বিসের বলে।'' সত্যশেখর চোখ দুটো সরু করে বলল, ''তাতে হয়েছে কী? ক্রিকেট বল হলে তবেই ছয়গুলো মান্যিগন্যি হবে আর ক্যাম্বিস বলের ছয়গুলো হরিজন সম্প্রদায়ের হয়ে যাবে? যে বলেই হোক ছয় মারতে গেলে তো টাইমিংটা ঠিক রাখতে হয়। পা ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। মারব কি মারব না এই বিচারটাও তো করে নিতে হয়। তা হলে কী বলে খেলেছিস, এই প্রশ্ন আসছে কেন?''

বাবুকে এখন দেখাচ্ছে গুগলিতে বিভ্রান্ত ব্যাটসম্যানের স্টাম্পড হওয়ার মতো। ঢোক গিলে বলল, ''আচ্ছা আচ্ছা, মানছি তুই সি কে-র থেকেও বড় ব্যাটসম্যান। ব্যারিস্টারি করিস, যুক্তির জাল ছড়িয়ে জজেদের মাথায় টুপি পরানো তোর পেশা। তা হঠাৎ ফিট হওয়ার ইচ্ছেটা হল কেন? বিয়েবাড়ি কি শ্রাদ্ধবাড়িতে নেমন্তন্নটন্ন, পেয়েছিস নাকি?''

''অই তোর এক কথা। কবে সেই মলুর মায়ের শ্রাদ্ধে রাজভোগ পিছু দশ পয়সা বাজি রেখে তিরিশটা খেয়েছিলুম, সেটা নিয়ে আজও খোঁটা দিয়ে যাচ্ছিস।'' সত্যশেখরের গলায় অভিমান ফুটে উঠল।

''দেবে না খোঁটা? তিন-তিনটে টাকা পকেট থেকে বার করে দিতে হল। তখন কলেজে পড়ি, হাতখরচ পাই তিরিশ টাকা, তার থেকে তিন টাকা চলে গেলে কী অসুবিধায় পড়তে হয়, তা তুই বুঝবি না,'' এই বলেই বাবু চক্রাকারে দৌড়োনো মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখল, দৌড় এখন জগিং-এর পর্যায়ে নেমে এসেছে। বাবু আপন মনে বলল, ''পাঁচ পাক মানে প্রায় এক মাইল, তাও পারে না।'' তারপর সে সত্যশেখরকে বলল, ''সতু, ওরা এখন লাস্ট ল্যাপে, তুই ওদের পিছু নিয়ে ছোট। হারি আপ।''

চার পাক শেষ করে মেয়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন তারা ওয়াকিং রেসের থেকে জোরে এবং দৌড়ের মাঝামাঝি অবস্থায়। সত্যশেখর সবার

পিছনে থাকা মেয়েটির সঙ্গ নিল। মেয়েটি হঠাৎ একটি বয়স্ক ভারিক্কি লোককে তার পাশে দৌড়োতে দেখে দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল। সত্যশেখরও গতি বাড়াল এবং পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত গতি বজায় রেখে বুঝল খুবই ভুল করে ফেলেছে। বুক ধড়ফড় করছে, ঊরু দুটোয় মনে হচ্ছে দু'টন লোহা ঝুলছে। পা আর চলছে না, আরও তিরিশ মিটার ছুটে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবু হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল। সত্যশেখর কাছে আসতে সে বলল, "কতবছর পর দৌড়োলি, কুড়ি, পঁচিশ?"

সত্যশেখর একটু ভেবে নিয়ে বলল, "পঁচিশ নয়, কুড়ি বছর হবে বোধহয়। একবার একটা ষাঁড় খেপে গিয়ে তাড়া করেছিল, এর থেকে বেশি জোরে ছুটেছিলুম। মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, এম এ ফাইনাল ইয়ার, ইউনিভার্সিটির গেট থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট পর্যন্ত ছুটেছিলুম।

"ষাঁড়টা কি তোকে শেষ পর্যন্ত তাড়া করেছিল?"

"জানি না, আমি তো পিছন ফিরে দেখিনি।"

"হঠাৎ তোর ফিট হওয়ার ইচ্ছে হল কেন সেটা তো বললি না।"

"আটঘরা-বকদিঘি এ বছরের ম্যাচটায় খেলব বলে। তুই তো জানিস এই ম্যাচের গুরুত্ব কী ভীষণ দুটো গ্রামের লোকের কাছে। এ বছর হরিকাকা দুটো প্লেয়ার কলকাতা থেকে ভাড়া করে আনবে বলেছে। অনৈতিক, একদম ইম্‌মরাল, কনটেস্টের স্পিরিটটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ভাড়াটে প্লেয়ার খেলিয়ে জিতলে বকদিঘির লোকেরা কি সেই নির্মল আনন্দটা পাবে, যেটা পেত গ্রামের লোককে দিয়ে খেলে জিতলে? তুই বল, এটা কি হরিকাকার উচিত?"

বাবু চুপ করে রইল। সত্যশেখর ওর দ্বিধাগ্রস্ত মুখ দেখে যথেষ্ট ভরসা পেল। ডান হাতটা মুঠো করে তুলে ঝাঁকিয়ে বলল, "আমরা এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। আনুক ওরা ভাড়াটে প্লেয়ার, আমরা আটঘরার লোক দিয়েই টিম করব আর জিতবও।"

"তুই খেলবি?" বাবু কৌতূহলী স্বরে বলল।

"অবশ্যই। কালুও খেলবে। দু'বছর আগে এই ম্যাচে আমার একটা সেঞ্চুরি আছে— তেরোটা সিক্সার মেরে।"

বাবু মুচকি হেসে বলল, "এবারও মারবি নাকি?"

উত্তেজিত হয়ে উৎসাহভরে সত্যশেখর বলল, "তেরোটা কেন, তার বেশি—" বলেই হোঁচট খেল। স্তিমিত গলায় বলল, "ফিটনেসটা ঠিক আগের মতো নেই রে! তা ছাড়া তারপর আর তো ব্যাট ধরিনি। ছয়গুলো সব

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয় মারলুম কিন্তু এক রান, দু'রান নিতে হলে তো দৌড়োতে হবে। স্লিপে দাঁড়ালেও তো ঝাঁপাতে টাপাতে হবে।''

বাবু হেসে হালকা সুরে বলল, ''এখন তোর ওজন কত?''

''পঁচাশি কেজি।''

''হাইট?''

''বাবার থেকে দু'ইঞ্চি কম, ছ'ফুট এক ইঞ্চি।''

''শোন সতু, দু'-তিন সপ্তাহের মধ্যে তোর ওজন কম করে পনেরো কেজি কমাতে পারব না। আর ওজন না কমালে যে ফিটনেস চাইছিস সেটা পাবি না। তার থেকে বরং ওই মেয়েগুলো এখন যে ব্যায়াম করছে সেগুলো কর।''

সত্যশেখর চোখ কুঁচকে ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়ামে রত মেয়েদের কিছুক্ষণ দেখে বলল, ''ঠিক আছে, তবে ওদের সঙ্গে করব না, বাড়িতে ছাদে করব।''

''তাই করিস, কালু তোকে দেখিয়ে দেবে।''

বিব্রত হয়ে সত্যশেখর বলল, ''আবার কালু কেন? ও তো সঙ্গে সঙ্গে ওর বড়দিকে টেলিফোনে জানাবে আর সেটা হরিকাকার কানে পৌঁছে যাবে। উফ্‌ফ্‌। তোর মামা তো বকদিঘিতে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সেটা চাউর করবে।''

হাসি চেপে বাবু বলল, ''তুই ছয় মারা প্র্যাকটিস কর। মেয়েদের ক্যাচিং প্র্যাকটিস দরকার। আমি বল করছি, তুই তুলে তুলে মার, ওরা লুফুক। প্যাড পরে নে।''

মেয়েদের জন্য খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম পার্কের পাশেই একটা বাড়িতে রাখা থাকে। প্র্যাকটিসের আগে ব্যাট প্যাড গ্লাভ্‌স স্টাম্প ও বল একটা বিশাল ক্যানভাসের থলিতে ভরে সেগুলো বয়ে আনে মেয়েরাই। সত্যশেখর সেই থলি থেকে প্যাড ব্যাট গ্লাভ্‌স বার করে পরে নিয়ে নেটের ক্রিজে এসে দাঁড়াল।

বাবু মেয়েদের উদ্দেশে বলল, ''এবার ক্যাচিং প্র্যাকটিস। সবাই দূরে দূরে ছড়িয়ে যাও। লং অনে আর লং অফে দু'জন করে, মিড উইকেটে তিনজন, ডিপ ফাইন আর স্কোয়্যার লেগে দু'জন করে। একস্ট্রা কভারে দু'জন। কলাবতী গ্লাভ্‌স পরো, উইকেটের পিছনে দাঁড়াও। ফসকালেই স্টাম্পড করবে।''

বাবুর নির্দেশমতো মেয়েরা ছড়িয়ে গিয়ে জায়গা নিল। বাবুর প্রথম বল লেগব্রেক। লেগস্টাম্পের দু'ইঞ্চি বাইরে আলতো করে তুলে দেওয়া গুড লেংথে। সত্যশেখর শূন্য থেকে বলের অবরোহণ মুখ তুলে দেখতে দেখতে এক কদম বেরিয়ে বিশালভাবে পিছনে তোলা ব্যাট দিয়ে কপিবুক অন ড্রাইভ করল এবং ফসকাল।

"হাউজ দ্যাট।"

কলাবতী কাকাকে স্টাম্পড করার আনন্দে একটু বেশিই চেঁচিয়ে ফেলল। সত্যশেখর এক চোখ বন্ধ করে ভাইঝির দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বলল, "বাইফোকাল চশমার জন্য ফ্লাইটটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। অতটা ফ্লাইট করাবে বুঝতে পারিনি। কনট্যাক্ট লেন্স না পরে ভুল করেছি। বাড়ি গিয়েই পরে নেব।" তারপর সে চেঁচিয়ে বাবুকে বলল, "একটু জোরে দে।"

বাবুর ডেলিভারিটা জোরেই এল এবং ঈষৎ ওভারপিচ। সত্যশেখর আগের মতোই ব্যাট পিছনে তুলে চালাল। ব্যাট বলে লাগল আর বলটা প্রায় আটতলা বাড়ির উচ্চতায় লং অনের দিকে উঠল। সেখানে দুটি মেয়ের একজন অন্যজনকে চিৎকার করে "লিভ ইট" বলেই বলের নেমে আসার পথটা আন্দাজ করতে করতে ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে কয়েক পা গিয়ে ছুটে পাঁচ হাত সরে গিয়ে হাত মাথায় চাপা দিল এবং বলটা চার হাত দূরে জমিতে পড়ল।

বাবু চেঁচিয়ে বলল, "নমামি কী হল? ক্যাচটা ধরার চেষ্টা করলে না কেন?"

"বাবুদা, মেয়েদের ক্রিকেটে অত উঁচুতে ক্যাচ ওঠে না, ধরার তো অভ্যেসই নেই। ওনাকে একটু কমজোরে মারতে বলুন।"

বাবু এরপর বল করল শর্টপিচ। সত্যশেখর এক-পা পিছিয়ে পরম সুখে পুল করল। বল বিদ্যুৎগতিতে জমি দিয়ে গড়িয়ে স্কোয়্যার লেগে গেল। সেখানে ফিল্ড করছিল অলিপ্রিয়া। কামানের গোলার মতো বলটাকে আসতে দেখে সে হাত পেতেও তুলে নিল।

বাবু চেঁচিয়ে বলল, "এভাবে ফিল্ড করলে তো চারের মিছিল চলবে।"

অলিপ্রিয়া বলল, "বাবুদা, এত জোরে মেয়েদের ক্রিকেটে বল মারা হয় না।"

এরপর বাবু এগিয়ে এসে সত্যশেখরকে বলল, "সতু, তোর রিফ্লেক্স পারফেক্ট, তোর বডি কো-অর্ডিনেশনও ঠিক আছে। তোকে দেখে আমার ইনজামাম-উল-হককে মনে পড়ে যাচ্ছে, চালিয়ে যা।"

এরপর দুটি মেয়ে সত্যশেখরকে চার ওভার বল করল। চব্বিশটা বলের দশটা পার্ক পার হয়ে রাস্তায় পড়ল। ভাগ্য ভাল, রাস্তা দিয়ে তখন লোকজন কমই চলছিল।

"সতু, সব বলই যদি পার্ক পেরিয়ে যায়, তা হলে আমার মেয়েরা লুফবে কী করে? ওদের তৈরি করার জন্যই তো এই ক্লাব!"

সত্যশেখর বাবুর সমস্যাটা বুঝতে পারল। একটু ভেবে সে বলল, "ব্যাপারটায় খেয়াল রাখব। বাবু এবার বল, আমি কি পারব?"

"কী পারবি?"

"তোর মামার ভাড়াটে বোলারকে ঠ্যাঙাতে!"

"কী, নাম বল তো বোলারটার, কোন ক্লাবের?"

"ইস্টবেঙ্গলের কে এক খোকন ব্যানার্জি।" সত্যশেখর প্যাড খুলে দুটো পা টানটান করে ঝাঁকিয়ে নিতে নিতে বলল।

"খোকন!" বাবু অবাক হয়ে তাকাল। "কে এক বলছিস কী রে, খোকন তো এবারই রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার এগেনস্টে রঞ্জি ম্যাচে এগারোটা উইকেট নিয়েছে। একেই তুই 'কে এক' বলছিস? বাংলা খবরের কাগজ কি তুই পড়িস না? খোকনকে ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনালে দলে না নেওয়ার জন্য কাগজগুলো সিলেক্টরদের মুন্ডুপাত করছে।"

সত্যশেখর টেরিয়ে তাকাল বাবুর দিকে। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "এ-গা-রো-টা! কী বল করে? শোয়েব আখতার না শ্যেন ওয়ার্ন? ফাস্ট, না স্লো?"

"মিডিয়াম ফাস্ট।"

"ওহ্‌হ্‌, তা হলে তো হেসেখেলে ছক্কা চালাব। মিডিয়াম পেসারদের বল ব্যাটের ঠিক জায়গায় টাইমিং মতো লাগালেই আর দেখতে হবে না। দেখলি তো কেমন মারলুম।"

"সতু, আমি যে বল করলুম সেটা ক্যাচিং প্র্যাকটিসের বল। ওগুলো হাঁকড়ে মনে করছিস খোকনকেও হাঁকড়াবি? ভাল। ক'টা ছয় মারিস সেটা হরিমামা কি কালুর কাছ থেকে জেনে নেব।"

এবার মেয়েদের ব্যাটিং ও বোলিং এবং কলাবতীর উইকেটকিপিং প্র্যাকটিস শুরু হবে। সত্যশেখরকে সোমবার একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলার সওয়াল করতে হবে হাওড়া কোর্টে, মক্কেল আসবে আর ঘণ্টাখানেক পর, সে ব্যস্ত হয়ে কলাবতীকে বলল, "কালু আমি চললুম। আচারটা খেয়ে ঝালের চোটে মাথাটা সেই যে গরম হয়ে উঠল, বাড়ি গিয়ে ঠান্ডা জলে চান করতে হবে।" তারপর গলা নামিয়ে বলল, "আচার খেয়েছি সেটা বাবাকে বলিসনি... আর অন্য কাউকেও নয়।"

বিকেলে কলাবতী গাড়িবারান্দা থেকে দেখল কাকা গাড়ি নিয়ে বেরোল এবং একঘণ্টা পরই ফিরে এসে তার সেরেস্তায় ঢুকল, হাতে একটা পলিব্যাগ। সে বুঝে গেল কাকা কোথাও থেকে খাবার কিনে এনেছে। কলাবতী নীচে নেমে এল।

সে সেরেস্তায় ঢুকে দেখল কাকা গভীর মনোযোগে একটা ব্রিফ পড়ছে। কলাবতী এধার-ওধার তাকিয়ে পলিব্যাগটা খুঁজল কিন্তু দেখতে পেল না।

ব্রিফ থেকে মুখ না তুলে সত্যশেখর বলল, "জানতুম আসবি। গাড়ি থেকে নামার সময়ই দেখেছি তুই বারান্দায় এসে দাঁড়ালি। যা, চট করে দুটো প্লেট নিয়ে আয়। আটটার সময় গণেন আসবে, তার আগেই শেষ করে ফেলতে হবে।"

গণেন টাইপিস্ট। সত্যশেখর ডিকটেশন দেয় আর শুনতে শুনতে সে ঝড়ের বেগে টাইপ করে যায়। যেদিন থেকে সত্যশেখর সেরেস্তা খুলে ওকালতি শুরু করেছে গণেন সেইদিন থেকেই সন্ধ্যায় এসে টাইপরাইটারে বসছে।

কলাবতী দুটো প্লেট নিয়ে এসে দেখল টেব্‌লে পলিব্যাগটা বসানো, তার ভেতরে কাগজের দুটো বাক্স। বাক্স বার করতে করতে সত্যশেখর বলল, "বাবা কোথায় রে?"

"দাদু ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক্স দেখছেন... কাকা এটা কী খাবার?" কলাবতী কৌতূহলে কাকার পাশে এসে দাঁড়াল।

"হুঁ, হুঁ, এখন কলকাতায় কতরকম বিদেশি খাদ্যবস্তু যে তৈরি হচ্ছে! চিনে খাবারটাবার একঘেয়ে হয়ে গেছে, এর নাম পিজ্জা, জাতে ইতালিয়ান।"

ত্রিভুজের আকারে কাটা ইস্ট দিয়ে মাখা ময়দার রুটি ওভেনে বেক্‌ড হয়ে মুড়মুড়ে, তার উপরে চিজ, মাংসের পরত, ক্রিম, টম্যাটো সস, ক্যাপসিকাম, চেরি ইত্যাদি। সত্যশেখর দুটো ত্রিভুজ আলতো করে প্লেটে রেখে বলল, "খেয়ে দ্যাখ।" আঙুলে ক্রিম লেগে গেছে, চেটে নিয়ে সে দুটো পিজ্জা অন্য প্লেটে রেখে তাকাল ভাইঝির দিকে। কলাবতী দু'আঙুল দিয়ে পিজ্জা তুলে বড় হাঁ করে আধখানা মুখে পুরে কামড় বসাল, মুড়মুড়ে পিজ্জা ভেঙে যেতেই সে চিবোতে শুরু করল। সত্যশেখর গভীর উৎকণ্ঠায় খাওয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। কলাবতী চোখ বুজে তৃপ্তিভরে ঘাড় নাড়তেই হাঁফ ছেড়ে বলল, "আগে কখনও খাসনি তো। আমাদের এদিকে এসব পাওয়া যায় না, তবে পাওয়া যাবে।"

বলতে বলতে সত্যশেখর নিজের প্লেট থেকে তুলে খেতে শুরু করল। কলাবতী দ্বিতীয় পিজ্জা শেষ করে আঙুল চেটে কাকার খাওয়া দেখতে লাগল।

"কী, আর একটা? তুলে নে। কিন্তু এটাই শেষ।"

"ক'টা এনেছ?" দ্বিতীয় বাক্স থেকে একটা তুলে নিয়ে কলাবতী বলল।

"আটটা।"

"তুমি একাই পাঁচটা খাবে!" অবাক ও ক্ষুব্ধস্বরে বলল কলাবতী।

"কেন, আমার কি পাঁচটা খাওয়ার ক্ষমতা নেই?" সত্যশেখর বলল চ্যালেঞ্জের সুরে।

"ক্ষমতা তো আমারও আছে। আমি তো সিংহিবাড়ির মেয়ে, আমি কি বকদিঘির মুখুজ্যেবাড়ির মেয়ে নাকি যে, এইটুকুটুকু খুঁটে খুঁটে খাব?"

কলাবতী যা আশা করেছিল সেটাই দেখতে পেল। কাকার মুখ প্রসন্নতায় ভরে উঠল। স্মিত চোখে তাকিয়ে বাক্সের দিকে আঙুল দেখিয়ে সত্যশেখর বলল, "নে একটা, তবে এটাই লাস্ট।"

খাওয়া শেষ করে জিভ দিয়ে ঠোঁট ও আঙুল থেকে ক্রিম চেটে নিয়ে সত্যশেখর বলল, "ছোটবেলা থেকেই দেখেছি মলু একদমই খেতে পারে না, পাখির আহার।"

"সেজন্যই বড়দির ফিগারটা অত ভাল। চলাফেরায় চটপটে, মেঝেয় কিছু পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে তুলে নিতে পারে। স্কুলের বারান্দায় বৃষ্টির জল জমলে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে যায়...।"

"হয়েছে হয়েছে।" সত্যশেখর থামিয়ে দিয়ে বলল, "প্লেট দুটো নিয়ে যা, এখুনি গণেন আসবে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কলাবতী বলল, "বাবুদার কথাটা মনে আছে? ওজন না কমালে যে ফিটনেস তুমি চাইছ সেটা পাবে না। ওজন কমাতে গেলে খাওয়া কমাতে হবে, আর ব্যায়াম শুরু করতে হবে।"

কটমট করে তাকিয়েই সত্যশেখরের চাহনি কোমল হয়ে গেল। ঘরে গণেন ঢুকেছে।

মিলেনিয়াম ম্যাচের তোড়জোড়

রাজশেখরের সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান পটল হালদারের কথাবার্তার চারদিন পর রাত্রে আটঘরা থেকে পরমেশের টেলিফোন এল। সিংহিরা তখন খাওয়ার টেবলে। মুরারি হ্যান্ডসেটটা এনে রাজশেখরকে দিয়ে বলল, "আটঘরা থেকে।"

শুনেই সত্যশেখর ও কলাবতী খাওয়া বন্ধ রেখে উৎসুক চোখে তাকাল। এরপর যে সংলাপ বিনিময় হল তার একপক্ষেরটা ওরা দু'জন শুনতে পেল। তবে পাঠকদের সুবিধের জন্য দু'পক্ষের কথাই লেখা হল এখানে :

"হ্যালো, কে?"

"জ্যাঠামশাই, আমি পরমেশ।"

চুঁচুড়া কোর্টে চাকরি করে পরমেশ এবং আটঘরা থেকেই সে বাসে যাতায়াত করে। আটঘরার ক্রিকেট উন্নয়নের দায়দায়িত্ব তার হাতে এবং বাৎসরিক ম্যাচটিরও অন্যতম সংগঠক। নিজে ক্রিকেট খেলে না।

"বলো পরমেশ কেমন আছ? এই ক'দিন আগে পটল এসেছিল। বলল হরি মুখুজ্যে এবার কলকাতা থেকে দু'জন ক্রিকেটার ভাড়া করে আনবে। একজন মোহনবাগানের, অন্যজন ইস্টবেঙ্গলের। আমি হরিকে বললুম, এই ম্যাচে আজ পর্যন্ত কখনও ভাড়া করে এনে কাউকে খেলানো হয়নি। দুটো গ্রামের লোকেদের থেকে টিম করে খেলা হয়। এই ঐতিহ্য বকদিঘি যদি ভাঙতে চায় ভাঙুক, আটঘরা ভাঙবে না। দেখি বকদিঘি কেমন করে জেতে। পরমেশ, ওকে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়েছি।"

"আর সেই চ্যালেঞ্জের কথা পটলদা এখানে হাটেবাজারে, শিবতলায়, রিকশা স্ট্যান্ডে পথসভা করে দু'দিন ধরে বলে বেড়াচ্ছে। আপনিও খেলবেন, কলাবতীও খেলে ম্যাচ জেতাবে। এইসব বলে যাচ্ছে। সতুদা আবার সেঞ্চুরি করবেন আর রেকর্ড গড়বেন। লোকে বেশ তেতে উঠেছে।"

কলাবতী দেখল, শুনতে শুনতে দাদুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

"বলো কী, আমিও খেলব বলে বেড়াচ্ছে। ওকে থামাও, থামাও। এ তো মহাবিপদ হল! সতু আর কালু খেলবে, বাকি ন'জন তোমরা ঠিক করবে।"

"টিম এবার ঢেলে সাজানো হবে। আটঘরা স্কুলের ভেতরের ছোট্ট মাঠটায় গত বছর থেকে ক্রিকেট কোচিং চালু হয়েছে। ভানু ঘোষাল ডিস্ট্রিক্ট টিমে খেলেছে, সে-ই কোচ। খরচ দিচ্ছে মোহিনী রাইস মিল আর কালীমাতা

কোল্ড স্টোরেজ। তাই কোচিং সেন্টারের নাম মোহিনী কালীমাতা আটঘরা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি, সংক্ষেপে এম কে এ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ভুবনডাক্তার অ্যাকাডেমিকে অকাদেমি করতে চেয়েছিলেন, ভোটে বাতিল হয়ে যায়। অ্যাকাডেমি সামনের বছর কলকাতায় অম্বর রায় সাব জুনিয়ার টুর্নামেন্টে নাম দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। এদেরই চারটে ছেলেকে খেলাব বলে ঠিক করেছি।''

সত্যশেখর ভ্রূ কুঁচকে প্রায় ধমকে উঠলেন, ''চারটে কেন? ন'জনকে খেলাও।''

''না জ্যাঠামশাই, তা হলে মুশকিলে পড়ে যাব। বকু বোসের জায়গায় যদি কলাবতী উইকেট কিপিং করে, তা হলে তো ওকে বসাতে হবে। ওকে বসালে ডেকরেটরের বিল ডবল হয়ে যাবে।''

''কেন, বকু বোস কি ডেকরেটিং-এর ব্যাবসা করে?''

''ওর শালা করে। সুতরাং ওকে রাখতেই হবে। হাবুময়রা লাঞ্চে এবারও দই মিষ্টি দেবে বলেছে, ওর ছেলে বিশুকে তো রাখতেই হবে।''

''বিশু মানে সেই নীল বেলবটম পরা সাবস্টিটিউট ছেলেটা, ক্যাচ ধরতে গিয়ে যার মাথার উপর বল পড়েছিল?''

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার দেখছি মনে আছে! বিশু সাদা প্যান্ট-শার্ট করিয়েছে, ক্যাচ লোফার প্র্যাকটিস হপ্তায় এক ঘণ্টা করে করছে। খুব সিরিয়াস ছেলে। আগের দারোগাবাবু বদলি হয়ে গেছেন, মেজবাবু কমবয়সি একজন, বললেন তো কলেজ টিমে খেলেছেন এগারো বছর আগে। লেগ স্পিনার।''

''তোমাদের ওই ভুবন ডাক্তারটিকে বাদ দিতে পারো?''

''পারি। তা হলে ওর কম্পাউন্ডার চণ্ডীকেও বাদ দিতে হয়। কেননা ডাক্তারবাবু খেলবেন না অথচ তাঁর কম্পাউন্ডার খেলবে তা তো হতে পারে না। এতে তো ডাক্তারের প্রেস্টিজে লাগবে। ডাক্তারের প্রেস্টিজ চলে গেলে সে তো আর ডাক্তারই থাকবে না, হাতুড়ে হয়ে যাবে। জ্যাঠামশাই, আটঘরায় কি আপনি হাতুড়ে চাইবেন?''

''না, না, ডাক্তার থাকুক, একমাত্র এম বি বি এস তো ওই একজনই। তা হলে চণ্ডীকে বাদ দাও।'' নিশ্চিন্ত স্বরে রাজশেখর নির্দেশ পাঠালেন।

''জ্যাঠামশাই, তাতে সামান্য অসুবিধে আছে। চণ্ডী সত্যিই ভাল ক্রিকেটার। জোরের ওপর অফস্পিন করায় লেংথ রেখে, মোটামুটি ভাল ফিল্ড করে। ব্যাটে একটা দিক ধরে রাখতে পারে।''

"ঠিক আছে রাখো। ক'জন হল তা হলে— সতু, কালু, বকু, বিশু ডাক্তার, দারোগা, কম্পাউন্ডার, সাতজন আর অ্যাকাডেমির চারজন। টিম তো হয়েই গেল। ভাল কথা, টুয়েলফথ ম্যান কে হবে? ভাল দৌড়োতে পারে, থ্রো করতে পারে, ক্যাচট্যাচ ধরতে পারে এমন কেউ আছে?"

"এইখানেই একটু বিপদে পড়েছি জ্যাঠামশাই। ক্যান্ডিডেট তিনজন, পঞ্চায়েত সদস্য ভোলানাথ, সে আবার পটলদার ভাইপো, ফিশারিজ অফিসের পাঁচকড়ি আর স্কুলের গেমস টিচার। তবে ভোলানাথ ছাড়া কারুর রেসিডেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন নেই, দু'জনেই বাইরে থেকে এসে চাকরি করে চলে যায়। সুতরাং দু'জনকে বাদ দেওয়া যায়।"

রাজশেখর এবার ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বকদিঘি যে দু'জন প্লেয়ার ভাড়া করে আনছে তাদের কোয়ালিফিকেশন আছে কি না খোঁজ নিয়েছ? এটা কিন্তু খুব জরুরি ব্যাপার।"

"কাল নন্তুকে বকদিঘি পাঠিয়েছিলুম। ওখানে ওর দাদার শ্বশুরবাড়ি। ফিরে এসে বলল, খোকন ব্যানার্জিদের পৈতৃক বাড়ি বকদিঘিতে। চল্লিশ বছর আগে ওর ঠাকুরদা কলকাতায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। একটা ঘর নাকি এখনও ওদের অংশে আছে। পুজোর সময় খোকনরা আসে। আর মদন গুহ বকদিঘির কেউ নয়, ওর দিদির বিয়ে হয়েছে ওখানে। তবে শোনা যায় একবার মদন গুহ এক সপ্তাহ দিদির শ্বশুরবাড়িতে এসে থেকেছিল, মাছধরার শখ আছে, ছুটিছাটায় ছিপ নিয়ে আসে।"

রাজশেখরকে হতাশ দেখাল, স্তিমিত স্বরে বললেন, "তা হলে তো কিছু আর করার নেই। এক সপ্তাহ বাস করলে তো যোগ্যতা পেয়েই গেল। আর পতু মুখুজ্যে সেটা ঠিক প্রমাণও করে দেবে।"

"পটলদা পথসভায় বলেছে কোয়ালিফিকেশন টোয়ালিফিকেশন বুঝি না, ঐতিহ্য যখন ভাঙা হবেই তখন আমরাও পালটা ঐতিহ্য গড়ব।"

বিভ্রান্ত রাজশেখর বললেন, "পালটা ঐতিহ্য! সেটা আবার কী?"

"অবরোধ। পটলদা পথ অবরোধ করবেন। যে পথ দিয়ে ভাড়াটে সৈনিকরা মোটরে আসবে খেলার দিন, তিনি সেই পথ সকাল থেকে একশো ছেলেমেয়ে দিয়ে বন্ধ করে দেবেন, যাতে ওই দু'জন কোনওভাবে মাঠে পৌঁছোতে না পারে। আর এটাও জানিয়ে দিয়েছেন, এই কাজ গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে, সংবিধানে নাকি লেখা আছে।"

সন্ত্রস্ত হয়ে রাজশেখর খাড়া হয়ে বসলেন। "পথ অবরোধ গণতান্ত্রিক

অধিকার! বলো কী পরমেশ, এই বাৎসরিক ম্যাচটা এবার তো বন্ধ করে দিতে হয়, আর পটলকে নয়তো পাগলা গারদে পাঠাতে হয়। কোনটা করা উচিত?''

''কোনওটাই নয়, পটলদাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এসব কী বলছেন? তাইতে উনি বললেন, একটা কুকুর গাড়ি চাপা গেলে কলকাতায় পথ অবরোধ হয়, কেউ কিচ্ছু বাধা দেয় না, সবাই মাথা নিচু করে মেনে নেয়, আর এটা তো কুকুরের থেকেও বড় ব্যাপার, ঐতিহ্যের বিনাশ! জ্যাঠামশাই, এরপর আর কী বলব বুঝে উঠতে পারলুম না। ঐতিহ্যটাকে ইস্যু করে পোস্টার মারা শুরু হয়ে গেছে। সত্যশেখর সিংহর শতরানকে এই ম্যাচের শতাব্দীর সেরা ব্যাটিং কৃতিত্ব বলে তাকে অমর করে রাখতে স্তম্ভ গড়ার জন্য সাহায্যের আবেদন জানানো হচ্ছে। জ্যাঠামশাই, ওকে থামাতে পারবেন না, পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিততে পটলদা এই বাৎসরিক ম্যাচকে তুরুপের তাস করেছে। পোস্টারে, মিছিলে, জ্বালাময়ী বক্তৃতায় আটঘরা এমন তেতে উঠেছে যে, ধানের দাম পড়ে যাওয়া নিয়ে কেউ আর কোনও কথা তুলছে না। পোস্টারে এবারের ম্যাচকে মিলেনিয়াম ম্যাচ বলে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে।''

রাজশেখর হতভম্ব হয়ে বললেন, ''মিলেনিয়াম? শব্দটা পটলের মাথায় ঢুকল কীভাবে!''

''বোধহয় বাবুঘাটে গঙ্গার ধারে মিলেনিয়াম পার্ক দেখে ওর মাথায় এটা খেলে গেছে। ম্যাচের তিনদিন আগে থেকে রথতলা মাঠ ঘিরে মেলা বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে। নাগরদোলা, মেরি গো রাউন্ড তো থাকবেই, আর থাকবে নতুন খাবার চাউমিন আর রোলের দোকান, তাই শুনে এখানকার মিষ্টির দোকানদাররা প্রবল প্রতিবাদ জানাতে এই ফরেন খাবারের অনুপ্রবেশ রুখতে ঠিক করেছে খেলার আগের দিন দোকানের ঝাঁপ ফেলে রাখবে।''

রাজশেখর এতক্ষণ বুকে ধরে রাখা বাতাস মুখ দিয়ে বার করে বললেন, ''আমার চ্যালেঞ্জ জানানোটা দেখছি ভুল হয়ে গেছে। পরমেশ, এবার আমরা হারব মনে হচ্ছে। আম্পায়ার কারা হবে তুমি সেটা তো বললে না?''

''পতু মুখুজ্যেকে আমরা বলেছি সি এ বি-র পাশকরা নিরপেক্ষ আম্পায়ার দিয়ে এবার খেলাতে হবে। উনি রাজি হয়েছেন। আমাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের বন্ধুর ভাই প্রশান্ত রায় সি এ বি আম্পায়ার, তাঁর সঙ্গে উনি টেলিফোনে কথা বলেছেন। প্রশান্ত রায় আসবেন বলেছেন। অন্য আম্পায়ার

আনার দায়িত্ব বকদিঘির। জানি না কাকে আনবে।''

''ঠিক আছে, যদি কিছু বলার থাকে ফোন কোরো। আমারও কিছু জানার থাকলে আমি করব। তবে পথ অবরোধ টবরোধের মতো কিছু যেন না হয় সেটা দেখো।''

এই বলে রাজশেখর রিসিভার রেখে হাঁফ ছাড়লেন। সত্যশেখর ও কলাবতী উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর কথা ও মুখভাব লক্ষ করে যাচ্ছিল এবং অনুমান করছিল অপরদিক থেকে কী বলা হচ্ছে। রাজশেখর নিজে থেকেই সংক্ষেপে পরমেশ যা জানিয়েছে সেটা বলে যোগ করলেন, ''পটল এই বাৎসরিক খেলাটার একটা নাম দিয়েছে— মিলেনিয়াম ম্যাচ।''

''বাঃ, চমৎকার নাম দিয়েছে তো।'' সত্যশেখর উৎফুল্ল স্বরে বলল। ''এইসঙ্গে একটা মিলেনিয়াম ট্রফি চালু করলে কেমন হয় বাবা? যেমন ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে ফ্রাঙ্ক ওয়ারেল ট্রফি, ভারত অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বর্ডার গাওস্কর ট্রফি, ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অ্যাশেজ। তেমনি আটঘরা বকদিঘির মধ্যে মিলেনিয়াম ট্রফি!'' প্রস্তাবটা দিয়ে সে উৎসুক চোখে বাবা ও ভাইঝির দিকে তাকিয়ে রইল।

কলাবতী খুশিতে ঝকমক করে বলল, ''দারুণ হবে। মিলেনিয়াম ট্রফি ডোনেটেড বাই রাজশেখর সিনহা অফ আটঘরা, ট্রফির গায়ে লেখা থাকবে।''

সত্যশেখর চোখ বন্ধ করে কপালে আঙুলের টোকা দিতে দিতে চিন্তিত স্বরে বলল, ''কিন্তু একটা মুশকিল আছে। বকদিঘি, মানে হরিকাকা কি এটা মেনে নেবে? এতে তো ওদের প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যাবে। আমার মনে হয় পটল হালদারকে দিয়ে এটা প্রপোজ করালে ভাল হয়। বাবা আমিই বরং ওকে বলব আপনি পতু মুখুজ্যেকে গিয়ে বলুন আটঘরা পঞ্চায়েত মিলেনিয়াম ট্রফি ডোনেট করবে রুপোর জলুকরা এক হাত উঁচু, রঞ্জি ট্রফির আদলে একটা ট্রফি। শর্ত একটাই, ওতে রাজশেখর সিংহের নাম থাকবে।''

কলাবতী বলল, ''আমি একশো পার্সেন্ট শিয়োর বকদিঘি মানে হরিদাদু তাতে রাজি হবেন না। আটঘরা টেক্কা দিয়ে যাবে এটা উনি কিছুতেই মানবেন না। আমি বলি কী, এই ট্রফি জয়েন্টলি ডোনেট করার প্রস্তাব দিলে হয়তো উনি মেনে নেবেন।''

সত্যশেখর বলল, ''বাবা তুমি কী বলো?''

রাজশেখর শুকনো গলায় বললেন, ''আমি আবার বলব কী। তোরা

নিজেরাই প্রস্তাব দিচ্ছিস, নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছিস। ব্যাপারটা শোভন হয় যদি দুটো গ্রামের মানুষ মিলিতভাবে এই ট্রফি দান করে। কোনও ব্যক্তির নাম এর গায়ে খোদাই করলে খেলাটা তার চরিত্র হারিয়ে ফেলবে। সতু তুই নিজে গিয়ে হরিকে বল, পটলকে দিয়ে বলালে ব্যাপারটার গুরুত্ব কমে যাবে।''

সত্যশেখর সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, ''হরিকাকার কাছে আমি? ওরে ব্বাবা! চিমটি কেটে কেটে এমনভাবে কথা বলবে, তাতে মেজাজ ঠিক রাখাই দায় হয়ে পড়বে।''

''কিচ্ছু দায় হবে না, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'' কলাবতী আশ্বস্ত করল কাকাকে। ''তার আগে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাওয়াই ভাল।''

হ্যান্ডসেটটা রাজশেখরের সামনে টেব্‌লের উপর, কলাবতী রিসিভার তুলে পট পট বোতাম টিপল। বড়দির বাড়ির ফোন নম্বর তার মুখস্থ।

''হ্যালো, কে প্রভাদি? কালুদি বলছি, দিদিমণিকে দাও তো।''

একটু পরেই মলয়ার গলা ভেসে এল কলাবতীর কানে, ''কী ব্যাপার কালু, হঠাৎ ফোন?''

''বড়দি হরিদাদুর সঙ্গে একবার দেখা করব, ওই বাৎসরিক ম্যাচটা সম্পর্কে কথা বলার জন্য। করে ওনার সময় হবে সেটা জানতেই ফোন করলুম।''

''ম্যাচ সম্পর্কে তুমি ওইটুকু মেয়ে কী কথা বলবে, এটা তো বড়দের ব্যাপার। বড় কাউকে কথা বলতে বলো।''

''বড় একজন নিশ্চয় কথা বলবেন কিন্তু হরিদাদুর সঙ্গে কথা বলতে তিনি একদমই স্বস্তিবোধ করেন না তাই আমাকে সঙ্গে থাকতে হবে।''

''বাবার সঙ্গে কথা বলতে হলে তোমার সঙ্গী বড় লোকটির তো রাতে ছাড়া সময় হবে না। কাল রাতেই এসো, আসার আগে একটা ফোন কোরো।''

রিসিভার রেখে কলাবতী বলল, ''কাকা, কাল রাতে। মক্কেলদের তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিয়ো।''

পরদিন রাত আটটায় সত্যশেখর তার সেরেস্তার ঝাঁপ ফেলে দিয়ে ভাইঝিকে বলল, ''কালু চল মুখুজ্যেবাড়িতে। ভাল কথা, সেই আমের আচারের শিশিটা কোথায় রে?''

''ওটা তো দাদুর, দাদুকে দিয়ে দিয়েছি।''

''দ্যাখ তো একটু আছে কি না।''

''কাল দেখেছি সামান্য একটু পড়ে আছে। হঠাৎ এখন আচার খাওয়ার ইচ্ছে হল যে?''

"সেদিন খেয়ে যে ঝালটা লাগল তাতে রক্ত টগবগিয়ে উঠে মাথাটা এমন গরম করে দিল যে, মনে হচ্ছিল আমি একটা বুলডোজার, সামনে যা পড়বে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দোব। তারপরই তো বাবুর বলগুলো পার্কের বাইরে ফেলতে লাগলুম। এখন হরিকাকার সামনে বুলডোজার হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। দ্যাখ না শিশিটা।—"

"না না একদম বুলডোজার হবে না।"

কলাবতী আঁতকে উঠে বলল, "তুমি কি সিক্সার মারতে যাচ্ছ? তুমি যাচ্ছ হরিদাদুকে বুঝিয়ে মিলেনিয়াম নামে একটা ট্রফি চালু করার জন্য। দাঁড়াও, রওনা হওয়ার আগে একটা ফোন করার কথা আছে।"

"গাড়ি বার করছি, তাড়াতাড়ি আয়।" বলে সত্যশেখর নীচে নেমে গেল।

কলাবতী ফোন করল, ওধারে মলয়া। "বড়দি, আমরা এবার বেরোচ্ছি। ...দেরি হল? সে তো কাকার জন্য, মক্কেলদের সঙ্গে বসলে সময়জ্ঞান থাকে না। তারপর বায়না ধরল তোমার সেই আমের আচারটা খাবে... অ্যাঁ? কী করে আচারের কথা জানল? আমার হাতে শিশিটা দেখে কেড়ে নিয়ে একটুকরো মুখে দেয়, ভীষণ ভাল লেগেছে, তারপর অবশ্য শিশিটা দাদুর কাছে চালান করে দিই। বড়দি কাকা হর্ন দিচ্ছে, রাখছি।"

গাড়িতে যেতে যেতে সত্যশেখর গম্ভীরস্বরে বলল, "কালু, একটা কথা বলে রাখছি। যখন দেখবি আমি রেগে উঠছি তখন আমার হাতে চিমটি কাটবি কিংবা পা দিয়ে আমার পায়ে একটা ঠোক্কর দিবি। যখন দেখবি কথা বলতে বলতে আমি ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছি তখন হ্যাঁচ্চো করে হাঁচবি। আর একটা কথা, নিশ্চয় খেতেটেতে দেবে। দিলে ওদের সম্মান রাখতে একটুখানি খাবি।"

কলাবতী বলল, "একটুখানিটা কীরকম? পাখির আহার?"

"হ্যাঁ, ধর, চারটে সন্দেশ দিল, খাবি একটা।"

"সন্দেশ না দিয়ে যদি বাড়ির তৈরি ফিশফ্রাই দেয়? বড়দি দারুণ করে।"

"যদি খুব বড় সাইজের দেয় তা হলে বলবি, না না এতবড় খেতে পারব না। বলে প্লেটটা সরিয়ে রাখবি। ছোট হলে নিশ্চয় দুটো দেবে, খাবি একটা। মিষ্টি দেবেই, ওই যা বললুম একটা সন্দেশ কিংবা একটা রসগোল্লা। বুঝিয়ে দিবি আমরা খেতে আসিনি, একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এসেছি।"

"তুমিও কি প্লেট সরিয়ে রাখবে?"

"আমি?" সত্যশেখর মুখুজ্যেবাড়ির গেট দিয়ে গাড়ি ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, "আমিও তাই করব।"

শর্ত প্রত্যাহারে সিংহের আহার

বৈঠকখানায় সোফায় হেলান দিয়ে কাচের নিচু টেব্‌লে পা ছড়িয়ে হরিশঙ্কর টিভি দেখছিলেন। টেব্‌লের ওধারে আর একটা সোফা। দু'-তিনটি গদি মোড়া চেয়ার বড় ঘরটায় ছড়ানো রয়েছে। মেঝের অর্ধেকটা কার্পেটে ঢাকা। ওদের দু'জনকে ঢুকতে দেখে রিমোট কন্ট্রোলে টিভি বন্ধ করে দিয়ে পা নামিয়ে হরিশঙ্কর উদারস্বরে বললেন, "এসো এসো, কী সৌভাগ্য আমার। বোসো বোসো ওই সোফাটায় বোসো। দুটো সিংহ বাড়িতে ঢুকেছে একা তো সামলাতে পারব না, দাঁড়াও মলুকে ডাকি।" এই বলে তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন। তখনই মলয়া ঘরে ঢুকল। তার পিছনে প্রভা। প্রভার হাতে ট্রে। তাতে দু'টো কাচের গ্লাস।

টেব্‌লে ট্রে রাখল প্রভা। হালকা ঘোলাটে রঙের পানীয়। মলয়া গ্লাস দুটো দু'জনের সামনে রেখে কলাবতীকে বলল, "জলজিরা, খেয়ে নাও। বাড়িতেই তৈরি করা।" তারপর সত্যশেখরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও কী, চুপ করে বসে আছ যে? গ্লাসটা তোলো।"

সত্যশেখর আড়চোখে দেখল ভাইঝি গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়েছে। সে গলাখাঁকরি দিল। কলাবতী হাত টেনে নিল। মলয়া লক্ষ করে যাচ্ছিল, এবার সে গলা থেকে বড়দিকে বার করে বলল, "খেয়ে নাও কালু, দেরি কোরো না।" তারপর সত্যশেখরকে বলল, "তুমিও।"

দু'জনেই গ্লাস তুলে নিল। চুমুক দেওয়ার আগে সত্যশেখর বলল, "হরিকাকার গ্লাস কই?"

হরিশঙ্কর ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আমি সন্ধেবেলাতেই একগ্লাস খেয়েছি, ও-ই যথেষ্ট। বুঝলে, দারুণ খিদে হয়। জিরেভাজা, পুদিনা কাঁচালঙ্কাবাটা লেবুর রস, সন্ধব নুন এইসব দিয়ে যা টক ঝাল নোনতা একটা জিনিস তৈরি হয় না, কী বলব। বড্ড দেরি করে তোমরা এলে।"

দু'চুমুকে ওরা দু'জন গ্লাস শেষ করে টেব্‌লে রাখল। দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মলয়া। বুঝল ভাল লেগেছে, "আর এক গ্লাস করে হয়ে যাক।"

মলয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কলাবতী ফিসফিস করে বলল, ''কাকা, খাব?''

''হুঁ।'' সত্যশেখর চাপাস্বরে বলল।

''তারপর সতু, ম্যাচটা সম্পর্কে কী যেন বলবে শুনলুম মলুর কাছে। রাজু তো আমাকে চ্যালেঞ্জ দিল এবার আটঘরার জিত কেউ ঠেকাতে পারবে না। তুমি আবার নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ ট্যালেঞ্জ দেবে নাকি!'' হরিশঙ্কর সোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে বললেন।

''না হরিকাকা, আপনাকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার মতো ক্ষমতা বা স্পর্ধা আমার নেই।'' বিনীত ও মৃদুস্বরে সত্যশেখর বলল, ''আমি এসেছি একটা প্রস্তাব নিয়ে।''

সত্যশেখরের কথা শুনে হরিশঙ্কর সিধে হয়ে বসলেন আর মলয়া বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

''পৃথিবীর বয়স তো টু মিলেনিয়াম মানে দু'হাজার বছর হল। একটা হাজার বছর পূর্তি দেখা তো মানুষের জীবনে চট করে ঘটে না। এটা একটা বিশেষ ব্যাপার আমাদের মানে আটঘরা আর বকদিঘির জীবনে। তাই বলছিলুম—''

সত্যশেখরকে হাত তুলে থামিয়ে মলয়া বলল, ''সতু তুমি কি নিশ্চিত পৃথিবীর বয়স দু'হাজার বছর? আমি তো জানি জিয়োলজিস্টরা পাথর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন প্রায় চারশো ষাট কোটি বছর। তুমি বোধহয় খ্রিস্টাব্দের কথা বলতে চাও।''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, খ্রিস্টাব্দ। মলু ঠিক বলেছে।'' সত্যশেখর এই ডিসেম্বরে ঘেমে উঠে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছল।

''ঠিক আছে, মিলেনিয়াম তো বুঝলুম। এর সঙ্গে আটঘরা-বকদিঘির কী সম্পর্ক?'' হরিশঙ্করের গলায় কৌতুক ফুটে উঠল।

''সম্পর্ক মানে, পৃথিবীর জীবনে এতবড় একটা ব্যাপার ঘটল, আমরা এটাকে স্মরণীয় করে রাখতে কিছু একটা তো করতে পারি?''

''যেমন?'' হরিশঙ্কর ভ্রূ কোঁচকালেন।

''যেমন আমাদের বাৎসরিক ম্যাচটার নাম দিতে পারি মিলেনিয়াম ম্যাচ।'' বলেই সত্যশেখর ঝুঁকে পড়ল হরিশঙ্করের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য।

''চমৎকার নাম।'' হরিশঙ্কর কিছু বলার আগে মলয়া তার মত জানিয়ে দিল, উৎফুল্ল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সত্যশেখর তাকাল মলয়ার দিকে। একটু আগে

মলয়া পৃথিবীর বয়স নিয়ে তাকে অপ্রতিভ করায় যে লজ্জায় পড়েছিল সেটা থেকে যেন উদ্ধার পেল।

"একটা নাম দেবে? বেশ তো, দাও। এতে আমার কোনও আপত্তি নেই। এটা কার মাথা থেকে বেরোল, তোমার?"

প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্য মলয়া বলে উঠল, "তোমরা আসবে বলে জলখাবার তৈরি করেছি। যাই, প্রভাকে বলি লুচি ভাজতে।"

মলয়া ঘর থেকে বেরোতেই কাকা-ভাইঝি দৃষ্টি বিনিময় করল।

"নামটা পট—" সত্যশেখর পটল শব্দটা সম্পূর্ণ করার আগেই কোমরে কলাবতীর চিমটি পেয়ে চমকে উঠে চুপ করে গেল।

"কী ব্যাপার, পট বলে থেমে গেলে যে?" হরিশঙ্কর অবাক হয়ে বললেন।

কলাবতী বলল, "কাল রাতে খাওয়ার সময় কাকার মাথায় পট করে নামটা এসে গেল, সেটাই বলতে যাচ্ছিল। দাদু, আমারও একটা প্রস্তাব আছে।"

"ওরে বাবা, তোমারও একটা আছে? বলে ফেলো।"

"বছর বছর ম্যাচ তো হয়, কিন্তু উইনিং টিম তো কিছু পায় না। এবার থেকে উইনাররা একটা ট্রফি পাবে। তার নাম হবে মিলেনিয়াম ট্রফি।" কলাবতী প্রস্তাব দিয়ে উজ্জ্বল চোখে তাকাল।

"এটা কার মাথা থেকে বেরোল, রাজুর? ওর তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। এখন এইসব নিয়ে মাথা ঘামায়। ট্রফিটা দেখতে কেমন হবে, কত বড় হবে, কী দিয়ে তৈরি হবে, এর দাম দেবে কে, এসব নিশ্চয় ভেবে ফেলেছে। শুধু একটা শর্তে আমি রাজি হব আর ট্রফি তৈরির পুরো খরচও দেব, যদি ট্রফির গায়ে খোদাই করা থাকে 'বকদিঘির হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত' এই ক'টি কথা।"

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল প্রভা। দু'হাতে দুটি ঝকঝকে কাঁসার বগি থালা। থালা দুটি সে টেব্‌লে দু'জনের সামনে রাখল। থালায় বড় একটা বাটিতে ফুলকপি আলু কড়াইশুঁটি আর টমাটোর মাঝখানে বিরাজ করছে একটা বৃহৎ গলদা চিংড়ি। বাটির পাশে চাকা করে কাটা বেগুনভাজা। প্রভার পিছনে এসেছে মলয়া। তার হাতে বড় একটা স্টিলের গামলায় পাউডার পাফ-এর মতো ফুলকো লুচির স্তূপ। মলয়া বাটিটা থালা থেকে নামিয়ে টেব্‌লে রেখে সত্যশেখরের থালায় সাজিয়ে রাখল দশটি লুচি আর কলাবতীর থালায় চারটি।

পুরো আয়োজনটা ওরা দু'জন নির্বাক হয়ে বিস্ফারিত চোখে শুধু দেখে যাচ্ছিল। মলয়া নির্বিকার নিশ্চিত গলায় বলল, "নাও, শুরু করো। ভেতরে গিয়ে বেসিনে হাত ধুয়ে এসো।"

"বড়দি, এসব কী! এর নাম জলখাবার?" কলাবতী রুদ্ধশ্বাসে বলল। আড়চোখে দেখল কাকার নাকের পাটা ফুলে রয়েছে। সত্যশেখর তখন চোখ বন্ধ করে শুঁকছে গরমমশলা আর গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ।

"জলখাবারই তো, সামান্য ক'টা লুচি আর...নাও নাও হাত ধুয়ে এসো।"

হরিশঙ্কর বললেন, "জলজিরা কি আর এমনি এমনি দিয়েছে মলু। এতক্ষণে সতুর পেটে নিশ্চয় অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। মলু প্রভাকে বল, ডজন দুয়েক বেলে রাখতে।"

কলাবতী পা দিয়ে কাকার পায়ের উপর চাপ দিল, অর্থাৎ এখন কী করব?

"মলু, এত খাবার রাতেও আমরা খাই না।" সত্যশেখর গম্ভীর মুখে বলল, "বাড়ি গিয়ে তো আমাদের আবার খেতে হবে। তুমি অর্ধেক তুলে নাও।"

"বাড়ি গিয়ে আজ নাই বা খেলে! আমি জ্যাঠামশাইকে টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি তোমরা আজ রাতে বাড়িতে খাবে না।" বলেই সে দরজার পাশে র‍্যাকের উপর রাখা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল।

সত্যশেখর এবার ভাইঝির পায়ের উপর পা রাখল যার অর্থ ঠিক আছে, মেনে নে। মুখে বিব্রত নিরুপায় ভাব ফুটিয়ে সে বলল, "হরিকাকা, এ তো মহাবিপদে পড়লুম। আজ একমাস হল খাওয়া কমিয়েছি। রাতে দুটো মাত্র রুটি আলুছেঁচকি দিয়ে, আর দেখুন কী সব দিয়েছে। আমাকে বাঁচান।"

"বলো কী, তোমাকে বাঁচাব আমি! তবে কুড়িটা লুচি যদি খেতে পারো তা হলে আমি শর্ত বদলাব।" হরিশঙ্কর মজা করে বললেন।

"বদলাবেন মাত্র! প্রত্যাহার করবেন না?" সত্যশেখর এবার ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "আপনি কী করে ভাবলেন ট্রফিতে শুধু আপনারই নাম থাকবে আর আমরা সেটা মেনে নেব?"

"মেনো না। আমি তো মাথার দিব্যি দিইনি মানতে হবে বলে। ট্রফির কথা তো তোমরাই তুলেছ। তবে তোমরা একতরফা যদি ট্রফি দেওয়ার চেষ্টা করো তা হলে ম্যাচ জিতলেও সেটা আমরা নেব না।" হরিশঙ্কর দৃঢ় স্বরে বললেন।

কলাবতী উসখুস করছিল কিছু বলার জন্য। এবার সে বলল, "আচ্ছা, কারুরই নাম নয় যদি দুটো গ্রামের নাম শুধু লেখা হয়! যেমন আটঘরা ও বকদিঘির বাসিন্দাবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত।"

"কালু, এ কী বাংলা!" টেলিফোন সেরে ফিরে এসেই মলয়া শুনল কলাবতীর বলা শেষ বাক্যটি। "তুমি কি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ো যে বাসিন্দাবৃন্দ বলছ? বাসিন্দাদের দ্বারা বা অধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত বলতে পারতে। তুমি এখনও কিন্তু হাত ধোওনি। এই খারাপ অভ্যাসটা কালু তোমার কাছ থেকে অন্তত আশা করি না।"

ধড়মড় করে প্রথমেই উঠে পড়ল সত্যশেখর। বেসিনের দিকে যেতে যেতে মলয়াকে শুনিয়ে গজগজ করল, "হাত ধুই না তোমায় কে বলল?"

"কে আবার বলবে, বরাবরই দেখেছি নোংরা হাতে খাও।" চাপা গলায় বলেই মলয়া হরিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "শুনলে বাবা কালুর কথা! এই বয়সেই কি ম্যাচুওর্ড ওর চিন্তা, কোনও ব্যক্তির নামে নয়, দুটো গ্রামের লোককে সম্মান দিতে এই ট্রফি। ঠিক বলেছে।"

বড়দির কাছ থেকে এমন প্রশংসা শুনে কলাবতী প্রজাপতির মতো উড়ে ভিতরে গিয়ে বেসিনে কাকার পাশে দাঁড়াল।

"কালু, এটা খুব অন্যায় করলি। কাল রাতে বাবাই খাবার টেবলে বলেছিলেন, ব্যাপারটা শোভন হয় যদি দুটো গ্রামের মানুষ মিলিতভাবে এই ট্রফি দান করে। আর তুই কিনা কথাটা নিজের নামে চালিয়ে মলয়ার প্রশংসা নিলি।" ক্ষুব্ধ স্বরে সত্যশেখর ভাইঝিকে মৃদু ভর্ৎসনা করল।

"কাকা, হরিদাদুকে যদি বলতুম এটা রাজশেখর সিংহের মাথা থেকে বেরিয়েছে, তা হলে কি হরিদাদু প্রস্তাবটা এককথায় বাতিল করে দিতেন না?"

"কোথায় বাতিল করেছেন, এখনও তো এই নিয়ে কথাই বলেননি।"

"বড়দি যে বললেন ঠিক বলেছে।" কলাবতী অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "আর বড়দি ঠিক বললে হরিদাদুর সাধ্যি আছে সেটাকে বেঠিক করার?"

"তা বটে! এখন কুড়িটা লুচি খেয়ে হরিকাকাকে শর্ত বদলাতে রাজি করাতে হবে।"

"জলজিরা কাজ করেনি?" উদ্বিগ্নস্বরে বলল কলাবতী। "আমার তো বেশ খিদে খিদে লাগছে।"

"আমারও লাগছে, দেখি কতটা পারি। গলদা একটাই দিয়েছে না রে?" তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বলল সত্যশেখর।

ওরা ঘরে ফিরে আসতেই হরিশঙ্কর বলে উঠলেন, "সতু, একটা তো ঠিক হয়েই গেল। কালুমার কথা তো ফেলে দিতে পারব না। কিন্তু ট্রফি তৈরির খরচ আমি দোব। তবে এই শর্ত প্রত্যাহার করব কি না সেটা নির্ভর করছে—" তিনি মলয়ার দিকে তাকালেন। "ভাজতে শুরু করেছে?"

"আগে এগুলো শেষ করুক। প্রভা নজর রাখছে।" মলয়া চেয়ারে বসল।

কলাবতী লুচি ছিঁড়ে বেগুনভাজা থেকে খানিকটা নিয়ে মুখে দিল। সত্যশেখর একটা লুচির উপর একটা আস্ত ভাজা রেখে পাটিসাপটার মতো ভাঁজ করে আধখানা মুখে ঢুকিয়ে ছিঁড়ে চিবোতে চিবোতে বাকি আধখানাও ঢুকিয়ে দিল। চারটে বেগুনভাজা ও লুচি সে প্রায় তিন মিনিটে শেষ করল। কলাবতীকে দুটো বেগুনভাজা দেওয়া হয়েছে। সে দুটো লুচি দিয়ে একটা ভাজা খাওয়া শেষ করে বলল, "বড়দি, বেগুনভাজা দিয়ে লুচি খেতে বেশ লাগে।"

"তাই বলে আর কিন্তু পাবে না।" হেডমিস্ট্রেস মলয়া বলল। "ভাজাভুজি বেশি খেলে মোটা হয়ে যাবে।"

"আমারও কিন্তু খুব ভাল লাগে। স্কুল থেকে ফিরে বেগুনভাজা পরোটা না পেলে পেট তো ভরতই না, মনও ভরত না।" হরিশঙ্কর উৎসাহভরে বললেন, "সতু, তোমার কেমন লাগে বেগুনভাজা?"

সত্যশেখর গলদা চিংড়িটা বাটি থেকে থালায় নামিয়ে মুড়োটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে করতে বলল, "একটা কাঁচালঙ্কা পেলে আরও ভাল লাগত।" বলে সে মলয়ার দিকে তাকাল।

"বুঝেছি।" বলেই মলয়া চেয়ার থেকে উঠে ভিতরে চলে গেল। চিংড়ি দিয়ে সত্যশেখর ফুলকপি সহযোগে ছ'টা লুচি শেষ করেছে তখন মলয়া আরও চারটি বেগুনভাজা কড়াই থেকে নামিয়ে এনে ঘরে ঢুকল, সঙ্গে দুটি কড়ে আঙুলের মাপের কাঁচালঙ্কা।

"সতু ভীষণ গরম, একটু ঠান্ডা হতে দাও। ওমা! তোমার পাতে তো লুচি নেই! প্রভা, প্রভা।" ব্যস্ত হয়ে মলয়া ডাকাডাকি শুরু করতেই সঙ্গে সঙ্গে প্রভা গামলা হাতে ঢুকল। তাতে স্তূপাকৃত লুচি।

মলয়া বলল, "ওটা টেব্‌লে রাখো, সতু তুমি লুচি নিজের হাতে তুলে নাও। ক'টা দিয়েছ?"

প্রভা বলল, "তেরোটা। আর ভাজব?"

"নিশ্চয় ভাজবে।" হরিশঙ্কর বললেন, "শুধু সতু নাকি, কালুও তো রয়েছে। সিংহের আহার কি এই ক'টা লুচি দিয়ে সারা হয়?"

গম্ভীর হয়ে গেল সত্যশেখর। লুচির উপর বেগুনভাজা রেখে মুড়ল এবং মুখে তোলার আগে বলল, "ঠিক বলেছেন হরিকাকা, সিংহিরা একটু বেশিই খায়, যদি পরিবেশনটা একটু দরাজ হয়। মলু, চিংড়ি কি একটাই রান্না হয়েছে?"

"সে কী, একটা হবে কেন!" মলয়া ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। সে আর কিছু বলার আগেই প্রভা ঘরে এল হাতে একটা জামবাটি নিয়ে। তাতে আলু-কপির মধ্যে শুয়ে আছে দুটি গলদা।

"হরিকাকা কুড়িটা লুচি খেলে শর্ত বদলাবেন বলেছেন। কুড়িটা যদি খাই তা হলে শর্ত তুলে নিতে হবে, মানে প্রত্যাহার করতে হবে। এই কথা না পেলে আমি আর লুচি ছোঁব না।" বলেই সত্যশেখর থালা থেকে হাত তুলে নিল।

"এ আবার কী কথা!" মলয়া বিপন্ন মুখে বলল, "আমি নিজে বাজারে গিয়ে মাছ কিনেছি, নিজে হাতে রেঁধেছি। আর এখন বলছ খাব না!" বাষ্পরুদ্ধ গলায় কথাগুলো বলে সে করুণ চোখে বাবার দিকে তাকাল।

হরিশঙ্করের মুখ থমথমে হয়ে গেল। "সতু এটা কিন্তু ব্ল্যাকমেলিং। ঠিক আছে, ট্রফির গায়ে আমার নাম থাকবে না আর—।"

কলাবতী বলল, "আর ট্রফি তৈরির খরচটা দুই দাদু ভাগাভাগি করে দেবেন।"

মলয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "দেখলে বাবা কালু কত বুদ্ধিমতী! কী সুন্দর সমাধান করে দিল। সতু এবার কিন্তু ছোঁব না বললে সত্যি সত্যিই থালাবাটি সব তুলে নিয়ে যাব। শুরু করো।" মলয়ার আঙুল বেগুনভাজার দিকে তোলা।

"থালাবাটি তুলে নেওয়ার হুমকিটাও ব্ল্যাকমেইলিং।" বলেই সত্যশেখর বেগুনভাজার লুচিসাপটা মুখে ঢুকিয়ে কাঁচালঙ্কা দাঁতে কাটল।

অতঃপর ঘরের সবাই অবাক চোখে দেখল, গামলার লুচির সঙ্গে বেগুনভাজা কপি আলু কড়াইশুঁটি এবং দুটি গলদার দ্রুত অদৃশ্য হওয়া। প্রভা একটা থালায় আর একপ্রস্থ লুচি এনে গামলায় ঢেলে দিয়ে খেল।

"কাকা, পারবে?" কলাবতী ভীতস্বরে বলল।

সত্যশেখর ভাইঝির দিকে তাকিয়ে বলল, "হরিকাকাকে সিংহের আহার দেখাতে হবে না? তুই হাত চালা।"

"আমি আর খেতে পারব না।" কলাবতী হাত গুটিয়ে নিল।

মলয়া বলল, "সতু, এখনও রান্নাকরা দুটো মাছ আছে। লুচিগুলোর সদ্‌গতি করে দাও।"

"মুখ মেরে দিয়েছে আর মাছ নয়, চিনি দাও। গরম লুচি চিনি দিয়ে খেতে দারুণ লাগে।"

প্রভা তখন মলয়াকে বলল, "দিদিমণি, বকদিঘির নলেন গুড় তো রয়েছে। দাদাবাবু চিনি খাবেন কেন?"

"নলেন গুড়!" সত্যশেখর সোফা থেকে ছয় ইঞ্চি উঠে বসে পড়ল।

কলাবতী বলল, "কাকা আঠারোটা হয়ে গেছে কিন্তু।"

তাই শুনে হরিশঙ্কর দু'হাত তুলে বললেন, "দুটো এখনও বাকি তবু তার আগেই সব শর্ত প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। মেনে নিচ্ছি নাম হবে মিলেনিয়াম ট্রফি, তার গায়ে খোদাই থাকবে বকদিঘি ও আটঘরার, না কি আটঘরা ও বকদিঘির, কাদের গ্রামের নাম আগে থাকবে তাই নিয়ে তো পতু আর পটলের মধ্যে গজকচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যাবে।"

"দাদু, একটা কাজ করলে তো হয়। যুদ্ধ করার বদলে দুই গ্রামের বয়স্কদের সাক্ষী রেখে ওরা টস করে ঠিক করে নিক।"

"খুব ভাল সিদ্ধান্ত।" নলেন গুড়ের বাটিটা টেব্‌লে নামিয়ে রাখার আগেই প্রভার হাত থেকে সত্যশেখর প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিতে নিতে বলল।

"দেখলে বাবা, কী ক্লিয়ার হেডেড মেয়ে কেমন প্রম্পট্ ডিসিশন নিল!" মলয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেই সরু হয়ে গেল, "সতু চুমুক দিয়ে খেয়ো না, লুচি দিয়ে খাও।"

"সব তো ঠিক হয়ে গেল, খরচটা আমি আর রাজু ভাগাভাগি করেই দোব।" হরিশঙ্কর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। "কালকেই পতুকে ফোন করে বলছি পটলের সঙ্গে কথা বলুক।"

মিনিট কুড়ি পর ওরা যখন গাড়িতে উঠছে, মলয়া কলাবতীকে ডেকে চুপিচুপি একটা শিশি তার হাতে দিয়ে বলল, "এটায় ঝাল আরও বেশি।"

কলাবতী চটপট শিশিটা তার জিন্‌সের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। গাড়িতে যেতে যেতে সত্যশেখর বলল, "গুনেছিলিস?"

"আঠাশটা।"

"আরও পারতুম। মুখুজ্যেদের দেখিয়ে দিতুম সিংহের আহার কাকে বলে! আসলে গুড়টা তো বকদিঘি থেকে পাঠিয়েছে। চেয়ে খেলে হরিকাকা রটাবে

আটঘরার লোক চেয়ে চেয়ে বকদিঘির গুড় খেয়েছে। আমাদের খেজুর গাছ অনেক ভাল আটঘরার থেকে।''

''বড়দি দারুণ রান্না করে। ভেবেছিলুম তুমি চিংড়িটা আরও খাবে।''

''না, না, না, সব খেয়ে নিলে মলু আর হরিকাকা খাবে কী? অতবড় চিংড়ি বাড়িতে ক'টা আর রান্না হয়! আমরা তো আর নেমন্তন্ন খেতে যাইনি।''

বাড়ি পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমেই সত্যশেখর বলল, ''কালু, তোর প্যান্টের পকেটে উঁচুমতো ওটা কী রে? শিশি মনে হচ্ছে।''

''বড়দি টোম্যাটোর জেলি করেছেন, খানিকটা খেতে দিলেন। বললেন, মিষ্টিটা বেশি হয়ে গেছে।''

মোহিনী কালীমাতা আটঘরা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি

দিনচারেক পর রাজশেখর টেলিফোন করলেন নন্তুকে। বাৎসরিক ম্যাচের জন্য যে সংগঠক সমিতি হয় নন্তু তার আহ্বায়ক, প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজশেখর, কার্যনির্বাহী সভাপতি পটল হালদার এবং সচিব পরমেশ।

ফোন ধরেই নন্তুর প্রথম কথা, ''জ্যাঠামশাই, এইমাত্র আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলুম। পটলদা মাথা ঘুরে পড়ে গেছে, ডাক্তারবাবু দেখছেন, বলেছেন ভয়ের কিছু নেই। রাতটা রেস্ট পেলে ঠিক হয়ে যাবে, ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।''

রাজশেখর উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, ''হল কী পটলের?''

''টসে হেরে গিয়ে প্রচণ্ড শক পেয়েছেন। 'বকদিঘির নাম আগে থাকবে!' এই বলেই ধড়াস করে পড়ে গেলেন।''

''টসটা হল কোথায়? কে টস করল?''

''আটঘরা-বকদিঘি গ্রামের সীমানায় কালভার্টের ওপর। দুই গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারের সামনে একটা টাকা নিয়ে পটলদা টস করে, পতু মুখুজ্যে ডাকে হেড, আমাদের হেডমাস্টার জমি থেকে টাকা তুলে নিয়ে বললেন 'হেড পড়েছে।' আর শোনামাত্রই কথাটা বলে পটলদার মাথা ঘুরে গেল।

''যাক, ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই, এইটাই রক্ষে! আমাদের প্রিপারেশন কেমন হচ্ছে?''

''দারুণ উৎসাহ জ্যাঠামশাই। একদিন এসে দেখে যান না। আটঘরা স্কুলে

অ্যাকাডেমির নেটে রোজ প্র্যাকটিস চলছে। ডাক্তারবাবু সঙ্গে নিয়ে আসেন ব্র্যাডম্যানের আর্ট অব ক্রিকেট বইটা, নেটের পাশে ওঁর চাকর বইয়ের পাতা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। উনি একটা বল খেলেন আর নেটের ধারে গিয়ে বইয়ের ছবি দেখেন, ছবি দেখে এসে আবার ব্যাট করেন। একদিন আমায় বললেন, 'তোমাকে ব্র্যাডম্যানের অফ ড্রাইভ দেখাব, রোববার বিকেলে এসো। এখন লেট কাটটা ধরেছি, দিন তিনেক লাগবে, খুবই রিস্কি ডেলিকেট শট। পৃথিবীতে এখন তিন-চারজন মাত্র কনফিডেন্টলি লেটকাট করতে পারে। আমি জানতে চাইলুম সেই তিন-চারজন কে? উনি বললেন, সচিন, শ্রীনাথ, লারা। জ্যাঠামশাই রোববার আসুন না, লেটকাটের সঙ্গে অ্যাকাডেমির ছেলেদেরও দেখবেন।''

''পারি তো যাব।'' রাজশেখর ফোন রাখলেন। রাতে খাওয়ার টেব্‌লে তিনি পটলের টস করার ও মাথা ঘুরে পড়ার কথা বললেন। সত্যশেখর বলল, ''স্ট্রোক হয়নি এই যা রক্ষে।'' কলাবতী বলল, ''মিলেনিয়াম ম্যাচে আটঘরা যদি হেরে যায় তা হলে অবধারিত স্ট্রোক হবে। কাকা, পটল হালদারকে বাঁচাতে ম্যাচটা আমাদের জিততেই হবে। তুমি ফিটনেসটা বাড়াও।''

রাজশেখর বললেন, ''অপুর মা'র কী হল বল তো? দশদিন আগে ফোন করে বলল, অপুর পায়ের প্লাস্টার দু'দিন আগে কাটা হয়েছে। ছেলে চলাফেরা করতে শুরু করলেই ফিরে আসবে। প্লাস্টার নিশ্চয় কাটা হয়েছে, চলাফেরায় অসুবিধে হচ্ছে কি না কে জানে।'' চিন্তিত মুখে তিনি রুটি ছিঁড়ে বাঁধাকপির তরকারি দিয়ে আবার খাওয়া শুরু করলেন।

সত্যশেখর বলল, ''মনে হচ্ছে চলাফেরায় অপুর হয়তো অসুবিধে হচ্ছে, হয়তো হাড় ঠিকমতো জোড়েনি। ভুবন ডাক্তার জুড়েছে তো।''

ভুবন ডাক্তারের কথায় রাজশেখরের মনে পড়ল স্কুলে অ্যাকাডেমির নেটের কথা। নন্তু বলল, রোববার আসুন না। তিনি একচুমুক জল খেয়ে বললেন, ''সতু রোববার চল একবার আটঘরায় যাই। ওখানে কীরকম তোড়জোড় করে প্র্যাকটিস হচ্ছে সেটা দেখা হবে, পটলের সঙ্গেও দেখা করে শরীরের খবর নেওয়া যাবে আর অপুর মা ফিরতে দেরি করছে কেন সেটাও জেনে নেওয়া যাবে।''

কলাবতী বলল, ''রান্নাঘর শকুন্তলাদির হাতে ছেড়ে দিয়ে পিসি এতদিন যখন বাড়িতে রয়েছে তা হলে নিশ্চয় সিরিয়াস কিছু হয়েছে। কাকা, রোববার তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে রওনা হলে দুপুরেই পৌঁছে যাব।''

ওরা আটঘরায় পৌঁছোল দুপুর দেড়টা নাগাদ। প্রথমে গেল নিজেদের বাড়িতে। বাৎসরিক ম্যাচে কলকাতা থেকে বড়কত্তা তাঁর ছেলে আর নাতনি আসবে এই খবর আগেই জেনেছিল সিংহিদের বাড়ি ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক শচিন হালদার। ওরা যখন গাড়ি থেকে নামল শচিন তখন মালি ও চাকরকে দিয়ে বাগানের ঝোপঝাড় উপড়ে ফেলার কাজ তদারক করছিল। সে ছুটে গেল গাড়ির দিকে। রাজশেখরকে প্রণাম করে বলল, "কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে এলেন, স্নান খাওয়ার ব্যবস্থা করি। ওপরের শোয়ার ঘর গোছগাছ করে রাখা আছে।"

"কিছু দরকার নেই।" রাজশেখর হাত তুলে বললেন, "বাড়িতে ঢুকবও না, খেয়ে এসেছি এখন কিছু খাব না। আমরা দু'-একটা জায়গা ঘুরে কলকাতায় ফিরে যাব। তুমি গাড়িতে ওঠো, পটলের বাড়িটা দেখিয়ে দাও।"

কলাবতী আর সত্যশেখর দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে। কলাবতী বলল, "এতবড় বাড়ি, এত গাছ! কী শান্ত জায়গাটা! পাখি ডাকছে শুনতে পাচ্ছ কাকা?"

"ঘুঘুপাখি ডাকছে। কলকাতায় আমাদের বাড়ির বাগানে ছোটবেলায় বুলবুলি ঘুঘু আসত। এখন কাক শালিক চড়াই ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।" সত্যশেখরের স্বরে বিষাদের ছোঁয়া লেগে।

রাজশেখর ডাকলেন, "সতু, কালু আয়, আগে পটলকে দেখে আসি।"

কলাবতী বলল, "দাদু, তোমরা যাও, আমি এখন পিসির বাড়ি যাব। সেখান থেকে স্কুলে অ্যাকাডেমির নেটে চলে যাব।"

আটঘরার ভূগোল কলাবতীর জানা। সে হাঁটতে শুরু করল। সিংহিবাড়ির গা ঘেঁষে সরু গলি দিয়ে বেরিয়ে সে কয়েকটা একতলা পাকাবাড়ি, ফণিমনসা আর আশশ্যাওড়া গাছে ভরা ছোট একটা পোড়ো জমি পেরিয়ে বিশাল অশ্বত্থ গাছের গুঁড়ির পাশে বিসর্জন দেওয়া রং ধুয়ে যাওয়া দুটি শীতলা মূর্তির সামনে দাঁড়াল। শীতলা গাধার পিঠে বসে। জন্তুজানোয়ার পাখি আমাদের দেবদেবীর বাহন কেন যে হল এটা তার কাছে হেঁয়ালির মতো লাগে। যমের বাহন মহিষ, শিবের ষাঁড়, গণেশের ইঁদুর, নিশ্চয় এর কারণ আছে। দাদুর কাছে জেনে নিতে হবে। আবার সে হাঁটতে শুরু করল, লালচে পানায় ঢাকা পুকুরের পাশ দিয়ে পথটা ঢালু হয়ে নেমে বেগুনখেতের ধার ঘেঁষে ঢুকেছে ময়রাপাড়ায়। পাঁচ-ছ'টা কলাগাছ গোছা হয়ে প্রথম মাটির বাড়ির বেড়ার ধারে, আর একটু এগিয়ে ছোট একটা বাঁশঝাড় তার পাশ দিয়ে ভিতরদিকে

ঢুকে গেছে একটা পথ। পথের শেষে অপুর মা'র ঘর। তার দু'পাশে ওর দাদাদের ঘর। ঘরগুলোর মাঝে মাটির উঠোন, উঠোনে দাঁড়িয়ে কলাবতী ডাকল, "পিসি ... পিসি।"

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। হাতচারেক লম্বা সরু একটা বাঁশ দু'হাতে ধরে লাফ দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল তারই বয়সি কালোরঙের ছিপছিপে একটি ছেলে। বাঁ পায়ের গোছে ব্যান্ডেজ এবং চোখে বিস্ময়। কলাবতী একে আগে দেখেছে, বলল, "অপু, তোমার মা কোথায়?"

"ঘরে শুয়ে, ম্যালেরিয়া হয়েছে, আজ নিয়ে পাঁচদিন।"

কলাবতী লাফিয়ে দাওয়ায় উঠে জুতো খুলে ঘরে ঢুকল। তক্তপোশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে অপুর মা। বিছানায় বসে ঝুঁকে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কলাবতী বলল, "পিসি, আমি কালু।"

অপুর মা সাড়া দিল না। কলাবতী এবার গলা চড়িয়ে বলল, "তোমার কালুদিদি।"

কলাবতীর কথা যেন অসুস্থ মাথার মধ্যে একটু একটু করে ঢুকছে। সামান্য নড়ে উঠল অপুর মা'র দশাসই দেহটা। তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল, "কে কালুদিদি, তুমি এখানে!"

দু'হাতে অপুর মাকে জড়িয়ে ধরে কলাবতী বলল, "আমাদের ফেলে রেখে এসেছ একমাসের ওপর, বেঁচে আছি কি না সে খোঁজটাও নাও না।"

"বালাই ষাট। এই তো ম্যালোরি ধরার আগে পরমেশ ঘোষের বাড়ি থেকে কত্তাবাবাকে ফোন করলুম। শকুন্তলা ঠিকঠাক রাঁধছে কি না, ছোটকত্তা পেটভরে খাচ্ছে কি না খোঁজ নিলুম। তুমি ইস্কুলে টিপিন নিয়ে রোজ যাচ্ছ কি না তাও জিজ্ঞেস করলুম। তারপরই কম্প দিয়ে জ্বর এল।"

"জ্বর এখন কত? ডাক্তার দেখাচ্ছ?" কলাবতী অপুর মা'র কপালে আঙুল রেখে তাপ বোঝার চেষ্টা করে বলল, "জ্বর তো বেশি নয় দেখছি।"

অপু বলল, "সকালে দেখেছি একশো ছিল।"

"কাকে দেখিয়েছ, ভুবন ডাক্তার?"

"হ্যাঁ। উনি ম্যালেরিয়া আর পেটের রোগের চিকিৎসায় ধন্বন্তরি।"

অপু বলল, "ওনার ডাক্তারখানায় দূর দূর থেকে আসা রুগির ভিড় লেগেই আছে। ওনার ওষুধ খেয়েই তো মা'র জ্বর পরশু একশো তিন থেকে একশোয় নেমে আসে। তারপর অবশ্য আর নামেনি।"

"তোমার পা কি উনি সেট করেছেন?"

"না, না, ভুবন ডাক্তার হাড়গোড়ের কিচ্ছু জানে না।" অপুর মা'র শ্রান্ত মন ও শরীর হঠাৎই যেন তেজ ফিরে পেল। "বকদিঘির ছোকরা ডাক্তার অমল বিশ্বাসের কাছে নিয়ে যাই সাইকেল রিশকা করে। তিনি পায়ের ছবি তোলাতে বললেন, সেই তারকেশ্বরে নিয়ে গিয়ে ছবি তোলালুম। হ্যাঁরে অপু, কী যেন ছবির নাম?"

"এক্স-রে।" অপু বলল।

"তাই দেখে উনি বললেন, ভালই চিড় ধরে গেছে, বিছানায় দু'হপ্তা শুয়ে থাকো, হাঁটাচলা করতে হলে হাঁটবে খুব কম। এই বলে তো পেলাসটার করে দিলেন।" অপুর মা নিজের অসুখের কথা ভুলে অপুর কথা বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করল, "গাড়িতে এসেছ? কত্তাবাবা আর ছোটকত্তা কোথায়?"

"ওরা পটল হালদারের বাড়ি গেছে। তারপর স্কুলে যাবে। সেখানে প্র্যাকটিস হচ্ছে। আর ক'দিন পরেই তো এখানে বকদিঘির সঙ্গে আমাদের খেলা। তার আগেই কিন্তু তোমাকে অসুখ থেকে সেরে উঠতে হবে। মাঠে গিয়ে খেলা দেখবে তারপর আমাদের সঙ্গেই গাড়ি করে কলকাতায় যাবে। ততদিনে অপু নিশ্চয় হাঁটাহাঁটি করতে পারবে, তাই না অপু?" কলাবতী তার সাজানো দাঁতের ঝলসানি দিয়ে হাসল। পালটা হেসে অপু মাথা নাড়ল।

অপুর মা হতাশ স্বরে বলল, "তুমি কতদিন পরে এলে অথচ ঘরে খেতে দেওয়ার মতো কিছু নেই।"

"পিসি, আমারও তো উচিত ছিল হাতে করে কিছু আনা। তুমি খাচ্ছ কী?"

"আর খাওয়া, ভুবন ডাক্তার বলেছিল বিস্কুট আর বার্লি খেতে। খেতে পারলুম না। মুখে অরুচি।"

"আমি উঠি পিসি, দাদু আর কাকা অপেক্ষা করবেন। খেলার দিন মাঠে আবার তা হলে দেখা হচ্ছে। ওষুধ ঠিকমতো খেয়ো। তুমি তৈরি থেকো, কলকাতায় ওইদিনই নিয়ে যাব। শকুন্তলাদি রান্নাঘরটার যা অবস্থা করে রেখেছে।" বলে কলাবতী মনে মনে হাসল।

অপুর মা বিরক্ত স্বরে বলল, "আনাজের খোসা মাছের আঁশ মেঝেয় ছড়িয়ে রাখে তো? ফিজ খুলে ফিজের দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায় আমি জানি। রান্নাঘর দু'বেলা কান্তির মাকে দিয়ে মোছায় না সেটাও আমি এখান থেকে টের পাই।" অপুর মা তার রান্নাঘরের দুর্দশার কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে

পড়ল। তারপরই মনে পড়ল কথাটা, "কত্তাবাবাকে বোলো আমি অপুর মাথায় তারকনাথকে পুজো দেওয়া ফুল ছুঁইয়েছি, চন্নমেত্তর খাওয়াইনি। মনে করে বোলো কিন্তু।"

এখন অপুর মাকে দেখে কলাবতী একশো ডিগ্রি ম্যালেরিয়া জ্বরের চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাচ্ছে না। ঘর থেকে সে বেরিয়ে আসছে, অপু তার সঙ্গ নিল। ওর বাঁশ আঁকড়ে লাফিয়ে চলা দেখে কলাবতী বারণ করল। "তোমাকে আর সঙ্গে আসতে হবে না। পা-টাকে রেস্ট দাও।" বলেই সে অপুকে রেখে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল।

আটঘরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মূল ফটকের পাশে সীমানা পাঁচিলে এক হাত চওড়া ও দু'হাত লম্বা টিনের হলুদ বোর্ড সাঁটা। তাতে সবুজ অক্ষরে লেখা "মোহিনী কালীমাতা আটঘরা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।" তার তলায় লেখা "প্রতি শনি ও রবি। সকাল ও বৈকাল। অনুসন্ধান: বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভানু ঘোষাল।"

কলাবতী পৌঁছে দেখল একটি নেট খাটানো রয়েছে। জনা আষ্টেক ছেলে আর দু'-তিনজন বয়স্ক লোক নেটের আশেপাশে। ব্যাট করছে একটি ছেলে, বল করছে তিনজন। তাদের একজনকে সে চিনল, চণ্ডী কম্পাউন্ডার। দু'বছর আগে কলাবতী এই ম্যাচ খেলতে এসে এদের অনেককেই দেখেছে। যেমন সে এখন চিনতে পারল বকু বোস আর রাজশেখরের পাশের চেয়ারে বসা ভুবন ডাক্তারকে। বোলিং ক্রিজে একটা স্ট্যাম্পের পিছনে দাঁড়িয়ে বেঁটেখাটো সাদা ট্রাউজার্স আর সবুজ টি শার্ট পরা যে লোকটি প্রতিটি ডেলিভারির পর হাত নেড়ে ব্যাটসম্যানকে কিছু বলছে আর কাল্পনিক একটা ব্যাট দিয়ে খেলে দেখাচ্ছে, কলাবতী অনুমান করল ইনিই কোচ ভানু ঘোষাল।

রাজশেখরের চেয়ারের পিছনে গিয়ে কলাবতী নিচু স্বরে বলল, "পিসির ম্যালোরি হয়েছে, এখন ভাল আছে, সেরে উঠছে।"

"ডাক্তারবাবু একে চেনেন কি? আমার নাতনি কালু, কলাবতী। সালোয়ার-কামিজ পরা, ছেলেদের মতো করে কাটা চুল, কাঁধের থেকে চামড়ার ব্যাগ ঝোলানো, টিকলো নাক শ্যামবর্ণ কিশোরীকে দেখিয়ে রাজশেখর হাসলেন। ভুবন ডাক্তার চোখ-মুখ কুঁচকে স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল।

"আগে দেখেছি কি?"

"দেখেছেন, তবে অন্যভাবে। যে ম্যাচটায় সতু সেঞ্চুরি করল সেই ম্যাচটার উইনিং স্ট্রোক দিয়েছিল কালু।"

"সে তো গোপি ঘোষের ছেলে!" ভুবন ডাক্তার হাঁ করে কলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কলাবতী তাড়াতাড়ি বলল, "ডাক্তারবাবু, আপনার হাতের বইটা কীসের?"

"ক্রিকেটের বাইবেল, গত বছর কিনেছি। স্যার ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যানের—নাম শুনেছ তো?"

"না তো!" কলাবতী আকাশ থেকে যেন পড়ল।

ডাক্তার গদগদ কণ্ঠে বলল, "বিরাট ব্যাটসম্যান, বিরাট বিরাট, বলে বোঝাতে পারব না। হাজার হাজার রান করেছেন। এঁর লেখা এই বই, ক্রিকেট শেখার বই, এই বই পড়ে গাওস্কর, তেন্ডুলকর, সৌরভ, রাহুল সবাই ব্যাট করা শিখেছে।"

"আপনিও শিখেছেন!" কলাবতী উৎসাহিত হয়ে বলল।

"নিশ্চয়। অফ ড্রাইভ অন ড্রাইভ কভার ড্রাইভ সব এই বই থেকে শিখেছি। লেট কাটটা বড় ভোগাচ্ছে, ঠিক কবজা করতে পারছি না।" বিব্রত স্বরে বলল ভুবন ডাক্তার।

"ডাক্তারবাবু ব্র্যাডম্যানের অফ ড্রাইভ দেখাবেন বলেছিলেন, সেটা দেখান না।" নন্তু বলল, কখন যে সে চুপচাপ এসে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল কেউ তা লক্ষ করেনি।

"তোমাকে দেখাব বলেছিলুম না? ছেলেটার ব্যাট করা হোক।" নেটে ব্যাট করছিল একটি ছেলে, ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলার তালিম নিচ্ছে। ভানু ঘোষাল এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে ব্যাট নিয়ে নিজে ফরওয়ার্ড খেলে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "বলের পিচের কাছে সামনের পা নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটটা এইভাবে নামাবি, চোখ সবসময় বলের দিকে, মাথাটা নাড়ানাড়ি যেন না হয়। আবার খেল।"

ভুবন ডাক্তারের চেয়ারের পাশে জমিতে একটা আড়াই হাত লম্বা ক্যানভাসের ব্যাগ পড়ে ছিল। একটু দূরে ধুতি-শার্ট পরা শীর্ণ একটা লোককে "ছিরু" বলে ডেকে হাতের বই চেয়ারে রেখে ডাক্তার আঙুল দিয়ে ব্যাগটা দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ছিরু ব্যাগটা তুলে নিয়ে অনুসরণ করল তার মনিবের। দু'জনে ঢুকে গেল স্কুলের একতলার ঘরে। এটাই অ্যাকাডেমির ড্রেসিংরুম।

কলাবতী বলল, "দাদু, কাকাকে দেখছি না যে?"

"আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বলল, আসছি। বলেই শচিনকে সঙ্গে

নিয়ে গাড়ি চালিয়ে কোথায় যে গেল!" রাজশেখর বিভ্রান্ত মুখে নাতনির দিকে তাকালেন।

নন্তু বলল, "জ্যাঠামশাই, ছেলেদের উৎসাহটা দেখছেন। ওই যে ঢ্যাঙা ফরসা ছেলেটা রত্নাকর, রতু, ওকে টিমে নিয়েছি। ওয়ান ডাউন ব্যাট, আর বলটাও ভাল করে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্য, ভাল ব্যাট। দু'জনেই ভাল ফিল্ড করে। আরও দু'জন নেব, তবে সেটা ভানুবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব। আপনি রতুর ব্যাট দেখবেন?"

"থাক এখন, তোমরা যখন বেছে নিয়েছ তখন নিশ্চয়ই ভাল। পুরনো লোকেরা কে কীরকম ফর্মে রয়েছে সেটা দেখব বলেই এসেছি। আমাদের উইকেটকিপার তো বকু বোস, তাকে তো দেখছি না, চণ্ডী তো রয়েছে দেখছি, ওকে একটু বলটা করতে বলো। থানার মেজবাবুও তো নেই।"

"বকুদা ডাইভ দিয়ে কাল একটা ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছে। আজ সকালে দেখলুম সেঁক দিচ্ছে। বড়বাবু চুঁচড়োয় গেছেন, এস পি ডেকে পাঠিয়েছেন। থানা ফেলে রেখে মেজবাবু আসতে পারছেন না। কালও এসেছিলেন, কিছুক্ষণ বলও করলেন।"

রাজশেখর জানতে চাইলেন, "কেমন বল করে? তুমি তো বলেছিলে লেগস্পিনার।"

ঢোক গিলল নন্তু। এধার-ওধার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে এনে বলল, "অনিল কুম্বলের বল ওর থেকে বেশি ঘোরে।"

"তাতে কী হয়েছে। বলটা ঠিক জায়গায় রাখতে পারে তো?"

"যে ক'টা বল করলেন তার অর্ধেক পিচের মাঝখানে পড়ল। রতু সবক'টা পুল করল। বাকি অর্ধেক ফুলটস।"

রাজশেখর মাছি তাড়াবার মতো করে হাতটা নেড়ে বললেন, "বাদ দিয়ে দাও।"

নন্তু সিঁটিয়ে গিয়ে বললে, "মেজবাবুকে? বড়বাবু হলে নয় কিছু একটা বলে বাদ দেওয়া যেত, মেজ সেজবাবুদের বাদ দেওয়া যায় না, উনি বরং থাকুন। ধরে নিন আমরা দশজনে খেলছি। বকদিঘির টিমেও তো মেজবাবুর মতো প্লেয়ার থাকবে।"

"খবর নিয়েছ?"

"নিয়েছি। বকদিঘি স্কুলের হেডমাস্টারের ছেলে রাহুল, লেখাপড়ায় খুব ভাল। মাধ্যমিকে উনচল্লিশ প্লেস পেয়েছিল, চশমার পাওয়ার মাইনাস

নাইন, প্রায় অন্ধ। স্টেশনারি দোকানের অরুণাভ মিডিয়াম পেসার, পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট, জুতো পরলে ব্যথা লাগে। খেলবে বলে সেটা চেপে রয়েছে। গদাই জানা ওর সঙ্গে পতু মুখুজ্যের ঝগড়া একটা নালা কাটা নিয়ে। গদাই ওদের একমাত্র উইকেটকিপার। ওকে তাতালে দু'-চারটে ক্যাচ ছেড়ে দেবে।'' নন্তু ফর্দ পড়ার মতো গড়গড়িয়ে বলে যাচ্ছিল। রাজশেখর হাত তুলে থামালেন।

স্কুলের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ভুবন ডাক্তার। কালো ট্রাউজার্স পরে ছিলেন, এখন সেটা সাদা। নীল-কালো ডোরা দেওয়া বুশশার্ট পরে ছিলেন, এখন সেটা সাদা। দু'পায়ে প্যাড, দু'হাতে গ্লাভ্স, হাতে ব্যাট। পাক্কা ক্রিকেটারের মতো দেখাচ্ছে।

চেয়ার থেকে বইটা তুলে রাজশেখরের হাতে দিয়ে ভুবন ডাক্তার বলল, ''শেখার কি কোনও বয়স আছে, চল্লিশ চলছে, দেখুন এখনও শিখে যাচ্ছি। ব্র্যাডম্যানের কভার না অফ কোন ড্রাইভটা দেখবেন? আচ্ছা আগে অফটা দেখুন, খুলুন, অফ ড্রাইভের পাতাটা খুলুন, ব্র্যাডম্যান ড্রাইভ করছে ছবিটা দেখুন আর আমারটা দেখুন, মিলিয়ে নেবেন।''

ভুবন ডাক্তার গম্ভীর মুখে নেটের দিকে এগোল। রাজশেখর হতভম্ব চোখে কলাবতীর দিকে তাকালেন। ঢোক গিলল কলাবতী। নন্তু মিটমিটিয়ে হাসছে। ডাক্তার ভানু ঘোষালের কাছে গিয়ে বলল, ''অফ ড্রাইভ করব।'' তাই শুনে ভানু একটি সাড়ে চার ফুট উচ্চতার ছেলেকে ডেকে তার হাতে বল দিল। নেটে ব্যাট করছিল একটি ছেলে, সে নেট থেকে বেরিয়ে এল। ভুবন ডাক্তার গুড লেংথের কাছে গিয়ে ব্যাট দিয়ে মাটি কয়েকবার ঠুকে ক্রিজে এসে গার্ড নিয়ে ব্যাটটা লেগ স্টাম্পের সামনে ধরে একটা আঙুল তুলে দেখাল ভানুকে। ঝুঁকে গভীর মনোযোগে দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে ভানু আঙুল তুলে বলল, ''ইয়োর লেগ স্টাম্প।''

ভুবন ডাক্তার বলল, ''থ্যাঙ্ক ইউ।''

পুরো ব্যাপারটা দমবন্ধ করে কলাবতী দেখছিল আর মনে মনে ভাবছিল, আটঘরার ডাক্তার এসব শিখল কোত্থেকে। সাড়ে চার ফুটের ছেলেটি ছুটে এসে কোনওক্রমে বল ডেলিভারি করল। বলটা উঁচু হয়ে জমিতে পড়ার আগেই ভুবন ডাক্তার বাঁ পা এক গজ বাড়িয়ে ব্যাট তুলে ড্রাইভের জন্য তৈরি। বলটা পিচের মাঝামাঝি পড়ে তার বুকের কাছে উঠে আসছে দেখে ডাক্তার চাপড়ে বলটা জমিতে ফেলে দিয়ে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ''ভানু, চেঞ্জ বোলার।''

পরের বোলার তার কম্পাউন্ডার চণ্ডী। এবারও ডাক্তার বল ডেলিভারির আগেই এক পা বাড়িয়ে ব্যাট পিছনে তুলে ড্রাইভের জন্য তৈরি। চণ্ডী একটু জোরে বল করে, বল প্রায়শই লেংথে পড়ে এবং উইকেট থেকে উইকেটে সোজা থাকে। তার এই বলটা পিচ পড়ে ডাক্তারের ব্র্যাডম্যানীয় অফ ড্রাইভ করতে যাওয়া ব্যাটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে অফ স্টাম্প ফেলে দিল।

ঠোঁট কামড়ে ভুবন ডাক্তার কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে রাজশেখরের দিকে তাকিয়ে বলল, "লক্ষ করলেন বলটা জমি থেকে তিন ইঞ্চির বেশি উঠল না, স্কিড করে এল। বলটা ছেড়ে না দিলে এল বি ডবলু হয়ে যেতুম।"

রাজশেখর গম্ভীর মুখে বললেন, "তিন ইঞ্চি কি, আমার তো মনে হল দেড় ইঞ্চি উঠেছিল। এরকম বলে ব্র্যাডম্যানও ড্রাইভ করতে পারতেন না, ছেড়ে দিয়ে ঠিক করেছেন।"

অফ স্টাম্পটা ব্যাটের হ্যান্ডেল দিয়ে ঠুকে বসিয়ে ভুবন ডাক্তার আবার স্টান্স নিল। এবার বল করল আর একটি ছেলে। ডেলিভারিটা কিঞ্চিৎ ওভারপিচ। ভুবন ডাক্তার যথারীতি পা বাড়িয়ে দিয়েছিল। বলটা কোথায় পড়ছে, না দেখেই সে সপাটে ব্যাট চালাল। ব্যাটের কানায় লেগে লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে বলটা ডাক্তারের মাথার উপর দিয়ে আট ফুট উঁচু নেট টপকে পিছনদিকে চলে গিয়ে দেওয়ালে খটাস করে লাগল।

"চার, ডাক্তারবাবু এটা নির্ঘাত চার।" কলাবতী হাততালি দিয়ে বলে উঠল।

রাজশেখর বললেন, "অফ ড্রাইভ করে ব্র্যাডম্যানও তো চার রানই পেতেন, আপনিও তাই পেলেন। রান পাওয়ার জন্যই তো ব্যাট করা, আপনি বরং এই ব্যাক ড্রাইভটাই প্র্যাকটিস করুন। এটা অবশ্য এই বইয়ে নেই, তাতে কী হয়েছে। এটা তো নতুন জিনিস, আবিষ্কারও বলতে পারেন।"

খুশিতে ঝলমল করে উঠল ডাক্তারের মুখ, বলল, "বলছেন নতুন জিনিস? এটা তা হলে এবার ম্যাচে ছাড়ব।"

"ছাড়ুন, তবে অল্প করে।" রাজশেখর গম্ভীর মুখে বললেন।

ডিসেম্বর মাসে বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে আসে। সূর্যের আলো ম্লান হয়ে আসছে। নন্তু বলল, "জ্যাঠামশাই, আরও কি দেখবেন?"

"না নন্তু, আর কিছু দেখার নেই। চারটে ছেলেকে তো দেখলুম, খুবই অল্প বয়স, তবে ফিল্ডিংটা উৎসাহ নিয়ে করে, ক্যাচট্যাচও মন্দ ধরল না। আর তো এগারো দিন বাকি রয়েছে, এর মধ্যে কতটুকু আর উন্নতি করবে! পটলকে

বললুম তোমার সভা মিছিল পোস্টার পথ অবরোধ এসব বন্ধ করো। এই ম্যাচটা সংগ্রাম নয়— বাৎসরিক মিলনোৎসব, এই ভেবে তৈরি করো প্রীতির পরিবেশ। শুনে বেচারা কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। তবে দুটো স্তম্ভ গড়ার জেদ কিন্তু ছাড়ল না। একটা সতুর সেঞ্চুরির জন্য, অন্যটা আমাদের তিন পুরুষের একই ম্যাচে খেলার জন্য। এটা ছেলেমানুষি না পাগলামি, বুঝে উঠতে পারছি না। আচ্ছা নন্তু, এসব করে কি ও পঞ্চায়েত ইলেকশনে জিততে পারবে?''

নন্তু বলল, ''জ্যাঠামশাই, গ্রামের লোকের জীবনে রেষারেষি একটা গুরুতর ব্যাপার। আটঘরা বকদিঘির মধ্যে আকচাআকচি তো আমার ঠাকুরদা বলতেন তাঁর জন্ম থেকে দেখে এসেছেন। এবার তো মিলেনিয়াম ম্যাচ, এই প্রথম উইনারকে ট্রফি দেওয়া হবে। বুঝতেই পারছেন, টেম্পারেচার চড়ে গেছে। ট্রেনে দুই গ্রামের ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে হাতাহাতিও হয়ে গেছে। পটলদা এখন থামাতে গেলেও থামাতে পারবে না।''

এই সময় সত্যশেখর এসে হাজির হল।

''বাবা, দেখলে অ্যাকাডেমি? কালু কেমন দেখলি, ট্যালেন্ট আছে বলে মনে হল?''

''ট্যালেন্ট!'' কলাবতী চোখ কপালে তুলল। ''ব্র্যাডম্যানকে কি তুমি ট্যালেন্টেড বলবে?''

''জিনিয়াস বলব।''

''তা হলে আজ জিনিয়াসকে দেখলুম, তুমিও তাকে দেখবে ম্যাচের দিন।''

রাজশেখর বললেন, ''সতু, এতক্ষণ কোথায় ছিলিস?''

''এই কাছেই, বকদিঘিতে গেছলুম, ননী ঘোষের মাখা সন্দেশ, ছানা আর নলেন গুড় দিয়ে তৈরি, সেই ছোটবেলায় মুখুজ্যেদের বাড়িতে খেয়েছিলুম তারপর আর খাইনি। এদিকে এসেছি যখন, ভাবলুম যাই একবার মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। ওরাই তো এর ইনভেন্টর।''

''সতু, তুই বকদিঘি গিয়ে মিষ্টি কিনলি? এ-খবর হরির কানে ঠিক পৌঁছে যাবে। তারপর প্রচার হবে আটঘরার সিংঘিরা নিজেদের ময়রার বাসি গন্ধওলা মিষ্টি না খেয়ে বকদিঘি থেকে টাটকা জিনিস কিনে খায়। এতে ইলেকশনে পটলের কত ক্ষতি হবে জানিস?'' রাজশেখর রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ধমক দিলেন ছেলেকে।

সত্যশেখর দু'হাত তুলে শান্ত হওয়ার জন্য আবেদনের ভঙ্গি করে বলল, "আমাকে কেউ কিনতে দেখেনি। দোকানের অন্তত আড়াইশো গজ আগে গাড়ি রেখে টাকা দিয়ে শচিনকে কিনতে পাঠিয়েছি। শচিন তো আর সিংঘি নয়।"

কাছের এক চায়ের দোকান থেকে একটি ছেলে একটি কেটলি আর তিনটে কাপ হাতে নিয়ে হাজির হল। নন্তু কুণ্ঠিত স্বরে বলল, "জ্যাঠামশাই, চা।"

"না, না, আমি খাব না। ওদের দাও।"

সত্যশেখর চায়ে চুমুক দিয়ে ভাইঝিকে নিচু গলায় বলল, "এটা কী খাচ্ছি বল তো? তুই বলবি চা। আসলে একটা নতুন পানীয়।"

ফেরার জন্য মোটরে উঠেই রাজশেখর জিজ্ঞেস করলেন, "কালু, তুই তো ভাল করে বললি না অপুর মা'র খবর। কলকাতায় আসবে কবে? ছেলের পা কি এখনও ঠিক হয়নি?"

"বলছি, বলছি, ভুবন ডাক্তারের ব্যাটিং দেখে কেমন যেন গুবলেট হয়ে গেল সবকিছু। পিসির ম্যালোরি হয়েছে। এখানকার ধন্বন্তরি ভুবন ডাক্তারের চিকিৎসায় রয়েছে, জ্বর কমেছে। শকুন্তলা নামের টনিক দিয়েছি, এবার হু হু করে জ্বর নেমে যাবে। বলেছি, ম্যাচের দিন তৈরি থেকো, নিয়ে যাব। অপু এখনও অল্প খোঁড়াচ্ছে, হাড় ভাঙেনি।"

সত্যশেখর বলল, "ব্লাড টেস্ট করিয়েছে?"

কলাবতী বলল, "মনে তো হয় না এখানে ওসব টেস্ট করার ব্যবস্থা আছে, তা ছাড়া হুগলি জেলার সবাই জানে কম্প দিয়ে জ্বর এলে সেটা কী অসুখ। ভাল কথা, পিসি দাদুকে বলতে বলেছে অপুকে তারকনাথের চন্নামেত্তর খাওয়ায়নি, পুজোর ফুল শুধু কপালে ছুঁইয়েছে।"

রাজশেখর স্নেহের হাসি হেসে বললেন, "মেয়েটা বড় ভাল। ছোটবেলায় ওর বাবা সাতকড়ি মোদক আটঘরায় ছিল আমার খেলার সঙ্গী।" কিছুক্ষণ পর রাজশেখর বললেন, "সতু, মিলেনিয়াম কাপের নকশাটা হরিকে দেখিয়ে অ্যাপ্রুভ করিয়ে নিস, নইলে পরে ঝামেলা পাকাতে পারে।"

"আমি যাব না, কালুকে দিয়ে পাঠিয়ে দোব। ও কথাবার্তায় খুব ম্যাচিওরড, বুদ্ধিমতী, ক্লিয়ার হেডেড, আর যেন কী-কী বলল তোর বড়দি?" সত্যশেখর মুখ টিপে হেসে বলল। "হরিদাদু পর্যন্ত যেতে হবে না, বড়দিকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করালেই হবে।"

বাড়ি পৌঁছে মহামায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কাগজের বাক্স থেকে বেরোল এক

কিলোগ্রাম মাখা সন্দেশ। রাজশেখর ও কলাবতী তার এক-তৃতীয়াংশ খেয়ে আর পারল না।

"কাকা, তোমার ছোটবেলার মাখা সন্দেশ আর এই জিনিসটা কি এক?"

"এক কী করে হবে! ননী ঘোষ তো কবেই মারা গেছে। এখন তো ওর ছেলে দোকান চালাচ্ছে। গ্রামের লোক বেশি মিষ্টি পছন্দ করে, তাই বেশি গুড় ঢেলেছে। সত্যিই রে বড্ড মিষ্টি, আমিও আর পারছি না।" সত্যশেখর প্রায় আধ কেজি খাওয়ার পর সন্দেশের বাক্সটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, "মুরারির জন্য রইল।"

অঘ্রানের শেষ। সন্ধে থেকেই চেপে ঠান্ডা পড়েছে, উত্তুরে বাতাস বইছে। সত্যশেখর শীতকাতুরে। ফুলহাতা সোয়েটার পরে গরম কফির কাপ হাতে নিয়ে সে কলাবতীর ঘরের দরজায় টোকা দিল, "কালু, আসতে পারি?"

"এসো।" বিছানায় কাত হয়ে কলাবতী বই পড়ছিল, উঠে বসল।

"কী বই পড়ছিস?" কলাবতীর খাটে বসে কফিতে চুমুক দিয়ে সত্যশেখর বলল।

"দাদুর কাছ থেকে আনলুম ব্র্যাডম্যানের আত্মজীবনী ফেয়ারওয়েল টু ক্রিকেট। পড়েছ?"

"কব্বে পড়েছি, তুই এখন পড়ছিস! ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা না থাকলে অমন ব্যাটিং সম্ভব নয়।"

"এটা যদি ভুবন ডাক্তার বুঝত!" কলাবতী আক্ষেপের স্বরে বলে মাথা নাড়ল।

"কালু, বড্ড শীত করছে রে! মলু সেদিন তোকে যে ঝাল আচারটা দিল সেটা কি শেষ করে ফেলেছিস? থাকলে একটু দিবি? বকদিঘির মিষ্টিটা খেয়ে কেমন গা গুলোচ্ছে।" করুণ স্বরে সত্যশেখর বলল।

"এক মিনিট বোসো," কাকাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কলাবতী, পড়ার টেবলের ড্রয়ার থেকে আচারের শিশি বার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দু'মিনিট পর সে এক হাতে চামচে মশলামাখা আমের আচারের টুকরো, অন্য হাতে প্লেটে বরফের কিউব নিয়ে ফিরে এল।

সত্যশেখর আচার মুখে ঢুকিয়ে চোখ কুঁচকে চুষতে চুষতে বলল, "জানিস কালু, এই ঝাল আচারটা খেলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ইচ্ছে করে পেটাই, যে সামনে পড়বে তাকেই আচ্ছাসে পেটাই।" বলতে বলতে

সত্যশেখর ছুটল বেসিনের দিকে। মুখ ধুয়ে ফিরে এসে বরফের টুকরো জিভে রেখে বলল, "আটঘরায় ব্যাট করতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু সন্দেশ কিনতে গিয়ে এত দেরি করে ফেললাম। তোর ব্যাটটা কোথায় রে?" সে ঘরের চারধারে চোখ বোলাল।

"ব্যাট দিয়ে কী করবে!" অবাক কলাবতী বলল।

"শ্যাডো প্র্যাকটিস করব।"

আলমারির পাশ থেকে ব্যাট এনে দিল কলাবতী। ব্যাট নিয়ে সত্যশেখর বেরিয়ে গাড়িবারান্দায় গেল। কিছুক্ষণ পর কলাবতীর কানে এল, "হাই", "হুস্‌স্‌", "ইয়া", "ওহ্‌হ" শব্দগুলো। কৌতূহলী হয়ে সে অন্ধকার বসার ঘরে এল। সেখান থেকে আলো-জ্বলা গাড়িবারান্দা দেখা যায়। দেখল কাকা একজায়গায় দাঁড়িয়ে মুখের সামনে থেকে মশা তাড়াবার মতো করে ব্যাট চালিয়ে বলে উঠল "কড়াক্‌ ছয়।" আবার স্টান্স নিল। একটু ভেবে নিয়ে বাঁ পা বাড়িয়ে ব্যাট যতদূর সাধ্য পিছনে তুলে সবেগে নামিয়ে এনে সামনে তুলে বলে উঠল, "আবার ছয়।" সত্যশেখর স্টান্স নিল আবার। এবার মারল স্কোয়্যার কাট "কড়াক্‌ চার।" এবার সে একহাঁটু ভেঙে বসে সুইপ করতে গেল। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। কলাবতী তাই দেখে নিঃশব্দে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

তিনদিন পর টিফিনের সময় কলাবতী হেডমিস্ট্রেসের ঘরে গেল মিলেনিয়াম ট্রফির নকশা নিয়ে। "বড়দি, কাকা পাঠিয়ে দিল। আপনি অ্যাপ্রুভ করে দিন।"

"আমি কেন, বাবাকে গিয়ে দেখাও।"

"কাকা বলল, আপনি ঠিক আছে বললে হরিদাদু সেটা মেনে নেবেন।"

হেসে মলয়া নকশার নীচে "অনুমোদিত" লিখে নাম সই করে বলল, "রবিবার তোমরা আটঘরা গেছলে? তোমার কাকা বকদিঘিতে গিয়ে এক কিলো মাথা সন্দেশ কিনেছে, কেমন লাগল খেতে?"

কলাবতী অবাক হয়ে বলল, "আপনি জানলেন কী করে?"

"রবিবার রাতেই পতু মুখুজ্যে বাবাকে ফোন করেছিল। একসময় ভাল করত, এখন বিশ্রী সন্দেশ তৈরি করে মহামায়া। তোমার কাকা নিশ্চয় সিংহভাগটা খেয়েছে।" মলয়া টেবলে রাখা একটা চিঠির উপর ঝুঁকে পড়ল। কলাবতী বড়দির কথার জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিলেনিয়াম ম্যাচের দিনে আটঘরা

বড়দিনের দু'দিন আগে সত্যশেখর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল একটা পেস্টবোর্ডের বড় কার্টন মহাত্মা গান্ধী রোডের দোকান থেকে ডেলিভারি নিয়ে। দু'হাতে সেটা ধরে দোতলায় বসার ঘরে এসে টেব্‌লে রেখে বলল, "এই হল মিলেনিয়াম ট্রফি, কেমন হয়েছে দেখো।"

রাজশেখর টিভি-তে খবর শুনছিলেন, পাশে মেঝেয় বসে মুরারি। কলাবতীকে অঙ্ক করাতে ক্ষুদিরামবাবু আজ আসবেন না, তাই সে নিজের ঘরে টেব্‌লে বসে হোমটাস্ক করছিল। সত্যশেখর কার্টনের ঢাকনা খুলতে খুলতে "কালু, কালু" বলে ডাকল। ভিতরে রাখা কুচো কাগজের মধ্য থেকে দু'হাতে ট্রফিটা বার করে সে টেব্‌লে রেখে বিজয়ীর মতো হাসিতে মুখ ভরিয়ে বাবার দিকে তাকাল।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাজশেখরের চোখ। বললেন, "বাহ্, চমৎকার তো!"

"কাঠের ওপর রাখলে দু'ফুট।" রুপোর মতো ধবধবে ট্রফির গায়ে সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে সত্যশেখর বলল।

"ছোটকত্তা, এটা কি রুপোর?" মুরারি জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে ছোঁয়ার জন্য আঙুল বাড়িয়ে টেনে নিল।

"পেতলের ওপর রুপোর জল করা। রুপোর হলে হাজার টাকায় হত না।"

কলাবতী ঘর থেকে বেরিয়ে ট্রফিটা দেখে থমকে গিয়ে "উইইআ" বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এসে কানের মতো দুটো হাতল ধরে ট্রফিটা তুলে মাথার উপর বসাল। উচ্ছল স্বরে বলল, "কাকা, এটা যে একেবারে রঞ্জি ট্রফি!"

রাজশেখর বললেন, "কালু, তুই রঞ্জি ট্রফি কি নিজের চোখে দেখেছিস? বছর দশেক আগে কোশেন্ট ফোশেন্ট কীসব অঙ্কটঙ্ক করে বাংলা জিতেছিল, তুই তখন অ্যাত্তোটুকু, ট্রফিটা চোখে দেখিসনি। আমি দেখেছিলুম স্বচক্ষে একষট্টি বছর আগে, তখন স্কুলে পড়ি, বাবার সঙ্গে মাঠে গেছলুম। বাংলা সেবারই প্রথম রঞ্জি ট্রফি জেতে উনচল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে সাদার্ন পাঞ্জাবকে হারিয়ে। আনন্দটা দারুণভাবে এনজয় করতে পারতুম যদি না বাংলার এগারোজনের মধ্যে চারজন মাত্র বাঙালি থাকত। সতু, আর তোকেও বলছি কালু, ঘরের ছেলেদের নিয়ে গড়া দল যখন লড়াই করে জেতে, তখন যে গভীর সুখ বুকের মধ্যে জমা হয়, ভাড়াটেদের দিয়ে জেতা ট্রফিতে তা হয় না।

হরিকে এটাই বোঝাতে চেয়েছি।''

কলাবতী বলল, ''দাদু, রঞ্জি ট্রফির চেহারাটা ঠিক যেন এদেশি নয় মনে হচ্ছে।''

রাজশেখর বললেন, ''গ্রিসিয়ান আর্ন-এর ডিজাইনে তৈরি রঞ্জি ট্রফি। পাতিয়ালার মহারাজা টাকা দেন, তখনকার আমলের পাঁচশো পাউন্ড দিয়ে তৈরি সোনার ট্রফি। এখন এই রুপোর জল করা ট্রফির দামই পাঁচ হাজার টাকা! দিনকাল কীরকম বদলে গেছে দেখেছিস? তখন কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল মেয়েরা টেস্ট ক্রিকেট খেলবে!'' রাজশেখর ঝুঁকে ট্রফির গায়ে খোদাই করা লেখা পড়তে লাগলেন।

সত্যশেখর বলল, ''কালু, যেভাবেই হোক ভাড়াটে প্লেয়ারদের হারাতেই হবে।''

''মাত্র দু'জন তো ভাড়াটে প্লেয়ার। কাকা, এটা ক্রিকেট, চণ্ডী কম্পাউন্ডারের একটা বল কি ভুবন ডাক্তারের এক ওভার ব্যাটিং ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে যেতে পারে।'' কলাবতী বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, ''তা ছাড়া তুমি তো আছই।''

ট্রফিটা কার্টনের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে সত্যশেখর বলল, ''খেলার দিনই এটা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বাবা, তুমি পরমেশ কি নন্তুকে আজই ফোন করে নিশ্চিন্ত থাকতে বলো। ভাল কথা, আমাদের ক্যাপ্টেন কে?''

''সেটা ম্যাচের আগে নন্তু পরমেশ ঠিক করবে।''

রাতে সত্যশেখর আচার চেয়ে নিয়ে খেয়ে ব্যাট হাতে গাড়িবারান্দায় যাওয়ার সময় বলল, ''আজই শেষ প্র্যাকটিস।''

কিছুক্ষণ পর কলাবতী শুনল, ''হুউউস'', ''কড়াত'', ''ফটাস।''

বড়দিনের সকালে ভারী জলখাবার খেয়ে ওরা তিনজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কলাবতী ও সত্যশেখর সাদা ট্রাউজার্স সাদা শার্ট এবং বুট পরেই গাড়িতে উঠেছে, যাতে আটঘরায় গিয়ে পোশাক পালটাতে না হয়। হিসেব করে দেখেছে সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছোতে পারবে। খেলা শুরু এগারোটায়। কলাবতী তার খেলার সরঞ্জাম, ব্যাট, প্যাড, ব্যাটিং গ্লাভ্স এবং উইকেটকিপিং গ্লাভ্স একটা কিটব্যাগে ভরে সঙ্গে নিয়েছে। বকু বোসের কাঁধ ঠিক হয়েছে কি না সেটা এখনও অজানা রয়ে গেছে। দরকার হলে সে উইকেট কিপ করবে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় সত্যশেখর বলেছিল, "কালু, তোর ব্যাটটা দিয়ে ব্যাট করব।"

কলাবতী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "একদম নয়। শ্যাডো করা পর্যন্ত ঠিক আছে। ব্যাটটা ভাঙতে দেওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।"

শুনেই গোমড়া হয়ে যায় সত্যশেখরের মুখ। রাজশেখর বলেন, "সতু, কমলালেবু বিক্রি হচ্ছে দেখলে একবার দাঁড় করাবি। আগের বার ডাব কিনে নিয়েছিলুম মনে আছে?"

শ্রীরামপুরে পৌঁছে জি টি রোডের ধারের দোকান থেকে ক্রিকেট বলের আকারের এক ডজন কমলা কিনল সত্যশেখর।

"কালু, খোসা ছাড়িয়ে খাওয়া আর গাড়ি চালানো একসঙ্গে হয় না, তুই ছাড়িয়ে দুটো দুটো করে কোয়া আমার মুখে দিয়ে দে।"

সিঙ্গুর পার হয়ে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর রাস্তা বন্ধ করে লাঠি-বাঁশ নিয়ে ভিড় আর তড়পানি দেখে গাড়ি থামিয়ে সত্যশেখর স্বগতোক্তি করল। "পটল হালদারের পথ অবরোধ নয় তো?"

রাজশেখর বললেন, "আটঘরা থেকে এতদূরে পটলের এসব করার ক্ষমতা নেই। অন্য কোনও ব্যাপার, নেমে দেখ, ঠিক সময়ে আমাদের পৌঁছোতে হবে।"

মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে সত্যশেখর এগিয়ে গেল। ওর সাদা পোশাক ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভারিক্কি চেহারা দেখে ভিড়টা নিজেদের তড়পানি থামিয়ে অবাক ও বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে রইল।

জলদগম্ভীর স্বরে সে বলল, "ব্যাপার কী? রাস্তা বন্ধ করেছ কেন? আমি জেলা জজ, তারকেশ্বর যাচ্ছি বাবার পুজো দিতে।" শোনামাত্র সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ভিড়।

গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরা বয়স্ক একজন আঙুল তুলে ধুতিপরা এক প্রৌঢ়ের দিকে দেখাল, "হুজুর, ওই হল অমর পাড়ুই, ওর ছাগল আমার খেতের মুলো, কপি পরপর দু'দিন মুড়িয়ে সাফ করেছে। আমি প্রতিবাদ করায় ও আমার বলদটাকে বেঁধে রেখেছে। বলদটা ফেরত নিতে গেলে বলেছে, ফেরত দেব না, যা করতে পারিস কর, পঞ্চায়েতে গিয়ে নালিশ কর। হুজুর, পঞ্চায়েত ওর হাতের মুঠোয়। আজ আমি বলদ ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে পাড়ার লোকজন নিয়ে যাই। পাড়ুই পাড়ার লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের মারতে শুরু করে।"

গম্ভীর মুখে শুনে সত্যশেখর জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"হান্নান শেখ। কলকাতায় ছুতোর মিস্তিরির কাজ করি।"

অমর পাড়ুই নামক লোকটি এবার মুখ খুলল, "হুজুর, শেখ পাড়ার গোরু-ছাগল এসে আমাদের বাগান খেতের আনাজপাতি ধ্বংস করে যায় নিয়মিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আমরা এসব সহ্য করে গেছি। কিন্তু ব্যাপারটা এখন চরমে পৌঁছেছে। আপনি একটা বিহিত করুন।"

'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি' শুনেই সত্যশেখর বুঝল অমর মিটিং-মিছিল করা লোক। সে বলল, "এসব ব্যাপারের বিহিত রাস্তায় হয় না। কাল কোর্টে এসো, আমি তো সব দেখলুম, মনে হচ্ছে সেকশান ওয়ান ফর্টিফোর জারি করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ আমার জেলায় আমি হতে দেব না। এখন পথ ছাড়ো। দেখো বাস লরি ট্রেকার রিকশা দাঁড়িয়ে গেছে। কাল অবশ্যই কোর্টে আসবে, আমি নিজে হেয়ারিং করব। যাওও।" হুংকার দিয়ে সত্যশেখর কথা শেষ করে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। ভিড় দু'ভাগ হয়ে সরে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে। সত্যশেখর নির্বিঘ্নে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখল অমর ও হান্নান নমস্কার করছে।

"সতু কী বললি অতক্ষণ ধরে, ব্যাপারটা কী?"

সত্যশেখর সংক্ষেপে যা কথাবার্তা হয়েছে বলল, শুনে রাজশেখর অট্টহাস্য করলেন। কলাবতী লেবুর দুটো কোয়া কাকার মুখে ঢুকিয়ে দিল। সত্যশেখর বলল, "গল্পটা তোর বড়দিকে বলিস, ও তো সবাইকে বলে বেড়ায় আমার বুদ্ধি নেই।"

"আরও বলেন, তোমার নাকি ফিটনেস নেই। আজ দেখিয়ে দিয়ো ফিটনেস কাকে বলে।"

তারকেশ্বর থেকে আটঘরার কাছাকাছি মসৃণভাবে তারা চলে গেল। মাইল দুয়েক আগে তারা সামান্য ভিড় পেল। ভ্যানরিকশায়, সাইকেলে, হেঁটে অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে, প্রৌঢ়, যুবক চলেছে আটঘরার দিকে।

"দাদু, সার বেঁধে এত লোক যাচ্ছে কোথায় বলো তো?"

রাজশেখর সামনের সিটে সত্যশেখরের পাশে বসে। আঙুল তুলে রাস্তার উপর আড়াআড়ি টাঙানো একটা ফেস্টুন দেখালেন:

"মিলেনিয়াম ম্যাচ! মিলেনিয়াম ম্যাচ!!

সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট সংগ্রাম

আটঘরা বনাম বকদিঘি, তৎসহ মিলেনিয়াম মেলা

দলে দলে আসুন। আপনার প্রিয় আটঘরাকে সমর্থন করুন।"

রাজশেখর বললেন, "এবার বুঝেছিস?"

"বুঝেছি।" কলাবতী মজা পেয়ে জানলা দিয়ে তাকাল। রাস্তার ধারে একটা তালগাছের গায়ে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপন:

সুলভে রসনার সেরা স্বাদ নিন। এই প্রথম

কলকাতার নামী হোয়াং হো চিনা রেস্টুরেন্ট আটঘরায়

পাবেন নানাবিধ চাউমিন

চিকেন! প্রন! ভেজিটেব্‌ল!

কলাবতী বলল, "কাকা, খাবে নাকি হোয়াং হো রেস্টুরেন্টের চাউমিন?"

"খাই আর দুঃখের নদীতে ভেসে যাই! রক্ষে করো।"

রাজশেখর বললেন, "ছোটবেলায় রথের মেলা এখানে দেখেছি। এ তো দেখি সেইরকম ভিড়। সতু একটু দেখেশুনে চালা।"

আটঘরা গ্রামের চৌহদ্দিতে ঢোকামাত্র ঝকঝকে গাড়ি দেখে কিছু কিশোর ও তরুণ গাড়ির সামনে হাত তুলে দাঁড়াল।

সত্যশেখরকে একজন বলল, "আপনি তো সতু সিংহি। সেবার সেঞ্চুরি করেছিলেন। আজও কিন্তু করা চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে এক কিশোর বলল, "না করলে কিন্তু এই গাড়ি এখানেই জ্বালিয়ে দোব।"

"নিশ্চয় করব, কোনটে চাই, সিঙ্গল্ না ডাব্‌ল?" সত্যশেখর উদার কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিল। ছেলেটি থতমত হয়ে বলল, "একদিনের খেলায় ডবল করা শক্ত। সিঙ্গল হলেই চলবে।"

"ঠিক আছে, এখন পথ ছাড়ো।"

গাড়ি একটু এগোতেই কলাবতী আতঙ্কিত গলায় বলল, "কাকা, কী বললে ছেলেটাকে?"

"না বললে কি রাস্তা ছাড়ত? এরা যা চাইবে তক্ষুনি তাতেই রাজি হয়ে যেতে হয়। এটাও তোর বড়দিকে বলিস।"

মাঠের ধারে গাড়ি পৌঁছোতেই বুকে নীল ব্যাজ আঁটা একটি লোক শশব্যস্তে এগিয়ে এল। "গাড়ি রাখার জায়গা ওদিকটায়।"

তার নির্দেশমতো সত্যশেখর বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় গাড়ি রেখে দরজায় চাবি দিল। অ্যামপ্লিফায়ারে সানাই বাজছে। রাজশেখর বললেন,

"এরা তো দেখছি এলাহি ব্যাপার করেছে। আগের থেকেও জাঁকজমকটা বেশি।"

পরমেশ এগিয়ে এল। "জ্যাঠামশাই, এদিকে প্যাভিলিয়ন। আসুন।"

শুনে তিনজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। নীল কাপড়ে ঘেরা একটা হলঘরের মতো জায়গা। একধারে লম্বা একটা টেব্‌ল, তাতে সাদা চাদর পাতা। তার উপর দুটো ফুলদানিতে গাঁদাফুল। টেব্‌ল ঘিরে গোটা পনেরো লোহার ফোল্ডিং চেয়ার। অন্যধারে কাপড় ঘিরে তৈরি ছোট ছোট খোপ। তার গায়ে ইংরেজিতে লাল কালিতে লেখা কাগজ সেফটিপিন দিয়ে আটকানো। সেগুলোয় লেখা, "প্লেয়ার্স ড্রেসিং রুম।" "মেডিক্যাল রুম।" "আম্পায়ার্স রুম।" "কমিটি রুম।" একটিতে লেখা "টয়লেট।" এই হল আটঘরার 'প্যাভিলিয়ন'। জনা দশেক লোক ও ছেলে চেয়ারে বসে।

রাজশেখর চারধারে চোখ বুলিয়ে বললেন, "বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা তো, মিলেনিয়াম ম্যাচের উপযুক্ত বটে। পরমেশ, ট্রফিটা গাড়িতে রয়েছে ওটা নিয়ে এসো। কালু, চাবি নিয়ে সঙ্গে যা।"

নন্তু হাজির হল। রাজশেখর বললেন, "খেলা শুরুর তো আর পনেরো মিনিট বাকি। টস করবে কখন? আম্পায়াররা এসেছেন? কাকে ক্যাপ্টেন করলে?"

"কাল রাতে তিনজনের নাম নিয়ে আলোচনা করি।" নন্তু গলা নামিয়ে বলল, "বকু বোস, সত্যশেখর সিংহ আর ডাক্তার ভুবন রায়। বকুদার কাঁধের চোট পুরো সারেনি। খেলতে পারবেন কি না ঠিক নেই। না খেললে কলাবতী উইকেটকিপিং করবে। সতুদা আর ডাক্তারবাবুর মধ্যে ডাক্তারবাবুকেই আমরা বেছেছি। আজ এগারো বছর নিয়মিত খেলছেন, সারা ব্লকের লোক ওঁকে চেনে, ক্রিকেটে ওঁর পড়াশোনা উৎসাহ প্রচুর। তা ছাড়া ওঁর মনের ইচ্ছাও ক্যাপ্টেন হওয়ার। ওঁকে হতাশ করলে হয়তো রাত আটটার পর বাড়ি গিয়ে রুগি দেখা বন্ধ করে দেবেন, এইসব ভেবেই ওনাকে—"

"বেশ করেছ। আমাদের আম্পায়ার কই?" রাজশেখর ব্যস্ত হয়ে বললেন।

"উনি বাইরে সোফায় বসে আছেন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে বকদিঘির আম্পায়ার এখনও এসে পৌঁছোননি। পতু মুখুজ্যে বলল, যদি না এসে পৌঁছোয় তা হলে হরিশ কর্মকারকে ওরা নামাবে।"

"হরিশ!" আঁতকে উঠলেন রাজশেখর। "একটা অশিক্ষিত যাত্রার

প্রম্পটার, যে ক্রিকেট আইনের বই পড়েনি, সেবার প্রথম ওভারেই চারটে এল বি ডবলু দিয়েছিল। না না, হরিশ ফরিশ চলবে না, সি এ বি-র পাশ করা আম্পায়ার না হলে আটঘরা মাঠে নামবে না, পতুকে এটা জানিয়ে দাও, আর মাইকে বলে দাও খবরটা।''

এক মিনিট পরে মাইকে নন্তুর গলা শোনা গেল। ''অনুগ্রহ করে শুনুন। বকদিঘির সঙ্গে আটঘরার মৌখিক চুক্তি হয়েছিল মিলেনিয়াম ম্যাচ নিরপেক্ষ সি এ বি আম্পায়ারদের দিয়ে খেলানো হবে। আমরা আনব একজনকে, ওঁরা আনবেন অন্যজনকে। আমাদের আম্পায়ার এসে গেছেন কিন্তু ওঁদের আম্পায়ার আসেননি। আমরা স্থির করেছি দু'জন নিরপেক্ষ আম্পায়ার দিয়ে ম্যাচ না খেলা হলে এই ম্যাচ আমরা খেলব না। আশা করি আপনারা আমাদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবেন। ধন্যবাদ।''

নন্তুর ঘোষণা শেষ হওয়ামাত্র হাজার পাঁচেক কণ্ঠে গর্জন উঠল, ''সমর্থন, সমর্থন।... নিরপেক্ষ আম্পায়ার দু'দিকে চাই, দু'দিকে চাই... শেম শেম বকদিঘি।''

এবার মাইকে ভেসে উঠল পটল হালদারের কণ্ঠস্বর। ''আটঘরার মা-বোন এবং গুরুজনেরা, ভদ্রমহোদয়রা, আটঘরার প্রতি বকদিঘির এই হীন আচরণ, ম্যাচ বানচাল করার এই চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করুন আপনারা। আপনাদের সঙ্গে থাকবে আটঘরা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং আমিও...।''

রাজশেখর ভীত স্বরে বললেন, ''নন্তু, এ তো পটলের গলা, কোথায় ছিল এতক্ষণ?''

''দক্ষিণ দিকে গ্যালারির বাঁশের কাঠামোর বাঁশ আলগা হয়ে তিনটে তক্তা পড়ে গেছল। পটলদা ঘরামি এনে ঠিক করছিল।''

রাজশেখর দ্রুত প্যাভিলিয়ন থেকে বেরোলেন। দশ গজ দূরে মাঠের সীমানা, সেখানে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা পটল হালদার। রাজশেখর গিয়ে পাঞ্জাবির কোনা ধরে টানলেন, ''পটল, ভোটের এখনও অনেক দেরি, হীন আচরণের কথা ভোটের বক্তৃতায় বোলো, এখন নয়। চলে এসো।''

পটলকে নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে এসে রাজশেখর দেখলেন কার্টন থেকে ট্রফিটা বার করে টেব্‌লে রাখা। যারা সেখানে ছিল তারা ঘিরে রয়েছে টেব্‌ল। চোখ বিস্ফার করে দেখছে।

''দারুণ জ্যাঠামশাই, দারুণ,'' নন্তু বলল, অন্যরা সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

পটল হালদার কুঁজো হয়ে লেখাটা পড়ে ম্লানস্বরে বলল, "শুধু একটাই খুঁত, বকদিঘির নামটা আগে।"

অধিনায়ক ভুবন ডাক্তার ঢুকল। "সবাই রেডি তো? টস করতে যাব। পরমেশ প্লেয়ার্স লিস্টটা দাও। বকুর কাঁধ এখনও খচখচ করছে, ও খেলতে পারবে না। তার বদলে কলাবতী কিপ করবে। ভাল কথা, টস জিতলে কী করব?"

ডাক্তারবাবু সবার মুখ নিরীক্ষণ করে কিছু একটা বুঝে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে, ফিল্ড করব। আমাদের ভাল রান চেসার আছে। বোলিং ওপেন করবে কে? চণ্ডী আর রতুই করুক। ওয়ান চেঞ্জ অনিন্দ্য, তারপর মেজবাবু।"

পরমেশ প্লেয়ার্স লিস্ট ডাক্তারবাবুর হাতে ধরিয়ে দিল। তিনি কলম দিয়ে পরপর বোলারদের নামের পাশে সংখ্যা বসালেন।

"ভাল কথা, পরমেশ, খেলা কত ওভারের বলো তো? চল্লিশ না পঞ্চাশ ওভারের?"

"ত্রিশ ওভারের, ছ'ওভারের বেশি কেউ বল করতে পারবে না।" পরমেশ বলল," ফিল্ডিং রেস্ট্রিকশনস বলে কিছু নেই।"

কলাবতী পাশে দাঁড়ানো কাকাকে ফিসফিসিয়ে বলল, "দারুণ ক্যাপ্টেন। কোনও খবরই রাখেন না।"

নন্তু হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির হল। "এসে গেছে, ওদের আম্পায়ার এসে গেছে।"

ট্রফিটা পটল হালদার দু'হাতে তুলে প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। রাজশেখর বলে উঠলেন, "ও কী! ওটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?"

"মাঠের চারধারে ঘুরিয়ে পাবলিককে দেখাব তারপর একটা টেব্‌লের ওপর রাখব। যতক্ষণ খেলা চলবে, লোকে দেখবে।"

রাজশেখর বললেন, "হরি এসেছে?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র এলেন।" নন্তু বলল, "উনি আসার সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ারও এলেন।"

"ট্রফিটা প্রথমে হরির কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাও। তারপর ঘোরাতে হয় ঘোরাও। সতু, তুই হাতে করে নিয়ে যা।"

সত্যশেখর ট্রফিটা তুলে নিয়ে প্যাভিলিয়ন থেকে বেরোল, সঙ্গে পটল হালদার। আটঘরার পাশেই হলুদ রঙের কাপড়ে ঘেরা বকদিঘির প্যাভিলিয়ন।

বাইরে আটঘরার মতো দুটো লম্বা সোফা। তাতে বসে ছিল মলয়া, হরিশঙ্কর এবং বকদিঘির গণ্যমান্য কয়েকজন। তাদের পিছনে চেয়ারে ধোপদুরস্ত পোশাকে কয়েকটি পরিবার। মাঠের চারদিক পাঁচ ফুট উঁচু বাঁশের ওপর তক্তা পেতে গ্যালারি। বাউন্ডারি লাইন ঘিরে দুই গ্রামের বাচ্চা ছেলেরা এবং কিশোররা বসে। পটল হালদার স্লিপ বিলি করে খেলা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছে শুধু তাদেরই, যারা তার ভোটার বা সম্ভাব্য ভোটার।

দুই প্যাভিনিয়নের উলটো দিকে স্কোরবোর্ড। উচ্চতায় ও প্রস্থে আট ফুট করে। গতবার মাপটা ছিল ছ'ফুট। স্কোরবোর্ডের নীচে স্কোরারদের জন্য টেব্‌ল। মাঠের গ্যালারি ঘিরে নীল-হলুদ কাগজের শিকলের মালা। সৌহার্দ্যের প্রতীক বন্ধন!

ঝকঝকে সাদা ট্রফি হাতে সত্যশেখরকে দেখামাত্র মাঠের অধৈর্য গুঞ্জন থেমে গেল। সে হরিশঙ্করের সামনে এসে দু'হাত বাড়িয়ে ট্রফিটা সামনে ধরে বলল, "হরিকাকা দেখুন, কেমন হয়েছে।"

মলয়ার গলায় ঝুলছে ক্যামেরা, সে দাঁড়িয়ে উঠে ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে বলল, "সতু, তুমি ওইভাবে বাবার দিকে ধরে থাকো... হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর একটা।"

পটল হালদার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সত্যশেখরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ট্রফির কাঠের নীচে হাত বাড়িয়ে দিল। মলয়ার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। "আপনি সরে দাঁড়ান তো, আমাকে ছবি তুলতে দিন।"

"বাঃ বেশ হয়েছে।" হরিশঙ্কর মাথা নাড়লেন। "এবার এটা চারধারে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখাও। পতু কোথায়? এই যে পতু, তুমি আর পটল ট্রফিটার দু'দিক ধরে একচক্কর ঘুরিয়ে আনো।"

সেই সময় মাঠের ওধার থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠের তীব্র স্বর, "ছোটকত্তা, আমি এখানে।"

সত্যশেখর সচকিত হয়ে তাকাল এবং দেখল মাথায় ঘোমটা সাদা থান পরা অপুর মা গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নাড়ছে। সত্যশেখর হাতছানি দিয়ে ডাকতেই অপুর মা প্রায় হুড়মুড় করে ভূকম্পে ভেঙেপড়া বাড়ির মতো গ্যালারি থেকে মাঠে নেমে পিচের ওপর দিয়ে হেঁটে এপারে চলে এল। হাতে একটা পেটমোটা পলিথিনের থলি।

"ম্যালেরিয়া সেরে গেছে?" সত্যশেখর দ্রুত এগিয়ে জিজ্ঞেস করল।

অপুর মা মাথা নাড়ল, "একদম। ডাক্তারবাবু ধন্বন্তরি।"

"অপুর পা?"

"সে তো ওই মাচায় বসে রয়েছে খেলা দেখবে বলে। হেঁটেই তো এল!"

পরমেশকে ডেকে সত্যশেখর একটা চেয়ার আনিয়ে সোফার ধারে পেতে অপুর মাকে বলল, "এটায় বোসো।"

টস করতে গেল ভুবন ডাক্তার আর পতু মুখুজ্যে। ফিরে এসে হাসিমুখে ডাক্তার বলল, "জিতেছি, পতুবাবুকে বললুম আমরা আপনাদের রান তাড়া করব। কলাবতী রেডি হও। রতু, পলাশ অনির্বাণ, মেজবাবু ঠিক আমার পেছনে লাইন দিয়ে মাঠে নামবেন।"

সত্যশেখর গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু, ব্র্যাডম্যানের বইটা এনেছেন?"

"কেন কেন, আনব কেন? ওটা তো শেখার সময় দরকার হয়।" ভুবন ডাক্তার বলল, "এখন শেখা নয়, খেলতে যাচ্ছি। আসুন, নামা যাক।"

দুই আম্পায়ার একজন প্রশান্ত রায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অন্যজন নন্দ ভট্‌চাজ রোগা ছ'ফুট, সি এ বি-র প্রাক্তন আম্পায়ার, অবসর নিয়েছেন চার বছর আগে। দু'জনের দাবি, তাঁদের ক্লাবক্রিকেট খেলানোর মিলিত সংখ্যা আড়াই হাজার। ক্রিকেট আইন গুলে খেয়েছেন দু'জনেই।

"প্লে।"

ঘোরকৃষ্ণবর্ণ খেলা আরম্ভের অনুমতি দিলেন। বোলিং মার্কে চণ্ডী কম্পাউন্ডার। মালকোঁচা দিয়ে ধুতিপরা নয়। মিলেনিয়ামের মান রাখতে কলকাতা থেকে রেডিমেড সাদা ট্রাউজার্স কিনে এনেছে। কোমরটা ঢলঢল করায় ছেলের বেল্ট দিয়ে টাইট করে নিয়েছে। নতুন বলটা ঊরুতে ঘষা বন্ধ করে ডেলিভারি দিতে ছুটল।

স্ট্রাইকার মোহনবাগানের মদন গুহ। বকদিঘিতে দিদির শ্বশুরবাড়ি। মাঝেমধ্যে ছুটির দিনে ছিপ নিয়ে আসে মাছ ধরতে। পতু মুখুজ্যে বলে রেখেছে গত বছর এ এন ঘোষ, পি সেন ট্রফিতে আর লিগে মদন গুহর পাঁচটা সেঞ্চুরি হয়েছে, আটঘরার বোলিং ছিঁড়ে খাবে। ওর দিদির শ্বশুর ও শাশুড়িকে সোফায় বসিয়েছে পতু বিশেষ খাতির জানাতে।

উইকেটের পিছনে কলাবতী। চণ্ডীর বোলিং সে দেখেছে অ্যাকাডেমির নেটে। চার গজ পিছিয়ে দাঁড়াল। আটঘরার একমাত্র জোরে বোলার চণ্ডী। সারা মাঠ কৌতূহলে তাকিয়ে মেয়ে উইকেটকিপারের দিকে। পটল হালদার

পোস্টার মেরে জানিয়েছে: "আসুন? দেখুন!! পুরুষদের ম্যাচে মহিলা উইকেটকিপার। বিশ্বে এই প্রথম।" ভেঙে পড়েছে মেয়েদের ভিড় আটঘরার নাতনিকে দেখতে এবং কিছুটা হতাশ তার চুল দেখে, একদম ছেলেদের মতো করে কাটা!

চণ্ডী ছুটে আসছে। স্লিপে ভুবন ডাক্তার, মেজ দারোগা, বিশু পা ফাঁক করে ঝুঁকে পড়ল। সত্যশেখর বলেছিল, 'এমন জায়গায় রাখুন যেখানে আমাকে ছুটতে না হয়।' অধিনায়ক তাকে ব্যাটের সামনে সিলি মিড অফের জায়গা থেকে তিন গজ পিছনে দাঁড়াতে বলে জানায়, 'এই উইকেটে বল লাফিয়ে উঠবেই, মুখের কাছে ব্যাট তুলবেই, আপনি লোপ্পাই ক্যাচ পেয়ে যাবেন।"

বল ডেলিভারি দিল চণ্ডী। অফ স্টাম্পের ওপর একটু শর্টপিচ বল। মদন গুহ ব্যাট তুলল পিছনে। কলাবতী উবু হয়ে বসা থেকে উঠতে উঠতে ধরে নিল প্রচণ্ড একটা ড্রাইভে বল লং অফে এবার যাচ্ছে। মদন গুহ ড্রাইভ করল, নিখুঁত ফলো থ্রু। চণ্ডীর বল পিচ পড়ে একটু উঠে যাওয়ায় ড্রাইভটাও একটু উঠে গেল। বিদ্যুৎগতিতে বলটা সোজা সত্যশেখরের তলপেট লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কলাবতী চোখ বন্ধ করে ফেলল আতঙ্কে। সত্যশেখর দেখল গোলার মতো বলটা তার পেটের দিকে আসছে, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে চোখ বুজে দু'হাত পাতল পেটের সামনে। ফুটো হয়ে গেল বোধহয়।

অবিশ্বাসে বিস্ফারিত চোখ মদন গুহর, কলাবতীর। সারা মাঠ নিস্তব্ধ, আম্পায়ারের আঙুল তোলা আকাশের দিকে।

"মিলেনিয়ামের সেরা ক্যাচ। ফ্যান্টাস্টিক.... ফ্যান্টাস্টিক।" ঘোষণা করে ডাক্তারবাবু ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল সত্যশেখরকে। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলুম কি না।"

মাথা নাড়তে নাড়তে মদন গুহ ফিরল। পটল হালদার পাঞ্জাবি খুলে মাঠে ঢুকে বনবন করে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করছে, "ছিঁড়ে খাবে? কে কাকে ছেঁড়ে সেটা তো দেখাই গেল।"

"পটল, এটা ফুটবল মাঠ নয়।" রাজশেখরের জলদমন্দ্র স্বর হুঁশ ফেরাল পটল হালদারের।

কলাবতী এগিয়ে এসে বলল, "কাকা, ধরলে কী করে? হাত দুটো ঠিক আছে তো?"

"ওরে এ হল সিংহের থাবা। না ধরলে তো পেট ফুটো হয়ে যেত। ছেলেটা মেরেছে কিন্তু বেশ জোরে। চেটো দুটো জ্বলছে।"

অপুর মা বিভ্রান্ত। মাঠে ছোটকত্তাকে ডাক্তারবাবু জড়িয়ে ধরল। সবাই হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। "কত্তাবাবা, হল কী?"

"সতু বল ধরে নিয়ে একজনকে মোর করে দিয়েছে। এবার আর একজন যাবে তার জায়গায়।" অপুর মা যাতে বুঝতে পারে রাজশেখর সেই ভাষায় বললেন।

এবার ব্যাট হাতে নামল রাহুল। মাইনাস নয় পাওয়ারের চশমা, মাধ্যমিকে উনচল্লিশ স্থান পেয়েছে। প্রথম বলেই তাদের একমাত্র ব্যাটিং ভরসার প্রত্যাবর্তনে যেন তার ঘাড়ে বিপর্যয় রোখার দায়িত্ব পড়েছে, এটা তার মুখ দেখে কলাবতীর মনে হল। সে রাহুলকে শুনিয়ে সত্যশেখরকে বলল, "কাকা একটু এগিয়ে এসো, বল লাফিয়ে উঠলে তুমি ক্যাচ পাবে।"

সত্যশেখর এক পা এগিয়ে, ভুঁড়ি যতটা ঝুঁকতে দেয় ততটা ঝুঁকে দু'হাত জড়ো করে ব্যাটসম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রাহুলের কপালে ভাঁজ পড়ল। চণ্ডী বল করল। অফ স্টাম্পের বাইরে শর্টপিচ। রাহুট ব্যাট চালাল, বল কানায় লেগে লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে ডাক্তারের কাঁধের পাশ দিয়ে থার্ডম্যান বাউন্ডারির দিকে গেল। রান নিতে দৌড়েছে রাহুল। নন স্ট্রাইকার গদাই জানা "নো, নো" বলে চিৎকার করছে। পিচের মাঝ বরাবর থেকে রাহুল যখন ফিরে আসার জন্য ছুটল তখন ডিপ থার্ডম্যান পলাশের ছোড়া বল কলাবতীর হাতে জমা পড়তে চলেছে।

রানআউট হয়ে ফিরে আসার আগে রাহুল এগিয়ে গেল গদাইয়ের দিকে। "এটা কী হল?"

"রান ছিল না, দৌড়োলে কেন?" গদাই খিঁচিয়ে উঠল।

"আলবাত রান ছিল। ইচ্ছে করে আমাকে আউট করলেন।" গজগজ করতে করতে রাহুল মাঠ ছাড়ল। নামল রঞ্জি ট্রফি খেলা বোলার ইস্টবেঙ্গলের খোকন ব্যানার্জি। হাঁটা, ক্রিজে দাঁড়ানো, গার্ড নেওয়া সবকিছুই বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে সত্যিকারের ক্রিকেটার, কলাবতীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "বাবুদার কাছে তোমার কথা শুনেছি। রান আউটটা ভালই করেছ।"

"ওঁর কাছে আমিও আপনার কথা শুনেছি।"

ওভারের বাকি বলগুলো খোকন ছেড়ে দিল। প্রথম দুই বলেই দু'জন আউট, স্কোর বোর্ডে রান নেই। সে উইকেটে থিতু হতে মন দিল। আটঘরার দ্বিতীয় বোলার রত্নাকর বা রতু। এটা তার জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ। ঘরের লোকের চোখে পড়ার জন্য সে উৎসাহিত হয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত জোরে বল

করতে শুরু করল, ফলে একটি বলও ঠিক জায়গায় পড়ল না। গদাই তিনটি বাউন্ডারি সংগ্রহ করে নিল মিড উইকেট থেকে।

ওভার শেষে অধিনায়ক সত্যশেখরকে বলল, "আপনি আর এখানে থেকে কী করবেন, বল তো সব যাচ্ছে ওইদিকে, আপনি বরং ওইদিকের বাউন্ডারির কাছে গিয়ে দাঁড়ান। ছোটাছুটি করতে না পারেন ক্যাচ তো ধরতে পারবেন।"

ভুবন ডাক্তারের দেখানো আঙুলের নির্দেশে সত্যশেখর 'ওইদিকের' অর্থাৎ স্কোয়্যার লেগ বাউন্ডারির ধারে গিয়ে দাঁড়াল। চণ্ডীর বল গ্লান্স করে ফাইন লেগ বাউন্ডারিতে পাঠাল খোকন। সত্যশেখর ছোটার মতো একটা চেষ্টা করে দাঁড়িয়ে পড়ল। গ্যালারিতে বিদ্রূপাত্মক "ধুস্‌স্‌স্‌" ধ্বনি উঠল। শুধু একটা তীক্ষ্ণস্বর শোনা গেল, "ওরে এটাকে দড়ি বেঁধে মাঠে চরাতে নিয়ে যা।"

সত্যশেখর শুনল এবং লাল হয়ে উঠল তার মুখ, মনে মনে বলল, বলবেই তো নির্ঘাত বকদিঘির লোক। ঠিক আছে এবার বল এলে দৌড়োব। চণ্ডীর পরের বলে সোজা ড্রাইভ এবং চার, হাঁফ ছাড়ল সত্যশেখর, তার দিকে বল না আসায়। লং অফে আর লং অনে অ্যাকাডেমির দুটো ছেলে, তাদের মাঝ দিয়ে বলটা গেছে।

সত্যশেখর প্রার্থনা করল খোকন সব বল সিধে সিধে কি অফ সাইডে যেন মারে। পরের বল খোকন কাট করল থার্ডম্যানে, দুটো রান পেল। সত্যশেখর আকাশে মুখ তুলে চোখ বন্ধ করে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। পরের বল কভারে ঠেলে "রান" বলেই খোকন সিঙ্গল নিতে দৌড়োল। মেজবাবু ছুটে গিয়ে বল তুলতে গিয়ে ফসকাল। গ্যালারির দক্ষিণ দিকে "ধুস্‌স্‌স্‌" শুনেই মেজবাবু কটমট করে তাকাতেই দক্ষিণদিক বোবা হয়ে গেল।

চণ্ডীর শেষ বলটা খেলতে তৈরি গদাই জানা। অধিনায়ক হাত নেড়ে সত্যশেখরকে পিছিয়ে বাউন্ডারি লাইনের ধার ঘেঁষে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল। সবাই জানে বাঁ দিকে ছাড়া গদাই বল মারে না বা মারতে পারে না। চণ্ডীর বলটার লেংথ ও লাইন নিখুঁত ছিল, গদাই বাঁ হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে ঝাঁটা চালাবার মতো ব্যাট চালাল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ব্যাটটা বলের সঙ্গে লেগেও গেল।

উঁচু হয়ে রামধনুর মতো উঠে বাঁকা হয়ে বলটা নামছে। সত্যশেখর প্রথমে ভাবল বলটা তার মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে, তারপরই মনে হল যাবে

না। গ্যালারি থেকে রব উঠল, "ক্যাচ ক্যাচ, ধরুন ধরুন," বলের অবতরণ পথ দেখে তার বুক হিম হয়ে গেল— সোজা তার মাথা লক্ষ্য করে নামছে! ভাবল, এক পা এগিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব না ধরার জন্য হাত পাতব! ভাবা শেষ করার আগেই তাকে মাথার ওপর দুটি তালু রেখে মাথাটাকে বাঁচানোর নির্দেশ পাঠাল মস্তিষ্ক।

বল তালুর ওপর পড়ে ছিটকে বাউন্ডারি লাইন টপকে গেল। গ্যালারিতে উঠল হাহাকার। সত্যশেখর বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে। চণ্ডী এগিয়ে এসে বলল, "আপনার বোধহয় আঙুলে লেগেছে, ভেঙেও যেতে পারে।"

সত্যশেখর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনি বলছেন ভেঙেছে?"

"হ্যাঁ, যেভাবে বলটা হাতের ওপর পড়ল তাতে তো আঙুল ভাঙারই কথা। ডাক্তারবাবুকে একবার দেখান।"

ভুবন ডাক্তার এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "চণ্ডী কিছু হয়েছে? কীরকম দেখলে?"

নতুন ওভার শুরু বন্ধ রইল। আম্পায়াররা ওদের কাছে এসে বললেন, খেলা বন্ধ রয়েছে। চিকিৎসার দরকার হলে মাঠের বাইরে যান, সময় নষ্ট হচ্ছে।

"ডাক্তারবাবু আপনি একটু দেখুন তো, মনে হচ্ছে হাড় ভেঙেছে।"

"আমি আবার দেখব কী, আমি হাড়ের ডাক্তার নই। বকদিঘির প্যাভিলিয়নে আছে অমল বিশ্বাস, হাড়ের ডাক্তার। সতুবাবু, আপনি ওর কাছে যান।"

সত্যশেখর দু'হাতের আঙুল বারবার মুঠো করে, আঙুল মটকে বলল, "বকদিঘির ডাক্তারকে দিয়ে দেখালে আপনার চেম্বার কিন্তু পটল হালদার আস্ত রাখবে না, সেটাই কি চান?"

চমকে উঠে ডাক্তার ভুবন রায় বলল, "না না না, আপনার হাত ঠিক আছে, কাউকে দেখাতে হবে না, বরং উইকেটকিপারের পিছনে চলে যান। আপনার ভাইঝি তো বলটল ফসকাচ্ছে না, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।"

পনেরো ওভার সম্পূর্ণ হতে হল জলপান বিরতি। পনেরো ওভারে বকদিঘি দুই উইকেটে একশো সাঁইত্রিশ। ওভার পিছু রান গড়ে নয় দশমিক এক চার। খোকন একষট্টি, গদাই পঁয়তাল্লিশ। বাই শূন্য, ওয়াইড ষোলো, নো বল পনেরো।

স্কোরবোর্ড দেখে অধিনায়ক তাঁর কম্পাউন্ডারকে বললেন, "চণ্ডী, মনে

হচ্ছে রানরেটটা ঠিকই আছে। গতবার পনেরো ওভারে কত ছিল মনে আছে?"

"এগারো পয়েন্ট টোয়েন্টি।"

"তিরিশ ওভারে কত হবে মনে হয়?"

চণ্ডী চোখ বন্ধ করে ভেবে বলল, "এই খোকন ব্যানার্জি আউট না হলে ছত্রিশ ওভারে তিনশোও হতে পারে।"

"আউট হলে?"

"দেড়শোও হতে পারে, একশো সত্তরও হতে পারে।"

"তোমার এখনও দুটো ওভার বাকি, স্লগ ওভারের জন্য।"

সত্যশেখর তখন কলাবতীকে বলছে, "কালু একটা ক্যাচ ধরে হাততালি পেলুম, আর একটা ক্যাচ ফেলে গালাগালি। প্রথমটার কথা কয়েক মিনিটেই বেমালুম ভুলে গেল!"

কাকার চোখে বিস্ময় দেখে কলাবতী বলল, "তুমি তিনটে সিক্সার মারো, দেখবে আবার হাততালি পড়বে। গালাগালি আর হাততালি দেওয়ার জন্যই এরা মাঠে আসে।"

"তা তো বুঝলাম কিন্তু এই খোকন তো বোলার, এত ভাল ব্যাট করছে কী করে বল তো?"

"ওকে ইন্ডিয়া টিমে ঢুকিয়ে দাও, দেখবে ব্যাট করতে ভুলে গেছে।"

জলপানের পরই বকদিঘি ১৩৭-৩ হয়ে গেল। গদাই পুল করল রতুর ফুলটস, ব্যাটের কানায় লেগে শর্ট থার্ডম্যানে ক্যাচ উঠল। সেখানে লোক নেই। কলাবতী তিরবেগে প্রায় কুড়ি মিটার ছুটে দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর বল ধরা একটা হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল "হাউজাট।"

বাকরহিত হয়ে রইল অবাক মাঠ। কত বছর ধরে এই বাৎসরিক ম্যাচ হচ্ছে, কোনও উইকেটকিপার এই মাঠে এইভাবে ক্যাচ ধরেনি। একটা বাই রানও স্কোরবোর্ডে ওঠেনি। বকদিঘির আম্পায়ার বোলার প্রান্তে। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাস।

ক্যাচটা ঠিক ধরেছে তো? জমিতে পড়ার পর তুলে নেয়নি তো? বকদিঘির আম্পায়ার ঠিকঠাক বিচার করবে তো? আটঘরার সমর্থকদের মনে অজস্র প্রশ্ন। গদাই একদৃষ্টে আম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে। কলাবতী হাতে বলটা নিয়ে লোফালুফি করছে নির্বিকার মুখে, সে নিশ্চিত পরিচ্ছন্নভাবেই ক্যাচটা নিয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে আম্পায়ার আঙুল তুললেন।

উল্লাসে ফেটে পড়ল মাঠের অর্ধেক দর্শক। প্রথমেই ছুটে এল অধিনায়ক। কল্যাবতীর পিঠ চাপড়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক ক্যাচ মাই বয়, অসাধারণ।"

চণ্ডী বলল, "ডাক্তারবাবু, বয় না, গার্ল।"

"ইয়েস। ইয়েস গার্ল, মাই গার্ল।"

সত্যশেখর ফিসফিস করে বলল, "কালু, আমি ইন্‌সপায়ার্ড। সিংহিদের মান বাঁচালি।"

"কাকা মনে রেখো, জিতব বলে দাদু চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।"

রাজশেখর চোখ রেখেছিলেন সোফায় বসা পটল হালদারের দিকে। তাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে তিনি চাপা গর্জন করলেন, "পটল! পাঞ্জাবি খুলবে না।"

পটল হালদার করুণ মুখে বলল, "বড়বাবু, এমন একটা ক্যাচ। একটু সেলিব্রেট করব না? আটঘরা তো একটা নতুন জিনিস দেখল!"

"নতুন জিনিসটা তোমার ভোটের সময় কাজে লাগিয়ো, তবে এখন নয়।"

অপুর মা পাশে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, "লোকটা চলে এল যে, কালুদিদি কি ওকে মোর করল?"

"করল।"

"হ্যাঁ কত্তাবাবা, ইস্কুল থেকে ফিরলে শকুন্তলা ঠিকঠাক জলখাবার দেয় তো কালুদিকে?"

"দিলে কী হবে, খায় না তো। তুমি থাকলে তবু আচার, হজমি, ফুচকা এসব বন্ধ থাকে।" রাজশেখর আড়চোখে অপুর মা'র মুখের দিকে তাকালেন। মুখটা থমথমে হয়ে যেতে দেখে বললেন, "তুমি নেই তাই কালু সাপের পাঁচ পা দেখেছে।"

অপুর মা হাতের থলিটা তুলে বলল, "যাই একবার। সাপের দশ পা দেখাব।"

নতুন ব্যাটস্‌ম্যান অতুল মুখুজ্যে মাঠে নেমে খোকনকে দুটো কথা বলে ক্রিজে এসে গার্ড নিল। সাতবার বাৎসরিক ম্যাচ খেলেছে। রীতিমতো প্রবীণ। সাতবারে সর্বোচ্চ রান তেত্রিশ। এবার তারই অধিনায়ক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম মিলেনিয়াম ট্রফিটা হাতে তুলে নেওয়ার লোভ সংবরণ করতে না পেরে পতু এই বছরের ম্যাচে অধিনায়ক পদ থেকে নিজেকে সরায়নি।

রতুর এই বলটাও জোরের ওপর এবং ফুলটস। অতুল প্রথম বলটাই আচমকা পেটের সামনে দেখে ব্যাট পেতে দিল। বল গেল সোজা রতুর হাতে। চটপটে ছেলে, ক্যাচ ধরেই লাফিয়ে উঠল।

দু'হাত তুলে ছুটে গেল ডাক্তার।

"ফ্যান্টাস্টিক মাই বয়, ফ্যান্টাস্টিক।" বলেই চণ্ডীর দিকে তাকাল। চণ্ডী অনুমোদন জানিয়ে মাথা কাত করল। "দু'বলে দুটো উইকেট। এবার একটা হ্যাটট্রিকের বল দাও।"

ডাক্তার সাতজন ফিল্ডার রাখল নতুন ব্যাটসম্যান পতু মুখুজ্যেকে ঘিরে। উত্তেজনায় মাঠের দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠেছে। রতুর মুখ শুকনো, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। এত লোক তার দিকে তাকিয়ে, এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। চণ্ডী শর্টলেগ থেকে কাছে এসে কানে কানে বলল, "আর একটা ফুলটস দে অফ স্টাম্পের বাইরে।" শুনে রতু ঘাড় নাড়ল।

অধিনায়ক সিলি পয়েন্ট থেকে এগিয়ে গেল রতুর দিকে। ওর কানে মুখ রেখে বলল, "লেগ স্টাম্পের দু'ইঞ্চি বাইরে থ্রি কোয়ার্টার লেংথে।" শুনে রতু মাথা কাত করল।

মেজবাবু সিলি মিড অন থেকে ছুটে গেল রতুর কাছে। আঙুল তুলে বলল, "কিছু করতে হবে না, শুধু একটা ইয়র্কার দাও।" রতু ঢোক গিলে মাথা নাড়ল।

সবাই তৈরি। পতু মুখুজ্যে স্টান্স নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কী দেখে তিন পা বেরিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পিচ থেকে একটা বালির কণা খুঁটে তুলে ছুড়ে ফেলে দিল। ক্রিজে ফিরে আবার স্টান্স নিল। রতু বল করতে দৌড় শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মাঠের চারধার থেকে "হা আ আ আ" চিৎকার উঠল।

ডেলিভারিটা রতুর হাত থেকে বেরিয়ে পতুর মাথার ওপর দিয়ে কলাবতীর লাফিয়ে ওঠা গ্লাভ্স টপকে, ব্যাক স্টপার সত্যশেখরের দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে বাউন্ডারিতে পৌঁছোল। আম্পায়ার ওয়াইড সংকেত জানালেন। রতু মাথা নামিয়ে রইল। পতুর সামনের দাঁত বেরিয়ে এল। সে হাসছে।

"ইডিয়ট গবেট।" ভুবন ডাক্তার দাঁত চেপে গজরাল।

পতু বাকি তিনটে বল ব্যাটে খেলে আটকাল। ইনিংস এখন ১৩৭-৪। ষোলো ওভার হয়ে গেছে। পতুর পর আর রান করার মতো কেউ নেই। রান তোলার দায়িত্ব এবার নিল খোকন, পলাশ আর অনিন্দ্যর বল থেকে তিরিশ বলে তুলল তিরিশ রান। তার ব্যক্তিগত রান দাঁড়িয়েছে একানব্বই। পতুর

দশ। বকদিঘির স্কোর ১৭৭-৪। এতকাল পর্যন্ত বাৎসরিক ম্যাচে বকদিঘির কেউ সেঞ্চুরি করেনি। এবার একজন করবে।

এইসময় কলাবতীর মনে পড়ল কয়েকদিন আগে পড়া ব্র্যাডম্যানের 'ফেয়ারওয়েল টু ক্রিকেটে'-র একটা ঘটনা। ব্র্যাডম্যান ব্যাট করছেন ৯৯-এ। আর একটা রান করলেই তাঁর জীবনের একশোটা সেঞ্চুরি পূর্ণ হবে। খুবই সাবধানি তখন। মনেও উদ্বেগ। সেটা বুঝে বিপক্ষ অধিনায়ক ভারতের লালা অমরনাথ একটা কূট চাল চাললেন। বাউন্ডারির ধারে ফিল্ড করছিলেন কিষেণচাঁদ। তাঁকে ডেকে হাতে বল তুলে দিলেন। কিষেণচাঁদ বল করেন না, ব্যাটসম্যান। ব্র্যাডম্যান কখনও তাঁর বল খেলেননি। বেশ অবাক হলেন একটু অস্বস্তিতেও পড়লেন। একদম অজানা বোলার ঠকিয়ে দিতে পারে। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তিনি কিষেণচাঁদের তিনটি বল হুঁশিয়ার হয়ে খেলে অবশেষে মিড অন থেকে একটি রান নিয়ে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন।

কলাবতীর মনে হল ডাক্তারবাবু তো এখন অমরনাথের চালটা চালতে পারেন। মেজ দারোগাবাবু এখনও ম্যাচে বল করেননি, কী বল করেন কেউ তা জানে না, কলাবতীও জানে না। এমন এক বোলারের সামনে পড়লে খোকন ব্যানার্জি বিভ্রান্ত বোধ করে আউট হয়েও যেতে পারে। পৃথিবীর কত বড় বড় ব্যাটস্‌ম্যান বাজে বলে আউট হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

কলাবতী অধিনায়ককে গিয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব? এবার মেজবাবুকে দিয়ে একটা ওভার বল করান।"

"বলো কী!" ভুবন ডাক্তার যেন এই প্রথম ম্যালেরিয়ার রুগি দেখল। "একানব্বই করে সেট হয়ে গেছে, এখন তো ও মেজবাবুকে রসগোল্লার মতো গিলে খাবে।"

"নাও খেতে পারে, একটা ফাটকা খেলে দেখুন না!"

"হুম্‌মম্‌। ফাটকা?" ডাক্তার চোখ বন্ধ করে কপালে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বলল, "ঠিক আছে।"

মেজবাবুকে ডেকে অধিনায়ক প্রথমেই বললেন, "আপনি কী বল করবেন, শুনেছি স্পিন করান, লেগ না অফ?"

"দুটোই করতুম?"

"কবে করেছেন?"

"স্কুলে পড়ার সময়।"

"তা হলেই হবে, ফিল্ড কী সাজাব?"

"এগারোজনকেই বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে দিন।"

"উইকেটকিপারকেও?"

"ইচ্ছে হলে তাও দিতে পারেন।"

অধিনায়ক আটজনকে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে নিজে দাঁড়াল স্লিপে। খোকন অবাক হয়ে ফিল্ড সাজানো দেখে কলাবতীকে বলল, "বোলারটা কী বল করে?"

"আমি ওকে আগে দেখিনি।" সংক্ষিপ্ত জবাব কলাবতীর।

সে স্টাম্প থেকে চার গজ পিছিয়ে দাঁড়াল। মেজবাবু চার পা হেঁটে এসে যে বলটা করল সেটা শূন্যে উঠতে উঠতে খোকনের মাথার আট হাত ওপরে উঠে নামতে লাগল ঠিক মাথা লক্ষ্য করে। মুখ আকাশে তুলে বলে চোখ রেখে খোকন পিছোচ্ছিল। ডান পা, বাঁ পা, ডান পা, এবার গোড়ালিটা অফ স্টাম্পে লাগল এবং তাতেই একটা বেল পড়ে গেল। সবাই মুখ তুলে বল দেখছিল, কেউ লক্ষ করেনি ব্যাপারটা, শুধু কলাবতী আর লেগ আম্পায়ার ছাড়া।

"হাউজ দ্যাট।"

মেয়ে গলার সুতীক্ষ্ণ চিকন স্বর শুনে মাঠের সবাই চমকে তাকাল কলাবতীর দিকে। সে দৌড়ে স্টাম্পের কাছে এসে বেলটা তুলে ধরে স্কোয়্যার লেগ আম্পায়ারকে দেখিয়ে আবার আবেদন জানাল, "হাউজ দ্যাট।"

আম্পায়ার আঙুল তুললেন।

"ইস্‌স্‌।" মুখ বিকৃত করে খোকন জিভ কাটল। কলাবতীর দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভ হাসল।

"ব্যাড লাক।" বলল কলাবতী।

হইচই পড়ে গেল মাঠ ঘিরে। হিট উইকেট আউট আটঘরা আগে কখনও দেখেনি। অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কী হল? আউট কেন? এ কেমন আউট?"

ডাক্তারবাবু ছুটে এসে মেজবাবুর পিঠ চাপড়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক মাই বয়, ফ্যান্টাস্টিক। চণ্ডী, দেখলে তো, বোলিং চেঞ্জটা কেমন করলুম। প্রথমে ভেবেছিলুম তোমাকে বল দেব, তারপর কী মনে হল— থাক মেজবাবুকেই দিই।"

মেজবাবুর পরের বলেই নবাগত মুকুন্দ মালখণ্ডি তিন রান পেল ওভার থ্রো থেকে। অনিন্দ্য মিড উইকেট থেকে বল ছুড়েছিল, মেজবাবু ধরতে

পারেনি। পতু এখন স্ট্রাইকার। মেজবাবু আবার তাঁর আকাশচুম্বী বল করলেন। পিচের মাঝামাঝি পড়ছে বলটা। পতু ঠিক করতে পারছে না কী করবে। ক্রিজ থেকে বেরোবে কি বেরোবে না, মন স্থির করতে করতেই বল পড়ল জমিতে তারপর একটা ড্রপ খেয়ে এল কলাবতীর হাতে।

একটা ওভার বাউন্ডারি মারার বল নষ্ট হল। পতু সখেদে মাথা নেড়ে তৈরি হল ব্যাট হাতে। এবারের বলটা আগেরটার মতোই। পতু স্থির করেই রেখেছিল ছ'টা রান এবার নেবেই। ব্যাট তুলে সে প্রায় হেঁটেই বেরোল ক্রিজ থেকে বলের পিচের কাছে পৌঁছোবার জন্য। ব্যাটটা প্রচণ্ড বেগে নেমে এল। কিন্তু বলে লাগল না, একটা খোদলে পড়ে বল সরে যেতেই সে ফসকে গেল। ক্রিজে ফিরে আসার চেষ্টায় সে ঘুরে ঝাঁপ দিল ব্যাটটা বাড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু ততক্ষণে কলাবতী স্টাম্পিং-এর কাজটা সেরে ফেলেছে।

বকদিঘির ইনিংস সাতাশ ওভার এক বলে শেষ হল ১৯১ রানে। মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার সময় সত্যশেখর জিজ্ঞেস করল, "কালু, কী বুঝলি?"

"বুঝলুম, এতকাল ক্রিকেট সম্পর্কে কিছুই জানতুম না, দিব্যজ্ঞান হল।"

নিয়মানুযায়ী যে যার নিজের লাঞ্চ। আটঘরার লাঞ্চ স্পনসর করেছে কালীমাতা কোল্ড স্টোরেজ। সারা মাঠ ঘিরে কোল্ড স্টোরেজের সাতটা ফেস্টুন। লাঞ্চ রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে বকু বোস। এই নিয়ে অফিশিয়াল কেটারার হাবু মোদক বিস্তর ক্ষোভ জানিয়ে বলেছে, "আর আমি ফ্রি-তে দই মিষ্টি দেব না, তাতে বিশু টিমে চান্স পাক না বা নাই পাক।" বিশু হাবুর ছেলে।

টেব্‌লে প্লেট সাজানো। সকালে ভাজা লুচি দিস্তা করে রয়েছে একটা ঝুড়িতে। ছোট স্টিলের বালতিতে রুইমাছের কালিয়া, গামলায় টম্যাটোর চাটনি, কাগজের বাক্সে সন্দেশ, মাটির হাঁড়িতে রাজভোগ, স্তূপাকার সিঙ্গাপুরি কলা টেব্‌লের একধারে। পরিবেশনে ব্যস্ত ভলান্টিয়াররা।

পাশাপাশি বসেছে সত্যশেখর ও কলাবতী।

"কালু, লুচির অবস্থা দেখেছিস, মনে হচ্ছে ম্যালেরিয়া হয়েছে।"

"বেশি খেয়ো না, তুমি তো ওপেন করবে। মিষ্টির বোধহয় জন্ডিস হয়নি।"

"দেখলুম মলয়ার হাতে ক্যামেরা, খুব ছবি তুলছে। আমার ক্যাচ ধরাটাও নিশ্চয় তুলেছে।"

"বলতে পারব না। তবে মাথায় বল পড়াটা তুলেছেন, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

"আমিও। এমন সুযোগ বকদিঘির মেয়ে ছাড়বে না। তুই দেখিস ছবিটার একটা কপি আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে।"

লাঞ্চ শেষে ওরা দু'জন প্যাভিলিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে দেখল রাজশেখর আর অপুর মা কোথাও নেই!

"গেল কোথায় ওরা?" কলাবতী বলল।

"যাবে আর কোথায়, হয়তো চাওমিন কি রোল খেতে গেছে। টিমে না থাকলে প্লেয়ারদের সঙ্গে লাঞ্চ করা বাবা একদম পছন্দ করেন না।"

তক্ষুনি রাজশেখর আর অপুর মা এসে হাজির, সেইসঙ্গে অপুও।

"অপু বলল, চনমন খাব। কত্তাবাবা ওকে টাকা দিয়ে বললেন, যা খেয়ে আয়, আমাকে বললেন, তুমিও খাবে নাকি? বললুম, আগে চোখে দেখি।" অপুর মা'র কথার বাঁধ ভেঙে গেছে। বন্যার মতো কথা বেরিয়ে আসছে। ভেসে যাওয়ার আগেই সত্যশেখর বলল, "তোমরা কথা বলো, আমি তৈরি হই। কালু, তুই কত নম্বরে?"

"ছয় না সাত, দেখে নিতে হবে। কাকা, মনে রেখো জিততে হলে একশো বিরানব্বই করতে হবে একশো আশি বলে।"

গম্ভীর মুখে সত্যশেখর ভিতরে ঢুকে গেল। অপুর মা তারপর শুরু করল, "কী ভিড় কী ভিড় চনমনের দোকানে! কাছে যেতে পারি না। একটা মেয়ে দেখি ডিশে করে খাচ্ছে নাড়িভুঁড়ির মতো কী যেন, তাতে দুটো গাজর কুচি, বাঁধাকপি পাতা, পেঁয়াজ আর বলল তো কুচো চিংড়িও নাকি রয়েছে, আমি তো বাপু দেখতে পেলুম না। কাদার মতো কী একটা মাখিয়ে গপ গপ করে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি কী আনন্দ করে যে খাচ্ছে! দেখে গা গুলিয়ে উঠল। অপুকে বললুম খেতে হয় তো তুই খা, বলামাত্র ছেলে ছুটল কেনার জন্য। কত্তাবাবা বললেন, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, চলো আমরা হাবুর মিষ্টির দোকানে যাই।

"হাবুর দোকানে গিয়ে দেখি মাছি তাড়াচ্ছে। কাচের আলমারি ভরতি সন্দেশ রাজভোগ ল্যাংচা পড়ে রয়েছে। বলল, একশো গ্রাম দইও বিক্রি হয়নি সকাল থেকে, ভটচাজবাড়িতে জামাই আসবে তাই আটটা ল্যাংচা আর রাজভোগ বিক্রি হয়েছে। কালুদি, তোমার খাওয়া হয়েছে? আমি গুনেছি তুমি তিনজনকে মোর করেছ।"

অপুর মা'র কথার বন্যা রুখতে কলাবতী বোল্ডার ফেলল। "পিসি দেখি গিয়ে, কাকা কেমন তৈরি হচ্ছে। তুমি বোসো।"

ঝড়ের মতো পটল হালদার প্যাভিলিয়নে ঢুকল। "হারিআপ হারিআপ, আম্পায়াররা নেমে পড়েছে। এই যে শঙ্কর, তোমার পার্টনার সতুবাবু কোথায়?" প্লেয়ার্স রুমে সে উঁকি দিয়ে দেখল সত্যশেখর চেয়ারে বসে প্যাডের স্ট্র্যাপ আঁটার জন্য নিচু হওয়ার চেষ্টা করছে।

তাকে দেখে সত্যশেখর বলল, "লাগিয়ে দিন তো।"

শঙ্কর আর সত্যশেখর যখন মাঠে নামছে, ভুবন ডাক্তার এগিয়ে এসে বলল, "বেস্ট অফ লাক। ফার্স্ট তিনটে ওভার উইকেটের পেস আর বাউন্স বুঝে নিয়ে তারপর চালিয়ে খেলবেন, শঙ্কর একদিক ধরে থাকবে।"

বকদিঘির ইনিংসে প্রথম বলেই ছিল নাটক, আটঘরার ইনিংসেও তাই হল। খোকন ব্যানার্জি কদম মেপে বোলিং মার্কে গিয়ে বুট দিয়ে জমিতে আঁচড় কাটল, আম্পায়ারের কাছ থেকে গার্ড নেওয়ার তোয়াক্কা না করে সত্যশেখর ব্যাটটা জমি থেকে একহাত তুলে রেখে উদ্ধত ভঙ্গিতে বোলারের দিকে তাকিয়ে রইল।

খোকন শর্ট লেংথে অল্প আউটসুইং করিয়ে প্রথম ডেলিভারিটি দিল। লেগ স্টাম্প বরাবর পিচ পড়ে বলটা আচমকা লাফিয়ে উঠে যেন আরও গতি সঞ্চয় করে ফেলল। সত্যশেখর মাথাটা সরিয়ে নিতে দেরি করায় বলটা তার কপালের ডান দিকে লেগে 'খটাস' শব্দ তুলে স্লিপে ফিল্ডারদের মধ্য দিয়ে বাউন্ডারিতে পৌঁছে গেল। চশমাটা ছিটকে পড়েছে ক্রিজের ওপর।

সারা মাঠ বিস্ময়ে বিমূঢ়! সত্যশেখরের কপাল থেকে ঝরঝরিয়ে রক্ত ঝরছে। সাদা শার্টটার বুক কাঁধ লাল হয়ে গেল। ছুটে এসে একজন রুমাল দিয়ে আঘাতের জায়গাটা চেপে ধরল।

"চশমায় লাগলে চোখটা যেত।" একজন ভীতস্বরে বলল।

রুমালটা কপালে চেপে ধরে সত্যশেখর ফিরে এল। দু'জন ফিল্ডার তার দুই বাহু ধরে পৌঁছে দিল মাঠের সীমানা পর্যন্ত। অপুর মা প্রথম ছুটে গেল, সঙ্গে কলাবতী। রাজশেখর সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, "ডাক্তারবাবু দেখুন তো। খুব লেগে থাকলে এখুনি কলকাতায় নিয়ে যাব।"

সত্যশেখর হাত তুলে বলল, "ব্যস্ত হোয়ো না। কিছু হয়নি।"

সোফায় বসে চোখ বন্ধ করল সত্যশেখর। ভুবন ডাক্তার রুমাল সরিয়ে ক্ষতস্থান দেখে ব্যস্ত হয়ে পটলকে বলল, "তুলো দিন তুলো, আগে রক্ত পড়া

বন্ধ করতে হবে।" পটল ভিতরে ছুটল হন্তদন্ত হয়ে।

পাশের প্যাভিলিয়ন থেকে ছুটে এসেছে মলয়া আর হরিশঙ্কর। নিচুগলায় রাজশেখর বললেন, "বলটা ভালই করেছিল। সতু ডাক করতে পারল না। কী আর করা যাবে।"

একই স্বরে হরিশঙ্কর বললেন, "তাই বলে অমন করে লাফিয়ে উঠবে! নিশ্চয় জলটল দিয়ে, ঠিকমতো রোল করা হয়নি। পিচ তৈরির ব্যাপারটা তোর ক্রিকেট জানা ভাল কোনও লোকের হাতে দেওয়া উচিত ছিল।"

"আটঘরায় রোলার নেই, রোল করবে কোত্থেকে?" রাজশেখর অসহায় মুখে বললেন।

"বকদিঘিতে আছে, পরের বার বলিস পাঠিয়ে দোব।"

পটল একটা জুতোর বাক্স হাতে নিয়ে এল। লাল কালি দিয়ে তার ঢাকনায় ক্রস চিহ্ন আঁকা, এটাই মেডিক্যাল বক্স। তুলো, ব্যান্ডেজ, বেঞ্জিন, ডেটল, মলমের টিউব, লিউকো প্লাস্টার তার মধ্যে।

সত্যশেখর আহত হয়ে ফিরে আসায় তার জায়গায় নেমেছে কম্পাউন্ডার চণ্ডীচরণ রায়। মাঠের দিকে কারুর নজর নেই, সব চোখ সত্যশেখরে নিবদ্ধ। মলয়া তুলো, ডেটল দিয়ে কপাল গাল গলা থেকে রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে মৃদু স্বরে অনুযোগ করে বলল, "কী দরকার ছিল গোঁয়ারের মতো এই ম্যাচে খেলতে নামার!"

বন্ধ চোখের একটা খুলে সত্যশেখর বলল, "ভাড়াটে প্লেয়ার দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না, এটা তা হলে প্রমাণ করব কী করে?"

দর্শকদের হতাশ ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল মাঠ ঘিরে। ডাক্তারবাবু চণ্ডীকে ফিরে আসতে দেখে বলল, "বিশু, এবার নেমে পড়ো।"

বিশু একপায়ে প্যাড পরে ব্যাট হাতে শ্যাডো করছিল। অবাক হয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু, আমি তো পাঁচ নম্বরে!"

ডাক্তার গম্ভীর স্বরে বলল, "দেখছ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি। আমার জায়গায় তুমি এবার যাও।" তারপর মাঠের ওপাশের স্কোর বোর্ডের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মতো বলল, "এগারো রান দু' উইকেটে। চণ্ডীর সাত রান।"

সত্যশেখর সোফায় হেলান দিয়ে ছিল, সিধে হয়ে বসল, "দু' উইকেট নয় এক উইকেট। আমি এখনও আউট হইনি।"

মলয়া অবাক চোখে বলল, "হওনি মানে! আবার ব্যাট করবে?"

"অফ কোর্স। এখনও প্যাড খুলিনি। ডাক্তারবাবু ব্যান্ডেজ জম্পেশ করে বাঁধুন তো।"

ডাক্তার কপালের উপর দিয়ে মাথা ঘিরে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে ব্যান্ডেজের শেষ প্রান্তটা হাতে ধরে রেখে বললেন, "দুটো সেফটিপিন দেখি।"

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করল। পটল জুতোর বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করে মাথা নাড়ল। কলাবতী ছুটে ভেতরে গিয়ে তার ছোট কিটসব্যাগটা নিয়ে এল। এর মধ্যে সে বাবুদার পরামর্শ মতো টুকটাক দরকারি জিনিস— ব্লেড কাঁচি সুচ সুতো বোতাম সেফটিপিন প্লাস্টার ইত্যাদি—রাখে। খেলার সময় হঠাৎ কখন কী দরকার পড়ে কে জানে!

ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। এটা কী? জিনিসটা বার করল। মলয়ার দেওয়া ঝাল আমের আচারের সেই ছোট শিশিটা। কাকার হাত বা জিভের থেকে বাঁচাবার জন্য সে এই খেলার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। এই ভেবে, কাকা যেখানেই খুঁজুক না কেন, খেলার ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাবে না।

শিশিটা সে বাঁ হাতে ধরে ডান হাতটা ব্যাগে ঢুকিয়ে আবার সেফটিপিন খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল। সত্যশেখর তখন একদৃষ্টে কলাবতীর বাঁ হাতের দিকে তাকিয়ে। ডাক্তারবাবু ব্যান্ডেজে সেফটিপিন লাগিয়ে দিল।

"কালু, তোর হাতে ওটা কী রে, দেখি।" সত্যশেখর হাত বাড়াল।

কলাবতী হাত টেনে নিতে যাচ্ছিল, সত্যশেখর খপ করে হাতটা ধরে ফেলে শিশিটা ছিনিয়ে নিয়েই প্যাঁচ ঘুরিয়ে ঢাকনা খুলল। গন্ধটা শুঁকেই একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে যতটা আচার তোলা যায় তুলে মুখে পুরে দিল। চোখ বুজে চুষতে চুষতে আবার আঙুল ঢোকাল।

"আহ্‌হ্‌হ্‌ এটা আগের থেকেও ঝাল। আ হ্‌ হ্‌ হ্‌। কালু, ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলছে রে। উ হু হু হু।" সত্যশেখর জিভ বার করে মুখে বাতাস ঢোকাতে লাগল।

আতঙ্কিত কলাবতী বলল, "কাকা, এখানে বরফ নেই!"

"না থাক, কিছু আসে যায় না।" বলেই সত্যশেখর দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "ডাক্তারবাবু এবার আপনি নন, আমি নামব।"

সবাই হতভম্ব। ফ্যালফ্যাল চোখে দেখল সত্যশেখর আহত সিংহের মতো পায়চারি করছে আর বারবার অধৈর্য দৃষ্টিতে মাঠের দিকে তাকাচ্ছে। পারলে এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন।

বিশুর মারা ওভার বাউন্ডারি আটঘরা প্যাভিলিয়নের সামনে পড়ল। অতুল মুখুজ্যের এই ওভারে এটি তার তৃতীয় ছয়। তার নিজের রান এখন সাতাশ, শঙ্করের চোদ্দো। সে ছোটখাটো দুর্বল গড়নের ছেলে। তুলে বল মারে না। এক-দুই রান নিয়ে খেলে, সাত ওভারে আটঘরার স্কোর এগারো বাই রান ও দুই ওয়াইড সহ একষট্টি রান। খোকনকে তুলে রেখেছিল পতু প্রথম ওভার শেষ হতেই। দর্শকদের ধিক্কার ও আপত্তি প্রবলভাবে মাঠে আছড়ে পড়তে শুরু করেছিল সত্যশেখরের মাথায় বল লেগে রক্ত পড়া দেখে।

অতুলের ওভার শেষ হতেই পতু বল করার জন্য ডাকল খোকনকে। মাঠ ঘিরে আপত্তির ঝড় উঠলেও পতু তা গ্রাহ্য করল না। খোকনের প্রথম বলেই বোল্ড হল শঙ্কর। সত্যশেখর আম্পায়ারের তোলা আঙুল দেখেই ব্যাটটা তুলে নিয়ে হাঁ করে জিভ জুড়িয়ে নিতে নিতে মাঠে ঢুকে পড়ল।

কলাবতী চেঁচিয়ে বলল, "কাকা, গ্লাভ্‌স নাও।"

"দরকার নেই।" মুখ ফিরিয়ে বলল সত্যশেখর।

শঙ্কর তখনও আউট হওয়ার শোকে মুহ্যমান। ক্রিজে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। এর আগে এই পর্যায়ের বোলারের বল সে খেলেনি। ক্রিজ থেকে সে প্যাভিলিয়নের দিকে রওনা হচ্ছে তখন পৌঁছে গেল সত্যশেখর। গার্ড নেওয়ার বালাই নেই। ব্যাটটা তুলে রেখে সে তাকাল বোলারের দিকে। সে মাঠে নামামাত্র তার ব্যান্ডেজে মোড়া মাথা দেখে দর্শকরা কয়েক সেকেন্ড হতবাক থেকে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে হাততালি দিয়ে সংবর্ধিত করেছিল। খোকন যখন ডেলিভারি দেওয়ার জন্য দৌড় শুরু করল তখনও হাততালির উতরোল চলছে।

খোকনের প্রথম বল সোজা উড়ে গেল সত্যশেখরের ব্যাটের তাড়া খেয়ে শালিখ পাখির মতো সাদা চাদরের স্ক্রিনের উপর দিয়ে। আম্পায়ার দু'হাত তুললেন। দ্বিতীয় বল ঠিক একই ভাবে খোকনের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তৃতীয় বল পালাল মিড উইকেট বাউন্ডারির উপর দিয়ে। চতুর্থ বল পড়ল স্কোয়্যার লেগে বকদিঘি প্যাভিলিয়নের চালের উপর। পঞ্চম বল ছিল ইয়র্কার। এই প্রথম দেখা গেল সত্যশেখরের ফুট ওয়ার্ক। ডান পা একহাত পিছিয়ে বলটা হাফভলি করে নিয়ে লং অফের উপর দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে ফেলে দিয়ে পেল সাত রান। খোকন অবিশ্বাসভরে তাকিয়ে থেকে হাততালি দিতেই পতু বিরক্ত চোখে তার দিকে তাকাল। খোকন বলল, "সোবার্স ছাড়া এমন মার আর কেউ মেরেছে বলে শুনিনি।" ষষ্ঠ বলটি একটা শর্ট পিচ

অফস্টাম্পের বাইরে। সেটার গতি হল একস্ট্রা কভারের পিছনে বসা দর্শকদের মধ্যে। ছয় বলে ছত্রিশ রান! তুমুল কলরোলে আটঘরার আকাশবাতাস ভরে গেল।

ওভার শেষ হতে সত্যশেখর ডাকল বিশুকে। "এক দুই তিন একদম নয় পারো তো চার ছয় নাও। আমাকে দৌড় করালে রান আউট করে দেব।"

মুগ্ধ স্তম্ভিত বিশু ঘাড় নেড়ে ক্রিজে ফিরে গেল এবং অতুল মুখুজ্যেকে মেডেন দিল। পতু খোকনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "আর বল করবেন?" মুখ লাল করে ত্রিপুরার এগারো উইকেট নেওয়া বোলার বলল, "নিশ্চয় করব।"

খোকন বুঝে গেছে, লেগ স্টাম্পে বা তার বাইরে বল ফেললে এই ব্যাটসম্যান তাকে খুন করে ফেলবে। অফ স্টাম্পের বাইরে সে প্রথম বলটা রাখল। বলটা লেগের দিকে ঘোরাতে গেল সত্যশেখর। ব্যাটে ঠিকমতো লাগল না। বলটা প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে নির্জন লং অফ বাউন্ডারি পেরোল। মাঠ ঘিরে হতাশা ছয় দেখতে না পাওয়ায়। তবে হাততালি পড়ল, স্কোরবোর্ড দেখে আটঘরার রান একশোয় পৌঁছোনোর জন্য।

পটল ঝুঁকে রাজশেখরকে বলল, "বড়বাবু, নয় ওভারে একশো এক, তা হলে আঠারো ওভারে দুশো দুই। টার্গেট একশো বিরানব্বুই, তার মানে কুড়ি ওভারের আগেই জিতছি। সতুবাবু যদি একটা সেঞ্চুরি এবারও করেন—।"

"পটল খবরদার স্তম্ভটম্ভর কথা একদম তুলবে না। যদি ওইসব চিন্তা মাথা থেকে বার করে না দাও তা হলে এখুনি সতুকে খবর পাঠাব আউট হয়ে চলে আসার জন্য, তুমি কি সেটাই চাও?"

জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে মাথা নেড়ে পটল বলল, "একদম না, একদম না।"

তখন কলাবতী চুপিচুপি মলয়াকে—বকদিঘি প্যাভিলিয়নে বাবা ফিরে গেলেও মলয়া যায়নি—বলল, "কাকার এই পাগলের মতো ব্যাটিং কেন সেটা আমি জানি।" মলয়া কৌতূহলী চোখে তাকাতে কলাবতী বলল, "আপনার ওই একস্ট্রা ঝাল আচার খেয়ে, এর আগেও দেখেছি কাকার ইচ্ছে হয় বোলার ঠ্যাঙাতে। বড়দি বকদিঘি যদি আজ হারে, মনে হচ্ছে হারবে, তবে সেটা হবে আপনারই জন্য।"

খোকনের দ্বিতীয় বল অফ স্টাম্পের এত বাইরে দিয়ে গেল যে আম্পায়ার দু'হাত ছড়িয়ে ওয়াইড দেখালেন। সত্যশেখর মুচকি হাসল। মনে মনে বলল,

ভয় পেয়েছে। পরের বলটা সে ব্যাট চালিয়ে ফসকাল। প্যাডে লাগল, খোকন তো বটেই, থার্ডম্যানও বাউন্ডারির ধার থেকে দু'হাত তুলে বিকট স্বরে চিৎকার করল, "হাউজ্যাট।" আম্পায়ার মাথা নেড়ে আবেদন নাকচ করে দিলেন।

তখন পটল গদগদ স্বরে রাজশেখরকে বলল, "বড়বাবু, নিরপেক্ষ আম্পায়ার রাখার কথা আপনিই একমাত্র বলেছিলেন। এখন বুঝছি তাতে কত উপকার হয়েছে। যদি বকদিঘির আম্পায়ার হত তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গে আঙুল তুলে দিত!"

খোকনের পরের বল সত্যশেখর আর ফসকাল না। টেনিসের ফোরহ্যান্ড শর্টের মতো প্রচণ্ড জোরে অফস্টাম্পের বাইরের বলটা মারল। খোকন দ্রুত মাথা না সরালে হয়তো মুণ্ডুটা উড়ে যেত। মাঠটা একবার ছুঁয়ে বল বাউন্ডারি পেরিয়ে গেল। ওভারের বাকি বলগুলোয় রান হল না, কেননা ডিপ ফাইনলেগ, লং অন এবং থার্ডম্যান ফিল্ডারেরা বল থামিয়ে দেওয়ায় সত্যশেখর আর দৌড়োয়নি এবং রান নিতে ছুটে গিয়েও বিশু ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

স্কোরবোর্ড দেখে প্যাড পরে তৈরি থাকা ভুবন ডাক্তার বলল, "আর ছিয়াশি রান দরকার, কুড়ি ওভার এখনও হাতে আছে। মনে হচ্ছে হয়ে যাবে, কী বলো পরমেশ?"

পরমেশ বিজ্ঞের মতো বলল, "এটা ক্রিকেট ডাক্তারবাবু, আগে থেকে কিছু বলা যায় না।"

বলা যে যায় না, সেটা দেখা গেল অতুল মুখুজ্যের ওভারে। নিরীহ একটা শর্ট পিচ বল বিশু, সম্ভবত তার পার্টনারের ব্যাটিং দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে ব্যাট চালাল সোজা ছয় মারার জন্য। ব্যাটের উপরের দিকে লেগে বলটা উঠে গেল বোলারের মাথার উপর। ক্যাচ ধরতে তৈরি অতুলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পতু বলের নীচে দাঁড়াল এবং লুফল। তারপর বলল, "গত বছর তুমি ক্যাচ ফেলেছিলে নিজের বলে, মনে আছে? এবার আর ফেলতে দিলুম না।"

অধিনায়ক মাঠে নেমে প্রথমে গেল নন স্ট্রাইকার সত্যশেখরের কাছে, চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করতে। ব্যান্ডেজের বাঁধন ঠিক আছে কি না চোখ দিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করল, "যন্ত্রণা হচ্ছে?" আপনার চোখ দেখছি লাল হয়ে উঠেছে। আপনি এই ওভারটা চোখ বুজিয়ে থাকুন, বিশ্রাম পাবে

চোখ। আর ছয়টয়গুলো মারার সময় চোখে যাতে স্ট্রেন না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন। এই ডিসেম্বরেও দেখছি আপনি ঘামছেন!" বলেই ডাক্তার ভুবন রায় সত্যশেখরের কবজি দু'আঙুলে টিপে ধরে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে শুরু করলেন।

দুই আম্পায়ার, মাঠের খেলোয়াড়রা ততক্ষণে ওদের কাছে চলে এসেছে। এক আম্পায়ার বললেন, "খেলা বন্ধ রেখে মাঠে চিকিৎসা না করে ওকে বাইরে নিয়ে যান।"

ডাক্তার ভ্রূ কুঁচকে বলল, "নাড়ির গতি অস্বাভাবিক, ঘাম, চোখ লাল, মনে হচ্ছে এখুনি বেড রেস্ট দরকার, সতুবাবু আপনি রিটায়ার করুন।"

"কভি নেহি।" গর্জন করে উঠল সত্যশেখর। "আরও ছিয়াশি রান দরকার, সেটা তুলে দিয়ে তবেই ফিরব। নিন, খেলা শুরু করুন।"

অধিনায়ক ক্রিজে ফিরে গার্ড নিয়ে ব্যাট হাতে তৈরি হয়ে অতুলের বলের অপেক্ষায় রইল। বল ডেলিভারি হওয়ার আগেই ভুবন ডাক্তার ড্রাইভের জন্য কেতাবি ঢঙে বাঁ পা বাড়িয়ে ব্যাট পিছনে তুলে নিল। অতুলের বলটা বাড়ানো বাঁ পায়ের একহাত দূরে পড়তেই ডাক্তার সজোরে ব্যাট চালাল। বল উঠে গেল এবং অতুলের বাড়ানো হাতের আঙুলে লেগে কাছে দাঁড়ানো এক ফিল্ডারের কাছে গেল। ডাক্তার ততক্ষণে রান নেওয়ার জন্য ছুটেছে। প্রায় পনেরো গজ আসার পর দেখল নন স্ট্রাইকার তার ক্রিজ থেকে এক ইঞ্চিও বেরোয়নি। ফিরে যাওয়ার আগেই ফিল্ডার বল ছুড়ে দিয়েছে উইকেটকিপারকে। অধিনায়ক ঝাঁপিয়ে পড়েও নিজেকে রান আউট থেকে বাঁচাতে পারল না।

ফিরে যাওয়ার সময় ভুবন ডাক্তার ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, "দৌড়োবেন না সেটা আগে আমায় বলবেন তো।"

এরপর ব্যাট হাতে এল রতু। মুখ শুকনো। প্যাড পরে স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারছে না। অনভ্যাসের জন্য। সত্যশেখর তাকে হাত নেড়ে ডাকল, "খোকা তোমাকে ডাক্তারবাবু কোনও ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন কি?"

"বললেন পিটিয়ে খেলবি, যা পাবি মারবি।"

"একদম নয়। বল আটকাও, নয় ছেড়ে দাও। পেটানোর কাজটা আমার।"

রতু মাথা নেড়ে ক্রিজে ফিরে গিয়ে একটাও সোজা না আসা অতুলের বাকি বলগুলো ছেড়ে দিল। পতু এবার বোলিং চেঞ্জ করে অরুণাভকে আনল। মোটামুটি জোরে বল করে সে। তার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বল

উড়ে গেল বাউন্ডারির উপর দিয়ে, তৃতীয় ও পঞ্চম বল বাউন্ডারি লাইন ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। এক ওভারে বত্রিশ রান নিল সত্যশেখর।

পতু বুঝে গেছে, বাহাত্তর রান করা সত্যশেখরের উইকেট পাওয়ার চেষ্টা না করে অন্যদিকের উইকেটগুলো সরিয়ে দেওয়াই এখন বুদ্ধির কাজ হবে। অ্যাকাডেমির কিশোরের সামনে সে নিয়ে এল খোকনকে। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ তীক্ষ্ণ করে রতু খোকনের ছ'টা বলই এগিয়ে-পিছিয়ে ব্যাট দিয়ে খেলে দিল। সত্যশেখর শাবাস জানাতে বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল। রতুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল গর্বে।

বল হাতে নিয়ে পতু মুখুজ্যে ছুড়ে দিতে যাচ্ছিল অরুণাভকে। সে হাত জোড় করে বলল, "পতুদা আমাকে ছেড়ে দাও। দোকান চালিয়ে আমাকে খেতে হয়। আমার খদ্দের কমে যাবে আর ছ'টা বল করলে।"

পতু এধার-ওধার তাকাতেই কেউ আকাশ দেখতে শুরু করল, কেউ বাউন্ডারির দিকে এগিয়ে গেল। পতু এবার ঠিক করল নিজেই বল করবে। স্কোরবোর্ডে আটঘরার রান একশো আটত্রিশ চার উইকেটে। আর চুয়ান্ন রান করলেই জিতবে। পতু মনে মনে বলল, এই সতু সিংঘির উইকেটটা নিতে পারলেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে, এটাকে চাইই।

সত্যশেখরও তখন মনে মনে বলল, চুয়ান্নটা রান তুলতেই হবে। ভাড়াটে প্লেয়ার দিয়ে জেতা যায় না, এটা বুঝিয়ে ছাড়ব। এখন আর একটু পেতুম যদি আচারটা!

পতু অফস্পিন করায়। তার প্রথম তিনটি বল স্ক্রিনের উপর দিয়ে, চতুর্থটি স্ক্রিনের কাপড়ের উপরে, পঞ্চমটি মিড উইকেট গ্যালারিতে, ষষ্ঠটি বকদিঘির প্যাভিলিয়নের উপর পড়ল। তার পঞ্চম ওভার বাউন্ডারিতেই ব্যক্তিগত সেঞ্চুরি পূর্ণ হয়ে যায়, তার রান তোলার গতির সঙ্গে স্কোরবোর্ডের গতি তাল রাখতে পারছিল না। ওভার শেষ হতে বোর্ডে দেখা গেল তার রান ১০২।

গ্যালারিতে গর্জন ওঠার আগেই পটল হালদার ছুটে গেল মাঠের মধ্যে। চিৎকার করে সে কী বলছে কেউ শুনতে না পেলেও রাজশেখরের মনে হল তিনি যেন 'স্তম্ভ' আর 'মিলেনিয়াম' শব্দ দুটি শুনতে পেলেন। প্রবল হইচইয়ের মধ্যে মলয়া চুপিচুপি ফিরে গেল বকদিঘি প্যাভিলিয়নে, পটল দু'হাত ছড়িয়ে ছুটে কাছে আসার আগেই সত্যশেখর দু'হাত তুলে থামাল।

"পটলবাবু, এখনও আঠারো রান বাকি। খেলাটা আগে শেষ হতে দিন, প্লিজ।"

পটল হালদার ফিরে যাওয়ার সময় পতু মুখুজ্যের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পতু মুখ ঘুরিয়ে নিল। পটল বলল, "আর দুটো ওভার।"

দুটো ওভার লাগল। খোকন তার দ্বিতীয় বলেই রতুকে এল বি ডবলু করায় ব্যাট হাতে নামল কলাবতী। তাকে ক্রিজের দিকে এগোতে দেখামাত্র তুমুল হাততালি আর কলরোল উঠল গ্যালারিতে। একটি মেয়ে পুরুষদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে খেলছে এটা গ্রামের মানুষ আগে কখনও দেখেনি। তারা কৌতূহলী তো বটেই, অভিভূতও।

নন স্ট্রাইকার যে তার কাকা, কলাবতী তা বুঝতে দিল না। ক্রিজে এসে, সত্যশেখর কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কলাবতী তাকে আঙুল তুলে থামিয়ে দিয়ে গার্ড নিল। একটি মেয়েকে বল করতে হবে খোকন ব্যানার্জি এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় কখনও পড়েনি। ব্যাপারটা হালকা করে দেখাতে সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ফ্লাইট করিয়ে ডেলিভারি দিল। পা বাড়িয়ে কলাবতী নিখুঁত কভার ড্রাইভ করল। বল বাউন্ডারিতে গেল। খোকন কাঁধ ঝাঁকাল তাচ্ছিল্য দেখিয়ে। পরের বলটাও সে একই ভাবে করল একটু ওভারপিচ লেগ স্টাম্প বরাবর। কলাবতী পা বাড়িয়ে হাঁটু ভেঙে সুইপ করল। বল স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারি পার হল।

খোকন এবার সন্ত্রস্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়, এবার সে চারকদম ছুটে এসে জোরে বল করল পিচে ঠুকে দিয়ে। বল উঠল কলাবতীর বুকের কাছে। বিদ্যুৎগতিতে পুল করল জোরে ব্যাট চালিয়ে। বল আগের জায়গা দিয়েই বাউন্ডারি পার হল। আর ছয় রান বাকি। খোকন এবার তার পুরনো বোলিং মার্কে ফিরে গিয়ে পূর্ণগতিতে বল করল। লেগস্টাম্পে হাফভলি। কলাবতী গ্লান্স করল। বল উইকেটকিপারের বাঁ দিক ঘেঁষে বাউন্ডারিতে পৌঁছোল। ডিপ ফাইন লেগ ছুটেছিল কিন্তু সে পৌঁছোবার আগেই আটঘরার স্কোর ১৯০-এ পৌঁছে যায়। খোকন পরের বল ইচ্ছে করেই ওয়াইড দিল। একটা রান পেল আটঘরা। ম্যাচ এখন টাই। খোকন এবার ছুটে এসে জোরে বল করার ভান করে আস্তে ডেলিভারি দিল। কলাবতী ঠকে গিয়ে পিছিয়ে খেলতে গিয়ে বোল্ড।

মাঠ ঘিরে "হায় হায়"-এর মতো শোকধ্বনি উঠল। কিন্তু আম্পায়ারের ডান হাতটা যে পাশে প্রসারিত হয়ে রয়েছে 'নো বল' সংকেত জানিয়ে, সেটা কেউ লক্ষ করেনি। একটা রান যোগ হল অতিরিক্ত ঘরে। প্রথম মিলেনিয়াম ট্রফি জিতল আটঘরা।

সত্যশেখর এই প্রথম আজ ছুটল ভাইঝির দিকে। কলাবতীও ছুটে দিয়ে কাকাকে জড়িয়ে ধরল।

"উইনিং স্ট্রোকটা দেওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল রে কালু। হতচ্ছাড়া নিতে দিল না।"

"থাকগে না দিল তো নাই দিল। আমরা তো জিতেছি, দাদুর মুখরক্ষা হয়েছে, সেটাই বড় কথা।"

ফেরার সময় সত্যশেখর বলল, "বাবা এবার কী বলবে সেটা জানতে ইচ্ছে করছে। ওরে দ্যাখ দ্যাখ, তোর বড়দির চোখে ক্যামেরা। ভাল করে হেসে তাকা।" এই বলে সত্যশেখর জিভ বার করে দেখাল। "দেখবি ঠিক এই ছবিটা আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।"

রাজশেখরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে। অপুর মা অবাক হয়ে তাকিয়ে। কত্তাবাবার চোখে জল! সে এই প্রথম দেখল। ব্যাকুলস্বরে সে বলল, "কত্তাবাবা হয়েছে কী, আমরা কি হেরে গেছি? আপনার চোখে জল কেন?"

"ও তুমি বুঝবে না। আমরা জিতেছি।" রাজশেখর উঠে এগিয়ে গেলেন ছেলে আর নাতনির দিকে।

মিলেনিয়াম ট্রফি বিজয়ী অধিনায়ক ডাক্তার ভুবন রায়ের হাতে কে তুলে দেবে? রাজশেখর সিংহ না হরিশঙ্কর মুখুজ্যে? শুরু হল বাকবিতণ্ডা। অবশেষে কলাবতী প্রস্তাব দিল, "টস হোক, যে জিতবে তার পছন্দের লোক ট্রফি দেবে।" প্রস্তাব সমর্থন করল মলয়া।

মাঠের ধারে টেব্‌লের উপর ঝকঝকে ট্রফি বসানো। পতু ও পটল ট্রফির সামনে দাঁড়াল। সারা মাঠের দর্শক ভেঙে পড়েছে ট্রফির সামনে। ঠেলাঠেলি, চিৎকার সমানে চলেছে। পতু একটা টাকা নিয়ে টস করল। পটল হালদার ডাকল "হেড।"

দু'জনেই ঝুঁকে পড়ল জমিতে পড়া টাকার উপর। পটল হালদার হঠাৎ "আঁ" বলেই মাথা ঘুরে ধড়াস করে জমিতে পড়ে গেল। তাকে ধরাধরি করে তুলে সোফায় এনে শোয়ানো হল। পরমেশ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "হল কী, পটলদা অমন করে পড়ে গেলেন কেন।"

"হেড পড়েছে, পতুটা হেরেছে।" বলেই পটল হালদার আরামে চোখ বুজল।

ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজশেখর ডেকে নিলেন হরিশঙ্করকে। "হরি আয়, দু'জনে মিলে ট্রফিটা তুলে দিই।"

ডাক্তার ভুবন রায়ের হাতে ট্রফি ওঠার আগে রাজশেখর মাইকে বললেন দুটো কথা।

"এই মিলেনিয়াম ম্যাচ এবার থেকে হোক আমাদের মিলনের ম্যাচ। এই ট্রফি হোক মিলন ট্রফি। বকদিঘি আটঘরার মানুষজন এই বাৎসরিক ম্যাচকে প্রীতি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে মজা আর ফুর্তির ম্যাচ করে তুলুক। বছরে বছরে একবার আমরা মিলিত হব মিলনের জন্য। সামনের বছর আবার আমরা মিলব আটঘরায়।"

প্যাভিলিয়নে খেলার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে কলাবতী বলল, "কাকা, লাঞ্চ তো কিছুই খাওয়া হল না, এখন ভীষণ খিদে পাচ্ছে।"

"আমারও। টেব্‌লে পড়ে আছে লুচি আর কলা। শেষে কি রোল আর চাউমিন খেতে হবে!"

"কাকা, দাদু তো বলেই দিলেন আজ থেকে এটা মিলনের ম্যাচ হল। তা হলে আমরাই প্রথম শুরু করি। বকদিঘির কী লাঞ্চ হয়েছে দেখে আসব?"

"শিগগির যা। যদি কিছু বেঁচে থাকে তা হলে মিলন ভোজ দিয়ে ওপেন করা যাবে।"

কলাবতী ছুটে বেরিয়ে গেল। দু'মিনিট পর ছুটে ফিরে এল প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে। "কাকা, বড়দি বললেন, এখনও আছে পাঁউরুটি, ডিমের কালিয়া, কমলালেবু। তবে ডিম একটাও নেই, ঝোল আর আলু পড়ে আছে। দই শেষ।"

"হবে, ওতেই হবে।"

দু'জনে বকদিঘির প্যাভিলিয়নে এল। একটা বড় ডেকচি টেব্‌লে বসানো, সঙ্গে চারটে পাঁউরুটির প্যাকেট। দুটো শূন্য দইয়ের হাঁড়ি সাজিয়ে মলয়া অপেক্ষা করছে, সামনে গোটা আষ্টেক কমলালেবু।

"কালু, পাঁউরুটি দিয়ে কালিয়ার ঝোল অনেকেরই খেতে দারুণ লাগে। আর দইয়ের চাঁছি অনবদ্য জিনিস। বসে পড়ো।"

কাকা-ভাইঝি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চেয়ারে বসল। সত্যশেখর ফিসফিস করে বলল, "ওই অনেকেরটা হলুম আমি। ঠিক আছে ডেকচিটা এদিকে ঠেলে দে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

চারজনে গাড়িতে কলকাতা ফিরছে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা চালক সত্যশেখরের পাশে রাজশেখর, পেছনের সিটে কলাবতী ও অপুর মা।

অপুর মা বলল, "ছোটকত্তার আজ অনেক ধকল গেল। খাওয়াও তো কিছু হয়নি। আমি গিয়েই নুচি ভেজে দেব। ফ্রিজে কাঁচামাংস থাকলে ভাল, নয়তো ডিমের কালিয়া করে দেব। হবে তো?"

"খুব হবে, সঙ্গে বেগুন ভাজাও করে দিয়ো।"

"কাকা, ন'শো গ্রাম পাঁউরুটি আর আটটা আলু দিয়ে ঝোল একটু আগে খেলে, তাররপও—"

"কালু, খাওয়ার কথা থাক, ক'টা ছয় মেরেছি সেটাই বল।"

"ষোলোটা ছয় আর তিনটে চার। উনিশটা হিটে একশো আট রান।"

"ব্র্যাডম্যানও পারেনি। তুই কাউকে এটা বলে দ্যাখ বলবে গুল মারছে। খবরের কাগজে দিলে ছাপবে না। বাবু বলেছিল মলয়ার কাছ থেকে জেনে নেবে। দেখবি ষোলো ছয়কে ছ'টা ছয় করে দেবে। আর মাথায় বল লাগাটাকে বাড়িয়ে বলবে।"

"কাকা, একটা কথা মনে রেখো, বড়দির আচার খেয়েছিলে বলেই এভাবে ব্যাট করতে পেরেছ।"

কলাবতীর শক্তিশেল

কাঁকুড়গাছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে স্কুলের মেয়েদের নিয়ে নানারকম অনুষ্ঠান করার কথা ভেবেছে মলয়া। সে এই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। ভাবনাটা প্রথম সে জানায় ভূগোলের ব্রততী বেদজ্ঞকে। শুনেই পৌনে ছ'ফুট লম্বা, পঞ্চাশ কেজি ওজনের ব্রততী বলে উঠেছিল, "দারুণ হবে বড়দি। বাইরের লোককে দিয়ে ফাংশন করানো আর স্কুলের মেয়েদের দিয়ে করানোয় অনেক তফাত। কত প্রতিভা এই স্কুলে আছে জানেন?"

মলয়া মাথা নেড়ে জানাল, জানে না।

"আমিও জানি না। সেটা জানার জন্যই ওদের দিয়ে এবার ফাংশন করুন। নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি ..." ব্রততী থমকে আইটেম খুঁজতে লাগল।

অন্নপূর্ণা পাইন ওদের কথা শুনছিল। সে যোগ করল, "শ্রুতিনাটক, গীতিআলেখ্য, বৃন্দগান, সমবেত আবৃত্তি। এবারে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আমাদের হাউজিং-এর মাঠে শ্রুতিনাটক হয়েছিল। কী বলব ব্রততীদি, কী ভাল যে হয়েছিল, কী হাততালি আর কী হাততালি!"

"কী শ্রুতিনাটক হয়েছিল?" ব্রততী জিজ্ঞেস করল।

"কচ ও দেবযানী।"

"কারা করল?" আবার জিজ্ঞাসা ব্রততীর।

"অনামিকা আর ওর বাবা। ওদের দিয়ে এটা করান না।" অন্নপূর্ণার স্বর আদুরে শোনাল।

অনামিকা অন্নপূর্ণার মেয়ে, এই স্কুলেই ক্লাস সেভেনে পড়ে। বয়স তেরো।

ব্রততী অবাক হয়ে বলল, "ওইটুকু মেয়ে হল দেবযানী আর তার বাবা কচ? পারল করতে?"

"কেন পারবে না! অনামিকা তো আবৃত্তির কোচিং নেয় নবকুমার ঘোষের স্কুলে, হপ্তায় একদিন। নবকুমার খুব নামকরা আবৃত্তিকার। আমেরিকায় গিয়ে বাঙালিদের মুগ্ধ করে এসেছে।"

অন্নপূর্ণা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, মলয়া থামিয়ে দিয়ে বলল, "ব্রততীদি, এটা খুব স্পর্শকাতর ব্যাপার। অনেকের অনেকরকম মত, ইচ্ছা থাকতে পারে। আমার মনে হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইটেম নির্বাচন করা উচিত। ভবিষ্যতে তা হলে সমালোচনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।" এই বলে মলয়া তাকিয়ে রইল ঘরের অন্যান্যদের দিকে।

আরতি ঘটক, সদ্য বিয়ে হয়েছে, প্রায় দৌড়ে ক্লাসে আসে, ঘণ্টা পড়ে গেলেও পড়িয়ে যায়, মেয়েরা ঝালমুড়ি কিনে আরতির জন্যও এক ঠোঙা কেনে। এহেন ছাত্রীপ্রিয় আরতি বলল, "গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটা কী বড়দি?"

"সবাইয়ের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা।"

অন্নপূর্ণা বলল, "সবাইটা কে?"

মলয়া বলল, "আমরা সব টিচার, গার্জেনরা, ম্যানেজিং কমিটির মেম্বাররা মিলে ঠিক করব। এজন্য একটা মিটিং ডাকতে হবে। ব্রততীদি, আপনি কনভেনর। একটা চিঠি ড্রাফ্‌ট করুন, করে আমায় দেখান।"

আরতি বলল, "ছাত্রীদের তরফে কেউ ওই মিটিং-এ থাকবে না?"

মলয়া লজ্জিত স্বরে বলল, "ইস্‌স, ভুলেই গেছলুম, অবশ্যই থাকবে। অনুষ্ঠান তো ওরাই করবে। ব্রততীদি, টেন আর টুয়েল্‌ভ থেকে একজন করে থাকবে। কে থাকবে, সেটা আপনার বিবেচনামতো ঠিক করবেন।"

অসীমা দত্ত, যার স্বামী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক কিন্তু নিজে রাজনীতির ধারেকাছে নেই, বলল, "বড়দি এগারোশো মেয়ের এগারোশো গার্জেন— আপনি ক'জনকে ডাকবেন? প্রত্যেকের মতামত নিলে তো এগারোশো মতামত, পারবেন সামলাতে? তার চেয়ে বলি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটা ঝুলি থেকে বের না করে ঝুলিতেই রেখে দিন। বেছে বেছে কয়েকজন গার্জেনকে ডাকুন। গাজন নষ্ট হয় অধিক সন্ন্যাসীতেই। ভবিষ্যতে ঝামেলা পাকাতে পারে, এমন লোকেদেরই ডাকুন। আমি লিস্টি করে ব্রততীদিকে দোব।"

মলয়া বলল, "আমি এক্ষুনি তোমায় একটা নাম দিতে পারি — সত্যশেখর

সিংহ, কলাবতীর গার্জেন। এমন ঝামেলাবাজ লোক তুমি দুটি পাবে না।''

অসীমা বলল, ''আমিও একটা নাম দোব, পল্লবী গুহ।''

''ওহহো, সেই সমাজসেবিকা!'' মলয়া প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ''গার্জেনস মিটিং-এ যিনি মেয়েদের চরিত্ররক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন! অবশ্যই ওঁকে চিঠি দেবে। অসীমা, তুমি কোনও নাম দেবে?''

গম্ভীরমুখে অসীমা বলল, ''মিস্টার দত্ত, আমার কর্তা।''

সবাই অবাক হয়ে তাকাল অসীমার দিকে।

''ওনাকে দূষণে পেয়েছে।'' নির্বিকার স্বরে অসীমা বলল, ''শব্দদূষণ, দৃশ্যদূষণ, বায়ুদূষণ তো আছেই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সংস্কৃতিদূষণ। ব্রততীদি, কী বলব আপনাকে, দুলু একটা রাহুল দ্রাবিড়ের রঙিন পোস্টার কিনে এনে বৈঠকখানার দেওয়ালে সেঁটেছিল। ঘরটা সদ্য সাদা রঙে পেন্ট করা হয়েছে। ওর বাবা ছবিটা খুলে দিল! বলল, 'দৃশ্যদূষণ হচ্ছে। সাদা নির্মলতার প্রতীক, এই দেওয়ালে কোনও ছবি থাকবে না।' শাশুড়ি কানে কম শোনেন, টিভি তাই একটু জোরে চালাতে হয়। ব্যস, সেটা হয়ে গেল শব্দদূষণ, ভলিউম কমাও। দরজা-জানলা বন্ধ করে মা এখন টিভি দেখেন।''

''আর বায়ুদূষণ?'' অন্নপূর্ণার কৌতূহল উপচে পড়ল মিটিমিটি হাসিতে।

''কলকাতার বাতাসে অক্সিজেন কমে গেছে গাছ কেটে ফেলার জন্য। আর সেজন্যই বৃষ্টি হচ্ছে না, ফুসফুস আর হার্টের অসুখ বাড়ছে। গাছ লাগাও, যেখানে ফাঁকা জায়গা পাবে গাছের চারা বসাও। বাড়ির ছাদে এখন তেত্রিশটা টব, তাতে নয়নতারা, গাঁদা, জবা থেকে গোলাপ, বেল, এমনকী পালংশাকও। ছাদে পা রাখার জায়গা নেই। রোজ তেত্রিশটা টবে জল দেওয়া সোজা কথা! এম এল এ-বাড়িতে জলটা একটু বেশিই আসে, তাই রক্ষে।''

''সংস্কৃতিদূষণটা কী ব্যাপার?'' মলয়া উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে বলল।

''এখুনি কাজটা করে ফেলতে হবে, এক সেকেন্ডও দেরি করা চলবে না। দেরি করলেই অপসংস্কৃতির ক্যাটিগরিতে সেটা পড়ে যাবে। তা হলেই সেটা হবে সংস্কৃতিদূষণ।''

''উনি এসব মেনে চলেন?'' মলয়ার স্বরে সন্দেহ।

''চলতে চেষ্টা করেন খুব। এই তো গত রোববার, পাড়ার মাঠে ফুটবল ফাইনালে প্রধান অতিথি হয়ে গেছলেন ট্রফি দিতে। কার্ডে লেখা ছিল পাঁচটায় খেলা শুরু। পাঁচটা পাঁচ, তখনও দুটো টিম মাঠে নামেনি আর সভাপতিও এসে পৌঁছোয়নি। উনি গটমট করে বাড়ি চলে এলেন। বললুম, 'কী হল,

কাপ শিল্ড না দিয়েই চলে এলে যে?' বললেন, 'কর্মসংস্কৃতির গোড়ার কথা সময় মেনে চলা, না চললে সেটায় দূষণ ছড়ায়। সেটাই বন্ধ করা দরকার, ওরা বুঝল কিনা জানি না।' বড়দি, এই লোককে আগে ডাকুন, নইলে প্ল্যাটিনামকে ঝামেলায় ফেলে দেবে।''

''অবশ্যই।'' এই বলে মলয়া ব্রততীর দিকে তাকাল। ব্রততী ঘাড় নাড়ল।

অন্নপূর্ণা বলল, ''আমাদের প্রণতি খুব ভাল নাচত, স্কুলে ঢুকে আর বিয়ে করে নাচ ছেড়ে দিয়েছে। ওকে বলুন না, 'চণ্ডালিকা' কি 'তাসের দেশ'টা মেয়েদের দিয়ে করাতে। আমাদের অনেক মেয়ে তো খুব ভাল নাচে।''

মলয়া অবাক হয়ে বলল, ''প্রণতি নাচত? কই ওকে দেখে তো মনে হয় না! আচ্ছা, জিজ্ঞেস করব। ব্রততীদি, আর কাদের মিটিং-এ ডাকা উচিত ঠিক করে একটা লিস্ট করে ফেলুন, খুব লম্বা লিস্ট যেন না হয়। আমি একটা চিঠি ড্রাফ্‌ট করছি, সেটা জেরক্স করে কুরিয়ার মারফত পাঠাতে বৃন্দাবনবাবুকে বলে দেবেন।''

''কুরিয়ার কেন, ডাকে পাঠালেই তো হয়।'' অসীমা বলল।

''ওই যে বললুম, ঝামেলা পাকাবার লোক সবাই। অন্তত একজন তো আছেই, বলে বসবে চিঠি পাইনি।''

''কে বড়দি, কে?'' অসীমা বলল।

''নামটা তো আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি, সত্যশেখর সিংহ, কলাবতীর কাকা।''

''আপনি চেনেন?'' আবার অসীমার প্রশ্ন।

''হাড়ে হাড়ে, সেই ছোটবেলা থেকে।''

মলয়া মুখটা কঠিন করে বুঝিয়ে দিল, আজকের মতো আলোচনা শেষ।

সত্যশেখর মেনে নিল সে ঝামেলাবাজ

কথামতো বৃন্দাবনবাবু কুরিয়ার মারফত সত্যশেখর, বলরাম দত্ত, পল্লবী গুহ, জনপ্রিয় গণসংগীত গায়ক অরুণাচল সেনগুপ্ত এবং সিমেন্ট ব্যবসায়ী শিবশঙ্কর হালদারকে চিঠি পাঠালেন। সত্যশেখর বাদে এদের সবার মেয়ে এই স্কুলে পড়ে। ব্যারিস্টার সত্যশেখর অবিবাহিত। বাবা-মা মরা কলাবতীর একাধারে সে কাকা এবং প্রিয় বন্ধু। কুরিয়ারের লোক দুপুরে চিঠি দিতে

যায় সত্যশেখরকে। তখন গৃহকর্তা, সত্তরোর্ধ্ব, বিপত্নীক, প্রাক্তন জমিদার কলাবতীর ঠাকুরদা রাজশেখর ঘুমোচ্ছেন, সত্যশেখর কোর্টে, কলাবতী স্কুলে এবং মুরারী তাস খেলতে গেছে পাশের মালোপাড়ায়। বাড়িতে ছিল অপুর মা। যার পিতৃদত্ত নাম করুণাময়ী।

সদর দরজা খুলে অপুর মা দেখল একটা লোক, যাকে সে চেনে না। তাকে বলা আছে, দুপুরবেলা কোনও অচেনা লোক এলে দরজা খুলবে না। মুশকিল হয়েছে, দরজা না খুললে সে জানবে কী করে লোকটা চেনা না অচেনা। একটা আই-হোল দরজায় আছে বটে কিন্তু সেটা এমন উচ্চতায় যে, সে ফুটোয় লাগানো কাচে চোখ লাগাতে পারে না।

"কী চান?"

"একটা চিঠি আছে সত্যশেখর সিন্‌হার নামে। উনি আছেন?"

"ছোটকত্তা তো এখন কোর্টে। আপনি সন্ধেবেলায় আসুন।" ডাকাত টাকাত নয়, এটা অপুর মা বুঝে গেছে। তাই গলা অমায়িক করে বলল।

"আপনি চিঠিটা সই করে নিন।" বলল লোকটি।

মহা ফাঁপরে পড়ে গেল অপুর মা। কিন্তু এটা তো লোকটার কাছে ফাঁস করা যাবে না যে, সই করতে তার কষ্ট হবে।

"সইটই করাতে হলে সন্ধের পর আসুন। ছোটকত্তা তখন থাকবেন।"

"আপনিই রাখুন না সই করে।" লোকটি বলল।

কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে অপুর মা হাত বাড়াল, "দিন।"

লোকটি একটা কাগজ আর ডটপেন এগিয়ে ঘরকাটা একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, "এই জায়গায়, আর ফোন নম্বরটাও লিখে দেবেন।"

কাগজ-কলম হাতে নিয়ে অপুর মা এধার-ওধার তাকাল। কাগজটা রেখে সই করবে, এমন একটা উঁচু জায়গা খুঁজে না পেয়ে অবশেষে হাঁটু গেড়ে বসে মেঝেয় কাগজটা রেখে সেই ছোট্ট দেড় ইঞ্চি চৌকো জায়গায় কলম ঠেকিয়ে সে বিড়বিড় করে তার নামের বানানটা ঝালিয়ে নিতে লাগল। পাঠশালায় পড়ার সময় সে কোনওক্রমে 'করুণাময়ী' লিখতে শিখেছিল। বাবা সাতকড়ি মোদক তখন বলেছিল, 'অনেক শিখেছিস, আমাদের বংশের তুই প্রথম মেয়ে নিজের নাম লিখতে শিখলি। এবার রান্নাটা শেখ।' তারপর চারটি দশক কেটে গেছে, অপুর মা শুধু হাতা আর খুন্তি ধরেছে, কলম ধরেনি। বাংলা হরফের চেহারাগুলোও এখন আর মনে নেই।

প্রথমে সে 'ক' লিখল। যেটা দেখতে 'ফ'-এর মতো হল এবং চৌকো

জায়গার অর্ধেকটা সেই 'ফ' দখল করে নিল। এরপর সে 'র' লিখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে 'র'-কে 'রূ' করল এবং চৌকো ঘরটা এই দুটি অক্ষরেই ভরে গেল। ফ্যালফ্যাল করে কুরিয়ারের দিকে তাকিয়ে অপুর মা বলল, "কী হবে! আর তো জায়গা নেই।"

কুরিয়ার অভিজ্ঞ লোক, হেসে বলল, "ওতেই হবে। ফোন নম্বর কত?"

"তা তো জানি না। ফোন এলে ধরি, কথা বলি। কাউকে ডেকে দিতে বললে ডেকে দিই।"

"ঠিক আছে। চিঠিটা যার নামে, তাকে দিয়ে দেবেন।"

অপুর মা খামটা বিকেলে রাজশেখরের হাতে দিয়ে বলল, "কত্তাবাবা, ছোটকত্তার এই চিঠিটা পিয়ন দিয়ে গেল দুপুরে, আমি সই করে নিয়েছি।" 'সই' শব্দটার উপর অপুর মা একটু বেশি জোর দিল।

সন্ধ্যাবেলায় সত্যশেখর চিঠিটা পড়ে কলাবতীকে ডেকে বলল, "কালু, তোদের স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি, তিনদিন ধরে চলবে অনুষ্ঠান। প্রোগ্রাম ঠিক করার জন্য গার্জেনদের মিটিং ডেকেছে মলু, রোববার বিকেল চারটেয়।"

"জানি। ছাত্রীদের তরফ থেকে আমি আর ধুপু মিটিং-এ থাকব।"

"তা থাকিস, কিন্তু গার্জেনরা কেন? প্রোগ্রাম তো স্কুল-কমিটিরই ঠিক করার কথা।"

"ক্লাস সেভেনের অনামিকার কাছে শুনলুম, ওর মা অন্নপূর্ণাদি বাড়িতে বলেছেন, বড়দি চেয়েছেন সবার মতামত নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠানের সূচি ঠিক করতে, যাতে ভবিষ্যতে ঝামেলা না হয় আর ঝামেলাবাজ লোক হিসেবে বড়দি প্রথমেই সত্যশেখর সিংহর নাম করেছেন। কাকা, এটা কিন্তু বড়দির খুব অন্যায় হয়েছে।" অভিমানে কলাবতীর গাল ফুলে উঠল।

"কিচ্ছু অন্যায় হয়নি, ও ছোটবেলা থেকে আমাকে চেনে এবং জানে।"

কলাবতী ভেবেছিল কাকা রেগে উঠবে, তার বদলে এমন ঠান্ডা নিশ্চিন্ত স্বরে বলল কিনা, বড়দি অন্যায় বলেনি! তার গালের অভিমান চুপসে গেল।

"চেনে, জানে বলে দিদিদের কাছে তোমাকে ঝামেলাবাজ বলে পরিচয় দেওয়াবেন? না কাকা, এটা বড়দির খুব অন্যায় হয়েছে, আমার গার্জেনকে অপমান করেছেন।"

"মলু যে একথা বলেছে, তার প্রমাণ তো মায়ের মুখে শোনা অনামিকার কথা?" এবার ব্যারিস্টার সত্যশেখরের গলা বেরিয়ে এল। "অনামিকার মা

অন্নপূর্ণাদি যদি বলে, আমি এসব কথা বলিনি এবং বলবেই, হেডমিস্ট্রেসকে কে আর চটাতে চাইবে, তা হলে তুই কিচ্ছু বলতে পারবি না তোর বড়দির এগেনস্টে। আমি বিশ্বাস করি, হাণ্ড্রেড পারসেন্ট করি, মলু আমাকে ঝামেলাবাজ বলেছে, বলার অনেক ভ্যালিড রিজন আছে, সেসব তুই জানিস না, জেনে কাজও নেই। যাই হোক, মিটিং-এ আমি যাব। ওরা কী বলে শুনব, তারপর যা বলার বলব।''

জুবিলির জন্য গণতান্ত্রিক মিটিং

মিটিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে টিচার্স রুমে। যে ক'টা চেয়ার আছে তার সঙ্গে আরও কয়েকটি রাখা হয়েছে, দুটি টেবলও। স্কুল পরিচালন সমিতির প্রেসিডেন্ট পলাশবরণ ঘোষ বসেছেন ঘরের একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটি টেবলে। তার পাশের চেয়ারে হেডমিস্ট্রেস মলয়া মুখোপাধ্যায়, তার পাশে ব্রততী বেদজ্ঞ, তার সামনে টেবলে রাখা একটা নতুন খাতা, মলাটে মোটা অক্ষরে লেখা 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি প্রস্তুতি সভার কার্যবিবরণী ও অভিভাবকদের প্রস্তাবাদি।'

এদের উলটোদিকের দেওয়াল ঘেঁষে সারি দিয়ে রাখা অভিভাবকদের জন্য পাঁচটি চেয়ার ও একটি টেবল। একটি চেয়ার বাদে বাকিগুলি পূর্ণ। প্রেসিডেন্টের ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা চেয়ারগুলিতে বসেছে কয়েকজন শিক্ষিকা। ঘরের মাঝখানটা ফাঁকা। দরজায় টুলে বসে চতুরানন মিশির, হেডমিস্ট্রেসের খাসবেয়ারা। পাশের ঘরটা ক্লাস ফাইভ এ-ওয়ান। সেখানে দশটি কাচের গ্লাস, জলের ড্রাম ও একডজন সফট্ ড্রিঙ্কের বোতল নিয়ে বসে আছে টিচার্স রুমের তত্ত্বাবধায়িকা গিরিবালা ঢালি। ব্রততীর কড়া নির্দেশ তাকে দেওয়া আছে, ''সফট্ ড্রিঙ্ক্স শুধু বাইরের লোকেদের দেবে। কোনও দিদিকে নয়, এমনকী বড়দিকেও নয়, দু'জন ছাত্রীকেও নয়। ওদের জন্য শুধু পরিশুদ্ধ খাওয়ার জল।''

গিরিবালা জানতে চায়, ''পেসিডেনবাবুকে মিষ্টি জল দোব তো?''

ব্রততী তিন-চার সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বলে, ''দেবে, উনি বাইরের লোক।''

মলয়া ঘড়ি দেখল। চারটে বাজতে তিন মিনিট। একটা চেয়ার এখনও

ফাঁকা। চেয়ারটা সত্যশেখরের জন্য। বাকিরা এসে গেছে। মলয়া হাতছানি দিয়ে কলাবতীকে ডাকল। কলাবতী বুঝে গেছে বড়দি কেন ডেকেছে। চেয়ার থেকে উঠে এসে সে মলয়ার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "সাড়ে তিনটেয় ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামাতে বসল দেখে এসেছি। তারপর চা খাবে।"

"তারপর সাড়ে চারটের সময় হেলতে-দুলতে আসবে। সাধে কি বলি ঝামেলাবাজ।" ফিসফিস এবং কিড়মিড় করে মলয়া বলল।

"বড়দি আপনি অপেক্ষা করবেন না, ঠিক চারটেয় শুরু করে দিন।" কলাবতী নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। ব্রততী ওদের কথা শুনছিল, সে মাথা নেড়ে অনুমোদন করল।

বলরাম দত্ত, এম এল এ, তিনিও ঘড়ি দেখছিলেন। বললেন, "ম্যাডাম আর এক মিনিট, আশা করি ঠিক সময়েই সভা আরম্ভ করে কর্মসংস্কৃতি রক্ষা করবেন।"

"অবশ্যই।" গম্ভীর এবং কঠিন স্বরে মলয়া বলল।

মলয়ার দুটো গলা। স্কুলে বেরোয় লিড্‌স ইউনিভার্সিটির সোশ্যাল সায়েন্সের ডক্টরেট ছাপ লাগা 'বড়দি' গলা এবং স্কুল থেকে বেরোলেই বকদিঘির মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে, মিষ্টি নরম ভিতু ভিতু 'মলু' গলা। দুটো গলাকেই কলাবতী চেনে ছোটবেলা থেকে।

"এবার আমাদের সভা আরম্ভ হচ্ছে।" স্কুলের সবচেয়ে সিনিয়র টিচার ব্রততী বেদজ্ঞ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আমি প্রস্তাব করছি আমাদের স্কুলের প্রেসিডেন্ট, মানে ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট হাইকোর্টের জজ শ্রী..."

মলয়া ফিসফিস করে বলল, "হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বলুন।"

"মার্জনা করবেন, হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, আমাদের প্রেসিডেন্ট শ্রীপলাশবরণ ঘোষ মহাশয়কে আজকের সভায় পৌরোহিত্য করার জন্য প্রস্তাব করছি।"

স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে উঠে অন্নপূর্ণা পাইন বলল, "আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।"

অত্যন্ত মনোযোগে ব্রততী খাতা খুলে প্রথম প্যারাটি লিখে ফেলল। তারপর বলল, "আমি এবার সভা পরিচালনার জন্য মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

অনুষ্ঠানসূচি লেখা একটা কাগজ ব্রততী এগিয়ে দিল সভাপতির দিকে।

প্লাস পাওয়ারের চশমা চোখে লাগিয়ে তিনি কাগজে চোখ বুলিয়ে বললেন, "এবার প্রধানশিক্ষিকা আজকের সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করাবেন।"

মলয়া গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করল, "মাননীয় সভাপতি ও আমন্ত্রিত অভিভাবকরা, আমার সহকর্মী ও ছাত্রীরা, আপনারা জানেন আমাদের স্কুল পঁচাত্তর বছর পূর্ণ করবে সামনের জুলাই মাসে। এই পল্লির কয়েকজন শিক্ষাব্রতীর চেষ্টায়, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, পল্লিবাসীর সক্রিয় সহযোগিতায় তেরোটি মেয়ে নিয়ে স্কুলের যে চারাগাছটি রোপিত হয়েছিল, আজ তা এগারোশো ছাত্রীর মহীরুহে পরিণত..."

ঠিক এই সময়েই কোমরে প্যান্টের বেল্ট আঁটতে আঁটতে সাদা গেঞ্জি পরা, হাতে চশমা, আলুথালু চুলে, চটি পায়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল সত্যশেখর।

মলয়া ভাষণ থামিয়ে তাকিয়ে রইল, সারাঘর হতভম্ব। আচমকা দীর্ঘদেহী, মোটাসোটা একটি লোক হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে পড়ায় সভা নির্বাক। সত্যশেখর বুঝতে পেরেছে সে বিদঘুটে একটা অবস্থা তৈরি করে ফেলেছে তাই বোকার মতো লাজুক হেসে বলল, "একটু দেরি হয়ে গেল।"

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলরাম দত্ত বলল, "তিন মিনিট দেরি হয়েছে।"

"তা হলে তো প্রায় ঠিক সময়েই এসে গেছি।" সত্যশেখরকে আশ্বস্ত দেখাল, "নিন, এবার শুরু করুন।" খালি চেয়ারটা দেখে সে সেটায় বসল।

মলয়ার মুখ থমথমে। বক্তব্য পেশ করার মুখেই এমন একটা বাধা পেয়ে তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। ভূমিকা বাদ দিয়ে সে সরাসরি বিষয়ে চলে এল। "আমরা ঠিক করেছি প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব তিনদিন ধরে করব। তিনদিন দীর্ঘ সময় আর তাতে খরচও বেড়ে যাবে।"

সমাজসেবিকা পল্লবী গুহ বলল, "কত বাড়বে সেটা কি হিসেব করেছেন?"

"করিনি। তবে মোট কত খরচ করতে পারব তার একটা অ্যামাউন্ট আমরা আনুমানিক ধরেছি — পঞ্চাশ হাজার টাকা। স্কুল থেকে দিতে পারব তিরিশ হাজার, ছাত্রীদের কাছ থেকে দশ টাকা করে নিয়ে এগারো হাজার আর ডোনেশন-বিজ্ঞাপন থেকে দশ হাজার। এই টাকায় তিনদিন ধরে ফাংশন করা আমার মনে হয় সম্ভব নয়।"

জমি ও বাড়ির প্রোমোটার, ব্যবসায়ী শিবশঙ্কর হালদার বলল, "পঞ্চাশ হাজারে তিনদিন?" হতাশায় মাথা নাড়ল। "মেয়েদের একদিন তো ভাল করে খাওয়াবেন, তাতেই তো অর্ধেক টাকা চলে যাবে, তারপর আর্টিস্ট এনে জলসা, সিনেমা, থিয়েটার এসব করতে গেলে," হাত নাড়তে নাড়তে শিবশঙ্কর বলল, "আরও দু'লাখ।"

ছাত্রী প্রতিনিধি ধূপছায়া এবার বলল, "আমাদের ভাল করে না খাওয়ালেও চলবে। প্যাকেটে লুচি-আলুর দম-বোঁদে দিলে সোনামুখ করে আমরা খাব।"

বলরাম দু'হাত ঝাঁকিয়ে বলল, "এই তো চাই। কবজি ডুবিয়ে মাংস-ভাত, কি বিরিয়ানি, এসব কী? এটা বিয়েবাড়ি না কালীপুজো? এঁটো কলাপাতা, হাড়গোড় ফেলে ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ করা? না, না, ওই মেয়েটি ঠিক বলেছে, প্যাকেটের খাবার।"

শিবশঙ্কর হালদার এখনও হাল ছাড়েনি। বলল, "আমার শালার কেটারিং ব্যাবসা, তাকে বললে থার্টি পারসেন্ট লেস করে দেবে। তা ছাড়া প্যাকেটে খাবার দেবেন, কিন্তু প্যাকেটগুলো এখানে-ওখানে ফেললে তাতে কি পরিবেশদূষণ হবে না?"

"ফেলবে কেন? বাড়ি নিয়ে যাবে।" বলরাম উত্তেজিত হয়ে গলা চড়াল।

মলয়ার মনে হল ব্যাপারটা বাগ্‌বিতণ্ডার দিকে গড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে বলল, "খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা ফান্ডের অবস্থা বুঝে পরে আমরা ঠিক করব।"

ব্রততী ঝুঁকে খাতায় লিখে নিল। শিবশঙ্কর বলল, "থার্টি পারসেন্ট নয়, লিখুন ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লুচির সঙ্গে প্যাকেটটাও কি খেয়ে ফেলবে? ওটা তো ফেলতেই হবে, তাতে বোধহয় দূষণ হবে না।"

শিবশঙ্করের চিমটিটা বলরাম হজম করে নিল।

মলয়া বলল, "আর কারও যদি কোনও প্রস্তাব থাকে, বলতে পারেন।"

"আমার একটা প্রস্তাব আছে।" পল্লবী গুহ গলা পরিষ্কার করার জন্য ছোট্ট করে কেশে নিয়ে বলল, "পড়াশুনোয় এই স্কুল কলকাতার সেরা দশটা স্কুলের একটা। মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের রেজ়াল্টই তা বলে দিচ্ছে। পড়াশুনোর সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক কাজ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। সমাজের, দেশের মঙ্গল হয় এমন একটা কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন, যা অন্যান্য স্কুলকে ইনস্পায়ার করবে।"

সারাঘর কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব। পল্লবী সেটা উপভোগ করে বলল, "রক্তদান শিবির।"

সত্যশেখরের প্রবেশ দেখে যতটা হোঁচট খেয়েছিল সভা, এবার চিৎপাত হয়ে পড়ল।

এই প্রথম সত্যশেখর কথা বলল, "বলেন কী! এইসব নাবালিকাদের শরীর থেকে রক্ত টেনে নেবেন? পুলিশে ধরবে যে!" দাঁড়িয়ে উঠে সে সভাপতির উদ্দেশে বলল, "ইয়োর অনার, এই প্রস্তাব অনৈতিক এবং আইনবিরুদ্ধ। কোনওমতেই এটা মানা যায় না।"

পলাশবরণ ঘোষ বহু বছর পর 'ইয়োর অনার' শুনে প্রসন্ন মনে বললেন, "প্রস্তাব খারিজ।"

পল্লবী দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র স্বরে বলল, "এখনও আমার বক্তব্য পুরোটা শোনা হল না, তার আগেই খারিজ! এটা পুরো অগণতান্ত্রিক।"

সভাপতি বিব্রত হয়ে বললেন, "আপনি আপনার বক্তব্য শোনাতে পারেন।"

"নাবালিকাদের রক্ত টানার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা আমার নেই। তাদের অভিভাবকদের রক্ত নেওয়ার জন্য শিবির হোক। বাবা-মায়েরা স্বেচ্ছায় এসে রক্ত দিয়ে যাবেন, এটাই আমার প্রস্তাব।"

পল্লবী গুহ বসে পড়ে এক গ্লাস জল চাইল। মিশিরজি তাড়াতাড়ি টুলে বসা থেকেই চাপা গলায় ফাইভ এ-ওয়ান ঘরের দিকে মুখ করে বলল, "গিরি, জল এক গ্লাস।"

গিরিবালা প্রস্তুত ছিল। দশ সেকেন্ডের মধ্যে জলভরতি গ্লাস একটি প্লেটের উপর রেখে ঘরে ঢুকে সত্যশেখরের সামনে দাঁড়াল। তার মনে হয়েছে, আলুথালু চুল, গেঞ্জিপরা, মোটাসোটা লোকটিরই বোধহয় তেষ্টা পেয়েছে।

"আমাকে নয়, ওনাকে।" সত্যশেখর পাশে বসা পল্লবী গুহকে দেখাল। তারপর বলল, "আমার রক্ত জল হয়ে গেছে ওনার প্রস্তাব শুনে।"

পল্লবী গ্লাস হাতে নিয়ে বলল, "জল নয়, জমাট বেঁধে বরফ হয়ে গেছে। এবার ওটা গলাবার জন্য চা খান।" বলেই এক চুমুকে গ্লাস খালি করে দিয়ে বলল, "ম্যাডাম কি চায়ের ব্যবস্থা রেখেছেন?"

ব্রততী তাড়াতাড়ি বলল, "চা নয়, সফ্‌ট ড্রিঙ্কস আছে। গিরি ...।"

গিরিবালা দ্রুত ফাইভ এ-ওয়ানে ফিরে গেল।

পল্লবী গুহর প্রস্তাব শুনে সভা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল, তারপর ফিসফাস, তারপর আরতি ঘটক মুখ খোলে। "ছাত্রীদের বাবা-মায়েরা হলে অবশ্য বলার কিছু নেই। তবে টিচাররা এতে অংশ নেবে না।"

সত্যশেখর বলল, "কেন নেবেন না? তাঁরা তো নাবালিকা নন!"

"প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে প্রত্যেকেরই অংশ নেওয়া উচিত। টিচাররা নিচ্ছেন, আশা করব গার্জেনরাও নেবেন। তাঁদের জন্য এই মহৎ কাজটি যদি বরাদ্দ করা হয় তা হলে তাঁদের মহানুভবতায় ভাগ বসিয়ে টিচারদের রক্ত দেওয়াটা উচিত হবে না। ঠিক কিনা?" অন্নপূর্ণা এই বলে তার সহকর্মীদের দিকে তাকাল, সকলের মাথা একদিকে হেলে পড়ল।

"রক্ত অভিভাবকরাই দেবেন, অবশ্য শিবির যদি স্থাপন করা যায়।" মন্তব্যটি অসীমা দত্তর।

তার স্বামী বলরাম এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার মুখ খুলল, "রক্ত দান টান তো শুনলুম, কিন্তু পরিবেশদূষণ নিয়ে কতরকম প্রচার যে এলাকায় এই জুবিলি আর ছাত্রীদের মারফত করা যায়, সেকথা কি আপনারা ভেবেছেন? জুবিলি উৎসবকে স্রেফ নাচগান, নাটক আর জলসায় পর্যবসিত না করে সমাজ উন্নয়ন, সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির একটা আন্দোলন গড়ার হাতিয়ার করে তোলা উচিত।"

কলাবতী ধূপছায়ার কানে ফিসফিস করে বলল, "ভদ্রলোককে মনে হচ্ছে পলিউশনে পেয়েছে। আন্দোলন মানে স্কুলের মেয়েদের নিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে পদযাত্রা, নয়তো ঝাঁটা নিয়ে একদিন রাস্তা সাফ করা।"

"দেখি না আর কী বলেন, তারপর দূষণ আর রক্তদান কীভাবে হয় দেখা যাবে।" ধূপছায়া কথা শেষ করে দেখল, গিরিবালা দু'হাতে আঙুলের ফাঁকে কাগজের খড় ঢোকানো চারটে বোতল নিয়ে সেগুলো কাদের দেবে বুঝতে না পেরে ব্রততীর দিকে তাকিয়ে। ব্রততী সন্তর্পণে ডান হাতের তর্জনী তাক করে দেখাল সত্যশেখরকে। গিরিবালা সত্যশেখরের হাতে বোতল তুলে দিল। তর্জনী দু'ইঞ্চি ডাইনে সরল, বোতল পেল বলরাম, আরও দু'ইঞ্চি ডাইনে সরল তর্জনী, গণসংগীত গায়ক অরুণাচল বোতল নিল, এর পর পেল পল্লবী গুহ। ব্যবসায়ী শিবশঙ্কর হালদার আর সভাপতি পলাশবরণ বাকি রয়ে গেছে। ব্রততী 'ভি' দেখাল গিরিবালাকে দুটি আঙুল তুলে। গিরিবালা ব্যস্ত পায়ে ফাইভ এ-ওয়ানে ফিরে গিয়ে দুটি বোতল এনে তর্জনীর নির্দেশমতো শিবশঙ্করকে দিতে গেল।

"না, না, আমাকে নয়। ডায়াবিটিস আছে, ডাক্তারের বারণ।"

গিরিবালা নিরুপায় চোখে ব্রততীর দিকে তাকিয়ে বুদ্ধের বরাভয় দানের মতো ব্রততীর হাতের তালু দেখে বুঝল — থাক, দিতে হবে না। তারপরই সে দেখল তালু থেকে বুড়ো আঙুলটা বাঁ দিকে বেঁকে গেল। বাঁ দিকে বসে মলয়া, তার পাশে সভাপতি। গিরিবালা একটা বোতল মলয়ার সামনে রেখে বলল, "বড়দি, আপনার।"

কথা ছিল বোতল পাবে শুধু বহিরাগতরা। বিব্রত মলয়া তাড়াতাড়ি বোতলটা পাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনি নিন। আমি পরে খাব।"

গিরিবালা বাকি বোতলটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, সত্যশেখর ডাকল, "এই যে, ওটা দেখি।" হাত বাড়িয়ে বলল, "একটা খেয়ে কি তেষ্টা মেটে!"

সফ্‌ট ড্রিঙ্ক্‌স বিতরণ দেখে ধূপছায়া বলল, "কালু, আমাদের দেবে না?"

"না, আমরা ভিতরের লোক। দেখলি না, বড়দি খেলেন না।"

"তোর কাকা কিন্তু দুটো খেলেন।"

"দুটো কেন, যে ক'টা আনানো হয়েছে সব খেয়ে নেবে যদি অফার করা হয়। তবে এখানে খাবে না, বড়দির ভয়ে। বাইরে নিলুর দোকানে ঠিক আরও গোটাচারেক খাবে।"

সবার বোতল শেষ হয়েছে দেখে মলয়া বলল, "আমরা দুটো প্রস্তাব পেয়েছি। এবার আর কেউ কিছু বলবেন?"

গলা ঝেড়ে নিয়ে সত্যশেখর বলল, "প্ল্যাটিনামের আগে নিশ্চয়ই ডায়মন্ড জুবিলি পনেরো বছর আগে হয়েছিল।"

এই স্কুলে তিরিশ বছরের শিক্ষিকা ব্রততী বলল, "হয়েছিল।"

মলয়া তখন অসুস্থ ছিল, অনুষ্ঠানে আসতে পারেনি। কী হয়েছিল তা সে জানে না। তাই চুপ করে রইল।

সত্যশেখর আবার বলল, "তখন কী প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেটা যদি বলেন।"

"দু'দিন ফাংশন হয়েছিল। সব কিছু ব্যবস্থা করেছিলুম আমরা টিচাররা, উঁচু ক্লাসের ছাত্রীরা আর ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন মেম্বার মিলে। প্রথম দিন উদ্বোধন করেন জ্যোতিবাবু। রাইটার্স থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে এসেছিলেন, আট মিনিট ছিলেন। ছাত্রীরা নেচেছিল, কয়েকজন টিচার আবৃত্তি করেছিল..."

"বই দেখে না, না-দেখে?" কৌতূহলটা সত্যশেখরের বলাই বাহুল্য।

একটু কঠিন গলায় ব্রততী বলল, "না দেখে। আমি আবৃত্তি করেছিলুম 'দুই বিঘা জমি' — না দেখে। আর বক্তৃতা দিয়েছিলেন চব্বিশ বছর ধরে ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষাল। তাঁর বক্তৃতার আধঘণ্টার মাথায় হাততালি শুরু হওয়ায় তিনি বসে পড়েন। তিনদিন পর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। আমরা ঠিক করেছিলুম তিনি পঁচিশ বছর চেয়ারম্যান থেকে সিলভার জুবিলি করলে তাঁকে সংবর্ধনা দেব, আমাদের সেই আশা আর পূরণ হয়নি।" আশা অপূর্ণ থাকার দুঃখে ব্রততীর গলা ধরে এল।

"অতুলকৃষ্ণবাবুকে তা হলে প্ল্যাটিনাম জুবিলির রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান করে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হোক।"

সত্যশেখরের প্রস্তাব শোনামাত্র ব্রততী খাতায় লিখে নিল।

"মিস্টার সিন্‌হার কথামতো মাননীয় অতুলকৃষ্ণ ঘোষাল মশাইকে বিশেষ সংবর্ধনা দিতে পারলে আমাদের ভালই লাগত।" মলয়া মন্থর, ভারী গলায় বলল, "কিন্তু গভীর পরিতাপের কথা, তিনি গতবছর পঁচানব্বই বছর বয়সে মারা গেছেন।"

"খুবই দুঃখের কথা। ওনার এই অকালমৃত্যুর কথা কালো, মোটা, চৌকো বর্ডার দিয়ে আপনারা যে সুভেনির নিশ্চয়ই বের করবেন, তাতে যেন ছাপা হয়। আর একটা কথা ম্যাডাম, আমি সিন্‌হা নই, সত্যশেখর সিংহ, সিঙ্গিও বলতে পারেন।"

মলয়া কটমটে চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, "ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য সিঙ্গিমশাইকে ধন্যবাদ।"

"হেডমিস্ট্রেস বক্তৃতা দেননি?" আবার সত্যশেখর।

মলয়া ফিসফিস করে ব্রততীকে, "বলেছিলুম ঝামেলাবাজ।"

"বড়দি তখন সদ্য স্কুলে জয়েন করেছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী, না হলে নিশ্চয় বক্তৃতা দিতেন। তবে এবার দেবেন।" ব্রততী জানিয়ে দিল।

"ক'মিনিট দেবেন, সেটা যেন ঠিক করে রাখেন।" বলল বলরাম দত্ত। তারপর যোগ করল, "গার্জেনদের তরফে একজনকে যেন বলতে দেওয়া হয়।"

ব্রততী লিখে নিল। কলাবতীর ফিসফিস ধুপুর কানে, "রেডি থাক, একটা পরিবেশরক্ষার ভাষণ শুনতে হবে।"

"হাততালি দেওয়ার রিহার্সালটা তা হলে তুইই অ্যারেঞ্জ করিস।" বলেই

ধূপছায়া কাঠ হয়ে গেল, ব্রততী একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে।

"আর কী-কী হয়েছিল?" পল্লবী গুহ জানতে চাইল।

"অনেক কিছুই হয়েছিল। এখন আর সব মনে নেই।" ব্রততী মনে করার চেষ্টায় ভ্রূ কুঁচকে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েরা নাটক করেছিল 'অবাক জলপান'। সুকুমার রায়ের লেখা। আর ফাইভের মেয়েরা সাঁওতালি নাচ নেচেছিল, খুব হাততালি পেয়েছিল। আলপনা দেওয়ার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ইলেভেন বি-র মেয়েরা ফার্স্ট হয়েছিল। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝখান দিয়ে ওদের আঁকা আলপনা এক হপ্তা কেউ মাড়ায়নি," ব্রততীর গলায় প্রচ্ছন্ন গর্ব।

গণসংগীত গায়ক অরুণাচল মন্তব্য করল, "আর্টের রিয়েল সমঝদারি একেই বলে।"

"ও হো হো, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি," ব্রততী মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে তার লম্বা শরীরটা নুইয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো করে ফেলল, "শেষ অনুষ্ঠান ছিল স্কুলের উঠোনে সিনেমা শো। 'শোলে' দেখানো হয়। সে যে কী ভিড় হয়েছিল কী বলব, ছাত্রী আর গার্জেনরা মিলে হাজারখানেক তো হবেই, দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত ছিল না। একটা মাত্র অঘটন দু'দিনের একেবারে শেষের এই অনুষ্ঠানে ঘটেছিল।" ব্রততী জল খাওয়ার জন্য সভাপতির সামনে রাখা জলের গ্লাসটা টেনে নিল। পনেরো বছর আগের ঘটনা মনে পড়াতেই বোধহয় গলা শুকিয়ে গেছে। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে সে রুমালে মুখ মুছল।

"বাসন্তী যখন টাঙ্গা চালিয়ে গব্বরের লোকেদের হাত থেকে পালাচ্ছে, সবাই তখন টানটান, কী হয়-কী হয়, আর ঠিক সেই সময়..." বাচ্চাদের ভূতের গল্প বলার মতো গলায় ছমছমে ভাব এনে চার সেকেন্ড থেমে ব্রততী বলল, "লোডশেডিং!"

"কী সব্বোনাশ!" আঁতকে উঠল অরুণাচল।

"আপনারা তখন কী করলেন?" সত্যশেখর উদ্‌গ্রীব পরের ঘটনা শোনার জন্য।

"আমরা সবাই দৌড়ে এই টিচার্সরুমে এসে দরজায় খিল আর ছিটকিনি তুলে দিলুম। মিশির আর দু'-তিনজন টিচার বাইরে রয়ে গেছে, তারা দুমদুম করে দরজা ধাক্কাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। অন্নপূর্ণা ঘরের মধ্যে 'হে মধুসূদন রক্ষা করো, ব্রততীদি দরজা খুলো না, পাবলিক ঢুকে পড়বে,' বলে চেঁচাচ্ছে।"

অন্নপূর্ণা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল, "মোটেই আমি 'দরজা খুলো না' বলিনি। বাইরে কলিগরা বিপন্ন, তখন কি ওরকম কথা বলা যায়?"

"আপনি কি তখন দরজা খুলে দিয়েছিলেন?" ব্যারিস্টার জেরা শুরু করল।

"কী করে খুলব? অসীমা তো তখন দু'হাতে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। ওর গায়ে তো জোর বেশি। অসীমা, উঠে দাঁড়াও তো।"

অসীমা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "পনেরো বছরে দশ কেজি ওজন বেড়েছে। এখন দেখে মনে হবে আমার গায়ের জোর ওর চেয়ে বেশি। কিন্তু তখন ইচ্ছে করলেই অন্নপূর্ণা আমায় ঠেলে সরিয়ে দিতে পারত।"

অন্নপূর্ণা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে গণসংগীত বলে উঠল, "থাক এখন ওসব কথা, এবার বলুন লোডশেডিং হওয়ার পর পাবলিক কী করল।"

ব্রততী বলল, "কী করবে আবার, চেয়ার ভাঙতে শুরু করল, সে কী আওয়াজ!"

সত্যশেখরের জেরা অব্যাহত, বলল, "ভাঙল মানে? নিশ্চয় কাঠের চেয়ার ছিল।"

ব্রততী বলল, "স্টিলের চেয়ারের ভাড়া বেশি, তাই কাঠের ..."

"ওইখানেই তো ভুল করেছিলেন।" গণসংগীত বলে উঠল, "বিয়ে কি বউভাত হলে কাঠের চেয়ার ঠিক আছে, কিন্তু বিনিপয়সায় সিনেমা দেখতে কি গান শুনতে আসে যখন, পাবলিকের মেজাজ তখন স্টিলের হয়ে যায়। দুটো পয়সা বাঁচাবার চিন্তা যদি মাথায় না রাখতেন, তা হলে ভাঙচুরটা হতে পারত না। গত মাসে ধপধপিতে শীতলাপুজোর একটা ফাংশনে গেছলুম। ঠিক আমারই প্রোগ্রামের সময় হল লোডশেডিং।"

"চেয়ার ভাঙাভাঙি হল তো?" বলরাম এবং পল্লবী প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল।

"ভাঙবে কী করে! সব তো লোহার চেয়ার। ওরা তো জানত লোডশেডিং হবেই। তখন কী কাণ্ড ঘটবে সেটা ওরাও যেমন জানত, আমিও তেমনি জানতুম। গাইছিলুম 'ও আমার দেশের মাটি', যেই না অন্ধকার হয়ে মাইক বন্ধ হল, সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে ফুলভলিউমে শুরু করলুম 'কারার ওই লৌহকপাট।' আড়াই-তিনহাজার লোক পিনড্রপ সাইলেন্ট। তবলচি চণ্ডী কাহারবা বাজাচ্ছিল, এবার যুদ্ধের ড্রামের মতো বাজাতে শুরু করল, জমে

গেল আসর। শুধু ভয় ছিল ওই 'লাথি মার ভাঙ রে তালা' লাইনটা নিয়ে। ভাঙাভাঙির কথা শুনে জনগণের মনে বিদ্রোহের সুপ্ত বাসনা যদি সত্যি সত্যি জেগে ওঠে, তা হলে তো লাথি মেরে চেয়ার ভাঙতে শুরু করবে। তখন কী করলুম বলুন তো?''

গণসংগীত গায়ক সাত সেকেন্ড চুপ। সারা ঘর কৌতূহলে হাবুডুবু। সভাপতি ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে বলে ফেললেন, ''অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন, তাই তো?''

''আরে না না। সটকান দেবে অরুণাচল, তাই কখনও হয়! পঞ্চাশ হাজার লোকের মিটিং-এ গেয়েছি, আর এ তো ...'' একটা তুড়ির শব্দ হল। ''খুব সিম্পল। একটা শব্দ বদলে দিলুম, লাথির জায়গায় ঘুঁষি বসিয়ে দিলুম। ঘুঁষি মেরে তালা ভাঙতে গেলে আঙুল ভেঙে যাবে, কেউ আর ভাঙাভাঙিতে গেল না। ওদিকে জেনারেটর চালু হয়ে গেছে। ফাংশনও শুরু হয়ে গেল।''

সত্যশেখর বলল, ''দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি তো মশাই আপনার, উকিল হলেন না কেন? হেডমিস্ট্রেসকে অনুরোধ করছি, নোট করুন, চেয়ার রাখতে হবে লোহার আর জেনারেটরের ব্যবস্থা অতি অবশ্য চাই। কাগজে দেখলুম কোলাঘাটের তিনটে ইউনিট বসে গেছে।''

''ভাল সাজেশন দিয়েছেন মিস্টার সিঙ্গি,'' মলয়া বলল।

''ধন্যবাদ।'' বিনীত স্বরে বলল সত্যশেখর, ''আর একটা প্রস্তাব দোব। যদি সিনেমা দেখাতে চান, তা হলে এমন ফিল্ম বাছুন যা দেখে দর্শকরা উত্তেজনা বোধ করবে না, সফট্, টেন্ডার, সেন্টিমেন্টাল এমন ফিল্ম।''

''এবং বাংলা বই।'' এম এল এ বলরাম দত্ত এতক্ষণ চুপ করে থেকে হাঁপিয়ে যাচ্ছিলেন, ''বলিউডের হিন্দি বই আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলায় যেভাবে সংস্কৃতিদূষণ ছড়াচ্ছে, একে প্রতিহত করতে হবে। না করলে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে না।''

ব্যবসায়ী শিবশঙ্কর বলল, ''এ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের ফিল্ম দেখাতে পারেন, যেমন 'দেবদাস'। হিন্দি নয়, বাংলা।''

সমাজসেবিকা পল্লবী তীব্র স্বরে আপত্তি জানাল, ''তা কী করে হয়? দেবদাস তো শুধু ড্রিঙ্ক করে, অল্পবয়সি মেয়েরা দেখে কী শিখবে?''

''ইস্‌স, এটা তো মনে ছিল না।'' শিবশঙ্করের দাঁত জিভে প্রায় বসে যাচ্ছিল, ''না, না, 'দেবদাস' স্কুলে দেখানো যাবে না। তা হলে বরং

'বামাখ্যাপা', কি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করার মতো ফিল্ম দেখানো হোক। আমি ক্যাসেট জোগাড় করে দোব।''

ভারী, গভীর গলায় অরুণাচল বলল, ''কোনও কন্ট্রোভার্সি হবে না যদি সত্যজিৎ রায় দেখান, 'পথের পাঁচালি' বা 'গুগাবাবা'। এতে প্রেম নেই, মদ খাওয়া নেই, ক্লিন ছবি। ধর্মটর্ম, কি বিপ্লবের আদর্শ এখনকার ছেলেপুলেদের টানে না।''

কলাবতী ধুপুকে কানে কানে বলল, ''শাহরুখের 'দেবদাস' দেখেছিস?''

''দেখেছি।''

''আমাদের কেব্‌ল টিভিতে দু'বার দেখিয়েছে, ফ্যান্টাসিক।''

মলয়া বলল, ''কী ফিল্ম দেখানো হবে, সেটা পরে ঠিক করা যাবে। তা যাই ঠিক হোক, হিন্দি নয়, আর ভায়োলেন্স থাকা চলবে না।''

''হাসি থাকা চলবে কি?'' প্রশ্ন সত্যশেখরের।

''নিশ্চয় চলবে, হাসি অতি উপকারী জিনিস। আমাদের পাড়ায় হাসির ক্লাব খোলা হয়েছে,'' গণসংগীতের গলায় প্রচ্ছন্ন গর্ব। ''আমিও লাফিং ক্লাবের মেম্বার। রোজ সকালে মেম্বারদের সঙ্গে পনেরো মিনিট টানা হাসি। বলব কী, শরীর-মন তাজা, ঝরঝরে হয়ে যায়।''

''কীভাবে হাসেন, সেটা একবার দেখাবেন কি?'' নিরীহ স্বরে বলল সত্যশেখর।

''না আ-আ-আ।'' তীক্ষ্ণ, উঁচু গলায় প্রায় ধমকের সুরে মলয়া শব্দটা করে কঠিন চোখে তাকাল সত্যশেখরের দিকে। কাঁচুমাচু ব্যারিস্টার অসহায় চোখে তাকাল ভাইঝির দিকে।

নিজের গলার স্বরে লজ্জা পেয়ে গেল মলয়া। আসলে বহুক্ষণ ধরে আজেবাজে ছেলেমানুষি কথাবার্তায় বিরক্ত বোধ করছিল। সভা ডাকার গুরুত্বটা কারও কথায় প্রকাশ না পাওয়ায় সে বুঝে গেল, পাঁচজনের মত নিয়ে সব কাজ করা যায় না। কিন্তু মাথা যে এতটা গরম হয়ে যাবে, সে বুঝতে পারেনি। লজ্জা ঢাকার জন্য সে নরম স্বরে বলল, ''কলাবতী, ধূপছায়া, তোমরা কিছু বলবে?''

ধূপছায়া দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ''বড়দি, মেয়েদের নিজেদের কিছু অনুষ্ঠান থাকা উচিত। বাইরের লোক এনে কিছু করলে লোকের ধারণা হবে এই স্কুলের মেয়েরা পড়া ছাড়া আর কিছুই পারে না। আমরাও যে অনেক কিছু পারি সেটা দেখাবার সুযোগ দেওয়া হোক।''

মলয়া তার হতাশা কাটিয়ে উঠে আগ্রহী স্বরে বলল, "নিশ্চয় তোমরা অনুষ্ঠান করবে। কী করবে, সেটা ভেবেছ?"

কলাবতী বলল, "আমরা সায়েন্স এগজিবিশন করব, নাটক করব।"

"শ্রুতিনাটক।" শিক্ষিকাদের একজন বলে উঠল।

কলাবতী বলল, "নিজেরা নাটক লিখে নিজেদের পরিচালনায় অভিনয় করব।"

"'অবাক জলপান' আবার করা যায়।" সত্যশেখর বলে উঠল।

"তা কেন! সুকুমার রায়ের তো আরও নাটক আছে, 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' করা যায়।"

কলাবতী থামামাত্র মলয়া বলল, "কিন্তু এই যে বললে, নিজেরা নাটক লিখে অভিনয় করবে?"

অপ্রস্তুত কলাবতী কথাটা শুধরে নেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, "'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'ই যে করব এমন কোনও কথা নেই। ওটা তো আশি-নব্বই বছর আগের লেখা, তাকে অবলম্বন করে আর একটা আধুনিক শক্তিশেল তো লেখা যায়।"

"কে লিখবে, তুমি?" মলয়া বলল।

"শুধু আমি কেন, সবাই মিলে লিখব।"

"বেশ। তবে মজাটা যেন থাকে।" মলয়া রাজি হয়ে গেল।

ব্রততী ঘাড় নিচু করে ঘসঘস করে লিখে নিচ্ছে। মলয়া ইশারায় মিশিরকে জানিয়ে দিল সফ্‌ট ড্রিঙ্ক্‌স পরিবেশন করতে। মিশির চাপা গলায় নির্দেশ পাঠাল ফাইভ-এ-ওয়ানে। বোতল হাতে গিরিবালা ঘরে ঢুকতেই মলয়া সভাপতিকে কানে কানে কী যেন বলল।

"ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলারা," সভাপতি বলে উঠলেন, "আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় যোগ দিয়ে সুচিন্তিত পরামর্শদানের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। আপনাদের সুপারিশ অবশ্যই বিবেচনা করবেন প্রধান শিক্ষিকা। প্ল্যাটিনাম জুবিলিকে সফল করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় জুবিলি সার্থক হয়ে উঠুক, এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আজকের সভা এখানেই সমাপ্ত হল।"

এরপর হাততালি। মলয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ব্রততীর সভার কার্যবিবরণী লিখে যাওয়া তখনও চলছে। বাইরের আমন্ত্রিতরা একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন কলাবতী বলল ধূপছায়াকে, "ধূপু,

নিলুর দোকানে চল। কাকা ঠিক হাজির হবে।''

প্রাক্তন বিচারপতিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে মলয়া ফিরছিল, কলাবতীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিচুগলায় বলল, ''কাকাকে বোলো, ভদ্রলোকেদের মাঝে যেতে হলে একটা জামা অন্তত গায়ে দিতে হয়।''

''বলব,'' বাধ্য ছাত্রীর মতো কলাবতী মাথা হেলাল।

''কী বলবি রে কালু?''

''কাকাকে জামা পরতে।'' হেসে ফেলে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে কলাবতী বলল, ''আমার কাকাটা একটা ব্যোম ভোলানাথ, এটিকেটের ধার ধারে না, দেখলি না অত লোকের মধ্যে নির্বিকারভাবে গিরিমাসির কাছ থেকে কেমন বোতলটা চেয়ে নিল। দোষ শুধু একটাই, ভীষণ পেটুক। তাই নিয়ে কম হাসাহাসি হয় বাড়িতে!''

স্কুলের ফটক পেরিয়ে দু'জনে নিলুর দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ধূপছায়া বলল, ''খুব তো বলে দিলি আধুনিক শক্তিশেল লিখব, পারবি? কখনও নাটক লিখেছিস?''

''সেই জন্যই তো লিখব, আমার মধ্যে একজন নাট্যকার লুকিয়ে আছে কি না, সেটা তো জানতে হবে!'' দাঁড়িয়ে পড়ল কলাবতী। একটু উত্তেজিত স্বরে সে যোগ করল, ''লেখার চেষ্টা না করলে সে খবরটা পাব কী করে? শুরুটা সবাইকেই তো একসময় করতে হয়, আমিও করব।''

''দারুণ একটা ডায়ালগ দিলি, আমার তো হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে। তোর হবে, নাটক লেখা হবে। ওই দ্যাখ, কাকা নিলুদার দোকানে।''

দু'জনে এগিয়ে গেল সত্যশেখরকে দেখে।

''এসে গেছিস।'' সত্যশেখর যেন জানত কলাবতী আসবে, ''নিলু দুটো বোতল দাও, কেমন মিটিং হল বল তো?'' তারপর নিজেই উত্তর দিল, ''আরে দূর দূর, এই নিয়ে কখনও মিটিং করে? মলুটার বুদ্ধিশুদ্ধি কোনওদিন ছিল না। আজও নেই। কী সব লোক ডেকে এনেছে! একজন বলল রক্তদান শিবির করতে, আর একজন বলল পরিবেশ আন্দোলন গড়ার হাতিয়ার করতে, আর একজন লোহার চেয়ার রাখতে আর একজন গুগাবাবা দেখাতে। আমি দেখলুম এভাবে চললে মিটিং আর শেষ হবে না, এটাকে ভন্ডুল করে দেওয়া দরকার। আর তা করতে হলে চটিয়ে দাও মলুকে। দিলুম চটিয়ে। ব্যস খতম মিটিং। ... আর একটা করে খা, আমিও খাই। নিলু, আরও তিনটে।''

সত্যশেখরের শক্তিশেল ব্যাখ্যা

রাতে খাওয়ার টেবলে সত্যশেখর রাজশেখরকে বলল, "জানো বাবা, কালু নাটক লিখবে।"

রাজশেখর রুটি ছিঁড়ে লাউঘন্ট দিয়ে পুঁটলি বানাচ্ছিলেন। চোখ বিস্ফারিত করে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বটে! কী নিয়ে?"

"সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর আধুনিক সংস্করণ। তাই তো রে, কালু?"

কলাবতী চামচে করে শুধুই লাউঘন্ট খাচ্ছিল, রুটি প্লেটেই পড়ে আছে। কাকার কথা যেন কানেই যায়নি, এমনভাবে সে পাশে দাঁড়ানো অপুর মাকে বলল, "পিসি, ঘন্ট খানিকটা তুলে রেখো, কাল ভাত দিয়ে খেয়ে স্কুলে যাব। দারুণ হয়েছে।"

ঘন্টর পুঁটলিটা মুখে ঢুকিয়ে রাজশেখর বললেন, "আধুনিক সংস্করণটা আবার কী? নাটকটা হবে কোথায়, করবে কারা?"

কলাবতী চুপচাপ খেয়ে চলেছে। সত্যশেখরই শেষ দুটো কৌতূহলের জবাব দিল, "হবে কালুদের স্কুলের কম্পাউন্ডে। উপলক্ষ স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি, করবে স্কুলের মেয়েরা। আরও অনেক কিছু তিনদিন ধরে হবে, তারই একটা এই নাটক।"

"ভাল কথা। তা সুকুমার রায়ের লেখাটাই তো করা যায়।"

আচমকাই কলাবতী প্রশ্ন করল, "আচ্ছা দাদু, শক্তিশেল জিনিসটা কী?"

রাজশেখরকে অপ্রতিভ দেখাল। আমতা আমতা করে বললেন, "রামায়ণে অবশ্য এক্সপ্লেন করে বলা নেই। শক্তি মানে তো জানিসই, পাওয়ার, জোর, স্ট্রেংথ, আর শেল মানে ... অপুর মা, চট করে বাংলা অভিধানটা নিয়ে এসো তো।"

দমবন্ধ করে বিস্ফারিত চোখে অপুর মা তাকিয়ে রইল।

"আনতে গেলে গোটা লাইব্রেরিটাই গন্ধমাদনের মতো নিয়ে আসবে। হনুমানের বিশল্যকরণী খোঁজা আর অপুর মা'র অভিধান খুঁজে আনা তো একই ব্যাপার," সত্যশেখর তারিয়ে তারিয়ে কথাগুলোকে লাউঘন্টর সঙ্গে মিশিয়ে বলল। তারপর যোগ করল, "অপুর মা, অভিধানের বদলে বরং আর একটু ঘন্ট এনে দাও।"

হাঁপ ছেড়ে অপুর মা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছদ্ম কোপ দেখিয়ে

কলাবতী বলল, "কাকা, পিসিকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না একদম। জানো, সই করে কুরিয়ারের কাছ থেকে চিঠি নিয়েছে। পিসি পূর্ণ সাক্ষর, লিটারেট। আচ্ছা তুমি বলো তো, শেল কথাটার মানে কী?"

সত্যশেখর পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, "কাশিপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির নাম শুনেছিস?"

"শুনেছি।"

"তা হলে শেল কথাটার মানে জিজ্ঞেস করছিস কেন? শেল মানে কামানের গোলা।"

"রামায়ণে কামানের গোলা!"

"এতে অবাক হওয়ার কী আছে? দু'-চার হাজার বছর আগে সায়েন্সে আমরা কত অ্যাডভান্স্ড ছিলুম জানিস? পুষ্পক রথ, সেটা কী বল তো?" সত্যশেখর চোখ সরু করে রইল। পাঁচ সেকেন্ড পর বলল, "স্যাবার জেট! অগ্নি বাণ, বরুণ বাণ, শব্দভেদী বাণ, এ সবই তো এখন রকেট, গ্রেনেড, এ কে ফর্টি সেভেন, স্টেনগান। তখনও শেল ছিল, এখনও বোফর্স কামানে সেটা ভরা হয়।"

"কাকা, আমরা যদি এতই অ্যাডভান্স্ড ছিলুম, তা হলে বিশল্যকরণীর মতো ক্যান্সারের ওষুধ বের করতে পারছি না কেন? হনুমান লাফ দিয়ে ভারত থেকে লঙ্কায় গেল, আর লং জাম্পে একটা অলিম্পিক গোল্ড এখনও আমরা আনতে পারিনি।"

রাজশেখর ছেলে আর নাতনির ঝগড়া শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, "সতু, তুই কি সত্যি সত্যিই বিলেত গেছলি? এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে তোর কথা শুনে ব্যারিস্টারিটা সত্যিই পাশ করেছিস কিনা।" কথা শেষ করে তিনি টেবল থেকে উঠে পড়লেন। তখনই লাউঘন্ট নিয়ে এল অপুর মা। সত্যশেখর ফ্যালফ্যাল করে বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া দেখছে।

"ছোটকত্তা, কতটা দোব?"

"সবটা।"

"কাকা, দাদু খুব চটেছে। স্যাবার জেটের পূর্বপুরুষ পুষ্পক রথ, অগ্নিবাণ থেকে আইডিয়া নিয়ে রকেট, এইসব গাঁজাখুরি থিয়োরি শুনলে আমিও তোমাকে কিন্তু অপুর মা আর বজরংবলীদের সঙ্গে এক দলে ফেলে দোব। দাদু তো অলরেডি ফেলেই দিয়েছে। দেখলে না, কীরকম থমথমে হয়ে গেল মুখটা।"

সত্যশেখরের গৌরবর্ণ মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। বাবাকে যেমন ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয়ও করে। "তাই তো রে কালু, বাবা আমাকে যা বলল, তার মানে তো আমি অশিক্ষিত। তার মানে..."

টেবলে রাখা সেলফোনটা বেজে উঠল। সত্যশেখর তুলে নিয়ে প্রথমেই কে ফোন করছে তার নম্বরটা দেখে নিয়ে অস্ফুটে বলল, "মলু, এত রাতে!"

কলাবতীর কান খাড়া হয়ে উঠল। সে খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে বড়দি কেন ফোন করছে।

"হ্যাঁ বলো। ... খাচ্ছিলুম। অপুর মা দারুণ একটা লাউঘন্ট করেছে উইথ চিংড়ি। কালু এখন আঙুল চাটছে ... য়্যা? না, না, আমার গোটাদশেক হাওয়াই শার্ট আছে, তোমাকে আর কিনে পাঠাতে হবে না ... একদম নয়। গেঞ্জি পরে মিটিং-এ যাওয়াটা সিঙ্গিবাড়ির কালচার নয়, এটা তুমি ভালই জানো। রোববার সব ভদ্রলোকই দুপুরে একটু ঘুমোয় ... আমি কুম্ভকর্ণের মতো টানা ছ'মাস ঘুমোই তোমাকে কে বলল? ঘুম থেকে উঠেই মিটিং-এ দৌড়োনো যায় না। একটু বিশ্রাম নিতে হয়, চা খেতে হয়।" এরপর কলাবতী দেখল কাকার মুখ লাল হতে হতে গম্ভীর হয়ে গেল।

"আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। বাবা বলল অশিক্ষিত, কালু বলল বজরং, তুমি বলছ কুম্ভকর্ণ, একমাত্র অপুর মা এখনও কিছু বলেনি। হয়তো বলবে ঘটোৎকচ।" বোতাম টিপে সত্যশেখর সেলফোনটা নামিয়ে রাখল।

"ওর হেডমাস্টারি স্বভাবটা আর বদলাল না।" এই বলে সত্যশেখর উঠে পড়ল, কলাবতীও।

বসার ঘরে কিছুক্ষণ টিভি দেখে কলাবতী শুতে যায়। তার আগে সে একবার দাদুর সঙ্গে দেখা করে। রাজশেখর এখন লাইব্রেরিতে। কলাবতী দরজায় উঁকি দিতেই তিনি বললেন, "কালু শুনে যা, শেল কথাটার একটা মানে পেয়েছি অভিধানে।"

কলাবতী দেখল টেবলে গোটাতিনেক পাতা খোলা মোটা মোটা বই। সে বুঝল, দাদু খুব গুরুত্ব দিয়েছে 'শেল' শব্দটায়। সে একটা চেয়ার টেনে বসল।

"সংস্কৃত শল্য থেকে শেল। তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ অস্ত্রবিশেষ। এর থেকে খুব একটা ধারণা করা গেল না জিনিসটা কেমন ছিল।" রাজশেখর আর একটা বই টেনে নিলেন। "এখানে বলছে, শ্বশুর ময়দানব শক্তিশেল তৈরি করে জামাই

রাবণকে সেটা দেন। এতে আটটা ঘণ্টা বাঁধা আছে। বজ্রনিনাদী, মহাবেগবাণ এবং সর্পজিহ্বার মতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণকারী শত্রুশোণিতপায়ী অস্ত্র। এর আঘাতে রাবণ লক্ষ্মণকে ভূপাতিত করেন। ওষধি পর্বতের দক্ষিণ শিখর হতে বিশল্যকরণী, সাবর্ণকরণী, সঞ্জীবকরণী আর সন্ধানী এই চার প্রকার মহৌষধি আনতে গেলেন হনুমান, কিন্তু ওষধি খুঁজে না পেয়ে পর্বতের শৃঙ্গটিই উৎপাটন করে নিয়ে আসেন। সেই সব ওষধি আঘ্রাণ করলে লক্ষ্মণ নীরোগ হয়ে পুনর্জীবিত হন।'' পড়ার চশমাটা চোখ থেকে সরিয়ে রাজশেখর বললেন, ''এই হল শক্তিশেল আর তার পরের ঘটনা। তুই যদি আরও কিছু জানতে চাস তা হলে বইটা নিয়ে যা। রাত্তিরে ঘুমোবার আগে রোজ একটু একটু করে পড়িস। নাটক যে বিষয় আর ঘটনা নিয়ে, সেটা আগে ভাল করে জেনে নেওয়া উচিত।'' রাজশেখর বইটা ঠেলে দিলেন কলাবতীর দিকে।

''দাদু, রাত্তিরে পড়ায় প্রধান বাধা পিসি। এগারোটা বাজলেই আলো নিভিয়ে দেবে।''

''কিছু একটা বলে ম্যানেজ করবি। আর একটা বই তোকে নাটক লেখার জন্য পড়তে হবে।''

রাজশেখর আলমারি খুলে বের করলেন মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাবলি। ধূসর মলাট, বইয়ের পাতাগুলো হলদেটে। কিছু পাতা খসে পড়ছে। এক সপ্তাহ বয়সি সন্তানকে মা যেভাবে ধরে, কলাবতী দেখল দাদু সেইভাবে দু'হাতে বইটি ধরে তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ''আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলুম। এর একটা ছোট অংশ আমাদের ম্যাট্রিকের বাংলা সিলেবাসে ছিল। ষাট বছর আগে পড়েছি এখনও ভুলিনি, শুনবি? মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করে যুদ্ধে যাবে। মন্দিরে যজ্ঞে বসার আগে তার কাকা বিভীষণ লক্ষ্মণকে গোপনে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন মন্দিরে। উদ্দেশ্য মেঘনাদকে হত্যা করা। ওই দু'জনকে মন্দিরের মধ্যে দেখে মেঘনাদ বলল ... আমাদের বিষ্ণুহরিবাবু ক্লাসে এইভাবে বলেছিলেন ...'' কলাবতী দেখল দাদু চোখ বুজলেন, ''এতক্ষণে—অরিন্দম কহিলা বিষাদে;— জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে। হায় তাতঃ, উচিত কি তব এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী, সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ শূলিশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতুষ্পুত্র বাসববিজয়ী। নিজগৃহ পথ তাতঃ দেখাও তস্করে? চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'' রাজশেখর চোখ খুলে বললেন, ''কালু, কী গ্রেস, কী ডিগনিটি। বাঙালি জীবনে তখন এটাই দরকার ছিল।''

রাজশেখরকে যেন ভূতে পেয়েছে। তিনি ষাট বছর আগে ফিরে গেছেন তাঁর কৈশোর জীবনে। সারাঘর গমগম করে উঠছিল তাঁর গম্ভীর স্বরে। দরজায় এসে দাঁড়াল অপুর মা।

"কালুদি, কাল ইশকুল আছে, শোবে এসো।"

"কালু, শক্তিশেলের আগের ঘটনা জানা দরকার নাটক লেখার জন্য। কেন রাবণ শেল ছুড়েছিল সেটা পাবি এই মেঘনাদবধে। এখন শুতে যা।"

অ্যাক্টর সন্ধানে কলাবতী ও ধূপছায়া

ক্লাস টেন এ-ওয়ান সেকশনের দরজায় দাঁড়িয়ে কলাবতী অপেক্ষা করছিল ধূপছায়ার জন্য। ঠিক দশটা বাজতে দশে পিঠে বইয়ের বস্তা নিয়ে তাকে আসতে দেখে কলাবতী এগিয়ে গেল।

"পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে আছি তোর জন্য, কথা আছে। এখন কার ক্লাস?

"আরতিদির। জিয়োগ্রাফি।"

"ওঁকে তো বড়দি ভূগোল নিয়ে কী যেন ডিমনস্ট্রেট করে দেখাতে বলেছেন?"

"দেখাবেন নাকি চাঁদে মানুষের হাঁটা আর মাটির তলা থেকে কীভাবে কয়লা তোলা হয়। বি-টু থেকে সাত-আট জন লেগে পড়েছে। ল্যাবরেটরিতে টিফিনের সময় ওরা আরতিদির সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছে। কেমিস্ট্রির আর ফিজিক্সের কী সব এক্সপেরিমেন্ট দেখানো হবে। কিন্তু আমাদের নাটকের কদ্দুর?"

"অনেক দূর, নাটক তো হবে, কিন্তু অ্যাকটিং করবে কারা? সেটা আগে ঠিক করতে হবে তো? তুই ঠিক করার কাজটা নে।" কলাবতী হাতের খাতাটা খুলে একটা কাগজ বের করে ধূপছায়ার হাতে দিয়ে বলল, "এতে সব লিখে দিয়েছি। চরিত্রের নাম আর কেমন মেয়ে চাই। তুই পড়ে নে আর টিফিনে কথা হবে।" কলাবতী এই বলে দ্রুত নিজের ক্লাসে চলে গেল।

টিফিনে ওরা দু'জন বসল কম্পাউন্ডে নিমগাছের নীচে সিমেন্টের বেদিতে। ধূপছায়ার হাতে কলাবতীর দেওয়া কাগজটা।

"রাম পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, ছিপছিপে, কণ্ঠস্বর মিষ্টি এবং ভরাট, একে

কোথায় পাব এই স্কুলে?'' ধূপছায়া অসহায় চোখে তাকিয়ে রইল। ''ছিপছিপে তো সবাই, কিন্তু ভরাট গলা আর পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি আমাদের ক্লাসে একটাও নেই। সব আমার মতো পাঁচ-দুই আর মিহি গলা, তুই রামটাকে একটু অন্যরকম করে দে, আর নয়তো নিজে কর।''

''আমি লিখব, ডিরেকশন দোব আবার অভিনয়ও করব, অত হয় না।''

''কেন হয় না? উৎপল দত্ত কি করতেন না?''

''সে উনি পারতেন।'' কয়েক সেকেন্ড ভেবে কলাবতী বলল, ''রাম শেষ পর্যন্ত না পাওয়া গেলে তখন ভেবে দেখা যাবে। লক্ষ্মণকে খুঁজে বের কর। আর বাকি সব বোধহয় ক্লাসেই পেয়ে যাবি। একটা ঢ্যাঙা আছে তোদের ক্লাসে, ওকে বল।''

''সুগ্রীবের জন্য?''

''না, বিভীষণের জন্য। আমার নাটক হবে মেঘনাদবধ কাব্য অবলম্বনে। কীভাবে বধ হল সেটা জানিস? তবে শোন, লক্ষ্মণকে নিয়ে বিভীষণ চুপিচুপি পথ দেখিয়ে নিকুম্ভিলা উপবনে যাবে। সেখানে মেঘনাদ তখন যজ্ঞের জন্য মন্দিরে সবেমাত্র বসেছে। তার আগে একটা ব্যাপার তোর জেনে রাখা দরকার, মেঘনাদের নাম ইন্দ্রজিৎ হল কেন? জানিস কেন হল?''

''ইন্দ্রকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল বলে।'' ধূপছায়া বুঝিয়ে দিল রামায়ণ তার পড়া আছে।

''হারিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজিৎ কী করল তারপর?'' উত্তরের অপেক্ষা না করে কলাবতী নিজেই বলল, ''ইন্দ্রকে বেঁধে লঙ্কায় নিয়ে আসে। দেবরাজের এরকম হেনস্থা দেখে দেবতারা ব্রহ্মাকে লিডার করে একটা ডেলিগেশন নিয়ে ইন্দ্রের মুক্তিভিক্ষা করতে আসে। ইন্দ্রজিৎ বলল আমাকে অমরত্ব বর দাও, তবেই ইন্দ্রকে ছাড়ব। ব্রহ্মা তাতে রাজি নন। বললেন অন্য বর চাও। তখন ইন্দ্রজিৎ বলল, যখন আমি অগ্নির পুজো করে যুদ্ধ করতে যাব তখন আমার জন্য অগ্নি থেকে ঘোড়াসমেত রথ উঠে আসবে, সেই রথে যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ আমি যেন অমর হই। অগ্নিপুজোর জপ আর হোম আনফিনিশ্‌ড রেখে যুদ্ধে গেলে তবেই আমাকে মারা যাবে, রাজি? ব্রহ্মা আর কী করেন, ইন্দ্রকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তথাস্তু বলে তাতেই রাজি হয়ে গেলেন।''

''কী অবাস্তব আর গাঁজাখুরি ব্যাপার,'' ধূপছায়া হেসে উঠল।

''আর হ্যারি পটারে এসব থাকলেই সেটা হয় দারুণ কল্পনা।'' কলাবতীর স্বরে চাপা ব্যঙ্গ।

"তারপর কী হল বল।" ধূপছায়া তর্কে আর গেল না।

"কী আর হবে। মেঘনাদের আর যজ্ঞ করা হল না। অস্ত্র হাতে তো আর পুজো করতে আসেনি, তাই নিরস্ত্র লোককে লক্ষ্মণ খুন করে দিল। ছেলের এভাবে মৃত্যু হওয়ায় রাবণ খেপে গিয়ে যুদ্ধ করতে গেল। এলোপাতাড়ি রামের চ্যালাদের পিটিয়ে ছাতু করে হনুমানকে আর সুগ্রীবকে এমন ঠ্যাঙানি দিল যে, দু'জনই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পড়িমরি পালিয়ে বাঁচল। রাবণ তারপরই শক্তিশেল মেরে লক্ষ্মণকে শুইয়ে দিল। তারপর তো বানরদের কবিরাজ সুষেণ শেকড়বাকড় আনতে হনুমানকে পাঠাল গন্ধমাদন পাহাড়ে। হনুমান গাছপালা হাতড়ে চিনতে না পেরে পাহাড়ের মাথাটাই ভেঙে নিয়ে এল। তারপর...।"

টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ল। কলাবতী উঠে দাঁড়াল, "এখন এই পর্যন্ত। তুই বরং রাতে টেলিফোন করিস। আমার ফর্দমতো এখন মেয়েদের পাস কিনা দ্যাখ।"

অন্নপূর্ণাকে টিচার্স রুম থেকে বেরোতে দেখে কলাবতী দোতলার সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাল।

"এই যে কলাবতী," অন্নপূর্ণা পিছু ডাকল। "তোমার নাটকের কদ্দূর? কারা কারা অভিনয় করবে সিলেক্ট করে ফেলেছ? অনামিকা কিন্তু ভাল অভিনয় করে, ওর দেবযানী তুমি তো শোনোনি?"

"অন্নপূর্ণাদি, এ নাটকে পাত্রপাত্রীরা সব রাক্ষস আর বানর, শুধু রাম লক্ষ্মণই মানুষ। এই দুটো ভূমিকায় একটু বড়, মানে লম্বা মেয়ে চাই।"

"ওমা, অনামিকা তো বেঁটে নয়। ও তো চার ফুট দশ ইঞ্চি। এই তোমার কাঁধের সমান।"

"অন্নপূর্ণাদি, আমি এখন যাই। অসীমাদির ক্লাস, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। লেখাটা হোক, তখন দেখা যাবে।"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে কলাবতী লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল।

"কালু, নাটকের কোন অঙ্কে পৌঁছোলি?" রাজশেখর খাওয়ার টেবলে জানতে চাইলেন।

"অঙ্ক একটাই। পরদা টেনে শুরু, পরদা টেনে শেষ। বড়দি বলে দিয়েছেন এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে। ওটাই শেষ প্রোগ্রাম।"

সত্যশেখর বলল, "আধুনিক শক্তিশেল বলেছিলিস, মনে আছে? আধুনিক মানে এখনকার ব্যাপার। করবে তো স্কুলের মেয়েরা। সবারই এই প্রথম অভিনয়, তোরও। ভাল করে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি না করালে কিন্তু গুবলেট হয়ে যাবে।"

"দাদু, আমি ভাবছি রিহার্সালটা স্কুল ছুটির পর আমাদের ছাদে করব।"

সত্যশেখর বলল, "আমাদের ছাদে কেন? স্কুল থেকে এতদূর এসে করার চেয়ে স্কুলেরই একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে তো করা যায়। তোদের টিচার্স রুমটা তো বেশ বড়। তা ছাড়া রিহার্সালের একটা খরচ আছে। সেটা তো স্কুলকেই দিতে হবে।"

"ব্রততীদি বলে দিয়েছেন প্রতিদিনের জন্য দশ টাকা। তার বেশি দরকার হলে নিজেরা চাঁদা তোলো।"

ভুরু কপালে তুলে সত্যশেখর বলল "দ-অ-অ-শ টাকা, বলিস কী রে! বন্ধ ডাক, অবরোধ কর। অতগুলো মেয়ে, স্কুলের ছুটির পর খিদেয় পেট চুঁইচুই করবে, তখন চেঁচিয়ে পার্ট বলবে? কালু, বলে রাখছি খাবার ব্যবস্থা কর, নয়তো দেখবি একটা-দুটো করে রোজ মেয়ে কমে যাবে। আচ্ছা, কখন থেকে বসে আছি অপুর মা তো খেতে টেতে দিল না। ব্যাপার কী!"

মৃদু হেসে রাজশেখর বললেন, "দুপুরে টিভি-তে রান্না শেখাচ্ছিল। অপুর মা আর মুরারি বসে বসে দেখেছে। 'বাদশাহি চানা গোস্ত কা খুল্লাম খুল্লা'। দেখে অপুর মা বলল 'হেঃ, এই রান্নার জন্য এত বাসনকোসন, কায়দাকানুন আর বকবক? মুরারিদা বাজার থেকে মাংস, টকদই, কিসমিস, গরম মশলা আর কাবলে ছোলা এনে দাও তো। ওর চেয়ে ভাল খুল্লা খুল্লা ঘুগনি আমি রেঁধে দোব।' মুরারি বাজার থেকে ফিরল সন্ধেবেলায়। বাগমারিতে বিকেলে বাস চাপা, তারপর বাসে আগুন, রাস্তা অবরোধ, পুলিশ, লাঠি আর গুলিও। মুরারি আটকে পড়েছিল, তাই রাঁধতে দেরি হচ্ছে, একটু অপেক্ষা কর। কালু,

ততক্ষণ কাকাকে কিছু খেতে দে। কোর্ট থেকে ফিরে তো খানকয়েক পরোটা আর আলুর দম ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি।''

সত্যশেখর ব্যস্ত হয়ে বলল, ''না, না, এখন আমাকে কিছু খেতে দিতে হবে না, কালু তুই বোস। বরং বল তোর আধুনিক নাটকে কী কী থাকবে? রামায়ণের গল্প, রাম-রাবণের একটা যুদ্ধ দেখিয়ে দে। মালোপাড়ায় শেতলাপুজোয় যাত্রা হত। মুরারির সঙ্গে চুপিচুপি একবার দেখতে গেছলুম। বর্গি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে জমিদার ভৈরব রায়ের সে কী তরোয়ালের লড়াই। বাঁয়াটা ড্রামের মতো বাজছে, ক্ল্যারিওনেটে মার্চের সুর আর ঝাঁঝরটা ঝম করে উঠছে মাঝে মাঝে। এই দ্যাখ, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'' সত্যশেখর বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল কলাবতীর দিকে। ''তুই বরং একটা তরোয়ালের লড়াই রাখ। লক্ষ্মণ ভার্সাস রাবণ কিংবা কুম্ভকর্ণের সঙ্গে সুগ্রীবের।''

''কাকা, রামায়ণে মেজর লড়াইগুলো হয়েছিল তির-ধনুকে আর শক্তিশেলটা তরোয়াল নয়। দাদু, পৌরাণিক কাহিনিতে গদা আর তিরই তো প্রধান অস্ত্র ছিল?''

''তা বলতে পারিস। তবে সতু যা বলল, রোমহর্ষক কিছু রাখলে নাটক জমে যায়। বছর ষাটেক আগে আমার ছোটবেলায় স্টার থিয়েটারে নাটক দেখেছি পৌরাণিক কাহিনি। তাতে শনির দৃষ্টিতে ভস করে গণেশের মুন্ডু ভস্ম হয়ে যাওয়া দেখায়। স্টেজের পিছনে একটা পরদায় ফুটে উঠল বিশাল দুটো চোখ আর সঙ্গে সঙ্গে গণেশের মুন্ডুটা ভ্যানিশ হয়ে ধোঁয়া উঠল। পার্বতী তো কান্নাকাটি শুরু করলেন। বিষ্ণু তখন স্টেজের মধ্যিখান থেকে সুদর্শন চক্রটা ছুড়লেন, সেটা উইংস দিয়ে উড়ে গেল। তারপর একটা হাতির মাথা ভেসে এল। বিষ্ণু সেটাই শিশু গণেশের গলায় জুড়ে দিলেন।''

কলাবতী অবাক হয়ে বলল, ''দাদু, এ তো ম্যাজিক!''

রাজশেখর বললেন, ''আমার এখনও মনে আছে সমুদ্র মন্থন দেখেছিলুম। ঠিক ওইভাবে স্টেজের পিছনে পরদায় দড়ির মতো বাসুকিকে মন্দার পর্বতে পেঁচিয়ে টানাটানি করায় তার মুখ থেকে বেরোল কালকূট বিষ। তার গন্ধে ত্রিলোক মূর্ছিত হলে ব্রহ্মা অনুরোধ করলেন মহাদেবকে সেই বিষ পান করার জন্য। তারপর কী দেখলুম জানিস? স্টেজ অন্ধকার হয়ে গেল আর মহাদেব নিচু হয়ে আঁজলা ভরে সেই বিষ তুললেন, দেখলুম তাঁর দু'হাতের মধ্যে দপদপ করছে একটা নীল আলো। সেটা মুখে দিলেন, গলাটা নীল হয়ে গেল। বিষটা ওখানেই রইল, তার মানে নীল আলোটা গলায় আটকে রইল।

মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ। সে যে কী অবাক কাণ্ড, থ্রিলিং! এইরকম কিছু যদি তোর আধুনিক নাটকে রাখতে পারিস, তা হলে লোকে তোকে মনে রাখবে। তবে এসব দেখাতে হলে টাকার দরকার। পাবলিক স্টেজে ষাট-পঁয়ষটি বছর আগে হাউসফুল হয়ে যেত প্রতি শো-এ। গ্রাম থেকে দল বেঁধে লোকেরা আসত থিয়েটার দেখতে, থিয়েটারের তখন টাকা ছিল।'' রাজশেখরের কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

সত্যশেখর বলল, ''রিহার্সালের জন্য দশ টাকা যেখানে বরাদ্দ সেখানে আর কী আশা করো, কালু কি সমুদ্র মন্থনের মতো হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন দেখাতে পারবে? কালু একবার দ্যাখ না, অপুর মা-র খুল্লা খুল্লা ঘুগনির কতদূর।''

কলাবতী চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে, তখনই ট্রে হাতে অপুর মা, তার পিছনে মুরারি খাওয়ার ঘরে ঢুকল। ট্রে থেকে চিনেমাটির বৌলটা টেবলে রেখে অপুর মা বলল, ''এই হল আমার খুল্লা খুল্লা ঘুগনি। কত্তাবাবু, আপনি আগে খেয়ে বলুন কেমন হয়েছে।''

মুরারি দিস্তা করা রুটির প্লেট টেবলে রেখে বলল, ''এই খুল্লা খুল্লা ঘুগনি অপুর মা অদ্ধেক টিভি থেকে আর অদ্ধেক ওর বাবার কাছ থেকে শেখা রান্না মিশিয়ে নতুন একটা জিনিস বানিয়েছে।''

রাজশেখর বললেন, ''তুই খেয়ে দেখেছিস?''

''খানিকটা চাখতে দিয়েছিল। গন্ধটা শুঁকুন, টেস করে দেখুন।'' মুরারির জিভে উৎসাহ ঝরছে। সত্যশেখর ইতিমধ্যেই চোখ বুজিয়ে ফেলেছে। কলাবতী জানে, অত্যন্ত উপাদেয় কিছু খাদ্য খাওয়ার আগে কাকা চোখ বুজে খাদ্যটিকে ঈশ্বরজ্ঞানে ধ্যান করে আধমিনিট ('বুঝলি কালু, এতে জিভের প্রত্যেকটা কোষ জাগ্রত হয়ে চনমন করে ওঠে'), তারপর গন্ধ শুঁকে চোখ খোলে।

অপুর মা ইতিমধ্যে বাটিতে তার 'খুল্লা খুল্লা' তুলে রাজশেখরের সামনে রেখেছে।

''বাবা গন্ধটা কেমন খুলেছে বলো?'' সত্যশেখরের নাক ফুলে উঠেছে।

রাজশেখর একচামচ মুখে দিলেন। কপালে ভাঁজ পড়ল। অপুর মা উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে। কপালের ভাঁজ সমান হল। ''এ তো দ্রৌপদীর হাতে রাঁধা ঘুগনি রে সতু, খেয়ে দ্যাখ।'' রাজশেখর এই বলে রুটি ছিঁড়লেন।

দশ মিনিট পর শূন্য বৌলটার দিকে তাকিয়ে সত্যশেখর বলল, ''একটু

তাড়াতাড়িই মনে হচ্ছে খেলুম।'' তারপর গলা নামিয়ে বলল, ''অপুর মা কি আমায় ঘটোৎকচ মনে করছে?''

''না। বরং তোমার খাওয়া দেখে খুশিই হচ্ছে। রান্না নিমেষে উড়ে গেলে রাঁধুনিরা খুশি হয়, কাকা আমার নাটকে ঘটোৎকচকে আনব।''

''সে কী রে! রামায়ণে কিনা মহাভারতের ক্যারেক্টার?'' রাজশেখর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

''দাদু এটা হবে আধুনিক লক্ষ্মণের শক্তিশেল। পৌরাণিকে আর আধুনিকে মিলেমিশে একাক্কার হয়ে যাবে। চারিদিকে কত ঘটোৎকচ আর কুম্ভকর্ণ টিভিতে আর খবরের কাগজে কিলবিল করছে, তারই দুটোকে নাটকে ছেড়ে দোব।'' বলতে বলতে সে আনমনা হয়ে আঙুল চাটতে শুরু করল।

তাই দেখে অপুর মা বলল, 'কালুদি, আর একটু খাবে? এনে দোব?''

''আরও আছে নাকি?'' সত্যশেখর অকালে ঘুম ভাঙানো কুম্ভকর্ণের মতো ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, ''তা হলে আমাকে আর একটু।''

''আমাকেও।'' রাজশেখর বললেন।

কলাবতী অন্যমনস্কের মতো উঠে বেসিনে হাত ধুয়ে ঘরে এসে সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে টেবলে বসল। মাথা নামিয়ে একমনে লিখে যেতে থাকল। মনের মধ্যে ভেসে ওঠা কথাগুলো চেতনার তলে ডুবে যাওয়ার আগেই সে অক্ষরের জাল দিয়ে তাদের তুলে কাগজের উপর ধরে রাখতে চেয়ে কলমটাকে দ্রুত চালাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর অপুর মা এসে বলল, ''তোমার ফোন, ধুপু করেছে।''

''একমিনিট, ধরে থাকতে বলো।'' মুখ না তুলে কলমের গতি বাড়িয়ে সে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে বসার ঘরে এসে ফোন ধরল।

''বল।''

''আমার ক্লাস, আর নাইন-এ সেকশনে গিয়ে বললুম কে কে অভিনয় করতে চাও। সবাই হাত তুলল। আমি চাই, আমি চাই, বলে চেঁচামেচি এমন জুড়ে দিল যে, মনে হল যেন পাঠশালায় লজেঞ্জস বিলোতে এসেছি। আমার ক্লাসে বিয়াল্লিশ আর নাইন-এ-তে ছেচল্লিশ মোট অষ্টআশি কিন্তু দরকার তো বানরসেনা সমেত বারো-তেরো জন। আমার ক্লাস থেকেই রাবণ পেয়েছি, সঞ্চারী পাল, বেশ লম্বা, মোটা মোটা হাত, গলাটাও অনেকটা হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে কথা বললে যেমন শোনায়, তেমনি। একজন বলল ক্লাস এইট-

এ-তে একটা মেয়ে আছে, রবিনা নাম, রাবণের মতো লম্বা-চওড়া তবে খুব মিনমিনে গলা, রামের জন্য মানাবে। ওকে বলে দেখব। বিভীষণ, সুগ্রীব ক্লাস নাইনে আছে, শুধু তোর ফর্দমতো হনুমানটাকে পাইনি এখনও। কাল স্কুলে আয়, তোকে রাম-রাবণ দেখাব।''

''ধুপু, মেঘনাদের কী হবে? খুঁজে বের কর। আর শোন, নাটকে থাকবে কুম্ভকর্ণ আর ঘটোৎকচ। দুটো খুব রোগা মেয়ে বের কর।''

''কালু, ওরা তো রাক্ষস, ভয়ংকর বিরাট চেহারা!''

''সেকালের রাক্ষসরা একালে রোগা-প্যাংলা হয়ে গেছে। যদি তেমন চেহারার না পাওয়া যায় তো, তুই আর আমিই করব। কাল একটু তাড়াতাড়ি স্কুলে আয়, আমি গেটে তোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকব।''

ফোন রেখে কলাবতী ঘরে এসে দেখল, অপুর মা খাটের পাশে মেঝেয় বিছানা পেতে শোওয়ার তোড়জোড় করছে।

''কালুদি, শুয়ে পড়ো কাল ইশকুল আছে।''

''না পিসি, আমার পরীক্ষা সামনে, ভৌতবিজ্ঞানের কিছু তৈরি হয়নি, আজ রাতে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করতেই হবে। তুমি ঘুমোও।''

''আবার পরীক্ষা? এই তো সেদিন একটা পরীক্ষা দিলে, আবার? ভূতটুত নিয়ে কি রাত্তিরে না পড়লেই নয়?''

হনুমান খুঁজে পাওয়া গেল

ধূপছায়ার অপেক্ষায় স্কুলগেটে দাঁড়িয়ে কলাবতী। মেয়েরা, শিক্ষিকারা স্কুলে ঢুকছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে দুটো কথাও বলছে।

''কলাবতীদি তুমি নাকি নাটক লিখছ, জুবিলি ফাংশনের জন্য?''

''হ্যাঁ।''

''আমাকে একটা পার্ট দাও না, দেবে?''

''তুই কাঁদতে পারবি?''

''হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা।'' মাথাটা হেলিয়ে দিল মেয়েটি।

''ধূপছায়ার কাছে নাম দিয়ে আসিস। চিনিস তো ওকে?''

''হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা।''

মেয়েটিকে দেখে কলাবতীর মনে হল, লক্ষ্মণ শক্তিশেলের আঘাতে মূর্চ্ছা

যাওয়ার পর তাকে ঘিরে যে সব বানর কান্নাকাটি জুড়বে তাদের একজন হতে পারে।

"কলাবতী, দাঁড়িয়ে কেন? নাটকের খবর কী? আমরা কিন্তু অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি। কী লেখো দেখার জন্য। আমাদের মেয়ের লেখা, আমাদের মেয়েরাই অভিনেতা-অভিনেত্রী, এই স্কুলের পঁচাত্তর বছরের ইতিহাসে এই প্রথম।"

"ব্রততীদি, অভিনেতা কেউ নেই, সবাই অভিনেত্রী।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বটে।" ব্রততী ঘড়ি দেখল। "যাই।" দু'পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আর শোনো, তোমাদের রিহার্সালের ডেলি অ্যালাউন্সটা বড়দি বলেছেন পনেরো টাকা করে দিতে। কে এক গার্জেন কমপ্লেন করে বলেছেন দশ টাকায় তো দশ মুঠো চানাচুরও হবে না। তুমি কী বলো?"

ঢোঁক গিলে কলাবতী, ব্রততী যাতে অপ্রতিভ না হয়, বলল, "ছোট ছোট মুঠো হলে কুড়ি মুঠো তো হবেই। আর যাদের নেব তাদের হাতের চেটো আগে দেখে নেব।"

"গুড। রিহার্সাল শুরু করার আগের দিন আমাকে জানিয়ো, টাকা দিয়ে দোব। তবে ঝালমুড়ি কি ফুচকা খাওয়া চলবে না। গিরিকে টাকা দেবে, ও কলা এনে রেখে দেবে। কলায় ভিটামিন আছে, পুষ্টিকর জিনিস।"

ব্রততী চলে যাওয়ার পর কলাবতীরই ক্লাসের চিত্রা বসু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার সঙ্গে বিনতা আর চারুশীলাও।

চিত্রা বলল, "লক্ষ্মণের শক্তিশেলে কিন্তু অনেক গান আছে। কে গাইবে?"

কলাবতী বলল, "আমার সময় বাঁধা, একঘণ্টা। আমার নাটকে গান থাকবে না।"

ঠোঁট মুচড়ে চারুশীলা বলল, "গান ছাড়া লক্ষ্মণের শক্তিশেল, তবেই হয়েছে!"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিনতা বলল, "এ তো রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ। কেমন হবে কে জানে।"

ওরা তিনজন চলে গেল। কলাবতী ঠোঁট কামড়ে কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। এই তিনজন মিলে একটা দল। পাশাপাশি বসে শুধু নিজেদের মধ্যে ফিসফাস গুজগুজ করে। একসঙ্গে স্কুলে আসে, ছুটির পর একসঙ্গে বেরোয়। কলাবতীকে ওরা দেখতে পারে না যেহেতু সে সবার প্রিয়, বিশেষ করে

বড়দির। প্রাক্তন জমিদারবাড়ির নাতনি অথচ একফোঁটাও বড়লোকি চাল নেই। ওই তিনজন বলে, এটাই ওর বড়লোকি চাল। শুনে কলাবতী শুধু হেসেছে। কিন্তু এখন ওদের কথা শুনে মনে মনে রেগে উঠল। কেননা, খোঁচাটা তার বোধ আর বুদ্ধিকে দেওয়া হয়েছে।

রাগতে রাগতে সে দেখল ধূপছায়া আসছে, কিন্তু ধূপুর পিছনে ওটা কে?

"দেরি হয়ে গেল, কী করব ইস্ত্রিওলাকে সকালে শাড়িটা দিয়েছিলুম, সাড়ে ন'টার সময়ও দেখি শাড়িটা ফেলে রেখেছে। ইস্ত্রি করিয়ে কাপড় পরে আসতে আসতে ..."

ধূপছায়া বলতে বলতে থেমে গিয়ে কলাবতীর দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছনে তাকাল। স্কুল ড্রেস পরা একটা মেয়ে, পিঠে বইয়ের ব্যাগ। উচ্চতা সাড়ে চার ফুটের একটু বেশি, ওজন পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কেজি, গলাটা আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না, যাকে বলে ঘাড়ে-গর্দানে। কিন্তু হাঁটছে দু'হাত ফাঁক করে দোলাতে দোলাতে, গটমট করে এবং বেশ দ্রুত। দেখেই বোঝা যায় শরীরটা অত্যন্ত ফিট, তা না হলে অত ওজন নিয়ে অমন চটপটে গতিতে হাঁটা যায় না। মেয়েটির জ্বলজ্বলে চোখের থেকে ঠিকরোচ্ছে মজা পাওয়ার ফুলকি! সারা মুখে হাসিখুশির আভা মাখানো। দেখলেই ভাল লেগে যায়। কলাবতীরও লাগল।

"কী দেখছিস রে কালু?"

"আমার হনুমানকে। খোঁজ নে কোন ক্লাসে পড়ে।"

ধূপছায়া চেঁচিয়ে উঠল। "এই এই, এই মেয়েটা।"

মেয়েটি থমকে পড়ল। "আমায় বলছ?"

"হ্যাঁ, তোমায়। কোন ক্লাস, নাম কী?" ধূপছায়া এগিয়ে গেল, কলাবতীও।

"সেভেন-এ-ওয়ান। রুকমিনি তলওয়ালকর। আমাকে সবাই রুকু বলে ডাকে।"

কলাবতী বলল, "দেরি হয়ে যাচ্ছে তোমার, ক্লাসে যাও। তোমার সঙ্গে টিফিনে কথা বলব, নিমগাছতলায় এসো, কেমন।"

রুকমিনি একটু অবাকই হল। উঁচু ক্লাসের দুটো দিদি হঠাৎ তাকে গেটের কাছে এমনভাবে ধরল, যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

"কালু, এই তোর হনুমান! এমন সুন্দর মেয়েটাকে হনুমান বানাতে চাস?" ধূপছায়ার স্বরে ক্ষোভ আর অনুযোগ।

"ওর চেহারাটা খুব ফানি, মজাদার। হনুমানও তো তাই ছিল। এক লাফে সাগর ডিঙিয়ে যাওয়া, লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া, বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে গন্ধমাদন পাহাড়ের চুড়োটাই ভেঙে নিয়ে এল। এই সব মজা না থাকলে কি নাটক জমে?"

আতঙ্কিত চোখে ধূপছায়া বলল, "তোর মতলব কী বল তো? হনুমানের লাফ, লঙ্কায় আগুন, গন্ধমাদন নিয়ে উড়ে আসা — এসব দেখাতে চাস?"

"পাগল! আগুন? ওরে বাব্বা, বড়দি তা হলে হার্টফেল করবেন। এসব দেখাতে পারত ষাট-সত্তর বছর আগের স্টার থিয়েটার। এসবে যা খরচ পড়বে, আমাদের স্কুল তো তা করতে পারবে না, সুতরাং ওসব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে যা করা যেতে পারে সেটা নিয়েই ভাবা ভাল। এই রুকমিনিকে দেখে একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। ধুপু, রোববার সকালে আমাদের বাড়িতে আয়, দুপুরে ভাত খাবি।"

টিফিনের সময় রুকমিনি এল নিমগাছতলায়। অপেক্ষা করছিল কলাবতী আর ধূপছায়া।

"রুকু, আমরা নাটক করব প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে, তুমি রামায়ণ পড়েছ?" কলাবতী ভূমিকা না করে সোজা বিষয়ে চলে এল।

"হ্যাঁ, ছোটদের রামায়ণ। টিভি-তেও দেখেছি।"

ধূপছায়া উৎসাহিত হয়ে বলল, "বাঃ, তা হলে তো কালুর কাজটা সহজ হয়ে গেল। রুকু তো তা হলে হনুমানকে দেখে ফেলেছে। আচ্ছা, হনুমানকে তোমার কেমন লাগে?"

"খুব ভাল। গায়েও ভীষণ জোর। কীরকম লাফ দিয়ে উড়ে গিয়ে লঙ্কায় পড়ল!" রুকমিনির চোখ গোল হয়ে ঝকমক করে উঠল।

কলাবতী বলল, "আমাদের নাটকে হনুমান থাকবে, তুমি করবে হনুমান?"

"লাফিয়ে সাগর পার হবে?" রুকমিনি পালটা প্রশ্ন করল, "আমি কিন্তু লাফাতে পারি।"

ধূপছায়া বলল, "কতটা পারো?"

"দেখবে?" এই বলে রুকমিনি নিমগাছতলা থেকে দশ-বারো হাত হেঁটে গেল। তারপর ঠোঁট কামড়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ছুটে এসে জোড়পায়ে লাফ দিয়ে মাটিতে ধপাস করে পড়ল। সেখানে যত মেয়ে ছিল অবাক হয়ে তারা রুকমিনির দিকে তাকাল। জমিটা শক্ত। রুকমিনির লেগেছে। কলাবতী

ছুটে গিয়ে হাত ধরে টেনে তুলল। স্কার্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রুকমিনি একগাল হেসে বলল, "দেখলে?"

"দেখলুম।" কলাবতী বলল, "রুকু, আমার নাটকে কিন্তু সাগর লাফিয়ে পার হবে না হনুমান, তা করতে হলে নাটকটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আমাকে মাত্র একঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে।" রুকমিনির মুখ ক্রমশ ম্লান হয়ে যেতে দেখে কলাবতী বলল, "না-ই বা লাফাল, অনেক মজার মজার কথা বলতে আর কাণ্ড করতে তো হনুমান পারে। পারে না ধুপু?"

ধূপছায়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "অবশ্যই পারে। হনুমানের জন্য কালু স্পেশ্যাল অ্যাকশন আর ডায়ালগ দেবে। রুকু, তুমি একটুও দুখ্যু কোরো না। তা হলে তুমি রাজি?"

রুকমিনি নিমরাজি ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে দিতেই কলাবতী বলল, "এই তো হনুমানের মতো লক্ষ্মী মেয়ে। হনুমানকে যা করতে বলা হত, মুখটি বুজে সেই কাজটি করত।"

"আমার মুখে কিন্তু মুখোশ দিতে হবে আর একটা ল্যাজ। টিভিতে ঠিক যেরকম দেখেছি।"

"অবশ্যই। এবার তুমি ক্লাসে যাও। রিহার্সালের সময় তোমাকে জানাব। আর একটা কথা, তুমি যে হনুমান করছ এ কথা কাউকে কিন্তু বলবে না।"

রুকমিনি চলে যেতে কলাবতী বলল, "চমৎকার মেয়ে। দেখবি ও দারুণ হনুমান করবে।"

"সে ওর লাফ দেওয়া দেখেই বুঝেছি। ওই চেহারা নিয়ে যেভাবে ছুটে এসে লাফাল! কোনও জড়তা নেই!" ধূপছায়া মুগ্ধ কণ্ঠে বলল।

"কতটা লাফাল বল তো?"

"আট-দশ ফুট তো হবেই, ওই ওজন নিয়ে! বাপ্‌স!"

"তা হলে রোববার আসছিস। যতটা লেখা হয়েছে, তোকে পড়ে শোনাব।"

রবিবারের মধ্যেই কলাবতী নাটকের শেষটুকু বাদে সবটাই লিখে ফেলল। পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো একটা ফ্ল্যাট ফাইলে গেঁথে রেখেছে ধুপুকে পড়াবার জন্য। সত্যশেখর রবিবার আড্ডা দিতে যায় বন্ধুর বাড়িতে। বেলা বারোটা নাগাদ সে ফিরছে, হাতে একটা পলিথিন থলি। ধূপছায়া তখন ফটক দিয়ে ঢুকছে। দু'জনের দেখা হয়ে গেল।

"এই যে ধুপু, এত দেরি করে এলে যে? ভালই হল, আজ তোমাকে

কাঁকড়ার ঝাল খাওয়াব। ঝাল খাও তো?'' উদ্বিগ্ন চোখে সত্যশেখর তাকাল এবং আশ্বস্ত হল 'খাই এবং ভালই খাই' শুনে, তারপর সে বকবক করতে করতে বাড়ির সদর দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

''এই পলিথিন থলিটা পকেটে নিয়ে রোববারে বেরোই। রোববারে গাড়ি চড়ি না, হাঁটি, রাস্তায় কত রকমের যে জিনিস পাওয়া যায়। এই দ্যাখো না, আজ একজন ঝুড়িতে কাঁকড়া নিয়ে বসেছিল মানিকতলা ব্রিজের উপর। কুড়ি টাকা জোড়া। কতদিন যে খাই না। নিলুম গোটাদশেক, লোকটার কাছে এই ক'টাই ছিল।'' বাড়ির ভিতর ঢুকে সে মুরারিকে দেখে থলিটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, ''অপুর মাকে দাও আর বোলো কড়া ঝাল দিয়ে যেন বানায়। প্রথমে গজগজ করবে, তুমি বলে দিয়ো ধুপুকে কথা দিয়েছিল কালু তোমার হাতে রাঁধা কাঁকড়া খাওয়াবে। সেই জন্য ছোটকত্তা কাঁকড়া খুঁজতে খুঁজতে সেই হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত — না টালিগঞ্জ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কালুদি কথা দিয়েছিল বলেই তো, তাই না ধুপু?''

হাসি চেপে ধুপু ঘাড় হেলিয়ে বলল, ''হ্যাঁ, কালু বলেছিলই তো।''

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে সত্যশেখর বলল, ''কালুর নাম করলেই জোঁকের মুখে নুন, অপুর মা স্পিকটি নট। ভীষণ ভালবাসে। দ্যাখো, আধঘণ্টার মধ্যে কাঁকড়া তৈরি হয়ে যাবে।''

দোতলায় চওড়া দরদালানটাই বসার ঘর। সোফা, ইজিচেয়ার আর টেবলে সাজানো। কলাবতী টিভি দেখছিল। ধুপুকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, ''আর একটু আগে এলি না কেন, কুইজের প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গেল,'' রেফ্রিজারেটর থেকে দু'লিটারের সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের বোতল বের করে দুটো গ্লাসে ঢেলে বোতলটা সত্যশেখরের হাতে দিয়ে বলল, ''পিসি কখন রান্না শেষ করে বসে আছে তোকে পোস্ত চিংড়ি খাওয়াবে বলে। আমি শুধু বলেছি, পিসি ধুপু চিংড়ি ভালবাসে। ব্যস সক্কালবেলায় মুরারিদাকে পাঠাল বাজারে। তারপর যা শুরু হল, যেন এটা যজ্ঞিবাড়ি।''

শুনতে শুনতে সত্যশেখরের চোখের পাতা পড়া বন্ধ। ধুপুর বুকের মধ্যে শুরু হল ধুকপুকুনি। শুকনো গলায় সত্যশেখর বলল, ''কালু, তুই ঠিক জানিস ধুপু চিংড়িই ভালবাসে, কাঁকড়া নয়? কিন্তু আমি যে কাঁকড়া নিয়ে এলুম! এখন কী হবে।''

''কী আর হবে, দুটোর কোনওটাই মাছ নয়। ধুপু পোস্ত চিংড়িটা খাবে, আর তুমি কাঁকড়াটা।''

একতলা থেকে উঠে এল মুরারি। বলল, "ছোটকত্তা, অপুর মা জানতে চাইল সবক'টাই কি রাঁধবে?"

গম্ভীর স্বরে সত্যশেখর বলল, "একটাও নয়। অ্যালার্জি আছে ধুপুর, দিনেরবেলায় কাঁকড়া খেলে ওর গায়ে র‍্যাশ বেরোয়, গা চুলকোয়। কালু এটা জানত না, আমিও নয়, আর ধুপুও ভুলে গেছল বলতে। ওকে বলো সবক'টা তুলে রাখতে।"

মুরারি চলে যাওয়ার পর কলাবতী বলল, "বেশ সামলে দিলে তো!"

সত্যশেখর বলল, "কারও ক্ষতি না করে ছোট্ট একটা-দুটো মিথ্যে কথা তো বলাই যায় পরিস্থিতি সামলাতে। অবশ্য পরিস্থিতিটা যদি নাটকীয় হয়, এই যেমন এখন হল, কালু, তোর নাটকে নিশ্চয় নাটকীয় পরিস্থিতি থাকবে।" থাকবেই ধরে নিয়ে সত্যশেখর বোতল থেকে ঢকঢক করে আধলিটার গলায় ঢেলে নিল।

কলাবতী বলল "নাটকীয় আবার কী! রামায়ণে ইন্টারেস্টিং যা-যা আছে, তেমন দু'-তিনটে ঘটনাই থাকবে। একঘণ্টায় কি গোটা মহাকাব্য দেখানো যায়?"

এই সময় স্নান সেরে ফতুয়া-পাজামা পরে রাজশেখর এসে তাঁর ইজিচেয়ারে বসে বললেন, "কালুকে অত করে বললুম নাটকটা আমাকে একবার পড়তে দে, কিছুতেই দিল না।"

সত্যশেখর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "আমাকেও নয়, যেন অর্থমন্ত্রীর বাজেট। একেবারে পার্লামেন্টে মানে স্টেজে করে দেখাবে। রামায়ণের দু'-তিনটে ইন্টারেস্টিং ইনসিডেন্ট নাকি ওর নাটকে থাকবে।"

রাজশেখর বললেন, "তা হলেই হবে। দেখবে তো স্কুলের মেয়েরা, ওরা যাতে মজা পায় তেমন ঘটনা থাকলেই হল। এ ব্যাপারে সেরা কিন্তু হচ্ছে হনুমান। স্টেজে একটা ল্যাজওলা হনুমান ছেড়ে দে, দেখবি নাটক জমে গেছে।"

ধূপছায়া প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "দাদু, আমরা একজনকে পেয়ে গেছি, রুকমিনি তলওয়ালকর। একেবারে আইডিয়াল হনুমান, বেঁটেখাটো, গাট্টাগোট্টা, দারুণ ফিট। ও রাজি হনুমান হতে।"

সত্যশেখর কৌতূহলী হয়ে বলল, "কী বললে, তলওয়ালকর? মলয়া যখন প্রেসিডেন্সিতে পড়ত তখন ওর সঙ্গে পড়ত ভারতী বোস। পরে এক জার্নালিস্টকে বিয়ে করে, নাম বিনায়ক তলওয়ালকর। আমি দু'জনকেই চিনি,

মলুই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। বিনায়কও বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা, একসময় ওয়েটলিফটিং করত। এই রুকমিনি বোধহয় ভারতীরই মেয়ে, জিজ্ঞেস করিস তো।''

কলাবতী বলল, ''রুকুর একটাই দুখ্যু, তার লাফ দেখাবার কোনও সুযোগ থাকছে না নাটকে।''

''না, না, কালু, এটা ঘোরতর অন্যায় হবে, বাল্মিকীকেও অপমান করা হবে যদি হনুমান লাফিয়ে সাগর পার না হয়।'' সত্যশেখর প্রায় হাতজোড় করেই ফেলেছিল, ''ভেবে দ্যাখ রামায়ণের ওটা একটা টার্নিং পয়েন্ট, রাহুল দ্রাবিড়ের আউট হওয়ার মতো। এটা বাদ দিলে বলব তোর ড্রামাটিক সেন্স নেই। আরে হনুমানই তো প্রথম কম্যান্ডো অ্যাটাক করে লঙ্কায়। আগুন লাগিয়ে লন্ডভন্ড করে দেয়।''

ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে কলাবতী বলল, ''কিন্তু কাকা, পক প্রণালী পেরোবার মতো লাফ কি রুকু দিতে পারবে? বড়জোর আট-দশ হাত পারবে, তাতে কি চলবে?''

''বলিস কী, আট-দ-অ-শ হাত দারুণ চলবে, পাঁচ হাত হলেও চলবে, তবে স্পোর্টসের লংজাম্প করার মতো নয়। স্টেজের এপাশ থেকে দৌড়ে এসে দারা সিংহের মতো 'জয় শ্রীরামজি' বলে দু'হাত তুলে আকাশে ওড়ার মতো একটা লাফ দিয়ে ওপাশের উইংসের বাইরে গিয়ে পড়বে।''

ধুপু আঁতকে উঠল, ''সব্বোনাশ, তা হলে তো হাড়গোড় ভেঙে যাবে।''

''আমি ওমনি ওমনি হাইকোর্টের উকিল হইনি ধুপু। অবশ্য অনেক পণ্ডিত-ডক্টরেট মনে করে, আমার মাথার মধ্যে গুবরে পোকার বাসা ছাড়া আর কিছু নেই।''

কলাবতী ফিসফিস করে ধুপুকে বলল, ''ডক্টরেট মানে বড়দি।''

''কালু, স্টেজ তৈরি করবে যে ডেকরেটর তাকে বলবি উইংসের ওদিকে, মানে যেদিকে হনুমান ঝাঁপ দেবে, প্যান্ডেল তৈরির কাপড় এনতার যেন ডাঁই করে রেখে দেয়। রুকু উড়ে গিয়ে তার উপর পড়বে। সেই সময় মিউজিক মানে ঝাঁঝর ঝম করে উঠবে। ভাল কথা, তোর মিউজিক হ্যান্ড থাকবে তো?''

কলাবতী বিপন্ন চোখে তাকাল ধূপছায়ার দিকে। নাটকের এই দিক অর্থাৎ আবহসংগীতের কথা তো সে ভাবেনি!

রাজশেখর এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। বললেন, ''কালু ঘাবড়াসনি।

খুঁজে দ্যাখ, স্কুলে অনেক মেয়ে নানারকম বাজনা শেখে — গিটার, বেহালা, সেতার, বাঁশি হারমোনিয়াম তো আছেই, তবলা ঢোলও এখন মেয়েরা শিখছে। এসব নাটকে মিউজিকের একটা বড় ভূমিকা থাকে।''

''ধুপু, তোর কাজ বেড়ে গেল।'' কলাবতী অসহায় স্বরে বলল, ''দাদু,আমি তো নাট্যকার আর নির্দেশক। বাকি যা কিছু জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব এই ধুপুর ঘাড়ে। সব ওকে সামলাতে হচ্ছে।''

ধূপছায়া গম্ভীর হয়ে বলল, ''আমাকে এখন সামলাতে হবে বড়দি আর ব্রততীদিকে। কালু, তোকে বলে দিচ্ছি এত কম টাকার বাজেটে পাড়ার বাচ্চাদের নাটকও করা যায় না। লাইট, মেকআপ, মিউজ়িক এগুলো তো মিনিমাম দরকার...''

ধুপুকে থামিয়ে সত্যশেখর বলল, ''এগুলোর খরচ দেবে না, তার মানে যতটা না দিলে নয় তাই দেবে। তোমাদের বড়দিকে তো চিনি, হাড়কেপ্পন। তোদের রিহার্সালে পাঁচটাকা শেষ পর্যন্ত বাড়িয়েছে!''

''হ্যাঁ। একজন গার্জেন নাকি বড়দিকে কমপ্লেন করে বলেছেন, দশ টাকায় তো দশ মুঠো চানাচুরও হবে না।''

''দশ মুঠো!'' সত্যশেখর আকাশ থেকে যেন পড়ল, ''আমি তো বলেছি পাঁচ মুঠো, অবশ্য আমার হাতের মুঠো। তবে মেকআপ, ড্রেস একটা প্রধান ব্যাপার মাইথোলজিক্যাল নাটকে, আমার এক ক্লায়েন্ট আছে পীতাম্বর অপেরার মালিক পীতাম্বর ঢোল। ওকে বলে দোব তোদের সাজিয়ে দেবে, পয়সা টয়সা নেবে না। লাইটের কি খুব দরকার হবে?''

কলাবতী বলল, ''না কাকা, তোমাকে ভাবতে হবে না, ফাংশনে যারা আলো দেবে তাদেরই বলে দোব স্টেজ অন্ধকার করে দেওয়া, আলো বাড়ানো-কমানো আর একটা জোরালো আলো মুখে ফেলার ব্যবস্থা যেন করে।''

মুরারি এসে বলল, ''ছোটকত্তা, চান করে নাও। রান্না হয়ে গেছে।''

সবাই খাওয়ার ঘরে এসে দেখল, টেবলে সাজানো খালি প্লেট, ট্রে-তে ধোঁয়া ওঠা ভাত, বৌলে মুগের ডাল, পোস্ত চিংড়ি, ছোট ছোট প্লেটে পারশে মাছের ঝাল আর বেগুনভাজা। আর টেবলের মধ্যিখানে একটা বড় অ্যালুমিনিয়াম গামলা, তাতে জলে ডুবে রয়েছে কয়েকটা কাঁকড়া। টেবলের একধারে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে অপুর মা ও মুরারি।

রাজশেখর একটু অবাক হয়ে গামলাটা দেখিয়ে বললেন, ''এটা কী?''

গম্ভীর স্বরে অপুর মা বলল, "ছোটকত্তার আনা ক্যাঁকড়া।"

"আমি তো তুলে রাখতে বললুম, কাল রান্না কোরো।" সত্যশেখরের স্বরে কিঞ্চিৎ বিরক্তি।

"ফ্রিজে তুলে রাখলে আর কিছু সেখানে রাখা যাবে না। সব ফেলে দিতে হবে।"

"কেন?" উদ্বিগ্ন চোখে বলল সত্যশেখর।

অপুর মা হাতায় করে একটা কাঁকড়া তুলে সত্যশেখরের নাকের কাছে ধরে বলল, "শুঁকুন।"

কাঁকড়ার গন্ধ নাকে টেনেই সত্যশেখর মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে প্রায় আঁতকে উঠে বলল, "ফেলে দাও, ফেলে দাও।"

"অন্তত সাতদিনের মরা। এই কিনতে টালিগঞ্জ গেছলেন! খোসা ভাঙতেই পচা গন্ধে ম-ম করে উঠল রান্নাঘর। ধুপু দিদিমণির তো সকালে ক্যাঁকড়া খাওয়া চলবে না, অ্যালার্জি না কী যেন গায়ে বেরোয়। মুরারিদা, বাজারে জ্যান্ত ক্যাঁকড়া পেলে নিয়ে এসো তো। লাউ দিয়ে রাঁধব। বিকেলে কালুদি দিয়ে আসবে, রাত্তিরে ধুপু দিদিমণি খাবে।"

গামলাটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অপুর মা বলে গেল, "টমটমের চাটনি আনছি।"

প্লেটে ভাত তুলে, বৌল থেকে দু'হাতা ডাল ঢেলে নিয়ে রাজশেখর সেটা ধুপুর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "জ্যান্ত কি মরা সেটা দেখে কিনবি তো?"

লজ্জিত, বিব্রত স্বরে সত্যশেখর বলল, "দেখলুম শান্তশিষ্ট হয়ে রয়েছে তাই আর বিরক্ত করিনি। সামনের রোববার ব্যাটাকে গিয়ে ধরব, অ্যায়সা থাপ্পড় কষাব, বাছাধন বুঝে যাবে কাকে পচা কাঁকড়া গজিয়েছে।"

কলাবতী বলল, "কাকা সামনের রোববার তুমি কি ভেবেছ লোকটা মানিকতলা ব্রিজের উপর বসবে?"

"তা নয়তো কোথায় বসবে?"

"টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের নীচে। ঠকানোর জায়গায় দ্বিতীয়বার কেউ বসে না।"

খাওয়ার পর ধুপুকে নিয়ে কলাবতী শোওয়ার ঘরে এল। পাণ্ডুলিপির ফাইলটা ধুপুর হাতে দিয়ে বলল, "আগে পড়ে নে, তারপর যা জিজ্ঞেস করার করবি। শুধু মনে রাখিস এটা আধুনিক লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সুকুমার

রায়ের নয়, কলাবতী সিংহর লেখা, ত্রেতা নয় কলিযুগে ঘটছে। অভিনয়ের সময় একঘণ্টা।''

রিহার্সালে প্রবল উৎসাহ মেয়েদের। ছুটির ঘণ্টা পড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা টিচার্স রুমের দরজায় এসে জড়ো হয়ে দিদিদের বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। অধৈর্য হয়ে কেউ কেউ ঘরে ঢুকে গিয়ে চেয়ার সরাতে শুরু করে। রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে নাটক, হনুমানজিও আছেন, তাই শুনে চতুরানন মিশির টুল নিয়ে বসে গেছল ঘরের একধারে। কিন্তু সংলাপের ভাষার মাথামুন্ডু বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে রিহার্সাল দেখা বন্ধ করে দেয়। যার যা সংলাপ কলাবতী আলাদা আলাদা কাগজে লিখে মুখস্থ করতে দিয়েছিল এবং তারা এমন মুখস্থ করে ফেলেছে যে, অভিনয় করে বলার বদলে কবিতা আবৃত্তির মতো গড়গড়িয়ে বলে ফেলছে। এটা সামাল দিতে কলাবতীকে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

মহা খুশি রুকমিনি। হনুমান লঙ্কার উদ্দেশে লাফ দেবে এটা থাকছে। ধুপুদির কাছ থেকে এটা শোনার পর সে বাড়িতে লাফ বা ঝাঁপ দেওয়া প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে। শোওয়ার খাটে কয়েকটা বালিশ রেখে সে বারান্দা থেকে ছুটে এসে ঘরের দরজার চৌকাঠ থেকে 'জয় শ্রীরাম' বলে চেঁচিয়ে দু'হাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিশের উপর। চৌকাঠ আর খাটের মধ্যে দূরত্বটা সাত ফুট। ঝাঁপাতে গিয়ে একদিন পা পিছলে ডান হাঁটু খাটের কাঠে লেগে জখম হয়। তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে ধূপছায়ার মাথায় হাত। দিনে তিনবার ঠান্ডা-গরম জল দু'দিন ধরে ঢেলে রুকমিনিকে ফিট করে দেয় তার মা। ক্লাস-সিক্স-এর জ্যোতির মা মুখোশ বানাতে পারেন, এই খবরটা পেয়ে ধূপছায়া চলে গেল জ্যোতিদের বাড়িতে। বানরসেনাদের জন্য মুখোশ তৈরি করে দিতে হবে গোটা পনেরো। জ্যোতির মা রাজি, যদি কাগজ আর রং তাঁকে কিনে দেওয়া হয়। এরপর ব্রততীর সঙ্গে ধূপছায়ার টাগ অফ ওয়ার কাগজ আর রং কেনার টাকা নিয়ে। ব্রততীর হিসেব অনুযায়ী মুখোশ পিছু একটাকার কাগজ এবং পঞ্চাশ পয়সার রং, মোট দেড় টাকার বেশি অনুমোদন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে রফা হয় একটাকা সত্তর পয়সায়।

একদিন মলয়া টিফিনের সময় তার ঘরে ডেকে পাঠাল কলাবতী ও ধূপছায়াকে। দু'জনে এসে দেখল বড়দির টেবলের উলটোদিকে বসে ব্রততী আর ধুতি-শার্ট পরা এক প্রৌঢ় আর দেওয়াল ঘেঁষে চেয়ারে বসা বছর

পঁচিশের এক তরুণ, যার মুখের একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তুটি হল নাক। কলাবতীর মনে হল বাঁশির মতো নাক বোধহয় একেই বলে। নাকের ডগা গোঁফ ছাড়িয়ে উপরের ঠোঁট প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। চোখ দুটি গোল গোল এবং ছটফটে।

মলয়া বলল, ''কালু, তোমাদের নাটকের খবর কী? শ্রীলা বলল তাদের অর্কেস্ট্রা রেডি, অর্চনারা এগজিবিশনের জন্য মেয়েদের আঁকা গোটা চল্লিশ ছবি জোগাড় করে ফেলেছে, আরতি তার মেয়েদের নিয়ে যা-যা তৈরি করে দেখাবে বলেছিল তার থ্রি-ফোর্থ রেডি, প্রণতি বলেছে নানান রাজ্যের ফোক ডান্সের একটা প্রোগ্রাম করবে। অন্নপূর্ণার 'কচ ও দেবযানী'টা নিয়ে আমাদের আলোচনায় বসতে হবে। কচ ও নিজে হতে চায়। সেটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না।''

ব্রততী বলল ''দু'জন পেন্টার, দু'জন জার্নালিস্ট, তিনজন মন্ত্রীকে সল্টলেকে পেয়ে গেছি। ওঁরা কথা দিয়েছেন আসবেন। কলাবতী, তোমাদের কীরকম স্টেজ চাই সেটা এনাকে বলো।''

ব্রততী চোখ দিয়ে প্রৌঢ়কে দেখিয়ে বলল, ''আমাদের ফাংশনের জন্য ডেকরেটিং-এর সব কাজ ইনি করবেন। বগলাবাবু, এই মেয়েটি নাটক করাচ্ছে, কীরকম কী হবে ও বলবে।''

গলা খাঁকারি দিয়ে বগলা ডেকরেটর্সের মালিক ভ্রূ কুঁচকে কলাবতীকে দেখে নিয়ে বলল, ''স্টেজ টেজ করার ব্যাপারে আমার চেয়েও ভাল বোঝে আমার ম্যানেজার এই ছেলেটি, বি কম পাশ।'' বগলাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে লম্বা নাক যুবকের দিকে তাকাল, ''ও নিজে থিয়েটার ফিয়েটার করে, এসব ব্যাপার ভাল বোঝে টোঝে। বরং আমাকে না বলে জয়দেবকেই বলুক। জয় 'ফুটো বেলুন' নামে একটা থিয়েটার দলের স্টেজ ম্যানেজার, ওকে বললে সব করে দেবে। হ্যাঁরে জয়, স্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা নাটক করবে, স্টেজটা কেমন হবে সেটা জেনে নিয়ে তুই করে দে।''

বাধ্য ছেলের মতো জয়দেব উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করে বলল, ''হ্যাঁ স্যার, ওদের কিছু করতে হবে না, শুধু একবার আমায় বলে দিক নাটকটার সিনপসিস আর কী কী ঘটনা দেখাবে বা দেখাতে চায়।''

কলাবতী বলল, ''সবার জানা কাহিনি, রামায়ণের দু'-তিনটে ঘটনা নিয়ে নাটক।''

জয়দেব বলল, ''ব্যস, ব্যস, বুঝে গেছি, সীতাহরণ, শূর্পণখা, জটায়ু...''

তাকে থামিয়ে দিয়ে ধূপছায়া বলল, ''আরও পর থেকে শুরু হবে নাটক।

এখন এই ঘরে বসে অত কথা বলা যাবে না। যদি পারেন তা হলে ছুটির পর আমরা স্কুলেই রিহার্সাল করি, আপনি আসুন, কীভাবে করতে চাই, সেজন্য কী দরকার, সেটা আপনাকে বলে দেব।''

মলয়া বলল, ''সেই ভাল। জয়দেববাবু, আপনি ছুটির পর এসে দু'জনের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন। আপনি তো নাটকের লোক, ওদের হেল্প করতেও পারবেন।''

বড়দির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধূপছায়া প্রথমেই বলল, ''নাকখানা দেখেছিস, শ্রীমান লম্বনাসিকা!''

কলাবতী বলল, ''নাটকপাগল। এদের মাথায় অনেক আইডিয়া ঘোরে, আমাদের কাজে লেগে যেতে পারে।''

স্কুল ছুটির পর কলাবতী রিহার্সাল দেওয়ার জন্য টিচার্স রুমের দিকে যাওয়ার সময় দেখল জয়দেব করিডরে দাঁড়িয়ে। প্রথমেই তার মনে হল এই লম্বনাসিকা সত্যিই নাটকপাগল, নইলে মেয়েদের স্কুলের সামান্য একটা নাটকের জন্য তখন থেকে অপেক্ষা করে থাকবে কেন!

কলাবতী ব্যস্ত স্বরে বলল, ''দাদা বাইরে কেন, ঘরে আসুন। রিহার্সাল দেখুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন কীরকম নাটক, কী আমাদের দরকার।''

জয়দেবকে নিয়ে কলাবতী টিচার্স রুমে ঢুকল। তখন রাম হাপুস নয়নে সীতার জন্য বিলাপ করছে। কলাবতী বলল, ''এই জায়গাটা কৃত্তিবাস থেকে নেওয়া, বর্ষায় চারিদিক জলে ডুবে গেছে, কবে জল সরবে, কবে সীতাকে উদ্ধার করা যাবে এই চিন্তায় পাগল হয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন—''

রাম তখন মাথা চাপড়ে বলে চলেছে :

ততদিনে সীতা হবে অস্থিচর্মসার।
কী জানি ত্যজে বা প্রাণ বিরহে আমার
একাকিনী অনাথিনী শত্রুমধ্যে বাস।
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস
আমা বিনা জানকীর অন্যে নাহি মন।
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত।
কী করিবে ভাই তুমি কী করিবে মিত

কলাবতী দেখল জয়দেব ড্যাবডেবে চোখে রামের দিকে তাকিয়ে বলল, "দারুণ মুখস্ত করেছে তো!" তারপরই সে চমকে উঠল লক্ষ্মণের সংলাপ শুনে।

রামের পাশে দাঁড়ানো লক্ষ্মণ ধমকে উঠে বলল, "ছিঃ দাদা, তুমি মেয়েমানুষের মতো কাঁদছ আর কৃত্তিবাস আওড়াচ্ছ? খোঁজ নাও রাবণ কেন বউদিকে কিডন্যাপ করল? সে ব্যাটা গেল কোথায়, বালিকে মেরে যাকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করে দিলে?"

রাম ॥ সুগ্রীবের কথা বলছিস? বলেছিল সীতা উদ্ধারে আমাকে সাহায্য করবে, নইলে কি আমি বালিকে মারি? যেই সিংহাসনে বসল অমনি সব প্রমিস ভুলে মেরে দিল। ব্যাটাকে কিষ্কিন্ধ্যায় না বসিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো উচিত ছিল।

লক্ষ্মণ ॥ যাই, হারামজাদাকে মারতে মারতে নিয়ে আসছি।

লক্ষ্মণ রাগে গরগর করতে করতে দশ পা হেঁটে গিয়ে একটি মেয়ের ঘাড় ধরে পিঠে মৃদুভাবে চড় মারতে মারতে ফিরে এল।

লক্ষ্মণ ॥ দাদা এই সেই ব্যাটা সুগ্রীব। যা বলার এখন দাদাকে বল।

হাতজোড় করে সুগ্রীব

হারাইয়া রাজ্য পাই রামের প্রসাদে।
তোমার প্রসাদে আমি বাড়িনু সম্পদে
হেরি রঘুনাথ স্বয়ং বিষ্ণু অবতার।
কার শক্তি শোধিবেক শ্রীরামের ধার
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে।
যাইব কেবল আমি তাহার সহিতে
না করিয়া রামকার্য বসে আছি ঘরে।
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে
পশুজাতি কপি আমি কত করি দোষ।
সেবক বৎসল রাম না করেন রোষ

লক্ষ্মণ ॥ খুব হয়েছে, ন্যাকামো করার জায়গা পাসনি? এবার একটু কাজ করে দেখা। বউদিকে রাবণ কোথায় রেখেছে সেই খোঁজটা চটপট এনে দে। দেখছিস না দাদার হাঁড়ির হাল হয়েছে চেহারার।

সুগ্রীব ॥ আজ্ঞে খোঁজ পেয়েছি। তিনি আছেন লঙ্কায় অশোক কাননে।

ব্যগ্রস্বরে রাম ॥ পেয়েছ, খোঁজ পেয়েছ? কেমন আছে সীতা?

সুগ্রীব ॥ বলতে পারব না। রাবণ একটা রাক্ষসকে পাঠিয়েছিল চিঠি দিয়ে। কিষ্কিন্ধ্যায় ওর লোক এসে তোলা তুলবে, আমি যেন কিচ্ছুটি না করি। লোকটাই আমাকে বলল।

লক্ষ্মণ ॥ তোর রাজ্যে এসে রাবণের লোক তোলা আদায় করবে, তুই কিছু বলবি না?

সুগ্রীব ॥ বলতে পারি, তবে পরেরদিনই আমার লাশ পড়ে যাবে।

রাম ॥ কোনও ভয় নেই, আমরা তোমার পাশে থাকব। তুমি শুধু সীতা কেমন আছে সেই খবরটা এনে দাও।

রিহার্সাল এই পর্যন্ত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রইল।

জয়দেবের হতভম্ব ভাবটা এতক্ষণে কেটে গেছে এবং সে বুঝে ফেলেছে এটা কী ধরনের নাটক। হাসতে হাসতে বলল, "ড্রেস, মেকআপ, তির ধনুক, গদা এসব নিশ্চয় লাগবে না। স্টেজের পিছনে সাদা কাপড় দিয়ে দোব। স্টেজটা মাটি থেকে চার ফুট উঁচু, দু'দিকে উইং, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে স্টেজে ওঠানামা। আচ্ছা লম্বায় কতটা হলে সুবিধে হয়?"

কলাবতী বলল, "অনেকটা লম্বা চাই, এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত। কেননা, হনুমান দৌড়ে এসে সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য ঝাঁপ দেবে।"

জয়দেব বলল, "ওরে বাবা, ঝাঁপও থাকবে! ঝাঁপিয়ে পড়বে কোথায়?"

"উইং দিয়ে স্টেজের বাইরে গিয়ে পড়বে, সেখানে অনেকগুলো বালিশ-তাকিয়া থাকবে। আপনাদের কাছে তো এসব থাকে, এনে রেখে দেবেন। ইনজুরি হলে বিপদে পড়ে যাব।"

"বেশ ভাল বুদ্ধি করেছেন তো।"

"বুদ্ধিটা আমার নয়, কাকার।"

"লঙ্কায় গিয়ে হনুমান তো লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ছিল। এই নাটকেও তা আছে নাকি?"

"লঙ্কাকাণ্ড মানে অগ্নিকাণ্ড? ওরে বাবা! তা হলে বড়দি তক্ষুনি নাটক বন্ধ করে দেবেন। ধুপুকে আর আমাকে পরদিনই টি সি দিয়ে বলবেন বিদেয় হও।"

জয়দেবের নাট্য-উৎসাহ ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে কথা বলার সঙ্গে। এই অল্পবয়সি নাট্যকার-পরিচালককে উপদেশ দেওয়ার জন্য তার মাথার মধ্যে সৃজনী পোকাটি কুটকুট করে কামড় দিল।

"আচ্ছা আপনার নাটকটা শেষ হবে রামায়ণের কোন জায়গায়?"

"সুকুমার রায় যেখানে শেষ করেছিলেন। শক্তিশেলের ধাক্কায় লক্ষ্মণ পড়ে গেল, হনুমান গন্ধমাদন পাহাড়টা মাথায় করে আনল, লক্ষ্মণ বেঁচে উঠল। ওইখানেই আমার নাটকও শেষ হবে। সময় একঘণ্টা, তার মধ্যেই যা কিছু।"

"শক্তিশেল মারাটা দেখাবেন কী করে? গন্ধমাদন নিয়ে হেঁটে হেঁটে তো হনুমান আসবে না, উড়ে আসবে। সিনেমায় দারা সিংহ তো তাই করেছিল।"

"এটা নিয়ে এবার ভাবতে হবে। বাইরে চলুন, রিহার্সালের সেকেন্ড পার্ট এবার শুরু হবে।" কলাবতী ঘরের বাইরে করিডরে এল, সঙ্গে জয়দেব। সেকেন্ড পার্ট মানে খাওয়া। দু'স্লাইস পাঁউরুটি আর যথেষ্ট ঝাল দেওয়া দমের দু'টুকরো আলু। এটা সম্ভব হয়েছে সত্যশেখর প্রতিদিন কুড়ি টাকা ভর্তুকি দেওয়ায় এবং গিরিবালা বাড়ি থেকে রেঁধে আনায়।

জয়দেব বলল, "আমি বলি কী, লক্ষ্মণকে রাবণ গুলি করুক। বন্দুক জোগাড় করতে পারবেন? গুলির আওয়াজটা বুড়িমা, কি চকলেট বোমা দিয়ে তৈরি করে দেওয়া যাবে। কিন্তু মুখোমুখি বানর আর রাক্ষস সৈন্যদের যুদ্ধটা কীভাবে হবে?"

"খুব সোজা, ক্যারাটে।" কলাবতী সহজ গলায় বলল, "তিনটে মেয়ে পেয়েছি, এই পাড়ায় ক্যারাটে স্কুলে শেখে। বাকিরা টিভিতে হিন্দি ফিল্ম দেখে দেখে সেদিন নকল করে দেখাল উইথ ডায়ালগ, ফ্যান্টাস্টিক। আর যুদ্ধের সময় অবিরাম স্টেজের দু'পাশে কালীপটকা ফেটে চলবে।"

"বড়দি তো তা হলে নাটক বন্ধ করে দেবেন, কালীপটকা ফাটবে তো আগুনে!"

"একটা উপুড় করা হাঁড়ির মধ্যে যদি ফাটে তা হলে তো ওনার আপত্তি করার কিছু থাকবে না।"

জয়দেব কবজি তুলে ঘড়ি দেখল। হঠাৎ যেন মনে পড়ল এমনভাবে বলল, "অ্যাকাডেমিতে আজ আমাদের নতুন নাটক 'বাঘের লোমের কাঁথা'-র ফোর্থ শো। আমার অ্যাপিয়ারেন্স অবশ্য শেষের দিকে, দেরিতে গেলেও চলবে।"

কলাবতী বিচলিত স্বরে বলল, "আপনাকে দেরি করিয়ে দিলুম, লজ্জা করছে।"

"আরে না না, এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে। আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে

যাব। একটা সাজেশন দিতে ইচ্ছে করছে, বুঝতে পারছি না দেওয়া ঠিক হবে কিনা।''

''কেন ঠিক হবে না?'' কলাবতী ব্যগ্র হয়ে বলল, ''আমি তো নতুন, কাঁচা, পরামর্শ চাই।''

''এই যে পদ্যে ডায়ালগ, এটা একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে। দর্শকরা তো রামায়ণ মহাভারত নামটাই শুনেছে, পড়ে টড়ে তো দেখেনি। ওদের কাছে বোরিং মনে হতে পারে। একটু ছেঁটে দিন, নয়তো গদ্যে বলা হোক।'' জয়দেব এই বলে কলাবতীর মুখভাব লক্ষ করল। মুখে বিরূপতা বা অপ্রসন্নতার ছায়া দেখতে না পেয়ে সে বলল, ''আমি একটা ব্যাপার করতে চাই, সেটা হল হনুমান গন্ধমাদন নিয়ে স্টেজে উড়ে আসবে।''

''সে কী! কীভাবে?'' বিস্মিত কলাবতীর চোখের মণি বড় হয়ে উঠল।

''একটু ভেবে নিতে হবে। হনুমানের সাইজটা দেখতে হবে আর সাহস আছে কেমন, সেটা জানতে হবে। উড়ে আসাটা কিন্তু চেষ্টা করলে করা যায়। রোপওয়ে দেখেছেন? তারের উপর দিয়ে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে ট্রলিতে মানুষ যায়। হনুমান যদি সেইভাবে যায়?'' জয়দেব এমনভাবে তাকাল যেন মহাকাশে ব্ল্যাক হোল হারিকেন হাতে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছে।

কলাবতী তো তাজ্জব। চোখ পিটপিট করে বলল, ''বলেন কী! এমন আইডিয়া তো আমার কাকার মাথাতেও আসেনি!''

''উনি নিশ্চয় নাটক করেন না।''

''হাইকোর্টের উকিল। ছোটবেলায় খুব যাত্রা দেখেছেন।''

''হায়ার না হয়ে লোয়ার কোর্টের উকিল হলে মাথায় ঠিক আইডিয়া গজিয়ে যেত। যাই হোক, যা বললুম এটা কাউকে বলবেন না। তা হলে কিন্তু সারপ্রাইজটা মাটি হয়ে যাবে। আমি গন্ধমাদনটা করে দেখাব।'' জয়দেব আবার ঘড়ি দেখল, ''অ্যাকাডেমিতে বেল বেজেছে, স্ক্রিন এইবার সরবে। আমি যাই।''

খাবারের বাক্স ও গ্যাস বেলুন: ঝামেলাবাজদের চমক

তিনদিনের প্ল্যাটিনাম জুবিলি শুরু হয়েছিল মাথায় হলুদ ক্যাপ ও স্কুল ড্রেস পরা প্রায় হাজার ছাত্রীর পদযাত্রা দিয়ে। কাঁকুড়গাছি থেকে দক্ষিণে ফুলবাগান ঘুরে পুবে কাদাপাড়া হয়ে ই এম বাইপাস ধরে উত্তরদিকে গিয়ে মানিকতলা মেন রোড ধরে পশ্চিমে এসে আবার কাঁকুড়গাছিতে। এক সারি দিয়ে এই পদযাত্রার আগায় চিত্রবিচিত্র করা কলসি মাথায় নিয়ে সকাল ছ'টায় প্রথম হাঁটতে শুরু করে হেডমিস্ট্রেস মলয়া। প্রতি দশ মিনিট অন্তর মাথা বদল হয়। প্রোগ্রামে লেখা ছিল 'পূর্ণমঙ্গলঘট মস্তকে ধারণ করে শিক্ষিকাদের এলাকা প্রদক্ষিণ'। কিন্তু ঘট বা কলসির আকার দেখে চারজন শিক্ষিকা জানিয়ে দেয় তাদের ঘাড়ে স্পন্ডিলোসিস, পূর্ণ নয়, কলসিটা শূন্য করা হোক। কেউ টের পাবে না ওটা খালি না ভরতি। কিন্তু এগারোজন শিক্ষিকা এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলে, ''স্কুলের মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িয়ে, মঙ্গলঘট পূর্ণ রাখতেই হবে। ওই চারজনকে বাদ দিয়ে আমরাই ঘট বইব।'' তাই হয় শেষ পর্যন্ত। দু'ঘন্টায় প্রায় চার মাইল পথ পরিক্রমা করে এই পদযাত্রা। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, শেষ পঁয়তাল্লিশ মিনিট মঙ্গলঘট বহন করেছিল গিরিবালা ঢালি।

এই পদযাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আধমিনিটের জন্যও ট্র্যাফিক জ্যাম করেনি। এ জন্য ট্রাফিক বিভাগের এসি ব্রততী বেদজ্ঞর সবিশেষ প্রশংসা করেন। সারি দিয়ে যাওয়া মেয়েদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত হেঁটে ব্রততী মিছিলকে সরলরেখায় আনতে ''স্ট্রেট লাইন, স্ট্রেট লাইন, স্ট্রেট লাইনে হাঁটো'' বলে কাঁধে রুল দিয়ে টোকা মেরে মেরে ফুটপাথের দিকে সরিয়ে দেয়। পদযাত্রার আগায় যে দুটি মেয়ে স্কুলের নাম ও প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী লেখা ব্যানার টানটান করে দু'ঘণ্টা ধরে হেঁটেছে, ব্যানারটা তারা মুহূর্তের জন্য আলগা করে ঝুলিয়ে ফেলেনি।

পদযাত্রা স্কুল থেকে শুরু হয়ে শেষ মেয়েটি বেরিয়ে যাওয়ার দু'মিনিটের মধ্যে স্কুল বাড়ির পিছনে ছোট্ট ফাঁকা জমিতে খাটানো শামিয়ানার নীচে প্রোমোটার শিবশঙ্কর হালদারের কেটারার শ্যালকের তত্ত্বাবধানে দরবেশ তৈরি এবং লুচির জন্য ময়দা মাখার কাজ শুরু হয়। আর আলুর দমের জন্য আলু সিদ্ধ করতে বড় একটা গ্যাসের বার্নারে কড়াই বসে যায়।

শিবশঙ্কর তিনদিন আগে স্কুলে এসে মলয়াকে বলে যায়, ''প্ল্যাটিনাম

জুবিলি তো বছর বছর হয় না, জীবনে একবারই হয়। মেয়েরা একটু মিষ্টিমুখ করবে না? এই ক'টা তো মেয়ে, কত আর খরচ হবে? দশ হাজার, পনেরো হাজার? আপনাদের এক পয়সাও দিতে হবে না, আমার মেয়ে পুতুল তার বন্ধুদের, দিদিমণিদের খাওয়াবে। মা অভয়ার কৃপায় পুতুলের বাবার এটুকু খরচ করার ক্ষমতা আছে।''

মলয়া বলেছিল, ''কিন্তু খাবারের বাক্সগুলো...''

তাকে থামিয়ে দিয়ে শিবশঙ্কর বলে উঠেছিল, ''পরিবেশদূষণ? ভেবে রেখেছি। দুটো ড্রাম থাকবে, মেয়েরা খেয়ে ড্রামে বাক্স ফেলবে, আমার লোক সেগুলো কর্পোরেশনের জঞ্জালের ভ্যাটে ফেলে দিয়ে আসবে, ব্যস, দূষণের ঝামেলা আর থাকবে না।''

হাঁপ ছেড়েছিল মলয়া। তার ভয় ছিল দূষণ নিয়ে বলরাম দত্ত আবার আন্দোলন না পাকায়। পুতুলের বাবা যে চমকটা মলয়াকে দিয়েছিল, প্রায় সেইরকমই চমক পেল মিশিরজি।

জয়ন্তী পদযাত্রা শুরু হতেই স্কুল ফাঁকা। পাহারা দিতে রয়ে যায় চতুরানন মিশির, দারোয়ান ভোলা দাস আর ঝাড়ুদার গণেশ। হেড ক্লার্ক বৃন্দাবনবাবু ভিয়েনের কাছাকাছি টুলে বসে। বিশাল স্কুল কম্পাউন্ডের একদিকে প্যান্ডেল ও মঞ্চ তৈরির কাজ শেষ। প্লাস্টিকের বেত লাগানো লোহার চেয়ার এসে গেছে, সেই সঙ্গে লম্বা লম্বা তিনটি সোফা, হলুদ আর খয়েরি কাপড়ে প্যান্ডেল মোড়ার কাজ চলছে। মঞ্চে জয়দেব পরদার খোলা-বন্ধ পরীক্ষায় এবং হনুমানকে উড়িয়ে আনার ব্যবস্থায় নিযুক্ত। ইলেকট্রিকের তার বিছানো কালই শেষ হয়েছে। টিউব এবং বাল্‌বের ফিটিংস এবার লাগানো হবে।

মিশিরজি দাঁড়িয়ে ছিল লোহার ফটকে। একটা আপাদমস্তক ঢাকা মোটরভ্যান তার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভ্যান থেকে একটি লোক নেমে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, ''এটা কি কাঁকুড়গাছি উচ্চ বালিকা স্কুল?''

মিশিরজি বিরক্তমুখে আঙুল তুলে ফটকের উপরের সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে বলে, ''বাংলাতেই তো লেখা, পড়তে পারেন না?''

লোকটি মিশিরের কথায় কান না দিয়ে বলল, ''মলয়া মুখার্জি কে? এই চালানে সই করতে হবে, মাল আছে, নামিয়ে কোথায় রাখব?''

মিশির এতগুলো কথা মাথায় সাজিয়ে নিতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল, তারপর বলল, ''মলয়া মুখার্জি এখানে বড়দি। তিনি এখন জলুস নিয়ে

বেরিয়েছেন, তিন-চার ঘণ্টা তো লাগবেই ফিরে আসতে। কী মাল আছে? আমি সই করে নিয়ে নিলে হবে?''

''আপনি এখানে কী করেন?''

''আমি বড়দির খাস বেয়ারা।'' মিশিরের স্বর গম্ভীর ও নম্র, নিজের গুরুত্ব বোঝাতে। লোকটি ইতস্তত করে বলল, ''এখানে স্কুলের মাস্টার টাস্টার কেউ আছে?''

মিশির আবার বিরক্ত হয়ে বলল, ''মাস্টার কোথায় পাবেন, সব দিদিমণি। হেড কেলার্‌ক বৃন্দাবনবাবু আছেন, চলবে?''

''চলবে, ডেকে আনুন, খুব জরুরি দরকার।''

মিশির ডেকে আনল বৃন্দাবনকে। ততক্ষণে ভ্যানটা ভিতরে ঢুকে স্কুলের কোলাপসিবল গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটি বলল, ''মলয়া মুখার্জি অর্ডার দিয়েছিলেন, সকাল সাতটার মধ্যে মাল রেডি করে ডেলিভারি দিতে। দেখুন সাতটার আগেই নিয়ে এসেছি।'' লোকটি চালানের আসল ও কপি, দুটো ছাপা বিল বুকপকেট থেকে বের করে বিস্মিত বৃন্দাবনের হাতে দিয়ে বলল, ''সই করে দিন আর মাল কোথায় নামিয়ে রাখব সেই ঘরটা একটু দেখিয়ে দিন।''

বৃন্দাবন চালানে চোখ বুলিয়ে দেখল উপরে লেখা ইউনিক এন্টারপ্রাইজ। জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স। হতভম্ব স্বরে বলল, ''তিনশো পঁচাত্তরটা গ্যাস বেলুন! কে আনতে বলল?''

লোকটি বলল, ''মলয়া মুখার্জি অর্ডার দিয়েছেন, তিন হাজার টাকা আগাম পেমেন্টও করে দিয়েছেন। পাঁচটা করে এক-একটা বাঞ্চে পঁচাত্তরটা বাঞ্চ। পঁচিশটার বেশি এই ভ্যানে ধরল না। বাকি পঞ্চাশটা দু'বারে এনে দিচ্ছি, খুব কাছেই বেলেঘাটায় আমাদের অফিস, যাব আর আসব। কী যে ঝামেলার কাজ, হাত ফসকালেই উড়ে যাবে, একটু তাড়াতাড়ি করুন।''

চালানে সই করে আসলটা ফিরিয়ে দিয়ে বৃন্দাবন কৌতূহলী হয়ে বলল, ''দরজাটা খুলুন তো, একবার দেখি।''

''দেখুন আর ঠিকঠাক গুনে নেবেন, এখানে পঁচিশটা বাঞ্চে একশো পঁচিশটা বেলুন আছে।''

লোকটি ভ্যানের পিছনের দুটি পাল্লা সন্তর্পণে খুলে দেখাল। লাল, হলুদ, সবুজ, সাদা ও নীল, পাঁচ রঙের বেলুন নিয়ে সুতোয় বাঁধা এক-একটি তোড়া, দিঘিতে পদ্মফুল বাতাসে যেমন হেলে দোলে, তেমনি গ্যাস বেলুনের তোড়াগুলো ভ্যানের মধ্যে ভাসছে, দুলছে।

"একটা ঘর দিন, সেখানে বেলুনগুলো ছেড়ে দোব।"

বৃন্দাবন তাকাল মিশিরের দিকে। মিশির বলল, "ফাইভ বি-টু-তে ছেড়ে দিক।"

লোকটি, মিশির ও বৃন্দাবন দু'হাতে দুটো করে বেলুনের তোড়া ধরে ভ্যান থেকে বেলুনগুলো নিয়ে গেল ফাইভ বি-টু-তে। ছেড়ে দেওয়ামাত্র সেগুলো বুদবুদের মতো উঠে ঘরের সিলিং-এ ঠেকে রইল। আধ ঘন্টার মধ্যেই বাকি পঞ্চাশটা তোড়া এসে গেল। ঘরের দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা পকেটে রেখে বৃন্দাবন বলল "পঁচাত্তরটা তোড়া মানে পঁচাত্তর বছর। দেখেছ মিশির, বেলুনগুলোর গায়ে আমাদের স্কুলের নাম আর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী লেখা আছে। আইডিয়া আছে বটে বড়দির!"

মিশির বলল, "এগুলো আকাশে ছাড়া হলে যাবে কোথায়?"

বৃন্দাবন বলল, "যেদিকে হাওয়া দেবে সেদিকে যাবে। এখন পুবদিকে হাওয়া দিচ্ছে, যাবে সল্ট লেকে।"

ঘট মাথায় ফটক দিয়ে প্রথম ঢুকল গিরিবালা। তার পিছনে ব্যানার ধরে দুটি মেয়ে। ব্রততীর নির্দেশে স্কুল কম্পাউন্ডে পূর্বনির্ধারিত ছক অনুযায়ী পাঁচ সারিতে দাঁড়াল মেয়েরা। প্রতি সারির মাথায় একটি টেবল, ঝুড়িতে করে খাবারের বাক্স এনে তার উপর থাক দিয়ে রাখা হচ্ছে। ভোরে উঠে স্কুলে এসে চার মাইল হেঁটে মেয়েদের পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে।

মঙ্গলকলস মাথায় নিয়ে গিরিবালা সেটা কোথায় নামিয়ে রাখবে বুঝতে পারছে না। আরতি ঘটককে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আরতিদি, কলসিটা কোথায় রাখব? যেখানে-সেখানে তো রাখা ঠিক হবে না।"

আরতি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "তাই তো।" তারপর দৌড়ে গিয়ে অন্নপূর্ণা পাইনকে ধরল, "কলসিটা কোথায় রাখা যায় বলো তো, অন্নপূর্ণাদি?"

অন্নপূর্ণা বলল, "ব্রততীদি গিরিকে বলে দেয়নি কোথায় রাখতে হবে?"

আরতি বলল, "গিরিই তো জিজ্ঞেস করল কোথায় রাখবে। আমি বলি কী, আমাদের টিচার্স রুমে এখন রাখুক।"

সেই সময় বৃন্দাবন মলয়ার হাতে বেলুনের চালানটা তুলে দিয়ে বলল, "আগে বলেননি, সারপ্রাইজটা কিন্তু দারুণ দিলেন।"

অবাক মলয়ার ভ্রূ চালানে চোখ রেখেই কুঁচকে উঠল, "এটা কী? আমি গ্যাস বেলুনের অর্ডার দিয়েছি!" ভ্রূর সঙ্গে কপালে বিস্ময়ের কুঞ্চন ফুটল।

"দিয়েছেন কী, মাল এসেও গেছে। আসুন, দেখে যান।"

মলয়াকে নিয়ে বৃন্দাবন ফাইভ বি-টু-র ঘরের তালা খুলে দরজার একটা পাল্লা সবেমাত্র টেনেছে, বেলুনের একটা তোড়া বেরিয়ে এল। বৃন্দাবন হাঁই হাঁই করে উঠে সেটা দু'হাতে ধরতেই একটা বেলুন ফেটে গেল। তোড়াটাকে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিয়ে বৃন্দাবন বলল, "জানলা দিয়ে দেখুন।"

জানলায় গিয়ে মলয়া ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখল নানান রঙের বেলুন উপরে ওঠার জন্য বেঞ্চ ও ডেস্কের উপর একে অপরের ঘাড়ে চেপে অপেক্ষা করছে।

বেলুন ফাটার আওয়াজে কৌতূহলী হয়ে অসীমা, অন্নপূর্ণা এবং পাশের টিচার্স রুম থেকে গিরিবালা এসে হাজির। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে তারা তাকাল বৃন্দাবনের আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে এবং একই সঙ্গে 'ওম্মা' বলে উঠল।

বৃন্দাবন বলল, "'ওম্মা' কী বলছেন, এগুলো ওড়াতে হবে, মেয়েদের ডেকে আনুন। পঁচাত্তরটা তোড়া, এক-একটায় পাঁচটা করে, তার মানে তিনশো পঁচাত্তর। এইমাত্র একটা ফেটে গেল, এখন তিনশো চুয়াত্তর। এ সব কার কল্যাণে বলুন তো?"

বৃন্দাবন ঠোঁট আকর্ণ টেনে ধরে মলয়ার দিকে তাকাল এবং বলল, "আমাদের স্কুলের নাম আকাশে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াবে, দূর-দূরান্তের কত লোক জানবে..."

"জানবে, যখন গ্যাস ফুরিয়ে মাটিতে নেমে আসবে।" অসীমা বলল।

"গ্যাস সবারই একদিন না-একদিন ফুরোয়, তাই বলে কি বেলুন ওড়ার আনন্দ করবে না?" অন্নপূর্ণা হালকা স্বরে কথাটা বলে মেয়েদের খবর দিতে ছুটে গেল।

ব্রততীর তত্ত্বাবধানে খাবারের বাক্স পাঁচটি টেবল থেকে দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। অন্নপূর্ণা ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল, "বেলুন, বেলুন, বড়দি বেলুন এনেছেন ওড়াবার জন্য। যারা বেলুন ওড়াতে চাও, তারা ফাইভ বি-টু-তে চলে এসো।"

অন্নপূর্ণার কথা শেষ হতে না-হতেই লাইন ছেড়ে হুড়মুড় করে মেয়েরা ছুটে গেল স্কুলবাড়ির দিকে।

ব্রততী বিরক্ত স্বরে অন্নপূর্ণাকে বলল, "আগে আমাকে বলবে তো, তা নয়

সর্দারি করে নিজে বললে, দ্যাখো তো একটা কেওস তৈরি করে দিলে।"

ফাইভ বি-টু-র দরজায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বৃন্দাবন দরজার একটা পাল্লা ফাঁক করে হাত গলিয়ে একটা তোড়ার গলার সুতো ধরে বেলুন টেনে বের করে সামনে যে মেয়েকে পাচ্ছে, তার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি উঁচু করে তোড়াটি ধরে ছুটে গেল কম্পাউন্ডে। সেখানে ব্রততী তাকে পাকড়াও করল।

"অ্যাই, অ্যাই, এখন বেলুন ছাড়বে না। আগে লাইন করে দাঁড়াও। সবাই একসঙ্গে মিলে ছাড়বে।"

পঁচাত্তরটি মেয়ের হাতে বেলুন দেওয়ার কাজ যখন চলছে, মলয়া তখন বিধ্বস্ত অবস্থায় তার খাস কামরায় মাথায় হাত দিয়ে বসে। হাতব্যাগের মধ্যে রাখা সেল ফোনটা বেজে উঠতে সে ক্লান্ত হাতে ব্যাগ থেকে বের করে কানে ধরে বলল, "হ্যালো, কে বলছেন?"

"ঝামেলাবাজ বলছি। লাগছে কেমন?"

"আন্দাজ ঠিকই করেছিলুম। সিঙ্গি না হলে আমাকে এমব্যারাস করার মতো বুদ্ধি আর কার মাথা থেকে বেরোবে!"

"এমব্যারাস্‌ড হয়েছ শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে।"

"তিন হাজার টাকার চেক আজই পাঠিয়ে দোব।"

"পাঠাতে হবে না। কালুর নাটকের দলবলকে একদিন পেটপুরে খাইয়ে দিয়ো এবং, বলা বাহুল্য, আমাকেও।"

হনুমানের গন্ধমাদন আনার পরিকল্পনা

জয়ন্তীর প্রথম দুটো দিন ভালয় ভালয় কাটল। উদ্বোধন করেন জীবিত প্রবীণতম শিক্ষিকা মহামায়া মজুমদার, বয়স পঁচাশি। রেকর্ড ঘেঁটে ষাট বছর আগে স্কুলে প্রথম পড়াতে আসা মহামায়ার নামটি বের করে বৃন্দাবন। এখনও তিনি পেনশন তুলছেন।

ডেকরেটর প্রায় চারফুট লম্বা পিতলের একটা প্রদীপের ঝাড় দেয়। তাতে ছিল একশো প্রদীপ। দুটি ছাত্রী কুঁজো হয়ে যাওয়া মহামায়াকে দু'দিক থেকে ধরে দাঁড়ায়। পঁচাত্তরটি প্রদীপে তেল ও সলতে দেওয়া ছিল। মহামায়া কাঁপা কাঁপা হাতে মোমবাতি দিয়ে দুটি প্রদীপ জ্বালান। বাকি তিয়াত্তরটা জ্বালায়

স্কুলের প্রেসিডেন্ট, হেডমিস্ট্রেস ও অন্যান্য শিক্ষিকারা। এরপর বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও চিত্র প্রদর্শনীর ফিতে কাটা হয়, বক্তৃতা দেওয়া হয়। লোকনৃত্য দেখায় স্কুলের মেয়েরা, সবশেষে হয় ম্যাজিক শো।

দ্বিতীয়দিন দুপুরে প্যান্ডেল ফাঁকা। তখন পরদা টেনে স্টেজে ফুল রিহার্সাল দিল কলাবতী তার নাটকের। হাঁটুর নীচে ঢলঢল করা লাল ফুলছাপ দেওয়া বারমুডা আর কালো ফুলহাতা গেঞ্জি পরে এবং লোহার তার বাঁকিয়ে তাতে খড় ও কাপড়ের হলুদ পাড় জড়িয়ে তৈরি করা ল্যাজ কোমরে বেঁধে রুকমিনি হনুমানের মুখোশ লাগিয়ে চুল মাথার উপর ঝুঁটি করে বেঁধে স্টেজের উপর দাপিয়ে যেভাবে হাঁটাচলা করল, তাতে জয়দেব পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বলতে বাধ্য হয়, "আসল হনুমানও হার মেনে যাবে এর কাছে। সব হাততালি তো এই মেয়েটাই নিয়ে নেবে। কী সাহসী!"

রুকমিনি সমুদ্র লঙ্ঘনের লাফটা তিনবার করে দেখাল। স্টেজের এক প্রান্ত থেকে 'জয় শ্রীরাম" বলে চিৎকার করে দুড়দাড় শব্দে যখন ছুটল, ল্যাজটা তখন উপর-নীচ করছিল স্প্রিং-এর মতো। দু'হাত তুলে খড়ি টানা একটা জায়গায় পৌঁছেই টেকঅফ করে। অপর প্রান্তের উইং-এর বাইরে জমিতে গোটাদশেক পেল্লায় তাকিয়া সাজিয়ে রাখা, তা ছাড়াও সতর্কতা হিসেবে একটা মোটা চাদরের দুটি প্রান্ত তাকিয়াগুলোর হাততিনেক উপরে শক্ত করে ধরে থাকে কলাবতী ও জয়দেব। হনুমানের পড়ার প্রথম ধাক্কাটা নিল ওই ধরে থাকা চাদরটা, তারপর সে চাদর-সমেত পড়ল তাকিয়ার উপর। রুকমিনির তিনটি লাফই নিখুঁত হল। তবে শেষ লাফটা দিতে পায়ের চাপটা একটু জোরেই দেয়, স্টেজের কাঠটা তাইতে মচ করে উঠেছিল।

দারুণ খুশি জয়দেব, হনুমানের ল্যাজের পাটের পুচ্ছটিতে হাত বুলিয়ে বলল, "ল্যাজটা কে তৈরি করে দিয়েছে?"

"বাবা।" গর্বিত স্বরে বলল রুকমিনি। "মা পরশু এই প্যান্টটা কিনে দিয়েছে। বলল, এখনকার হনুমানরা এইরকম প্যান্ট পরে। জামাটা দাদার, মানিয়েছে না?"

জয়দেবের কাছে কলাবতী জানতে চায়, হনুমানের গন্ধমাদন নিয়ে উড়ে আসার ব্যাপারটা কতদূর?

জয়দেব বলল, "তারের উপর যে রোলারটা থাকবে সেটা আজ বিকেলে পাব। উইং-এর বাইরে থেকে দড়ি ধরে টানলে রোলার থেকে ঝোলা হনুমান

দাঁড়িপাল্লার মতো একটা তক্তায় ঝুলতে ঝুলতে সড়সড় করে এদিক থেকে ওদিকে যাবে।''

''কিন্তু ওকে তো মাটিতে নামতে হবে, নাকি ঝুলেই থাকবে?'' কলাবতী তার সংশয় জানিয়ে দিল।

জয়দেব দু'হাত তুলে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, ''ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, ঝুলে থাকবে কেন, আস্তে আস্তে হনুমানকে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হবে ওই দড়িটা আলগা করে। অডিয়েন্স যাতে তারটা দেখতে না পায়, সেজন্য স্টেজের উপর থেকে একহাত একটা কালো কাপড় এধার থেকে ওধার ঝোলাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকের প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর তারটা খাটিয়ে দোব। রোলার লাগিয়ে ট্রায়ালও কমপ্লিট করব।''

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শেষ হল চার্লি চ্যাপলিনের 'গোল্ড রাশ' দেখিয়ে। দেখল প্রায় হাজার দেড়েক ছাত্রী, অভিভাবক এবং পাড়ার লোকেরা। দেখে সবাই খুশি। দারুণ মজার তো বটেই, তা ছাড়া ইংরেজি কথা বোঝারও ঝামেলা ছিল না। ছবিটা নির্বাক।

তৃতীয় দিনে বলরাম দত্তর 'দূষণ এবং ছাত্রীদের কর্তব্য' নামে বক্তৃতা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাঁচমিনিট পর মণ্ডপে ফিসফাস শুরু হয়, তারপর বেশ জোরেই কথাবার্তা এবং গল্পগুজব চলতে থাকে। ছোট মেয়েরা যখন ছোটাছুটি করে খেলতে শুরু করল, ব্রততী আর থাকতে না পেরে শ্রোতাদের ধমক দিয়ে মাইক টেনে নিয়ে বলে, ''অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে মাননীয় বলরাম দত্ত মহাশয় বলছেন, যে বিষয়টা আমাদের জীবন-মরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর আপনারা কিনা তা না শুনে গোলমাল করছেন? চুপ করে বসে শুনুন। নয়তো চুপচাপ চলে যান।''

আগুনে ঘি পড়ল। এক ছাত্রীর বাবা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ''আমরা এখানে জয়ন্তী দেখতে এসেছি, উৎসবের আবহাওয়া চাই, উনি আবহাওয়া দূষণ ঘটাচ্ছেন। কোথায় কী বলতে হয় জানেন না।''

ব্যস, শুরু হয়ে গেল ভদ্রলোককে সমর্থন করে হইহই। সামনের সোফায় বিশিষ্টজনের সঙ্গে বসেছিল মলয়া, রাজশেখর, পলাশবরণ, রাজ্যশিক্ষা সচিব, প্রধান স্কুল পরিদর্শক সহ তিনজন কমিটি মেম্বার। হইহইটা যখন রইরই হওয়ার দিকে, তখন মলয়া সোফা থেকে উঠে দ্রুত স্টেজের পিছনে চলে যায়।

পরদার দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আরতি ঘটক। মলয়া ব্যস্ত হয়ে বলল, ''টানো, দড়ি টানো, পরদা টানো।''

আরতি দু'হাতে ঘুড়ির সুতো টানার মতো দড়ি টেনে স্টেজ পরদা দিয়ে আড়াল করে দিল। স্টেজে তখন মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে বলরাম, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। মলয়া বলল, "ব্রততীদি, পাবলিককে বেরিয়ে যেতে বলা উচিত হয়নি।"

বলরাম গর্জন করে উঠল, "একশোবার উচিত হয়েছে।"

উইং-এর পাশে দাঁড়ানো অসীমা মন্তব্য করল, "জানি ঝামেলা একটা পাকাবেই।"

মাইকে মলয়া ঘোষণা করল, "শারীরিক অসুস্থতার কারণে বলরামবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না, এজন্য আমরা দুঃখিত।" মণ্ডপে বুউউউ ধ্বনি উঠল। "আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান যোগব্যায়াম ও সংগীতসহ গণব্যায়াম প্রদর্শন এখনই শুরু হবে। পরিচালনায় প্রখ্যাত গণসংগীত গায়ক অরুণাচল সেনগুপ্ত এবং নেতাজি যোগব্যায়াম শিবির। যোগব্যায়াম ও সংগীতে অংশগ্রহণকারী সবাই আমাদের স্কুলেরই মেয়ে। আবহ সুর রচনায় যাঁরা বাজনা বাজাবেন তাঁরাও আমাদের স্কুলের। অনুগ্রহ করে আপনারা কয়েকমিনিট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। ধন্যবাদ।"

স্টেজ থেকে বেরিয়ে মলয়া এল কাপড় ঘিরে তৈরি সাজঘরে। তাকে দেখেই মেয়েরা কিচিরমিচির বন্ধ করে তটস্থ। ব্যায়ামের দশ-বারোটি, বাজনার গুটিদশেক, নাটকের অন্তত পনেরোটি মেয়ে মিলে সাজঘরে পা ফেলার জায়গা নেই। সেই সঙ্গে বেহালা, কেট্‌লড্রাম, সেতার, ঢোল, তবলা, গিটার, হাতে বাঁশি, বিউগ্‌ল, ঝাঁঝর নিয়ে অপেক্ষমানদের পাশে মেকআপের বাক্স এবং বাচ্চাদের একটা ট্রাইসাইকেল।

"সব রেডি?" মলয়া গলা তুলে বলল। "অরুণাচলবাবু, শেফালি, পূর্বা, স্বাগতা, ধূপছায়া, কলাবতী তৈরি? মাইকম্যান, লাইটম্যানদের দেখুন জয়দেববাবু। তা হলে পরদা সরাতে বলি?" মলয়া আরতির দিকে তাকাতেই সে দড়ি টানতে শুরু করল।

পরদা সরে যেতেই বেজে উঠল ভৈরবী রাগ সেতারে ও বাঁশিতে। সুইমিং কস্টিউমের মতো পোশাক পরা ছয়টি মেয়ে প্রায় কুচকাওয়াজ করে স্টেজে এল কেট্‌লড্রাম ও বিউগ্‌ল ধ্বনি সহকারে। নেপথ্য থেকে প্রণতির (হাতে আসনের নাম লেখা ফর্দ) গলা ভেসে এল, "এখন শুরু হচ্ছে যোগাসন প্রদর্শন। প্রথমে হলাসন।"

মেয়েরা একের পর এক হলাসন, ভুজঙ্গাসন, শশঙ্গাসন, মৎস্যাসন ইত্যাদি

বারোটি আসন দেখাল। প্রতিটির শেষে পেল হাততালি। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' নেপথ্য থেকে অরুণাচল-সহ তিনজন ছাত্রী গেয়ে উঠল। ছুটে স্টেজে ঢুকল জনাদশেক মেয়ে। স্টেজের এ প্রান্ত, ও প্রান্ত ছুটোছুটি করে তারা ভল্টের এমন কসরত দেখাতে শুরু করল যে, স্টেজের কাঠ মচমচ করে উঠল। সকালে রুকমিনি যেখান থেকে লাফ দিয়েছিল, সেখানকার তক্তাটি ফেটে গিয়ে কোনওরকমে জোড়া লেগে রইল।

'ঊর্ধ্ব গগনের' পর শুরু হল 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী'। মেয়েরা শুরু করল একের কাঁধে আর একজন উঠে পিরামিড গড়া, মন্দির গড়া। বলা ছিল, যতক্ষণ গান চলবে ততক্ষণ তারা কাঁধে চড়ে থাকবে। কিন্তু অরুণাচলের গান আর শেষ হয় না। একবার শেষ হতেই আবার প্রথম থেকে শুরু করল। কাঁধে চড়া মেয়েরা টলমল করতে শুরু করল, যাদের কাঁধে উঠেছে তাদের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, ''মেয়েগুলো যে পড়ে যাবে। গানটা থামান।''

সঙ্গে সঙ্গে দশ-পনেরোটি গলা চিৎকার শুরু করল, ''থামান, গান থামান।''

গান থামিয়ে গণসংগীতগায়ক ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, ''চেয়ারগুলো কীসের?''

''লোহার,'' প্রণতি জানাল।

মেয়েরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে আরতি দড়ি টানল।

প্রচুর হাততালির মধ্যেই প্রণতির ঘোষণা ভেসে এল, ''আমাদের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান একটি নাটিকা এবার অভিনীত হবে, 'রাবণের শক্তিশেল'। রচনা ও পরিচালনায় আমাদেরই ছাত্রী কলাবতী সিংহ। তাকে সহযোগিতা করেছে ধূপছায়া নাগ। মঞ্চাধ্যক্ষ জয়দেব পাল। আলোকসম্পাতে ঋত্বিককুমার। আবহসংগীতে প্রণতি হালদার। এখন শুরু হচ্ছে জয়ন্তীর শেষ অনুষ্ঠান 'রাবণের শক্তিশেল'।''

ঘোষণা শেষ হতেই লাউডস্পিকারে শোনা গেল ঐকতান। অসীমা দৌড়ে গিয়ে লাউডস্পিকারের শব্দ নিয়ন্ত্রককে বলে এল, ''কমান, পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের নীচে রাখুন, নয়তো ঝামেলা বেধে যাবে।''

সোফায় মলয়া পাশে-বসা রাজশেখরকে বলল, ''জ্যাঠামশাই এতকাল

লক্ষ্মণের শক্তিশেল কথাটাই তো শুনে এসেছি, রাবণের শক্তিশেল আবার কী?''

''শক্তিশেলটা কার, রাবণেরই তো? ময়দানব ওটা তৈরি করে জামাই রাবণকে যৌতুক দিয়েছিল।''

রাজশেখরের কথা শেষ হওয়ামাত্র ঝপ করে মণ্ডপের আলো নিভে গেল আর ধীরে ধীরে মঞ্চের পরদা সরে যেতে লাগল। প্রায় এক হাজার জোড়া চোখ তাকিয়ে রইল মঞ্চের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে।

শুরু হল রাবণের শক্তিশেল

সন্ধ্যাকাল। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। মঞ্চের মাঝামাঝি, থলিতে মাথা রেখে আড়াআড়ি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে একটি লোক। ছোলাভাজা মুখে ফেলতে ফেলতে জিন্‌সের প্যান্ট আর ঢলঢলে শার্ট পরা কাকের বাসার মতো চুল মাথায় পাতলা চেহারার এক যুবক প্রবেশ করল। এধার-ওধার তাকিয়ে স্বগতোক্তি করল, ''এ কোথায় এলুম রে, বাবা। চারিদিকে জঙ্গল, ভর সন্ধেবেলা ভূত টুত বেরোবে না তো! ট্রেকারওলাকে বললুম কিষ্কিন্ধ্যা যাব, ব্যাটা এই জঙ্গলে নামিয়ে দিয়ে বলল এটাই কিষ্কিন্ধ্যা।''

বলতে বলতে যুবকটি কয়েক পা গিয়েই শুয়ে থাকা লোকটির পায়ে ঠোক্কর খেল। ভয়ে চমকে উঠে ''উরি বাবা, ভূউউত নাকি গো।'' বলে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর নিচু হয়ে খুঁটিয়ে দেখে বুঝল মানুষ। প্রচণ্ড রেগে ঘুমন্ত লোকটিকে লাথি মেরে সে বলল, ''এই ব্যাটা ওঠ, সন্ধেবেলায় রাস্তার মধ্যিখানে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিস, আক্কেল সাক্কেল নেই?''

লোকটি (উঠে বসে) মতো কেন, আমি তো কুম্ভকর্ণই!

যুবক ॥ কোন কুম্ভকর্ণ, রাবণের ভাই?

কুম্ভকর্ণ ॥ হ্যাঁ, বিভীষণের মেজদা, মেঘনাদের মেজকাকা।

যুবক ॥ তোমার বাড়ি তো লঙ্কায়। এটা তো কিষ্কিন্ধ্যা, মাঝে সমুদ্দুর। এলে কী করে?

কুম্ভকর্ণ ॥ ইচ্ছে করে কি আর এসেছি! দাদা বলল, তোর রাক্ষুসে খাওয়ার খরচ জোগাতে আমার ট্রেজারি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, কত আর নোট ছাপিয়ে সামাল দোব, এখনও তেত্রিশটা সোনার বাড়ি তৈরি করা বাকি। এই বলে

দাদা পুষ্পক রথে চাপিয়ে আমাকে এখানে এনে নামিয়ে দিয়ে বলল, তোলা আদায় করে খা।

যুবক ॥ আদায় হয়েছে?

কুম্ভকর্ণ ॥ আরে দূর, আমার তেমন লোকবল, মানে শাগরেদ নেই, পিছনে পার্টিও নেই, কেউ আমায় ভয় পায় না। তবে চেনে না তো আমি কে, একদিন টপাটপ বানরগুলোকে ধরে ধরে যখন মুখে ফেলব, তখন বুঝবে কুম্ভকর্ণ কী জিনিস। তা বাপু, তুমি কে?

যুবক ॥ আমি ঘটোৎকচ। তোমার ত্রেতার পরের দ্বাপর যুগের মানুষ, তোমার চেয়ে মডার্ন। ভীম আমার বাবা, হিড়িম্বা আমার মা, আমিও তোমার মতো রাক্ষস। (হাত বাড়িয়ে দিল, কুম্ভকর্ণ হাত ধরে ঝাঁকাল।)

কুম্ভকর্ণ ॥ রাক্ষস সব যুগেই আছে।

ঘটোৎকচ ॥ দেখবে কলিযুগেও থাকবে। কুম্ভ, আমি তো শুনেছি তোমার দাদা দুই যোজন লম্বা আর এক যোজন চওড়া একটা ঘর করে দিয়েছিল তোমার ঘুমোবার জন্য। অভিধানে বলেছে যোজন মানে চার ক্রোশ, এক ক্রোশ মানে আট হাজার হাত, দু'মাইলের বেশি। দু'যোজন মানে যা দাঁড়ায়, তোমার গতরটা তো দেখছি তেমন নয়।

কুম্ভকর্ণ ॥ আরে দূর, এই মহাকাব্যওলাদের কাজই তিলকে তাল করে দেখানো, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে না দেখালে ওদের পেটের ভাত হজম হয় না। তা বাপু ঘটোৎ, তুমি এই অবেলায় যাচ্ছিলে কোথা?

ঘটোৎকচ ॥ কাগজে বিজ্ঞাপন দ্যাখোনি, অত ঘুমোলে আর দেখবেই বা কী করে, সুগ্রীব সৈন্য রিক্রুট করবে, তোমার দাদার সঙ্গে যুদ্ধ করবে রাম আর চুক্তি অনুযায়ী সুগ্রীব রামকে সৈন্য সাপ্লাই দেবে, আজ রাত থেকেই লাইনে দাঁড়াতে হবে।

কুম্ভকর্ণ ॥ কেন মিছিমিছি বেঘোরে প্রাণটা দেবে ভাই। তার চেয়ে অন্য কোথাও চেষ্টা করো। তুমি পশ্চিমবঙ্গে চলে যাও না কেন, সেখানে রোজগারের এত পথ আছে যে, তুমি কোন পথটা নেবে ভাবতে ভাবতে দিশাহারা হয়ে যাবে।

ঘটোৎকচ ॥ দু'-একটা পথ বাতলে দাও তো ভাই। লোকে হিড়িম্বা রাক্ষুসির ছেলে, জংলি, এই সব বলে এমন ঘেন্না করে যে, সহ্য করা যায় না।

কুম্ভকর্ণ ॥ তুমি পুকুর বোজানোর কাজ শুরু করো। ঠিকা নাও আর পুকুর ভরাট করো। কেউ কিচ্ছু তোমায় বলবে না,, প্রোমোটার সব সামলে দেবে।

আর প্রোমোটার যদি খুঁজে না পাও, তা হলে ডাক্তার হয়ে যাও। ডিগ্রি নেই? কিচ্ছু ভেবো না, কতকগুলো ইংরিজি অক্ষর নামের পাশে সাইনবোর্ডে লাগিয়ে বসে যাও, কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। চুটিয়ে ডাক্তারি করে যাও গ্রামে, এমনকী শহরেও। ডাক্তার হতে ইচ্ছে না করলে মাস্টার হয়ে যাও, স্কুলে যেতেও হবে না। তুমি দু'-একটা চেয়েছিলে, আমি এক্ষুনি তিনটে বলে দিলুম। একটু ভাবতে সময় পেলে গোটা পনেরো পথ বলে দিতে পারতুম।

(নেপথ্যে বিউগ্‌ল্ ধ্বনি। কুম্ভকর্ণ ও ঘটোৎকচের সচকিত হয়ে স্থান ত্যাগ। সপার্ষদ রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

পারিষদদের মালকোঁচা করে পরা ধুতি। হাফ শার্ট। পিঠে কাগজে লালকালিতে লেখা 'সুগ্রীব', 'অঙ্গদ', 'জাম্বুবান' ইত্যাদি নাম পিন দিয়ে সাঁটা।

রাম (উবু হয়ে বসে ললাটে করাঘাত) ॥ সীতা সীতা! হায় সীতা! তুমি বেঁচে আছ কি মরে গেছ জানি না। কেউ যদি একবার খবর এনে দিত সীতা ঠিকমতো খাচ্ছে-ঘুমোচ্ছে কিনা, তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হতুম। সুগ্রীব, সীতার খবর নিতে কাউকে পাঠাও না ভাই। এই সাগরটা লাফ দিয়ে পার হওয়া মানুষের কর্ম নয়, পারে শুধু বানরেরা।

সুগ্রীব ॥ আপনি কিচ্ছু ভাববেন না সীতাপতি। জানকী কোথায় আছেন সে খবর যখন পেয়ে গেছি আর ভাবনার কিছু নেই। আমি লোক পাঠাচ্ছি।

লক্ষ্মণ ॥ লোক?

সুগ্রীব ॥ সরি, বানর পাঠাচ্ছি। বাবা অঙ্গদ, তোমার সাঙ্গোপাঙ্গদের ডাকো তো।

(অঙ্গদ উইং-এর কাছে গিয়ে ভিতরদিকে মুখ করে হাঁক দিল, 'এইই কারা আছিস দৌড়ে আয় রাজামশাই ডাকছেন।' হনুমানসহ কয়েকজন বানর ছুটে স্টেজে ঢুকল হুমড়ি খেতে খেতে।)

সুগ্রীব ॥ তোমাদের লম্ফঝম্পের কেরামতি এবার দেখাতে হবে। এই যে সাগর দেখছ (অপর প্রান্তের উইং-এর দিকে হাত তুলে দেখাল), এই সাগর লাফিয়ে পার হয়ে লঙ্কায় যেতে হবে। সেখানে অশোকবনে সীতাজননী রয়েছেন। তাঁর খবর আনতে হবে। তিনি ঠিকমতো খাচ্ছেন দাচ্ছেন কিনা, ঘুমটুম হচ্ছে কিনা, এগুলো জেনে আসবে আর এখানকার খবর, রামচন্দ্রর খবর দিয়ে বলবে তিনি ভীষণ কান্নাকাটি করছেন। আপনার অদর্শনে চান করেন না, চুল আঁচড়ান না, কিচ্ছুটি মুখে দেন না। আর বলবে আপনাকে

উদ্ধারের জন্য কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব জোর কদমে কাজ শুরু করেছেন। সাগরের উপর একটা ব্রিজ বানাবার জন্য টেন্ডার ডাকা হবে আর সৈন্য রিক্রুটের কাজ এখুনি শুরু হবে।

১ম বানর ॥ সাগরটা কত চওড়া রাজামশাই?

সুগ্রীব ॥ একশো যোজন।

২য় বানর ॥ ওরে বাব্বা। অতটা কী করে লাফাব। পঞ্চাশ যোজন হলে চেষ্টা করতে পারি।

৩য় বানর ॥ সত্তর-টত্তর হলে নয় লাফানো যায়।

৪র্থ বানর ॥ সাগরের মাঝামাঝি যদি পাহাড় টাহাড় গোছের কিছু থাকত তা হলে তার উপর প্রথম লাফ দিয়ে পড়ে আর এক লাফে লঙ্কায় পৌঁছোনো যায়।

জাম্বুবান ॥ হনুমান চুপ কেন? মহাবীর তুমি। (পাঁচালির সুরে)

জানিয়া সীতার বার্তা আইস হনুমান।
চিন্তিত রামরে সব করো পরিত্রাণ
পৌরুষ প্রকাশ করো সাগর লঙ্ঘিয়া।
শ্রীরামেরে তুষ্ট করো সীতা উদ্ধারিয়া

হনুমান ॥ মন্ত্রীমশাই, সুড়সুড়ি দিয়ে কার্য উদ্ধার হয় না। আগে বলুন মালকড়ি কী ছাড়বেন?

জাম্বুবান ॥ একশোটা মর্তমান কলা।

হনুমান ॥ ঠিক ঠিক দেবেন তো? মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি তো, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

জাম্বুবান ॥ হ্যাঁ রে বাবা, দোব।

(হনুমান বৈঠক দিয়ে হাত-পা ছুড়ে ওয়ার্ম আপ শুরু করল। ছোট ছোট লাফ দিয়ে স্টেজের উপর ঘুরল। সেই সঙ্গে পাঁচালির সুরে বলতে লাগল,

সাগর যোজন শত দেখি খালিজুলি।
শতবার পার হই আমি মহাবলী
উড়িয়া পড়িব গিয়া স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দরী

চূড়ান্ত লাফ দেওয়ার আগে দৌড়োবার জন্য হনুমান স্টেজের একপ্রান্তে কুঁজো হয়ে প্রস্তুত হল।

রাম ॥ হনু, একবারটি শোনো। (হনুমান কাছে এল। রাম কাঁধের থলি থেকে মালার মতো গাঁথা পানপরাগের পাউচ বের করে তার হাতে দিল) সীতাকে দিয়ো। রোজ ভাত খেয়ে একটা না খেলে অম্বল হয় ওর।

(পাউচগুলো বারমুডার পকেটে রেখে হনুমান আবার প্রস্তুতি নিল। কুঁজো হয়ে সামনে-পিছনে কয়েকবার দুলে হনুমান চিৎকার করে 'জয় শ্রীরামজি' বলেই দুড়দাড় বেগে স্টেজ কাঁপিয়ে ছুটে গিয়ে খড়ির দাগ টানা জায়গাটায় পৌঁছেই দু'হাত তুলে ঝাঁপ দিল। উইং-এর বাইরে জমির উপর একটা চাদর টানটান করে জালের মতো ধরে দাঁড়িয়ে ছিল জয়দেব ও কলাবতী। হালকাভাবেই হনুমান পড়ল তাকিয়াগুলোর উপর।

কলাবতী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "রুকু, লাগেনি তো?"

হাততালিতে তখন ফেটে পড়ছে মণ্ডপ। মেয়েরা ওঠবোস করছে চেয়ারে। গলা ছেড়ে 'রুকু, রুকু' বলে চেঁচাচ্ছে। তারই মধ্যে রাজশেখর মলয়াকে বললেন, "কালু লিখেছে কেমন বলো? অবশ্য সতু ব্রাশআপ করে কিছুটা ঝালাই করে দিয়েছে। প্রত্যেকটি মেয়ে কিন্তু দারুণ অভিনয় করছে।"

"ও যে এইরকম ভাবতে পারে ধারণায় ছিল না। ওর গোটা টিমটাকে একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াব," মলয়া কথাটা বলে এধার-ওধার তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজল, তারপর বলল, "উদ্বোধনের দিন যদি আসতেন, বেলুন ওড়ানো দেখলে আপনার ভাল লাগত।"

(ইতিমধ্যে মঞ্চে আবার আলো জ্বলে উঠেছে। বানররা চোখের উপর কর রেখে বহু দূরে আকাশে মিলিয়ে যাওয়া হনুমানকে দেখছিল।)

১ম বানর ॥ এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছে গেছে। যা একখানা লম্ফ দিল।

পাটাতনে খড়ির দাগ যেখানে কাটা, হনুমান সেখানে পায়ে ধাক্কা দেওয়ায় পেরেক খুলে গিয়ে পাটাতনটা ঝুলে পড়ে। অন্ধকার থাকায় সেটা কারও নজরে পড়েনি।

সুগ্রীব ॥ জাম্বুবান, আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ারটা কে যেন, তাকে ডাকো তো।

জাম্বুবান ॥ বিশ্বকর্মার ছেলে নল। দারুণ রাস্তাঘাট, বাঁধ বানায়। এক-একদিনে কুড়ি-পঁচিশ যোজন পাকা রাস্তা তৈরি করে ফেলে, এগারো-বারো দিন পর্যন্ত টিকে থাকে!

সুগ্রীব ॥ বটে বটে, এ তো দারুণ ইঞ্জিনিয়ার! এগারো-বারো দিন, বলো কী? আমি তো জানতুম সাড়ে সাতদিনের বেশি আমাদের রাস্তা টেকে না। নলকে ডাকো, ওকেই সেতুবন্ধনের বরাতটা দেওয়া যাক।

জাম্বুবান ॥ রাজামশাই, আমাদের নিয়ম বড় কাজ টেন্ডার ডেকে দেওয়ার।

সুগ্রীব ॥ আরে রাখো তোমার নিয়ম। দেখছ না রামচন্দ্রজির কী অবস্থা। আর সাতদিনও টেকেন কিনা বলা যায় না। জরুরি ভিত্তিতে আমাদের কাজ করতে হবে। টেন্ডার ফেন্ডার কাজ শেষ হলে ডেকো, তখন যা পাস টাস করার করে দেব। যাও, জলদি যাও। (জাম্বুবানের দ্রুত প্রস্থান)। রামচন্দ্রজি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। হাজার-হাজার বেকার বানর ছেলে সৈনিক হওয়ার জন্য গ্রাম থেকে ছুটে এসে সত্তর ঘণ্টা আগে লাইন দিয়েছে খবর পেলুম। সেতুটা করে ফেলছি, আর দুটো দিন সময় দিন, কাজ শুরু করে দেব। তারপর সেতুর উপর দিয়ে হাজার হাজার বানর সেনা গিয়ে দেখবেন কী লঙ্কাকাণ্ড তখন বাধিয়ে দেবে।

(জাম্বুবানের প্রবেশ। সঙ্গে নল, তার বগলে একটা ফাইল)

জাম্বুবান ॥ ধরে এনেছি রাজামশাই। সহজে কি আসতে চায়, ঠিকেদারদের সঙ্গে বৈঠক করছিল।

সুগ্রীব ॥ কীসের বৈঠক?

নল ॥ আজ্ঞে, গঙ্গোত্রীতে বন্যা। গ্রামকে গ্রাম জলে তলিয়ে যাচ্ছে। বোল্ডার ফেলতে হবে। ঠিকাদাররা যে রেট দিচ্ছে, তা মানা যায় না। তাই নিয়েই বৈঠক।

সুগ্রীব ॥ কী ঠিক হল?

নল ॥ মেনে নিলুম। লোকে কাজ হচ্ছে দেখতে চায়। দেখাবার একটা ব্যবস্থা তো হল।

সুগ্রীব ॥ খুব বুদ্ধিমান তো তুমি। তা এবার বুদ্ধি করে সেতুটা চটপট বেঁধে দাও।

নল ॥ কীরকম সেতু চাইছেন। (ফাইল খুলে সুগ্রীবকে দেখাতে লাগল) এটা হল সাসপেনশন ব্রিজ আর এটা হল ক্যান্টিলিভার...''

সুগ্রীব ॥ তোমার পেনশন টেনশন, লিভার ফিভার ছাড়ো। বেশি সময় দিতে পারব না, স্রেফ পরপর নৌকো সাজিয়ে তার উপর তক্তা পেতে দাও।

নল ॥ পন্টুন ব্রিজ? চারদিন সময় দিন, এমন জবরদস্ত সেতু বানিয়ে দেব অন্তত একমাস টিকবে। ততদিনে যুদ্ধটা শেষ হয়ে সীতাদেবীকে ওই সেতুর উপর দিয়েই ফিরিয়ে আনবেন রঘুনন্দনজি। (নলের প্রস্থান। প্রবেশ করল বিভীষণ)

বিভীষণ ॥ এখানে রামচন্দ্র কে আছেন?

রাম ॥ আমি। আপনি কে? কী দরকার?

বিভীষণ ॥ আমি লঙ্কেশপতি দশাননের ছোট ভাই বিভীষণ। আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে এসেছি। দাদা লাথি মেরে আমাকে একটা নৌকোয় তুলে দেয়, ভাসতে ভাসতে এসে পড়লুম। আমাকে দয়া করুন রাঘব। সীতা উদ্ধারে আমি আপনাকে লঙ্কার সব সুলুকসন্ধান দোব।

লক্ষ্মণ ॥ এ তো দেখছি ঘরশত্রু। দাদা, একে দরকার হবে। রেখে দাও। তা বাপু বিভীষণ, রাবণ তোমায় লাথি মারল কেন?

বিভীষণ ॥ দাদা তোলা আদায়ের জন্য কুম্ভকর্ণকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠাতে চাইল। আমি বললুম, 'এটা অধর্ম, অন্যায় কাজ হবে।' দাদা চটে গিয়ে লাথি মেরে বলল, 'তুই ধার্মিকদের সঙ্গে গিয়ে থাক, লঙ্কায় তোর স্থান হবে না।'

(এক বানর সেনা বিভীষণের কোঁচা খুলে পকেট হাতড়ে সার্চ করা শুরু করল। পকেট থেকে বেরোল একটা পুরিয়া। সেনাটি পুরিয়া খুলে শুঁকে সেটা সুগ্রীবের হাতে দিল।)

সুগ্রীব ॥ এটা কী বিভীষণ? মনে হচ্ছে নারকোটিক্স। তুমি কি এইসব নেশার জিনিস শোঁকো? খাও?

(মাথায় ছোট ছোট কাগজের নৌকো নিয়ে সার দিয়ে বানররা স্টেজের একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্টেজের পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে আবার স্টেজে ঢুকল।)

জাম্বুবান ॥ চোরা চালানদার হতে পারে। আমাদের সুকুমারমতি ছেলেদের নেশা ধরাতে হয়তো রাবণই এই ব্যাটাকে পাঠিয়েছে। একে জেলে রাখা উচিত।

রাম ॥ সুগ্রীব, বিভীষণ জেলে নয়, আমার সঙ্গে থাকবে। এইরকম লোকই আমার দরকার।

(নলের প্রবেশ।)

নল ॥ কাজ কমপ্লিট। এবার সৈন্য টৈন্য নিয়ে লঙ্কায় চলুন।

রাম (অবাক হয়ে) ॥ সে কী! এর মধ্যে হয়ে গেল সেতু?

নল (আরও অবাক হয়ে) ॥ এতে অবাক হওয়ার কী আছে? জরুরি ভিত্তিতে কাজ না? কাঠগুলো অবশ্য কাঁচা, বেশ নরম, একটু পা টিপে টিপে যেতে হবে। খাওয়া দাওয়াটা এবার সেরে ফেলুন, তারপর একটা দিবানিদ্রা দিয়ে ঝরঝরে হয়ে লঙ্কা জয় করতে বেরিয়ে পড়া যাবে।

(সকলের প্রস্থান। কুম্ভকর্ণ এবং ঘটোৎকচের প্রবেশ।)

কুম্ভকর্ণ ॥ ঘটোৎ, কী হল, ল্যাংড়াচ্ছ কেন?

ঘটোৎকচ ॥ আর বোলো না কুম্ভ। হাজার হাজার মরিয়া বেকার ছেলে এমন হুড়োহুড়ি শুরু করল যে, জাম্বুবানের পুলিশ লাইন সামলাতে লাঠি চালাল, লাইন ছত্রভঙ্গ। পায়ে লাঠি, পিঠে লাঠি, এই দ্যাখো না (জামা তুলে পিঠ দেখাল)। লাইন থেকে সেই যে ছিটকে গেলুম আর ঢুকতে পারলুম না। এখন ভাবছি মায়ের কাছে জঙ্গলে চলে যাব। সেখানে হাতিটা, গন্ডারটা তো খেতে পাব। তুমি এখন কী করবে?

কুম্ভকর্ণ ॥ আমিও দেশে ফিরে যাব। শুনলুম আমার ছোট ভাইটা এখানে এসে রামের সঙ্গে ভিড়েছে, নিশ্চয়ই আমার খবর এতক্ষণে রামকে দিয়েছে। ধরার জন্য পুলিশ নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দ্যাখো বাপু, জেল খাটা আমার পোষাবে না। শুনেছি ওখানে শান্তিতে ঘুমোনো যায় না। আমি বরং সুগ্রীবের সৈন্যদের সঙ্গে ভিড়ে সেতু দিয়ে কুচকাওয়াজ করে লঙ্কায় ফিরে

(নেপথ্যে ড্রামের ও বিউগ্‌লের আওয়াজ। মার্চ করে জনাদশেক বানরসেনা ঢুকে 'জয় জয় শ্রীরাম' বলতে বলতে অপরপ্রান্তের উইং-এর দিকে এগোল। কুম্ভকর্ণ শেষ সেনাটির পিছনে টুক করে ভিড়ে গেল।)

ঘটোৎকচ ॥ তা হলে আর আমিই বা এখানে থেকে কী করব। যাই। (প্রস্থান।)

স্টেজের আলো কমে গেল। বিপরীত দিক থেকে পূজারির বেশে মেঘনাদের প্রবেশ। স্টেজের মাঝখানে পূজা দেওয়ার ভঙ্গিতে বসে জোড়হাতে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল। চুপিসারে বিভীষণ ঢুকে হাতছানি দিয়ে লক্ষ্মণকে ডাকল। জিন্‌সের ট্রাউজার্স আর জ্যাকেট, মাথায় সবুজ কাউন্টি ক্যাপ পরা লক্ষ্মণ গুঁড়ি মেরে ঢুকল। উইং-এর আড়ালে সরে গেল বিভীষণ।

মেঘনাদ (চমকে উঠে) ॥ কে, কে ঢুকল এই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে? ওহ বিভাবসু, আপনি। কী সৌভাগ্য আমার। কিন্তু কী কারণে, কহ তেজস্বী আইলা রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে প্রসাদিতে এ অধীনে?

লক্ষ্মণ (দু'পা ফাঁক করে কোমরে হাত রেখে) ॥ নহি বিভাবসু আমি দেখ নিরখিয়া (স্টেজের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল) রাবণি। লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকূলে। সংহারিতে, বীরসিংহ তোমায় সংগ্রামে আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে অবিলম্বে।

মেঘনাদ ॥ সত্যি যদি তুমি রামানুজ, তা হলে কোন কায়দায় এখানে ঢুকলে? চারিদিকে এত পাহারা, মাছি পর্যন্ত গলার সাধ্য নেই।

লক্ষ্মণ (কোমর থেকে পাঁউরুটি কাটার ছুরি বের করে) ॥ কী করে ঢুকলুম? বিভীষণ, কোথায় গেলে বিভীষণ (প্রবেশ করল বিভীষণ) এই যে। তোমার কাকাই আমাকে রাস্তা চিনিয়ে এনেছে।

মেঘনাদ (বিষাদভরে) ॥ এতক্ষণে জানলুম কী করে লক্ষ্মণ ঢুকল রক্ষঃপুরে। হায় কাকা, কাজটা কি উচিত হয়েছে? তোমার মা-দাদা-ভাইপো কারা, সেটা কি ভুলে গেলে? নিজের বাড়ির রাস্তা চোরকে দেখালে, ছোটলোককে রাজবাড়িতে আনলে?

বিভীষণ ॥ কী করব বলো, আমি রাঘবের চাকর। তার বিপক্ষে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মেঘনাদ ॥ কাকা, তোমার কথা শুনে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে আনিলে একথা। স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে, পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধূলায়? কোন মহাকূলে তোমার জন্ম, সেটা কি ভুলে গেছ? এই লক্ষ্মণটা কী নীচ দ্যাখো, আমার কাছে অস্ত্র নেই, আর বলছে কিনা যুদ্ধ করো! এটা কি মহারথিপ্রথা?

লক্ষ্মণ ॥ ওসব বড় বড় প্রথার কথা রাখো। আজ তোকে বাগে পেয়েছি, আর ছাড়াছাড়ি নয়। তোকে শেষ করে এখান থেকে যাব (ছুরি তুলে এগিয়ে এল)। মেঘনাদ লাফ দিয়ে উঠে লক্ষ্মণের হাতে লাথি মারতেই ছুরি পড়ে গেল। বিভীষণ কুড়িয়ে নিয়ে তুলে দিল লক্ষ্মণের হাতে। মেঘনাদ ছুটে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "দাঁড়া, অস্ত্র আনি, তারপর দেখি তুই কত বড় বীর।" লক্ষ্মণ দ্রুত ছুরি মারল প্রস্থানরত মেঘনাদের পিঠে।

মেঘনাদ (আর্তস্বরে) ॥ বীর কুলগ্লানি, সুমিত্রানন্দন তুই! শত ধিক তোরে। রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে। কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি, পামর, এ চির দুঃখ রহিল রে মনে। বাবা, বাবা, তুমি এর বদলা নিয়ো। (টলতে টলতে বেরিয়ে গেল, তাকে অনুসরণ করল বিভীষণ ও লক্ষ্মণ)

(স্টেজ অন্ধকার। খাকি হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট ও মোজা পরা উদ্‌ভ্রান্ত রাবণ।

মাথায় হেলমেট, তাতে গোল করে সাঁটা নয়টি মুখ। দ্রুত অস্থির পায়চারি। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা দূত তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে।)

রাবণ ॥ কহ দূত! কে বধিল চির রণজয়ী ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।

দূত ॥ ইঁদুরের মতো নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ঢুকে সৌমিত্রি কেশরী অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছে। বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ, এখন শোক ভুলে যে আপনার ছেলেকে মেরেছে তাকে সংহার করুন।

রাবণ (চিৎকার করে) ॥ এ কনকপুরে, ধনুর্ধর আছে যত সাজ শীঘ্র করি চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা। এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে। (দূতসহ প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল বিউগ্‌ল, ড্রাম, ঢোল, ঝাঁঝর এবং কোলাহল, হুংকার। সপার্ষদ সুগ্রীবসহ রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

রাম (সভয়ে) ॥ সুগ্রীব, মনে হচ্ছে প্রলয় উপস্থিত, মাটি যেন কাঁপছে, টাইফুন যেন ধেয়ে আসছে। আমার ভীষণ ভয় করছে। রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে। (সুগ্রীবকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল) স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা। কূল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, রঘুবন্ধু, স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে তোমরা।

সুগ্রীব ॥ কিচ্ছু ভয় পাবেন না। দয়া করে কাঁদবেন না। এখন কান্নাকাটি করার সময় নয়। লক্ষ্মণ যে কেন ওইভাবে মেঘনাদকে খুন করল! এখন ঠেলা বুঝুন। রাবণ এখন খ্যাপা ষাঁড়, আমাদের গুঁতিয়ে শেষ করে দেবে, ওর টার্গেট এখন লক্ষ্মণ।

জাম্বুবান ॥ আমি বলি কী, লক্ষ্মণ এখন লুকিয়ে পড়ুক। আমি ওকে আমার পুকুরপাড়ের কচুবনে নিয়ে যাই। রাবণ খুঁজে পাবে না, আসুন লক্ষ্মণ। (লক্ষ্মণকে নিয়ে প্রস্থান।)

অঙ্গদ ॥ লক্ষ্মণ কি সাঁতার জানে? পুকুরপাড়টা ঢালু আর মাটিটা পিছল, গড়িয়ে পড়লে একেবারে জলে। ওকে বারণ করে আসি, ঢালের দিকে যেন না যায় (ছুটে প্রস্থান)।

(ট্রাইসাইকেল চেপে রাবণের প্রবেশ। গলায় দড়ি দিয়ে একটা লোহার নল, পিঠে বন্দুকের মতো আড়াআড়ি ঝোলানো। নলের মাথায় ঢোকানো একটা টর্চ। রাবণের কোমরে ঝুলছে চ্যালাকাঠ। ভিতরে হাঁড়ি চাপা কালিপটকা ফাটার শব্দ।)

রাবণ ॥ কোথায়, কোথায় লক্ষ্মণ। আজ ব্যাটার ছাল ছাড়িয়ে রোস্ট করে

খাব। (হনুমানকে দেখে) এই হনু (কোমর থেকে চ্যালাকাঠ খুলে হনুমানের পিছনে দু' ঘা কষিয়ে) ভাগ ভাগ। (গলা ধাক্কা, হনুমান পড়ে গেল এবং হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

সুগ্রীব (হাতজোড় করে) ॥ আমার হাঁটুতে বাত, দৌড়োতে পারব না। আস্তে হেঁটে যাচ্ছি (খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রস্থান)।

রাবণ ॥ এই যে রামচন্দর, দেবতাদের পুষ্যিপুত্তুর, পাবলিসিটি পেয়ে পেয়ে মহাবীর হয়েছ। না চাহি তোমারে হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমণ্ডলে আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে। কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী পামর?

রাম (কম্পিত কণ্ঠে) ॥ লক্ষ্মণ পুকুরপাড়ে কচুবনে। যদি বলো তো ডেকে আনছি।

রাবণ ॥ এক মিনিট সময় দিচ্ছি, ডেকে আনো।

(রামের দৌড়ে প্রস্থান।)

(রাবণ পিঠ থেকে নলটি খুলে পরীক্ষা করে সাইকেলে ঠেস দিয়ে রাখল। পায়চারি শুরু করল। উইং-এর কাছে লক্ষ্মণকে দেখা গেল।)

রাবণ ॥ এতক্ষণে রে লক্ষ্মণ। এ রণক্ষেত্রে নরাধম তোকে পেলুম। কুক্ষণে সাগর পার হলি, পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি, চুরি করিলি জগতের অমূল্য রাক্ষসরত্ন।

লক্ষ্মণ ॥ আমি ক্ষত্রিয়ের ছেলে, রাক্ষসকে ভয় পাই না, এটা জেনে রেখো।

রাবণ ॥ বটে। তোর লম্বা-চওড়া কথা বলা এবার ঘুচোচ্ছি।

(স্টেজের আলো বিদ্যুৎ চমকের মতো দপদপ করতে থাকল। দেখা গেল পিঠের নলটা রকেট লঞ্চারের মতো রাবণ কাঁধে রাখল।)

রাবণ ॥ লক্ষ্মণ, আজি নাহি রক্ষা মোর হাতে।

(নলের মাথায় ঢোকানো টর্চের বোতাম টিপল, তীব্র আলো অন্ধকার মঞ্চ ভেদ করে লক্ষ্মণের বুকে পড়ল। এবার চকলেট বোমা ফাটার শব্দ। ঝাঁঝর, ঢোল, ড্রাম বেজে উঠল। আর্তনাদ করে লক্ষ্মণ মঞ্চের উপর পড়ে গেল। অট্টহাসি হেসে রাবণ ঝুঁকে লক্ষ্মণকে দেখে সাইকেলে উঠে উইং দিয়ে বেরিয়ে গেল। আলো জ্বলে উঠল। ছুটতে ছুটতে মঞ্চে এল রাম, সুগ্রীব, বিভীষণ এবং অন্যান্যরা। লক্ষ্মণের বুকে আছড়ে পড়ল রাম।)

রাম ॥ ভাই রে লক্ষ্মণ (হাউহাউ করে কেঁদে)। আজি এ রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি বিপদসলিলে মগ্ন। রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে? কার কাছে

আমাকে রেখে গেলি ভাই, এইসব ভিতু কলা-খাওয়া বানরগুলোর হাতে? (কপাল চাপড়াতে লাগল।)

সুগ্রীব (লক্ষ্মণের নাড়ি টিপে বুকে কান পেতে) ॥ সুমিত্রানন্দন মনে হচ্ছে এখনও পুরো পটল তোলেননি, কলজেটা ধুকধুক করছে। হনুমান, দৌড়ে ডাক্তার ডেকে আন।

হনুমান ॥ এত রাত্তিরে ডাক্তার আসবে ভেবেছেন? তিন কাঁদি কলা দিলেও আসবে না। তাতে রুগি মরে তো মরুক।

সুগ্রীব ॥ কোবরেজমশাই সুষেণ গেলেন কোথা? (দেখতে পেয়ে) এই যে কোবরেজ, দেখুন তো লক্ষ্মণকে বাঁচিয়ে তোলা যায় কি না।

সুষেণ (লক্ষ্মণের পেট টিপে, চোখের পাতা টেনে, চুল ধরে নাড়া দিয়ে, হাতের আঙুল মটকে, নাকের তলায় হাত রেখে)

প্রভু না হও কাতর।
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্ধর
হস্ত-পদে রক্ত আছে প্রসন্নবদন।
নাসিকায় শ্বাস বহে প্রফুল্ল লোচন
হেনজনে নাহি মরে সবাকার জ্ঞানে।
আনিবারে ঔষধ পাঠাও হনুমানে

রাম ॥ এখন আমার মাথার ঠিক নেই, আপনিই বলে দিন কোথা থেকে কী ওষুধপত্তর আনতে হবে। অ্যাই হনুমান, কোবরেজমশাই যা আনতে বলবেন, নিয়ে এসো।

সুষেণ ॥

শুন পবননন্দন।
ঔষধ আনিতে যাহ হে গন্ধমাদন
গিরি গন্ধমাদন সে সর্বলোকে জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী

হনুমান ॥ কোবরেজি ওষুধ মানে গাছপালা, শেকড় গুঁড়ো। ওসব চেনা আমার কম্মো নয়। অ্যালোপ্যাথি হলে সোজা ট্যাবলেট ক্যাপসুল কেনো আর খাও, নয়তো প্যাঁট করে ইঞ্জেকশন ফোটাও।

জাম্বুবান ॥ কোবরেজমশাই, এ মুখ্যুটাকে বরং ফর্দ করে লিখে দিন নয়তো সব গুবলেট করে ফেলবে।

সুষেণ ॥ তাই লিখে দিচ্ছি। চটাপট জলদি যাবি আর আসবি। রাত্রি মধ্যে ঔষধ বাঁচাব সহজে। রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্যতেজে। আয় আমার সঙ্গে, ব্যবস্থা লেখার প্যাডটা বাড়িতে রয়ে গেছে।

(সুষেণ ও হনুমানের প্রস্থান।)

(স্টেজের আলো ক্ষীণ হতে হতে অন্ধকার।) উইং-এর বাইরে দ্রুত তৎপরতা। ব্রততী হাতঘড়ি তুলে কলাবতীকে দেখিয়ে বলল, 'আর পাঁচ মিনিট এক'ঘণ্টা হতে। নাইলনের দড়িতে দাঁড়িপাল্লার মতো ঝুলছে একটা পিঁড়ে। তার উপর তোলার চেষ্টা চলছে হনুমানকে। ধূপছায়া ও জয়দেব কোনওক্রমে পাঁজাকোলা করে রুকমিনিকে তুলে পিঁড়িতে বসাল। হাতে তুলে দিল ছোট্ট একটি ধামা। সেটা লাউডগা, কলমি আর পুঁইশাক, নিমপাতা ও কচুপাতায় ভরা। মজা পেয়ে মিটমিট করে হাসছে রুকমিনি।

কলাবতী ধমক দিয়ে বলল, "হাসবি না একদম। ধামাটা এইভাবে মাথায় ধরে স্টেজে নামবি। নেমে বলবি 'অন্ধকারে আপনার প্রেসক্রিপশনটা পড়তে পারিনি। হাতের লেখাটাও বিচ্ছিরি। গন্ধমাদনের মাথাটাই ভেঙে নিয়ে চলে এলুম। এবার যা খোঁজার খুঁজে নিন।' পারবি বলতে?"

হনুমান মাথা হেলিয়ে দিল। জয়দেব দড়ি ধরল টানার জন্য। টর্চটা হাতে নিয়ে চাপাস্বরে কলাবতী বলল, "গো হনু।"

মঞ্চ অন্ধকার। রোমাঞ্চিত হয়ে দর্শকরা টর্চের আলোয় দেখল ধামা মাথায় হনুমান। ধামা থেকে উপচে বিশল্যকরণীর নানান পাতা। ঝুলতে ঝুলতে হনুমান অন্য প্রান্তের উইং-এর দিকে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। স্টেজের উপরদিক থেকে ঝোলানো কালো কাপড় এবং অন্ধকার থাকায় হনুমান ঝুলছে যে তার থেকে, সেটি দেখা যাচ্ছে না। উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে টর্চের রশ্মিতে শুধু হনুমান। হাততালিতে ফেটে পড়ল মণ্ডপ। রুকমিনির মা অরুণা দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত তুলে ঝাঁকাতে লাগল। একদল মেয়ে চিৎকার করে উঠল 'জয় হনুমানজি কি জয়।' 'বলো বজরংবলীজি জিন্দাবাদ।'

হনুমান পুলকে একহাতে ধামাটা ধরে অন্য হাতটা তুলে সামান্য নাড়ল দর্শকদের উদ্দেশে। পিঁড়িটা একটু নড়ে উঠল। দড়ির কোথাও রোলারটা আটকে গেছে, জয়দেব টানাটানি করতেই হনুমান দুলে উঠল। অবশেষে জয়দেব মরিয়া হয়ে দড়িতে একটা হ্যাঁচকা দিল। হনুমান-বসা পিঁড়িটা কাত

হয়ে যেতেই রুকমিনি লাফ দিয়ে পড়ল অন্ধকার স্টেজে।

মড়াৎ একটা শব্দ। টর্চের রশ্মি হনুমানকে অনুসরণ করে যাচ্ছিল। দেখা গেল, হনুমান ধামা-মাথায় একটা গর্ত দিয়ে স্টেজের তলায় চলে যাচ্ছে। কলাবতীর মুখ দিয়ে বেরোল শুধু একটি শব্দ, "সর্বনাশ।"

জয়দেবের মুখ ফ্যাকাশে। কোনওক্রমে বলল, "কাঠটা পচে গেছল। তার উপর এত লাফালাফি!"

কলাবতী দৌড়ে স্টেজের পিছন দিয়ে অপর প্রান্তের উইং-এর সিঁড়ির কাছে উবু হয়ে ফিসফিস করে ডাকল, "রুকু, অ্যাই রুকু।"

"এই যে আমি।" স্টেজের অন্ধকার তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল হনুমান, "আমার ল্যাজটা দুমড়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। আমি এখন লোকের সামনে যাই কী করে?"

"যেতে হবে না। ধামাটা গর্ত দিয়ে স্টেজে তুলে কোবরেজ মশাইকে ডাক।"

স্টেজের আলো জ্বলে উঠেছে। দর্শকরা দেখল, স্টেজ ফুঁড়ে ধামা ভরা লতাপাতা উঠল, তার নীচে হনুমানের মুন্ডু।

হনুমান ॥ ও কোবরেজমশাই, শুনুন। আপনার জিনিসগুলো খুঁজে পেতে নিন এর মধ্যি থেকে।

(স্টেজে চিত হয়ে শুয়ে লক্ষ্মণ। তাকে ঘিরে সাত-আটজন। সেখান থেকে সুষেণ ছুটে এল। ধামাটা তুলে পাতা ঘেঁটে দেখল।)

সুষেণ (উল্লসিত কণ্ঠে) ॥ যা-যা চেয়েছি সব আছে এতে। আর ভয় নেই, লক্ষ্মণ বেঁচে গেল।

তখন আরতির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ব্রততী ভোকাট্টা করার মতো পরদার দড়ি টানতে টানতে বলল, "তিন মিনিট পর্যন্ত গ্রেস দিয়েছি, আর নয়।"

প্রচণ্ড কোলাহলের এবং হাততালির মধ্যে শেষ হল নাটক। কুশীলবদের দেখার জন্য দর্শকরা দাবি জানাল। পরদা সরে যেতে দেখা গেল মঞ্চে কলাবতীর দু'ধারে মেয়েরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু হনুমান নেই।

"হনুমান কোথায়, হনুমান কোথায়।" চিৎকার উঠল দর্শকদের থেকে।

কলাবতী ডাকল "অ্যাই হনুমান, শিগ্‌গির আয়।"

বিরাট একটা লাফ দিয়ে উইং থেকে স্টেজে পড়ল হনুমান। ল্যাজটা নামানো। হাতে একটা মর্তমান কলা। সেটার খোসা ছাড়িয়ে খেতে শুরু করল।

কলাবতী বলল, "এই নাটক লেখায় প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি দুই কবির কাছে—কৃত্তিবাস ওঝা আর মধুসূদন দত্ত। তারপর ওঁদের বই যিনি পড়তে দিয়েছিলেন, সেই রাজশেখর সিংহর কাছে।"

মিনিটদশেক পর রাগে কাঁপতে কাঁপতে মলয়া বলল, "কোথায় ডেকরেটরের সেই লোকটা? মেয়েটার হাড়গোড় যদি ভেঙে যেত?"

জয়দেব তখন উলটোডাঙা স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

কলাবতীর দেখাশোনা

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৪
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯
পৃ. ১১২। মূল্য ২৫.০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়/ স্নেহাস্পদেষু

ভূতের বাসায় কলাবতী

প্রথম সংস্করণ: আগস্ট ১৯৯৮
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯
পৃ. ১৪৪। মূল্য ৫০.০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: শংকর বসাক
উৎসর্গ: পুটু বোরা-কে

কলাবতী ও খয়েরি

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯
পৃ. ১১৮। মূল্য ৪৫.০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
উৎসর্গ: সুলেখক ডাঃ অনিরুদ্ধ ঘোষ/ স্নেহাস্পদেষু

কলাবতী, অপুর মা ও পঞ্চু

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০২
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯
পৃ. ১১২। মূল্য ৭০.০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: অনুপ রায়
উৎসর্গ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়/ গুণীজনেষু

কলাবতী ও মিলেনিয়াম ম্যাচ

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৩
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯
পৃ. ১২৮। মূল্য ৭৫.০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: প্রশান্ত মাজি-কে

কলাবতীর শক্তিশেল

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৫
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯
পৃ. ১১০। মূল্য ৭৫.০০
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কৃষ্ণেন্দু চাকী
উৎসর্গ: চিকিৎসক দম্পতি শান্তি ও গুরুসদয় ভট্টাচার্যকে/ স্নেহ ও প্রীতি সহকারে।

এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে

কলাবতীর দেখা শোনা

ভূতের বাসায় কলাবতী

কলাবতী ও খয়েরি

কলাবতী, অপুর মা ও পঞ্চু

কলাবতী ও মিলেনিয়াম ম্যাচ

কলাবতীর শক্তিশেল

9 789350 401026